১৩২০ বর্ষ-সূচী।

স



স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৮ম বর্ষ।] ১৩২০ সাল, বৈশাখ। [১ম সংখ্যা।

নূতন বৎসরে ঋষিগণের পদানুসরণ প্রয়াস।

এই প্রবন্ধে যে যে বিষয় আলোচিত হইবে তাই এই:—

১। মনের শান্তি—মনকে বাজে কথা, বাজে কাজ হইতে চুপ করান।

২। ব্যথিতের জন্য ডাকা—মনকে বসাইবার ভিত্তি।

৩। যাঁহাকে লইয়া মন চুপ করিবে তাঁহার কথা।

৪। যাহা করিলে মন চুপ করিবে—ঋষিগণের উপাসনা-প্রণালী।

প্রথম—মনকে চুপ করান।

শত শত ব্যথিতের প্রশ্ন "শান্তি পাই না, কি উপায় করিব?" কেহ শোকতাপে শান্তি পায় না, কেহ পাপ করিয়া শান্তি পায় না, কেহ সংসার-পীড়নে শান্তি পায় না।

কিন্তু শান্তি আছে, শান্তি পাওয়াও যায়। যে যেমন অবস্থায় আসিয়া পড়ুক্ না কেন শান্তি সকলেই লাভ করিতে পারে। প্রথমে ভাবনায় শান্ত হও, পরে যেমন কর্ম্মে পড়না কেন শান্তি আনিতে পারিবে। যদি কখন ভাবনায় শান্তি আনিতে অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা না করিয়া থাক তবে এখন হইতেই আরম্ভ কর। প্রথম প্রথম ক্লেশ হইবে সত্য, কিন্তু প্রত্যহ অভ্যাস কর ক্লেশ দূর হইবে, রস পাইবে, শান্ত হইয়া যাইবে। ভাবনায় শান্ত হইবার কর্ম্মগুলিকে

নিত্যকর্ম্মের অঙ্গ করিয়া ফেল, ফেলিয়া তিন বেলা অভ্যাস করিতে থাক। করিয়া দেখ নিশ্চয়ই শান্তি পাইবে।

কিন্তু শান্তি যে পাওনা বল—কে শান্তি পায় না? শান্তি পায় না মন। মনকে শান্ত করিতে চেষ্টা কর শান্তি পাইবে।

বাজে কথায়, বাজে লেখায়, বাজে কাজে কখন শান্তি পাইবে না। ক্ষণিক চিত্ত-বিনোদন যাহার লক্ষ্য সেইরূপ কথা, সেইরূপ লেখা, সেইরূপ কার্য্য হইতেছে বাজে কথা, বাজে কাজ। এস আমরা এই নববর্ষারম্ভ হইতে বাজে কথা বাজে কাজ ছাড়িয়া মনকে একট চুপ করাইতে অভ্যাস করি। মনকে একবারে চুপ্ করাইবার কৌশল হইতেছে প্রথমে ইহাকে বাজে কথা, বাজে কাজ হইতে অল্পে অল্পে প্রকৃত কাজের দিকে লওয়া যাওয়া। পরে যখন ইহা প্রকৃত কাজের ভাবনায় এক চিন্তাপ্রবাহে ডুবিবে তাহার পরে ইহা একবারে চুপ করিতে পারিবে। একবারে চুপ করা আয়ত্ত করিতে পারিলে শান্তি আর কখন ছুটিয়া যাইবে না।

এখন যে অবস্থায় আছ সেই অবস্থায় যাহা না কহিলেই নয় তাহা না হয় কহিলে কিন্তু প্রবল লক্ষ্য থাকিবে যাহা লইয়া থাকিলে চুপ্ করা যায় তাহা ধরিবার চেষ্টা এবং ধরিয়া তাহারই পুনঃ পুনঃ অভ্যাস। এই না ভাল? অন্ততঃ তিন বেলার নিত্য কর্ম্ম করিবার পরে। ইহা হইল নিঃশ্রেয়স জন্য—পরম শান্ত পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি পাইবার জন্য। ইহা ভিন্ন সমকালে অভ্যুদয় বা জগৎ রক্ষার কর্ম্মেও চুপ করাটি ধরিতে হইবে। অভ্যুদয় বা জগৎ রক্ষা কর্ম্মেও চুপ করাটী ধরার অভ্যাস যাহা তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। পরে ইহা আলোচিত হইতেছে।

কোন কিছুতে মগ্ন না হইতে পারিলে মন চুপ হয় না। মক্ষিকা পুষ্পমধুতে বসিতে পারিলে আর গুন্ গুন্ করে না। মধু ফুরাইলে আবার গুন্‌গুণানি। যে মধু কখন ফুরায় না সেই মধুতে বসিলে আর গুন্ গুন্ হইবে না। এস আমরা এই নববর্ষ হইতে সেই মধু, সেই 'রসো বৈ সঃ" সেই রস স্বরূপ যিনি তাঁহাতে বসিবার আয়োজন করি।

যদি এই জগতে উত্তম গতি লাভের কোন কিছু থাকে তবে ইহা এই আনন্দময়ে মগ্ন হইয়া মনোমায়া শান্ত করা। ইহা কঠিন। এত কঠিন যে শ্রীভগবানের শরণ না লইলে ইহার চেষ্টায় কেহই সফল মনোরথ হইতে পারে না।

এই বিষয়ে পরম পুরুষার্থ কর, প্রাণপণ চেষ্টা কর, করিয়া বল হে ভগবান্ আমি প্রাণপণ করিতেছি সত্য তথাপি আমার দ্বারা তোমাকে পাওয়া হয় না। আমি প্রাণপণ করিয়াও তোমার মুখাপেক্ষী হইয়া আছি। আমার পুরুষার্থে কর্ম্ম নিষ্পত্তি হইবে না। আমার পূর্ণ পুরুষার্থের উপরে যখন আমার দীনভাব তোমার শরণাপন্ন করায় তখনই কার্য্য নিষ্পত্তি হয়।

ইহা সত্য। মনকে চুপ করাইবার জন্য প্রবল পুরুষার্থ চাই আবার শরণাপন্নও হওয়া চাই। কিন্তু কোথায় সে পুরুষার্থ? কোথায় সেই শরণাপত্তি?

মোটেই বসিতে পারি না তার উপর আবার চুপ করান। ইহা কি হইবে? হইবে বৈ কি। যেরূপ করিলে বসা হয় সেইরূপ কার্য্যটিকে নিয়ম করিয়া বসার ভিত্তি করিয়া ফেলিতে হইবে। এস আমরা এই শুভ বর্ষারম্ভ হইতে পরস্পর পরস্পরের মঙ্গল জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রার্থনা করাটিকে নিত্যকর্ম্মের অঙ্গ করিয়া ফেলি।

কিছুতেই যে রস পায় না সেও তাহার প্রিয় ব্যক্তির বা প্রিয় স্বজনের বা পরিচিত দুঃখী আত্মীয়ের জন্য ভগবানকে ডাকিতে পারে।

আমরা এই প্রার্থনাকেই ভিত্তি করিয়া বসা অভ্যাস করিতে বলি।

পরস্পর পরস্পরের জন্য প্রার্থনা কত সুন্দর! পরের দুঃখে কাতর হইয়া সেই মঙ্গলালয়কে, সেই জগৎমঙ্গলকে ডাকা, ডাকিয়া ডাকিয়া নাম জপ করা কত সুন্দর!

পিতা মাতা, পুত্র কন্যার জন্য, পুত্র কন্যা, পিতা মাতার জন্য, স্বামী স্ত্রীর জন্য, স্ত্রী স্বামীর জন্য, গুরু শিষ্যের জন্য, শিষ্য গুরুর জন্য ভগবানের নাম জপ করিবে ইহা কি আবার হইবে? যদি সবাই চেষ্টা করে, করিয়া প্রতি পরিবারে ইহা প্রবর্ত্তিত হয় তবেত বড়ই ভাল হয়।

ঘরে ঘরে পরস্পর পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করাটা যদি নিত্যকর্ম্মের অঙ্গ হইয়া যায় তবে কি মন্দ হয়? অন্ততঃ পরিচিতের মধ্যে যাহারা ব্যথিত, যাহারা পীড়িত, যাহারা পাপীতাপী, যাহারা দাগা পাইয়া জ্বলিতেছে পুড়িতেছে তাহাদের জন্য প্রার্থনা কত সুন্দর! জগতের সকলের জন্য প্রার্থনা ইহা উচ্চ সাধকের কর্ম্ম। গুরু শিষ্যের জন্য প্রার্থনা করিয়া ডাকিবেন, শিষ্যও গুরুর জন্য প্রার্থনা করিবেন; স্বামী স্ত্রীর জন্য ডাকিবেন, স্ত্রীও স্বামীর জন্য ডাকিবে; এইরূপ ভাই ভগ্নী, শিষ্য আচার্য্য সকলেই সকলের জন্য ডাকুক—ইহাতে আবার

সমাজে একটা ধর্ম্মভাব আসিবে। সংসারটা একেবারে আজকালকার অনেক সংসারের মত ঈশ্বর-শূন্য সংসার হইবে না। ইহা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিলে কি সমাজের কিছুই উন্নতি হইবে না? সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও কিছুই কল্যাণ সাধিত হইবে না? হইবে বৈ কি।

ইহা প্রাচীন রীতি। বেদে ইহা দেখা যায়। ঋগ্বেদের শান্তিমন্ত্রে দেখা যায় বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইবার কালে শিষ্য আচার্য্যের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবত্ববতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারাম্। ওঁ শান্তিঃ ৩। মাতঃ শ্রীব্রহ্মবিদ্যে! তুমি আমাকে বোধশক্তি প্রদান করিয়া রক্ষা কর, আমার আচার্য্যকে শিষ্যবোধনশক্তি দিয়া রক্ষা কর। আবার বলি হে মাতঃ ব্রহ্মবিদ্যে! আমাকে রক্ষা কর, আমার আচার্য্যকে রক্ষা কর। আমাদের সকলের ত্রিবিধ দুঃখ শান্তি হউক।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় শান্তিমন্ত্রে পাওয়া যায়—

ও সহনাববতু। সহনৌ ভুনক্তু সহবীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ ৩। হে পরমাত্মন্ তুমি আমাদিগকে—শিষ্য ও আচার্য্যকে আসুরী সম্পদ্ হইতে রক্ষা কর। তুমি আমাদিগকে—শিষ্য ও আচার্য্যকে আপনার অভেদানন্দ ভোগ করাও। আমাদের শিষ্য ও আচার্য্যের মধ্যে যেন বিদ্বেষভাব না থাকে। ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক।

রামায়ণ মহাভারতেও এই প্রার্থনা পাওয়া যায়। শ্রীঅর্জ্জুন অস্ত্রশিক্ষা জন্য তপস্যার্থ যখন হিমালয়ে গমনোদ্যত তখন দ্রৌপদী কাঁদিতে কাঁদিতে অর্জ্জুনের হাত ধরিয়া বলিয়াছিলেন "তোমায় বিদায় দিতে আমার কি হইতেছে তুমি জান। কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে বিঘ্ন দিব না। তুমি যাও আমি নিত্য তোমার জন্য পূজা প্রার্থনা করিব।

আবার শ্রীহনুমান্ যখন শ্রীসীতার অন্বেষণার্থ সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় যাইবেন তখন তাঁহার সঙ্গিগণ বলিয়াছিলেন তুমি যাও! তোমার ইষ্টসিদ্ধি জন্য আমরা একপদে দাঁড়াইয়া প্রত্যহ শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিব।

তাই বলি আজকালকার নিত্য দুঃখপূর্ণ সংসারে এই পূজা ও প্রার্থনার জন্য অভ্যাসের চেষ্টা হইলে কি কিছু কার্য্য হয় না? যাঁহারা সংসারের দুঃখ দেখিয়া ব্যথিত তাঁহারা ঋষিদিগের এই প্রথা আবার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা কি করিবেন?

প্রথমেই এইরূপ প্রার্থনা করিয়া নিত্যকর্ম্মে উপাসনার অভ্যাস করিলে

ও করাইলে কাল্পনিক গল্প লেখার বা কাল্পনিক গল্প পড়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ ক্রমে অগ্রাহ্য হইয়া যাইতে পারে এবং সেই ভূমা সেই চিরস্থায়ী আনন্দস্বরূপের চিন্তা অভ্যাস হইতে পারে।

আর একটু কথা আছে। যাঁহারা নিত্যকর্ম্ম তিন বেলায় করেন তাঁহাদিগকেও নিত্যকর্ম্মের পরে একটু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে অভ্যাস করিতে হইবে। এই চুপ করাটিই শেষের কাজ, শেষ কাজও বটে।

কি লইয়া চুপ করিব যদি বলা যায় তাহার উত্তর তাঁহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া দেহের মধ্যে সহস্রারের পথে যে ত্রিকোণমণ্ডল আছে তাহা পার হইয়া যেন নিত্যধামে পৌঁছিলাম ইহা ভাবনা করিতে হইবে। ভাবনা করিয়া সেই ধামে সেই রমণীয়দর্শকে যেন এই স্পর্শ করিলাম—এই স্পর্শ করিলাম এই ভাবনা করিয়া যতক্ষণ পারা যায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। বিন্দুস্থানটিতে পৌঁছিলে পরমপদের আনন্দহিল্লোলে—সমস্ত স্পন্দনের নিবৃত্তিরূপ পরমশান্ত অবস্থার আভাস অন্ততঃ বিশ্বাসেও আনিয়া চুপ করা ইহাই উচ্চ সাধনা।

তার পর ব্যবহারিক-জগতের লৌকিক কর্ম্মকালে প্রতি ভাবনা, প্রতি বাক্য, প্রতি কার্য্য তাঁহাকে জানাইয়া করিতে অভ্যাস—ইহাই নিষ্কাম কর্ম্মে চুপ করার অভ্যাস।

২ (ব্যথিতের জন্য ভাবনা)

নূতন কথা আর কি হইল ? আমাদের দেশের নিতান্ত অজ্ঞ স্ত্রীলোকেও ত প্রার্থনা করে হে মা দুর্গা, হে মা কালি! আমার ছেলেটির চাকুরী যেন হয়! ছেলেটির রোগ যেন সারে ইত্যাদি। দোকানী পসারী অথবা আফিসের বাবুরাও ত কালীবাড়ীতে মাথা ঠুকিয়া বাহির হন বলেন ঠাকুর! আজ যেন বেশ লাভ হয়, দু'পয়সা উপরি পাই, আফিসের সাহেব বা বড়বাবু যেন সন্তুষ্ট হন। এ প্রার্থনা ত সবাই করে।

করে বটে কিন্তু এটা ব্যভিচার। এটা পাটোয়ারী বুদ্ধি। এটাতে ঈশ্বর-চিন্তা হয় না—হয় স্বার্থচিন্তা। পরস্পর পরস্পরের মঙ্গলচিন্তা জন্য হে মা কালি, হে মা দুর্গা চাকুরী দাও, দু'পয়সা দিয়া দাও এটা নিতান্ত জঘন্য। যেরূপে তাঁহাকে ডাকিতে হইবে—যাহাতে নিজের কাজও হইবে অন্যের কাজও হইবে তাহার সর্ব্বোচ্চভাব পরে আলোচনা করা হইতেছে। সর্ব্বোচ্চ অধিকারীর কার্য্যটি পড়িয়া বা জানিয়া আপন আপন অধিকার মত সংখ্যা

রাখিয়া জপাদি করার অভ্যাসই এখানে বলা হইতেছে। শিবপূজাদির কথাও লক্ষ্য। স্ত্রী স্বামীর জন্য জপ করিবেন বা শিবপূজা করিবেন—ইহাতেই প্রকৃত মঙ্গল হয়। ইহাতেই প্রকৃত ভালবাসা জানা যায়। নতুবা কাঁদিয়া কাটিয়া রাগ করিয়া, ঝগড়া করিয়া, জ্বালাইয়া পোড়াইয়া গহনা কাপড় আদায় করিয়া—অন্য সময়ে তাহাই পরিয়া বাহার দিয়া আসিয়া যদি বলা হয় দেখ দেখি কেমন সুন্দর—সে সুন্দর কেমন সে স্বামীও বুঝেন আর স্ত্রীও বুঝেন। এই রোগ হইতে সমাজ যাহাতে পরিত্রাণ পায় তাহার জন্য ভগবান্ তুমি প্রসন্ন হও এই প্রার্থনা মাত্র অবলম্বন করিয়া জপ বা শিবপূজাদি অভ্যাসের কথা বলা হইতেছে।

আর এক কথাও এখানে বলা উচিত। নিজের খেয়ালমত উপাসনা অপেক্ষা ঋষিদিগের পদানুসরণে প্রার্থনা, উপাসনা, পূজা ইত্যাদি উত্তম। ঋষিগণ আপনারা আচরণ করিয়া যেরূপভাবে উপাসনা করিতে বলিয়া গিয়াছেন তাহারই আলোচনা করিতে আমাদের বাসনা। কিন্তু আমরা কি এই কার্য্যের অধিকারী আর আছি? তথাপি যাহা নিত্য করিতে হয় তাহা আলোচনার চেষ্টাও ভাল। শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপন আপন অধিকার মত কার্য্য করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার প্রসন্নতা অনুভব করা যাইতে কি পারে না? আমরা যে বিষয় আলোচনা করিতে যাইতেছি সেই সমস্ত কার্য্যে যাঁহাদের অধিকার ইহা তাঁহাদেরই জন্য। একটু দেখিলেই যাঁহারা কর্ম্মী তাঁহারা ইহা বুঝিবেন। পুরাণে ঋষিগণ বেদের শিক্ষাই চালাইয়াছেন কিন্তু ভিন্ন প্রকারে। আমরা ঋষিদিগের পথই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করি ইহাই তাঁহাদের নিকট আমাদের প্রার্থনা। অপরে ইহা পাঠ করিয়া নিজের অধিকার মত জপ পূজাদি করিতে অভ্যাস করিলেই কার্য্যসিদ্ধি।

৩ (উপাস্য কে ?)

কাজের কথা আরম্ভ করা যাউক। মানুষ বিপদে পড়িয়া যাঁহাকে ডাকে তিনি কে প্রথমে পরিষ্কাররূপে ধারণা থাকা উচিত। যাঁহার উপাসনা মানুষ করিবে তাঁহার সম্বন্ধে কোন কিছু ধারণা যদি না থাকে, তবে আদৌ তাঁহাতে মনস্থির হয় না। বিশ্বাসে ক্ষণকালের জন্য ডাকা হইলেও তাহাতে কোন কিছু অবস্থা লাভ করা যায় না।

নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ ঈশ্বর এবং অবতার সর্ব্বশাস্ত্র একবাক্যে এই তিনের কথা বলিতেছেন। ইহার কোন একটি বাদ যদি দাও তবে তুমি শাস্ত্রমর্ম্মও ধারণা

করিতে পারিবে না, ঈশ্বরতত্ত্বও বুঝিবে না। তুমি যদি অবতার না মান তবে তোমাকে গীতা, রামায়ণ, ভাগবত, তন্ত্র এবং বহু উপনিষদ্‌কে প্রক্ষিপ্ত বলিতে হইবে। বেদকে কৃষকের গান বলিতে হইবে। পুরাণগুলি কিছুই নয় বলিতে হইবে। ভগবান্ বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, ব্যাস ইত্যাদি ঋষি নিতান্ত ভ্রান্ত ইহা বলিতে হইবে। ভগবান্ শঙ্কর এবং পরবর্ত্তী রামানুজাদি মহাপুরুষের কথা ত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য এইরূপ বুদ্ধি তোমার হইয়া যাইবে। এইজন্য যাঁহারা অবতার স্বীকার করিতে পারেন না, তাঁহাদের বাক্য বেদ শ্রুতি স্মৃতি সমস্ত বিরোধী। এই কারণে এই সমস্ত লোকের কথা অশ্রদ্ধেয়। বাস্তবিক এই সমস্ত লোকের কোন যুক্তিই সদ্‌যুক্তি নহে। উপস্থিত সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ অবতার মানিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে। এ সম্বন্ধে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

বলিতেছিলাম নির্গুণ ব্রহ্ম যিনি তিনি অবিজ্ঞাত স্বরূপ। তাঁহার সম্বন্ধে কোন কিছুই বলা যায় না। তিনি কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন। মন তাঁহাকে চিন্তা করিতে পারে না— বাক্য তাঁহার কথা কি বলিবে? তথাপি শাস্ত্রে আমরা নির্গুণ উপাসনার কথা পাই। উপাসনা এস্থানে স্থিতি। তাঁহাকে কোন কিছু দিয়া ধরা যায় না সত্য, কিন্তু তাঁহাতে স্থিতিলাভ করা যায়। এইটি আপনি আপনি ভাবে স্থিতি। এই আপনি আপনি ভাবে স্থিতিই নির্গুণ উপাসনা। সাধারণের নিকটে ইহা সুদূরপরাহত। ইনি তুরীয় ব্রহ্ম। ইনি সর্ব্বদা আপন স্বরূপে থাকিয়াও আত্মমায়া দ্বারা সগুণ ঈশ্বরভাবে বিরাজ করেন। এই সগুণ ঈশ্বরই অন্তর্যামী, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, বিরাট পুরুষ, জীবের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। নির্গুণ ব্রহ্মই মায়া সাহায্যে সগুণ হয়েন। যখন ইনি সগুণ হয়েন তখন ইনি বিশ্বরূপ। বিশ্বই ইঁহার দেহ। এই সহস্রশীর্ষা পুরুষই জগতের রক্ষা জন্য আবার মায়া মানুষ বা মায়া মানুষী হয়েন। নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রায় লোকে উপাসনা করিতে পারে না। সগুণ ব্রহ্ম বা বিশ্বরূপকেও সাধারণে ধরিতে পারেন। শুধু বিশ্বাসে বলে তুমিই আকাশ, তুমিই বায়ু, তুমিই অগ্নি, তুমিই সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে আছ। আকাশ ছাইয়া তিনি দাঁড়াইয়া আছেন আবার প্রতি জীবের হৃদয়ে রাজা হইয়া তিনি বিরাজ করিতেছেন। এই ভাবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিলেও মানুষ বিশ্বাসের ধর্ম্ম পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। ইহাতেও সাধকের সর্ব্বাঙ্গীন তৃপ্তি হয় না। সেই জন্য অবতার হইতে আরম্ভ করিতে হয়। ব্রহ্মা

বিষ্ণু মহেশ্বর, রাম, কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী ইত্যাদি বহুনাম এই সগুণ ঈশ্বরের। ইঁহাদের কোন একটি অবলম্বন করিয়া সেই রামই বিশ্বরূপে সাজিয়াছেন, সেই কৃষ্ণই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই ঈশ্বর আবার তিনিই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম তিনিই অবিজ্ঞাত স্বরূপ ইহা ভাবনা করিতে পারিলেই ঈশ্বরই কৃপা করিয়া সাধককে ভক্তি মুক্তি উভয়ই প্রদান করেন। যে কালে অবতার থাকেন না সেই সময়ে সাধক আপন গুরুকে রাম, কৃষ্ণ বা কালী, দুর্গা ইত্যাদি বলিয়া তিনিই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা তিনি সচ্চিদানন্দ পুরুষ ইহা ভাবিতে পারিলেও ধর্ম্মজগতের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা ক্রম অনুসারে লাভ করিতে পারেন। সর্ব্বশাস্ত্রে এই জন্য গুরুর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া হউক। শ্রীগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্"। এইটি তাঁহার নির্গুণভাব। তিনি কিছুই করেন না কিছুই করানও না। লোকে বলে যিনি কিছু করান না, কিছুই করেনও না তাঁহাকে কিরূপে উপাসনা করিব? তাই গীতা বলিতেছেন এই পুরুষও ঈশ্বর সাজেন। তখন ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। আবার এই শ্রীকৃষ্ণই বিশ্বরূপে অবস্থান করেন ইহাও শ্রীঅর্জ্জুনকে বলিয়াছেন। শ্রীঅর্জ্জুন প্রথমেই তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনিই যে বিশ্বরূপ, তিনিই যে অবিজ্ঞাত স্বরূপ ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন। সমস্ত দেবতা ইঁহারই অঙ্গীভূত। মহাকাশে ভূতসমূহ মাত্র দেখা যায় কিন্তু সাধনা দ্বারা চিত্তাকাশে উঠিতে পারিলে দেবতার দর্শন লাভ হয়। আর চিদাকাশে উঠিতে পারিলে সেই আপনি আপনি ভাবে স্থিতিলাভ হয়।

আমরা যাঁহাকে লইয়া মন চুপ করিবে তাঁহার কথা এই পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া ঋষিগণের সর্ব্বোচ্চ উপাসনার কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ।

জিজ্ঞাসা।

হে অনন্ত প্রেমাধার, প্রেম বিনিময়ে
তুমি নাকি অভাগার সব দুঃখ ল'য়ে
চাও শুধু অধমেরে করিতে আপন?
বিস্তৃত বিশ্বের মাঝে নিঃসঙ্গ যে জন
তুমি নাকি সব চেয়ে ভালবাস' তারে,
ডাকিছ সতত তব মন্দির দুয়ারে?
এমনি দয়াল তুমি! হে বিশ্বসুন্দর!
কেন করিলে না মোরে নিঃসঙ্গ কাতর?
দাস্যভাব নাহি মনে—তাই বুঝি মোরে
রাখিয়াছ বহুদূরে বড় পর ক'রে?

শ্রী—

জীবাত্মার প্রতি পরমাত্মা।

দুর্ব্বাক্য সহিতে পারিতেছ না বলিতেছ। একে রোগীর নিদারুণ অবস্থা কখন কি হয় কিছুই বলা যায় না। তাহার উপর এইরূপ দুর্ব্বাক্য। ঐ একটী ব্যক্তি হইতেই তুমি দুঃখ পাইতেছ বলিতেছ। যেন আর সহ্য করিতে পারিতেছ না। এই ত?

তুমিত সকলই জানিতেছ। আর জিজ্ঞাসা করা কেন? কিসে প্রতীকার করিব বল।

আমি পরমাত্মা। আমি বেদে তোমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছি। পুরাণে মায়ামানুষ হইয়া উপদেশ করিতেছি। তন্ত্রে মহাদেব পার্ব্বতী হইয়া শোক-শান্তির উপায় বলিতেছি। স্মৃতিতে মন্বাদি ঋষি হইয়া উপায় দেখাইতেছি তবু তোমার হইল না?

শত শত উপায় ত বলিতেছ আমার পক্ষে কোন্‌টি খাটিবে, তাহা মিলাইয়া লইতে পারিতেছি না বলিয়াই না দুঃখ?

আচ্ছা মিলাইয়া দিতেছি। মনোযোগ কর।

শ্রীগীতাতে আমি উপদেশ করিলাম ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যোগ হইলেই কোথাও হইবে অনুরাগ, কোথাও হইবে দ্বেষ। এই রাগ ও দ্বেষের বশে যাইও না: কারণ ইহারা জ্ঞানের শত্রু।

"তয়োন বশমাগচ্ছেৎ" কিরূপ হইলে বশ হওয়া হইল? ইহাতে ত বলিলে না যে রাগদ্বেষ একবারেই উঠিবে না। উঠিতে পারে কিন্তু বশে যাইও না।

হাঁ, তাহাই ত বলিলাম। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যোগ লোকব্যবহারে থাকিলেই হইবে। যখন সমাধি করিতে পারিবে, তখন রাগদ্বেষ একবারেই উঠিবে না। যত দিন তাহা না হইতেছে যত দিন ব্যবহারিক জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াছ তত দিন রাগ ও দ্বেষ জন্মিতে পারে, কিন্তু রাগ ও দ্বেষের বশে যাইও না। রাগ ও দ্বেষের বশীভূত হইয়া কোন কার্য্য করিও না।

রাগ ও দ্বেষ উৎপন্নও হইবে অথচ উহারা আমাকে বশীভূত করিয়া কোন কার্য্য করাইতে পারিবে না। এইরূপ হইবে কিরূপে?

'কোন কার্য্য করাইতে পারিবে না" ইহা ভাল করিয়া ধারণা কর।

বল।

কর্ম্ম তিন প্রকার। মানসিক কর্ম্ম বা ভাবনা। বাচিক কর্ম্ম বা বাক্য-প্রয়োগ এবং হস্ত পদাদি দ্বারা কর্ম্ম।

রাগদ্বেষ উৎপন্ন হইল কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছুই ভাবনা যদি না কর তবে ইহা দ্বারা বাচিক বা শারীরিক কোন কিছুই হইতে পারিবে না। যে সময়ে রাগ বা দ্বেষ উৎপন্ন হইবে সেই সময়ে যদি স্মরণ করিতে পার যে রাগদ্বেষ তোমাকে অনর্থে পাতিত করিবে তবে তুমি সেই অনর্থ নিবারণ জন্য প্রথম হইতে ঘন ঘন ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে আরম্ভ করিবে তখন মন ভগবৎ স্মরণে রাগ ও দ্বেষ ছাড়িয়া ক্রমে ভগবানের পাদপদ্ম স্মরণ করিতে পারিবে। আর যাহারা সর্ব্বদার কর্ম্ম যে ভগবানের নাম করা বা ধ্যান করা ইহা লইয়া পূর্ব্ব হইতে স্মরণ করিতে পারেন তাঁহাদের রাগদ্বেষ জন্মিবা মাত্র লয় হইয়া যাইবে। দেখিবা মাত্র হয়ত রাগদ্বেষ জন্মিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ স্মরণ উগ্রভাবে হইতে লাগিল। ইহাতেই রাগদ্বেধ উৎপন্ন হইয়াও তোমাকে বশীভূত করিতে পারিল না। এই অভ্যাস জন্যই বলিতেছিলাম—যাহাতে আসক্তি যায়—মা মা মা মা করিয়া ডাকিতে থাক। কিছুদিন অভ্যাস কর দেখিবে যাহা দেখিয়া চঞ্চল হইতে, তাহাই

তোমাকে নির্ম্মল আনন্দ দিবে। মা যে বড় নির্ম্মল, মা'কে ডাকিলে মলিনতা ধৌত হইয়া যাইবে। যাহা সুন্দর দেখ তাহারই উপরে মা মা মা মা ডাকা অভ্যাস কর। পবিত্রতা কি বুঝিবে। তবেই তোমার হইল।

ব্যক্ত-বাসনা।

সখা!

তোমারি সেবিকা স্মরণে আমার
পরাণে পুলক জাগে;
নয়নে আনন্দ ঘনায়ে আসে গো-
কি যেন কি নবরাগে।

কবে

তোমারি আদেশ পালিবার তরে
আমারে চাহিবে তুমি?
তোমারি জগতে সকল করমে
তোমারে যাইব নমি?

কবে

তোমার বিজন মনো-বনবাসে
ভরিয়া প্রীতির ডালা,
স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি থরে থরে
রচিব প্রেমের মালা!

আমি

তোমারি চিন্তায় দিবসে রাঙিয়া
রজনী পোহাব জাগি,
অরুণ রঞ্জনে শশির সিঞ্চনে
ঝরিব পূজার লাগি?

সখা!

জেনেছি মরমে এ'হৃদি আকাশে
তুমি সে শারদ ইন্দু;
অনাদি অনন্ত প্রেম-পারাবার
আমিত তোমারি বিন্দু।

কবে

আপন স্বরূপ স্মরণে তোমার
আমারে হইব হারা?
নিবেদি চরণে পিপাসিত হিয়া
সাগরে মিলিবে ধারা।

মৃ (ভবানীপুর)।

বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্রনন্দন।

(প্রথম দর্শনে)

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্বকাননে চায়॥
রাই কেন বা এমন হৈল (ধ্রু)
গুরু দুরজন, ভয় নাহি মন, কোথা বা কি দেব পাইল।
সতত চঞ্চল, বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে,
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসিয়া পড়ে॥
বয়সে কিশোরী, রাজার কুমারী, তাহে কুলবধূ-বালা।
কিবা অভিলাষে, বাঢ়য়ে লালসে, না বুঝি তাহার ছলা॥
তাহার চরিতে, হেন বুঝি চিতে, হাত বাড়াইল চাঁদে।
চণ্ডিদাস কহে, করি অনুনয়, ঠেকেছে কালিয়া ফাঁদে॥

রাত্র এক দণ্ড অতীত হইয়াছে, শ্রীমতী রাধিকা সুদেবী নাম্নী সখীসঙ্গে কথা কহিতেছেন, আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে যমুনায় জল আনিতে গিয়া যমুনাপুলিনে শ্যামসুন্দরকে দেখিয়া আসিয়াছেন। মুখরা ননদিনী সঙ্গে ছিলেন বলিয়া

ভাল করিয়া দেখা হয় নাই, কিন্তু তবু যাহা দেখিয়াছেন, তাঁহাতেই তাঁহার নয়ন মন ভুলিয়া গিয়াছে, এত সুন্দর রূপ বুঝি পৃথিবীর মানুষে হইতে পারে না। ইতিপূর্ব্বে এই যমুনাপুলিনেই একবার শ্যামসুন্দরকে দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে অতি দূর হইতে অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় দেখা হইয়াছিল; তারপর আরও একদিন শ্রীরাধিকার প্রিয় সখী বিশাখা শ্রীকৃষ্ণের একখানি প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করিয়া শ্রীমতীর সম্মুখে ধরিয়াছিলেন, তাহাতে "হঁা এ সেই বটে" বলিয়াই শ্রীরাধিকা মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ক্ষণকাল হইলেও আজ অতি নিকটে সেই নয়নরঞ্জন রমণীয়দর্শনকে দেখিয়াছেন। আজ আর প্রাণ কোন প্রকারেই ধৈর্য্য মানিতেছে না। তাই বড়ই মনোদুঃখে সুদেবীকে বলিতেছেন—

সখি!

ম'লাম ম'লাম শ্যাম অনুরাগে।
মনোহর মধুর, মূরতি নবকৈশোর,
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥
চিতে পাশরিতে নারি, বলনা কি বুদ্ধি করি,
কানু-শেল পশিল মোর বুকে।
টানিলে না টানা যায়, বাহিরিয়ে নাহি যায়,
অন্তর জ্বলয়ে ধিকি ধিকি॥

সখি! আমি মরিলাম, বুঝি তোমরা আর আমাকে বাঁচাতে পারিলে না, আমি শ্যাম-অনুরাগে মরিলাম; শ্যাম-অনুরাগের তীব্র যাতনা আর আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। যে দিন আমি কদম্ব-মূলে ত্রিভঙ্গ-মূরতি শ্যামসুন্দরকে প্রথম দেখিয়াছিলাম, সেই দিন হইতেই সেই মনোহর নবকৈশোর মূর্ত্তি সর্ব্বদা আমার হৃদয়-মাঝে বিরাজ করিতেছে, আমি কোন প্রকারেই মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছি না। সখি! সেই ললিত ত্রিভঙ্গ শ্যামরূপ আমার হৃদয়-মাঝে সুতীক্ষ্ণ শায়কের ন্যায় বিদ্ধ হইয়াছে; এ শর কোন রূপেই আমার হৃদয় হইতে বাহির হইতেছে না। 'আবার আপনা হইতে টানিতেও পারিতেছি না। আজও দেখ্‌লাম—

চরণে চরণ থুয়ে, অধরে মুরলী ল'য়ে
দাঁড়ায়েছে তেরছ-নয়নে।

অঙ্গুলী দোলায়ে শ্যাম, কি জানি কি দেখাওল
সেই কথা সদা পড়ে মনে ॥
কিছু নাহি সহে গায়, কেবা পরতীতি যায়
তিলে প্রাণ তিন ঠাঁই ধরি ।
বসু রামানন্দের বাণী, দিবানিশি নাহি জানি
অন্তর গুমুরে সদা মরি ॥

সেই কালবরণ আমার দিকে একবার চাহিয়াছিলেন। তাঁহার অরুণ নয়নের তেরছ চাহনীতে মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল; তাঁহার দিকে চাহিবা মাত্র, তিনি কালিন্দীর নীলজলের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে যেন কি দেখাইলেন, আমি সে ইঙ্গিত বুঝিতে পারিলাম না, তাঁহার সেই অঙ্গুলী-সঙ্কেত সর্ব্বক্ষণ আমার মনে জাগিতেছে, সখি! তাঁহার রূপ দেখিয়া অবধি কিছুই আমার ভাল লাগিতেছে না, আমার মনের অবস্থা যে কি হইয়াছে, বুঝি তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই, আবার যাহা প্রকাশ করিতে পারি, তাহাই বা কে বিশ্বাস করিবে? সখি! তোমরা আমার অন্তরঙ্গ এবং মর্ম্মী বলিয়াই তোমাদের কাছে প্রকাশ করিয়া থাকি। নতুবা সর্ব্বদা বহিরঙ্গ সহবাসে বাস করিতে হয়, কাহার কাছে আমার অন্তরের কথা প্রকাশ করিব, আমার মর্ম্মান্তিক দুঃখের কথা কে বুঝিবে, তাই মনের দুঃখ মনেই রাখি, অন্তরে অন্তরে গুমুরে মরিলেও মুখফুটে ব'লতে পারি না। সখি! আমাকে ব'লে দেও, কি উপায় করিলে সেই রমণীয়-দর্শনের শ্রীচরণে স্থান পাইব---বলিতে বলিতে শ্রীমতীর চক্ষে জল আসিল, সেই জাবটের নিভৃত প্রকোষ্ঠে কেবল মাত্র শ্রীমতী রাধিকা ও তাঁহার সখী সুদেবী বসিয়া আছেন, শ্রীরাধিকা কাঁদিতেংছন—

হেনকালে তথা, আইলা ললিতা,
রাধা দেখিবার তরে।
সে দশা দেখিয়ে, ব্যথিত হইয়ে,
তুলি বসাওল কোরে ॥
নিজ বাস দিয়ে, মু-খানি মুছায়ে,
পুছয়ে মধুর বাণী।

আজু কেন ধনি, হইলি এমনি,
কি হেতু বলনা শুনি ॥
আজনম সুখে, হাসি বিনা মুখে,
কভু নাহি দেখি আন।
আজু কেন ধনি, কাঁদিয়ে আকুল,
কেমন করিছে প্রাণ ॥
চিকুর অম্বর, এ সব সম্বর,
কেন হ'ল অগেয়ান।
জ্ঞানদাস কহে, মরমে লেগেছে
কালার পিরীতি বাণ ॥

এই ললিতা শ্রীরাধিকার প্রধানা সখী, ললিতা আসিয়া দেখিলেন শ্রীমতী কাঁদিতেছেন, কারণ বুঝিতে পারিলেন না; আপনার বসন-অঞ্চলে শ্রীরাধিকার মুখখানি মুছাইয়া দিয়া অতি ধীরে মিষ্টবাক্যে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—রাজ-নন্দিনি! কাঁদ্‌ছ কেন? তোমার মুখে আমরা হাসি ছাড়া কখনও বিষাদ ভাব তো দেখ্‌তে পাইনি? আজ হাসিমুখ এত মলিন কেন? অকস্মাৎ এমন কি হ'য়েছে, বসনভূষণই বা এলোথেলো দেখ্‌ছি কেন? সখি! তোমার চক্ষে জল দেখ্‌লে আমাদের অন্তরে যে বড় আঘাত লাগে? বল সখি! তোমার প্রাণ অধীর হ'য়েছে কেন? কেহ কি অনাদর ক'রেছে? বা কটুবাক্য বলিয়া তোমার কোমল প্রাণে আঘাত ক'রেছে? এত কাতর কেন?

শ্রীমতী কহিতেছেন।—

কেন গেলাম যমুনায় জলে।
(দেখ্‌লাম)
নন্দের দুলালচাঁদ, পাতিয়া রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছলে কদম্বের মূলে ॥
দিয়া হাস্য সুধাচার, অঙ্গছটা আঠা তার,
আঁখি পাখী তাহাতে পড়িল।
মনমৃগী হেনকালে, পড়িল রূপের জালে,
শূন্য দেহ পড়িয়া রহিল ॥

ধৈর্য্যশালে গর্ব্বহাতী, বাঁধা ছিল দিবারাতি,
ক্ষিপ্ত কৈল কটাক্ষ-অঙ্কুশে।
দন্ত-শিকল কাটি, অতি দ্রুতগতি ছুটি,
পলাইয়ে গেল কোন্ দেশে॥

লাজ ভয় হেমাগার, গুরু গৌরব সিংহদ্বার,
ধর্ম্মের কবাট ছিল তায়।
বংশীরব বজ্রাঘাত, পড়ি গেল অকস্মাৎ
সমভূমি করিল আমায়॥

কালিয়ের কটাক্ষবাণে, কুলশীল কোন স্থানে
ডুবিল হামারি ব্রজবাস।
অবশেষে প্রাণ বাকী, তাও বুঝি যায় সখি,
ভণয়ে জগদানন্দ দাস॥

ললিতে! আজ যমুনায় গিয়া আমার বলিয়া যাহা ছিল সকলই হারাইয়া আসিয়াছি। সেই কদম্বতলবিহারী শ্যামসুন্দর প্রাণ ছাড়া আমার সর্ব্বস্ব লইয়াছেন। জানিনা, যেখানে তিনি থাকেন সেখানকার কুল-কামিনীগণ কি করিয়া সতীধর্ম্ম রক্ষা করেন, তোমরা কি সেরূপ একদিনও দেখ নাই? আমার মাথার দিব্য, সেই কালবরণ শ্যামচাঁদকে একবার দেখিও; এতদিন গৌরবরণকেই আমি সুন্দর বলিয়া জানিতাম, আমার ধারণা দূর হইয়াছে, দেখ্‌লাম কালাচাঁদের কালোরূপে কদম্বকানন আলো করিয়াছে, সখি! সেই কালরূপের মাধুরী আমার দুইটি চক্ষে ধরিল না। যেন মূর্ত্তিমান্ পরমানন্দ কদম্বমূলে ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সো বর নাগর রাজ।
তপন-তনয়া তটে, নীপহি নিকটে,
হেলন নটবর সাজ॥

মরকত মুকুর, রতন জিনি লাবণী,
প্রতি তনু পিরীতি পশার।
শারদচাঁদ, ফাঁদই মুখমণ্ডল,
কুণ্ডল শ্রবণে বিহার॥

নাচত ভাঙ, মদন ধনু ভঙ্গিম,
নটখঞ্জন দিঠি জোর।
বাঁধুলী অধরে, মুরলীধর মাধুরী,
শ্রুতি মন মাতাওল মোর॥
উড়েত চূড়, চারু শিখিচন্দ্রক,
মলয় পবন সহ মেল।
ভণে যদুনন্দন, সবহু রসায়ন,
মম মন রসায়ন-কেল॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীনি—
৭১ নং ফিয়াসর লেন, কলিকাতা।

পূর্ব্ব-স্মৃতি।

২

সে স্বপন সে মদিরা আর ত আসিবে না রে।
জীবনের মত মোর সে নেশা ছুটিল কি রে?
জগৎ আপনা ভুলি যে ভাবে সতত ভোর।
সে ভাব পরশমণি আজি রে কোথায় মোর?
যাহার সেবাতে আমি উন্মত্ত সাধক প্রায়।
সে যাতনা সে কামনা বলিয়া বুঝান দায়॥
সেই মহাবেগ যাহা সতত সাধিত চিত।
যাহার মধুর ভাবে পরাণ ভরিয়া দিত।
কতই মনের শান্তি পাইতাম আমি হায়!
সে ছিল সবেতে মিশি সবই ছিল মেশা তায়॥
ভেঙ্গেছে সে ঘুম ঘোর—এখন উঠিয়া দেখি।
কোথায় গিয়াছে চলি আমারে সে দিয়া ফাঁকি॥
একাকিনী অনাথিনী বসিয়া আমি এখন।
করিতেছি হায়! হায়! আঁখি বারি বরিষণ॥

দিন ত গেছে মা চলি আয়ু-সূর্য্য যায় ডুবে।
এখনও আমার গতি বল মাগো কি হইবে ?
শুনেছি সাধুর মুখে তোমার অনন্ত নাম।
পাপী তাপী দীনে নাকি কর তুমি পরিত্রাণ ?
ছেড়েছি সকল সুখ ছেড়েছে সকল প্রাণ।
আমার সে শেষ দিনে দিও শ্রীচরণে স্থান ॥
ত্রিদিবে নাহিক দেব ! উপমা তুলনা তব।
বড় সাধ হয় তাই তোমাতে ডুবিবে "ভব" ॥
সাঁতার জানিনা প্রভু ! কেমনে ডুবিব আমি।
আমার যা পুঁজিপাটা সব জান অন্তর্য্যামী ॥
তোমাতে লুকান মাগো কিছু ত আমার নাই।
গিয়াছে তোমার বরে মায়ার পাপ বালাই ॥
আরত চায়না প্রাণ ডুবিতে সংসার হ্রদে।
ডুবে যদি মজেনাকো বিষয় মায়ার মদে ॥
কৃপাময় বহু কৃপা ক'রেছ দাসীর পরে।
তোমা ভাবে মাতৃভাব সদা জাগিবে অন্তরে।
যাবৎ প্রারব্ধ ভোগ নাহি শেষ হয় মম।
তাবৎ তোমারে নাহি ভুলি যেন এক ক্ষণ(ও) ॥

গিরিডি।

স্মৃতি-সঙ্কলন।

মালা গাঁথি গাঁথি মনে করি, ভয় হয় যদি ছিঁড়ে যায়।
শেষে হায়, ব্যর্থ মনোরথে—কেঁদে কেঁদে ফিরে যেতে হয়
জীবনের সঞ্চিত কুসুমে মনে হয় গাঁথি আমি হার।
দু'নয়ন অশ্রুপূর্ণ তাহে বেদনার উঠে হাহাকার।
শত ব্যথা জাগ্রৎ হইয়া সূচিবিদ্ধ করি দেয় প্রাণ।
মালা গাঁথা দূরে প'ড়ে থাকে—হৃদে উঠে করুণার তান।

ফুল স্মৃতি ভেসে ভেসে চোকে এনে দেয় কণ্টক যাতনা।
মালা গাঁথা ব্যর্থ আয়োজন—ব্যর্থ মোর স্মৃতি সংযোজনা॥
প্রাক্তনের প্রশস্ত মুকুরে, বর্ত্তমান দেখে অন্ধকার।
ভবিষ্যৎ রঙ্গিন ঝলকে—, পরিকর বাঁধে দুরাশার॥
গুপ্তস্মৃতি সেধে সেধে ডেকে পরবেশি সর্পের বিবরে।
দংশনের মর্ম্মান্তিক জ্বালা, পেতে আর কা'র সাধ করে?
মৃত্তিকার এক দীপশিখা—অন্ধকারে নির্জ্জন আগারে।
জ্বলে যদি কেবা ভেঙ্গে দেয়—মুখ ঢাকি' বসিয়া আঁধারে?
চন্দ্র হাসে যামিনীর ভালে, ফুল ফোটে কাননের গায়।
বৃক্ষতলে ঘন অন্ধকার—চক্ষু মেলি' কেবা দেখে তায়?
মুহূর্ত্তের মুহূর্ত্ত বাড়া'য়ে দ্বন্দ্ব কেন সময়ের সাথে?
যায় যেটী যাক্ চিরতরে—ফিরাওনা ডেকে তারে পথে।
বক্ষে নব উৎসাহ বাঁধিয়া নেমে এসো কর্ম্মক্ষেত্রে ভাই।
কাজ নাই স্মৃতি-সঙ্কলনে—বিয়োগান্তে দুঃখ কাজ নাই।

শ্রীহ—
বরঘরিয়া
(মালদহ)।

প্রয়োজন সিদ্ধি।

(১) প্রকৃতি-পুরুষ।

১। যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে, স্থূলই বল বা সূক্ষ্মই বল সেইখানেই প্রকৃতি ও পুরুষ মিশ্রিত হইয়া আছেন।

২। হংস যেমন জল হইতে দুগ্ধ পৃথক্ করিয়া শোষণ করিতে পারে সেইরূপ যিনি সর্ব্ব মানসিক বা বাহ্যিক ব্যাপারে প্রকৃতি হইতে পুরুষকে পৃথক্ করিতে পারেন তিনিই পরমহংস।

৩। ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে স চরাচরম্। কার্য্য করেন প্রকৃতি। কিন্তু আমি না থাকিলে পারেন না। আমি করিও না, করাইও না। "থাকি

মাত্র। তাহাতে প্রকৃতি আমার চেতনের প্রতিবিম্ব ধরিয়া গর্ভবতী হইয়া সন্তান প্রসব করেন। ইহাই সৃষ্টি। শক্তি শিবময়ী আর শিব শক্তিময়। শক্তির সমস্তই শিব, কিন্তু শিবের সমস্তই শক্তি হইলেও শিবের তুরীয় ভাগ আপনস্বরূপে সর্ব্বদা অবস্থিত। শক্তি দ্বারাই অবিজ্ঞাত পরিপূর্ণ ব্রহ্ম শিব-নামে অভিহিত। শক্তিই শিবমূর্ত্তি কল্পনা করেন। তাহাও ব্রহ্মের একাংশে। অন্য অংশ সদা শান্ত। শিবশক্তিযোগে সৃষ্টি।

৪। শুক্র, শোণিত মধ্যে পতিত হইল। বীজ জলমিশ্রিত মৃত্তিকায় বপন করা হইল। গর্ভমধ্যে প্রকৃতি গোপনে আমার অধ্যক্ষতায় আমার জন্য গৃহ প্রস্তুত করিতে লাগিল। গৃহ প্রস্তুত হইলে আমি গৃহপ্রবেশ করিলাম।

৫। প্রকৃতিনির্ম্মিত গৃহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শরীর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দশ মাস ধরিয়া মাতৃগর্ভে শরীর সৃষ্ট হইল। গর্ভ হইতে বাহিরে আসিল। ২৫ বৎসরে ইহার সমস্ত পুষ্টি হইয়া গেল। গৃহ সৃষ্ট হইল। গৃহের স্থিতি হইল। গৃহটা জড়ের মত রহিল বটে, কিন্তু ইহা প্রকৃতি-পুরুষ-মিলিত অবস্থা। জড়দেহ লইয়া প্রকৃতিপুরুষ খেলা করিতে লাগিলেন। এই দেহে কখনও তাঁহারা জাগ্রৎ হয়েন, হইলে দেহটাও যেন অদ্ভুত কৌশলে জাগিয়া উঠে। রক্তমাংস অস্থিবিশিষ্ট অচেতন একটা পিণ্ড—ইহার উপরে কে যেন শ্বাসের ফুৎকার প্রদান করেন। আর ইহা জীবিত হইয়া যায়। পুরুষ ও প্রকৃতি তখন বাহিরের কত কি দেখেন। এই বাহিরের সমস্ত বস্তুও এই প্রকৃতিপুরুষমিশ্রিত সৃষ্টবস্তু। ইহা পূর্ব্বেই সৃষ্টি হইয়াছিল। ক্ষুদ্র প্রকৃতি ও ক্ষুদ্র পুরুষ মিশ্রিত ক্ষুদ্র দেহ, বৃহৎ প্রকৃতিপুরুষ মিশ্রিত দেহ লইয়া ভোগ করিতে লাগিল।

ক্ষুদ্র দেহ লইয়া যে জাগ্রৎ স্বপ্নাদি আছে, বৃহৎ দেহ লইয়াও সেইরূপ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি আছে।

৬। প্রকৃতি বা শক্তি আপনি গৃহরূপে সাজিলেন। ছিলেন অব্যক্ত। অদ্ভুত কৌশলে ব্যক্ত হইলেন—গৃহরূপে প্রকাশিত হইলেন। পুরুষও চিরদিন অব্যক্ত। শক্তি, রূপ ধরিতে পারে, আকার ধরিতে পারে। পুরুষ কিন্তু অতি সূক্ষ্ম। জ্ঞানটা যেমন জিনিষ, আনন্দটা যেমন জিনিষ—ইনি সেই বস্তু। ইঁহার কোন আকারও নাই, কোন মূর্ত্তিও নাই। ইনি আপনিই আপনি।

ইনি স্বপ্রকাশ। ইনি চেতন। যিনি আপনিই আপনি, যিনি আপনাতে আপনি প্রকাশ তিনি আর এক ভাবে প্রকাশ হইতে চাহেন। কাহার নিকটে প্রকাশ হইবেন? বা কাহাতে প্রকাশ হইবেন?

৭। আপনিই আপনি আছেন। আপনিই আধার, আপনিই আধেয়। এক মহাশূন্যস্বরূপ অতিসূক্ষ্ম মহাপুরুষ আছেন। তিনি ঘন হইলেন। অতিসূক্ষ্ম যাহা তাহা ঘনত্ব প্রাপ্ত হইল। প্রাপ্ত হইলে হইল প্রকৃতি। সেই প্রকৃতিতে এই অতিসূক্ষ্ম চৈতন্য প্রকাশ হইলেন। পুরুষ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া একটা অব্যক্তের ব্যক্তরূপ হইল। এই অব্যক্তের আদি ব্যক্ত অবস্থাতে স্থূলত্ব আসিল না। ইহা সূক্ষ্ম আকার।

৮। এই প্রকৃতিপুরুষজড়িত অবস্থাই অর্দ্ধনারীশ্বর। শক্তি শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ হইয়াও পৃথক্ পৃথক্ সূক্ষ্মদেহে মিলিত। অবিজ্ঞতাস্বরূপ ব্রহ্ম শক্তিমান্ হইয়া পুরুষনাম ধারণ করিলেন। অনির্ব্বচনীয়া শক্তি মায়া হইতে আসিলেন গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপা প্রকৃতিরূপে। প্রকৃতিরূপে ভাসাও অতিসূক্ষ্ম। ইহাও অব্যক্ত। অব্যক্ত প্রকৃতিজড়িত চৈতন্যই হইলেন অর্দ্ধনারীশ্বর।

৯। জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ—জ্ঞানময় আনন্দময় নহে—জ্ঞানানন্দস্বরূপ যিনি তিনি আপনিই আপনি। ইনি ঘন হইলেন কিরূপে? আপনি-আপনিতে মায়া ভাসিলেন কিরূপে? ইনি ছিলেন কোথায়—ভাসিলেনই বা কিরূপে?

১০। মণির ঝলক যেমন স্বাভাবিক, ব্রহ্মসমুদ্রে স্পন্দনাত্মিকা, সঙ্কল্প-স্বরূপিণী মায়ার উদয়ও সেইরূপ। মায়ার উদয় হইলে অখণ্ড ব্রহ্ম, মায়া-পরিচ্ছিন্নমত হইয়া হইলেন চেতনপুরুষ। আবার চেতনপুরুষের চৈতন্যের প্রতিবিম্ব ধরিয়া চেতনবৎ হইয়া মায়া হইলেন প্রকৃতি। এই প্রকৃতিতে গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় রহিল। প্রকৃতি বা শক্তিই অব্যক্ত থাকিলেন।

১১। চেতনপুরুষ আপন প্রতিবিম্ব যখন প্রকৃতিতে নিক্ষেপ করিলেন—প্রকৃতির গর্ভাধান যখন হইল, সত্তামাত্রাত্মক্ মহানের তখন সৃষ্টি হইল। মহানের সঙ্গে পুরুষের যে প্রতিবিম্ব জড়িত হইল তিনি হইলেন জীব।

১২। মায়াকে যিনি বশীভূত করিয়া তাহার গর্ভাধান করেন, সেই পুরুষ হইলেন ঈশ্বর। আবার ঐ গর্ভাধানের ফলে যে সন্তান হইল, তিনি হইলেন মহৎপ্রকৃতিজড়িত পুরুষ বা জীব। এই জীব মায়ার বা অবিদ্যার বশ হইয়া গেলেন। ঈশ্বর মায়াধীশ। জীব মায়াধীন। ব্রহ্ম মায়াতীত।

১৩। সূত্রগুলি যেমন বস্ত্ররূপে পরিণত হয়, সেইরূপ স্পন্দনাত্মিকা সঙ্কল্প বা বাসনাগুলি ঈশ্বরপ্রেরণায় জগৎরূপে পরিণত হয়। অচিন্ত্য মায়ার অতি-সূক্ষ্ম ব্যক্তাবস্থা এই সঙ্কল্প। মায়াতে প্রতিবিম্বিত যে ব্রহ্মচৈতন্য তিনি ঈশ্বর। সগুণ ব্রহ্ম। স্বরূপতঃ তাঁহার আকার না থাকিলেও সঙ্কল্পখচিত সূক্ষ্ম জগৎবস্ত্রই ঈশ্বরের রূপ।

বস্ত্রের সহিত তন্তুবায় যেমন সূক্ষ্মভাবে মিলিত থাকে, সেইরূপ সঙ্কল্প-পুঞ্জের সহিত সঙ্কল্পকর্ত্তা মিলিত থাকেন। তিনিই ঈশ্বর। সূত্র সঙ্কুচিত হইলে যেমন বস্ত্র সঙ্কুচিত হয়, সূত্রবিস্তারে যেমন বস্ত্রের বিস্তার—সেইরূপ বাসনা যে যে স্থানে যেরূপে বিকৃত হয়, অন্তর্যামী ঈশ্বরও সেই সেই রূপে প্রকাশিত হয়েন।

১৪। মম যোনি মহৎ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্। সগুণ ব্রহ্ম পরমেশ্বর সত্তামাত্রাত্মক প্রকৃতির আদ্যবিকারস্বরূপিণী মহৎ ব্রহ্মে যে অহং বহুস্যাম্ রূপ সঙ্কল্প নিক্ষেপ করেন তাহা হইতেই স্থাবর জঙ্গমাদির সৃষ্টি হয়।

১৫। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞযোগে সমস্ত সৃষ্টি। ক্ষেত্রজ্ঞকে ঈশ্বর ও জীব উভয়াখ্যা দেওয়া যায়। ঈশ্বর অপরাপ্রকৃতিতে জীবচৈতন্য নিক্ষেপ করিয়া এই সৃষ্টি উৎপন্ন করিয়াছেন। এখন সৃষ্টিব্যাপারে ঈশ্বরের কার্য্য কতটুকু এবং জীবের কার্য্যই বা কতটুকু দেখিতে হইবে।

১৬। অহং বহুস্যাম্ আমি বহুশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া বহু হইব—এই সৃষ্টি-বিষয়ক সঙ্কল্প হইতে সর্ব্ববস্তুতে অনুপ্রবেশ পর্য্যন্ত সমুদায় ব্যাপার ঈশ্বরের কার্য্য।

ঈশ্বরই সর্ব্ববস্তু সৃষ্টির সঙ্কল্প করিয়া সেই সেই বস্তুতে অনুপ্রবেশ করেন। এইটুকু ঈশ্বরের কার্য্য।

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত সমুদায় ব্যাপার জীবকর্ত্তৃক পরিকল্পিত।

২. জীব ও ঈশ্বর।

১। ঈশ্বর বলেন প্রতিক্ষেত্রে আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ।

বিদ্ধিসর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত ইত্যাদি।

২। প্রতি দেহে কিন্তু যিনি আছেন অনুভব করা যায় তিনি জীব।

তিনি অল্পজ্ঞ। তিনি নিজ স্থূলদেহের কতক অংশে নিয়ন্তা। নিজ সূক্ষ্ম দেহের কতক অংশে অন্তর্যামী। ইনি অল্পশক্তিমান্।

৩। যিনি কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ, যিনি সর্ব্বান্তর্যামী, যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা তিনিই ঈশ্বর। ইনি সর্ব্বশক্তিমান্।

৪। আকাশের ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন অংশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া যেমন ভাবনা করা যায় যেন অনন্ত আকাশের ছায়া ইহাতে পড়িয়াছে, সমুদ্রের এক অংশমাত্র প্রত্যক্ষ করিয়া যেমন ভাবনা করা যায় ইহা সীমাশূন্য সমুদ্রেরই অংশ—সেইরূপ অল্পজ্ঞকে দেখিয়া ভাবনায় দেখা যায় যেন ইনি সর্ব্বজ্ঞেরই অংশ। সর্ব্বজ্ঞই যেন ইহাকে ছুঁইয়া আছেন। অল্পজ্ঞকে দেখিতে দেখিতে অল্পজ্ঞে একাগ্র হইলে যখন ইহার উপাধিটি ভুল হইয়া যায়, দেহজড়িত চৈতন্যকে ভাবিতে ভাবিতে যখন চৈতন্য অংশটিতে মন একাগ্র হয়, যখন জড়দেহটি হইতে মনটি গুটাইয়া আসিয়া চৈতন্যে লগ্ন হইবার জন্য জড়ভাবটি ভুল হইয়া যায়, যখন অল্প এই উপাধিটি বিস্মৃতিগর্ভে ডুবিয়া যায় তখন অজ্ঞ ও সর্ব্ব উপাধির নাশে যিনি আপনিই আপনি, যিনি শুধু জ্ঞ তিনিই জাগেন।

৫। বিস্মৃতি ক্ষণকালের জন্য হইতে পারে বা দীর্ঘকালের জন্য হইতে পারে, কিন্তু শরীরের ভুল হইলেও আবার যখন শরীর ও জগৎ স্মৃতিপথে আইসে তখন যাহা ছিল তাহাই হয়। কিন্তু যদি বিচার দ্বারা দেখা যায় শরীর ও জগৎ ভুল, মিথ্যা, তবে ইহা ভুল হইয়া আবার স্মৃতিতে আসিলেও কোন ভয়ের কারণ নাই। কারণ যাহা মিথ্যা তাহা উদয় হউক বা না হউক উভয়ই সমান।

৬। শরীরী শরীরকে "আমি" বলিলেই অল্পজ্ঞ, বদ্ধ জীব। জীব জগৎ-শরীরকে আমার শরীর ভাবিয়া, বিরাট্ দেহকে আমার দেহ ভাবিয়া ঐ দেহের নিয়ামকভাবে থাকিলেই ঈশ্বর। আবার ক্ষুদ্র বা বিরাট্‌দেহের অভিমান ছাড়িলেই আপনি আপনি।

৭। যিনি আপনিই আপনি তিনি স্বস্বরূপে থাকিতে যখন ইচ্ছা করেন তখনই স্বস্বরূপে থাকেন। ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি। ব্রহ্ম নিত্যই ব্রহ্মভাবে অবস্থিত। স্বস্বরূপে অবস্থান করিয়া কখন প্রকৃতির অধীশ্বর—বিরাট্ দেহের নিয়ামক হইয়া ইনি ঈশ্বর। কখন ক্ষুদ্রশরীরে অভিমান করিয়া—ক্ষুদ্রদেহে বদ্ধমত হইয়া ইনিই জীব। বহুদিন অভিমান করাটা বদ্ধাবস্থা। আবার

বহুদিন ধরিয়া অভিমান ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলেই মুক্ত অবস্থা লাভ হয়।

৮। বহুদিন শরীরী অভিমান হইয়া গেলে, "আপনিই আপনি" ভাব যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা ধারণায় আইসে না। আমিই আছি আর কিছুই নাই—আমি পরমশান্ত, সর্ব্বপ্রকার চলনরহিত, কি যেন করিতেছি তাহাও জানিবার কেহ নাই—প্রকৃতপক্ষে করাও কিছু নাই, করানও কিছুই নাই, অন্য কিছুই নাই আমিই আমি—এই ভাব বদ্ধজীবের ভাল লাগে না। সেই জন্য মুক্তিটি কি বুঝাইয়া দিলেও সকলে মুক্তি চায় না। অদ্বৈত ভাবটি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা ধারণা করিতে পারে না। সুখস্বরূপ হইতে সকলে চায় না সুখ ভোগ করিতে চায়। চিনি হইতে ভালবাসে না, চিনি খাইতে চায়। কিন্তু চিনি খাওয়া যতদিন আছে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চিনি না খাওয়া অবস্থাও ততদিন থাকিবে। এই ভয় ততদিন থাকিবেই।

৯। আপনিই আপনি এই ভাবে সর্ব্বদা থাকিয়া আপনা হইতে যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ভাব তাহাতে উঠে—সমুদ্রে তরঙ্গের মত ব্রহ্মে যখন ব্রহ্মা স্বভাবতঃ উঠেন, উঠিয়া আপন প্রকৃতিতে সুপ্তজীবের অনাদিকাল-সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার আলোচনা করিয়া তাহাই দেখেন, তখন করুণা পরবশ হইয়া যাহাতে উহারা মুক্ত হয় তজ্জন্য সহ যজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ইত্যাদি জ্ঞান উপাসনা কর্ম্মের সহিত জীব সৃষ্টি করিয়া সেই কর্ম্মের দ্বারা আপনিই আপনি ভাব লাভ করিতে বলেন।

১০। ব্রহ্মভাব লাভ করিতে পারিলেই ব্রহ্মভাবে স্বতঃসিদ্ধ মায়া উঠিবে। মায়া উঠিয়া ঈশ্বর ও জীব কল্পনা করিবে। ঈশ্বর আমি বহু হইব কল্পনা করিয়া সমস্ত সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিবেন, আবার জীব সুষুপ্তি স্বপ্ন জাগ্রৎ এই তিন অবস্থা হইতে মুক্ত পর্য্যন্ত কল্পনা করিবেনই। এ খেলা কবে আরম্ভ হইয়াছে কেহ জানে না। ফলে সৃষ্টি অনাদি। অনাদি হইলেও ইহার পুনঃ পুনঃ অন্ত হয়।

১১। ব্রহ্মভাবে স্থিতি হইলেই অর্দ্ধনারীশ্বরভাবে আদি দম্পতীর স্থির শান্তভাবে পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন, প্রকৃতি পুরুষ হইয়া প্রণয়, কলহ, মান ইত্যাদি এবং জীবের সহিত প্রকৃতির রঙ্গ—ইহা উঠিবেই। স্বস্বরূপে থাকিয়া ঐন্দ্রজাল দর্শন অপেক্ষা আনন্দ আর কি আছে।

১২। মায়া কখন ব্রহ্মে লুকাইতেছেন কখন ব্রহ্মে ভাসিয়া ঈশ্বর তুলিতেছেন, কখন ঈশ্বরকে আপন নৃত্যদ্বারা অভিভূত করিয়া জীবত্বে আনিতেছেন—এ রঙ্গ দর্শন বড়ই সুখের। কখন দুঃখী দেবতাদিগের কাতর আহ্বানে আপনি আসিয়া দেবতাদিগের বিঘ্ন বিনাশ করিতেছেন, কখন বা আপনি অসুরগৃহে আবদ্ধ হইয়া পুরুষ দ্বারা অসুর বিনাশ করাইতেছেন, কখন বা ক্লীব সংসারের সহিত জড়িত হইয়াও ক্লীব সংসারকে ফাঁকি দিয়া আপন রমণীয় দর্শনের সহিত মিলিত হইতেছেন। মায়ার এই সমস্ত আচরণ দেখিয়া, বরণীয় ভর্গের লীলা দেখিয়া নিজের উদ্ধার সাধন করিতে পারিলে—যা চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়।

(৩) উপাসনা।

১। সহস্রাশীর্ষা পুরুষঃ ইত্যাদিতে পুরুষসূক্ত দেখাইলেন ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত এই বিশ্ব সেই বিরাট্ পুরুষের অবয়ব। হউক অবয়ব কিন্তু ঈশ্বর-আরাধনা কেন?

২। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্, প্রজাপতি, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, অগ্নি, বিঘ্ন ভৈরব, মৈরাল মারিক, যক্ষ রাক্ষস এই সমস্ত দেব উপদেব। আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই বর্ণ চতুষ্টয়, গো অশ্ব মৃগাদি পশুবর্গ; গরুড়, শুকাদি বিহঙ্গমবর্গ; অশ্বত্থ বটাদি বৃক্ষবর্গ; যব ধান্য তৃণাদি ঔষধি সমস্ত; জল, প্রস্তর মৃত্তিকা, কাষ্ঠ কুদ্দাল প্রভৃতি যাবতীয় সৃষ্টবস্তু—ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ জড়িত। সমস্তই ঈশ্বরের অংশ।

ঈশ্বরাঃ সর্ব্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ"।

৩। সর্ব্বময় ঈশ্বর সকল পদার্থে সর্ব্বদা বিদ্যমান এজন্য সকলই পূজনীয়। যে ব্যক্তি যে কোন বস্তুকে ঈশ্বরজ্ঞানে আরাধনা করে তাহারই কাম্যফল সিদ্ধি হয়। আর যে ব্যক্তি যে প্রকারে ঈশ্বরের উপাসনা করে সেই ব্যক্তি সেই উপাসনার অনুরূপ ফল ভোগ করিতে সমর্থ হয়। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

৪। পূজ্যবস্তুর স্বরূপ ও পূজানুষ্ঠানের তারতম্য অনুসারে উপাসনা-ফলেরও উৎকর্ষ আছে।

৫। পৃথক্ পৃথক্ কাম্যফল সাধনের জন্য পৃথক পৃথক্ উপায় আছে। কিন্তু মুক্তি সাধনের জন্য ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান ভিন্ন—আপনিই আপনি এই ভাব

পরিজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। যেমন স্বীয় স্বপ্নাবস্থা নিবারণ নিমিত্ত স্বীয় জাগরণ ভিন্ন অন্য উপায় নাই সেইরূপ আত্মতত্ত্ব না জানা পর্য্যন্ত আপনিই আপনি ভাবে স্থিতি নাই।

৬। আপনিই আপনি ভাব না লাভ করা পর্য্যন্ত আদিদম্পতীর স্থির শান্তভাব দর্শন নাই; দুর্গা, সীতা, রাধা ভাব উপলব্ধি নাই। অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলেই বিশ্বনর্ত্তকীর অদ্ভুত রঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। তখনই ঈশ্বর জীব দেহাদি চেতন অচেতনাত্মক নিখিল বিশ্ব মায়া, কল্পিত স্বপ্নরূপে প্রতীয়-মান হয়।

৭। ঈশ্বরতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব আলোচনা কেবল সেই ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান জন্য। যাবৎ ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান না হয় তাবৎ আমরা ঈশ্বর লইয়া, ও জীব লইয়া থাকি।

৮। জীব ও ঈশ্বর মায়ারূপিণী কামধেনুর দুইটি বৎস। ইহারা সেই কামধেনুর দ্বৈতরূপ দুগ্ধ পান করে। ইহাতে অদ্বৈত ভাবের কোন হানি হয় না। অদ্বৈত বস্তু সর্ব্বদা চিৎরূপে ভাসমান। দ্বৈত বস্তু সকল—মায়াময়, অনিত্য। সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাঃ—হইলে অদ্বৈত লইয়া থাকা যায়।

৯। তত্ত্বাভ্যাস মনোনাশ বাসনাক্ষয়—সমকালে সাধনা করিলে আপনিই আপনি ভাবে স্থিতি হয়। এই তিনের মধ্যে তত্ত্বাভ্যাসটিই শ্রেষ্ঠ। দ্বৈত বস্তু অনিত্য, অদ্বৈত বস্তু নিত্য—ইহার অনুশীলনই তত্ত্বাভ্যাস। তত্ত্বাভ্যাস করিতে করিতেই—দ্বৈতের মিথ্যাত্ব বোধ হয়। এই অবস্থায় বোধ হইবে অচিন্ত্যরচনাময় এই জগৎ মায়ারই কার্য্য। দেহ বা জগৎ ভুলিয়া থাকা তত্ত্বজ্ঞান নহে—দেহ বা জগৎ মিথ্যা ইহা জানাই তত্ত্বজ্ঞান।

১০। চেতন নিত্য, জড় অনিত্য। চেতনের অভাব অনুভূত হয় না। কারণ এই অভাব অনুভব করিবে কে? কোন কিছুর অভাবও যে অনুভব করে সেও চেতন। চেতনই অনুভব কর্ত্তা, জড় পদার্থের অনুভব শক্তি নাই। এই জন্য চৈতন্য নিত্য। জড় অনিত্য।

১১। বিশেষরূপে শাস্ত্রার্থ পর্য্যালোচনা করিলে বুদ্ধির মালিন্য কাটে—সাধনার রুচি বর্দ্ধিত হয়, তখন চৈতন্যকে জড় হইতে পৃথক্ বুঝিয়া আপনিই আপনি ভাবে স্থিতিলাভ করা যায়। কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা বুদ্ধির শুদ্ধি হয় বিচার দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। অদ্বৈত তত্ত্ব বিচারই বিচার।

১২। তত্ত্ববিচারে রিপু মল দূর হয়। জীবন্মুক্তি হয়। রিপু সকল হৃদয়গ্রন্থি। কামনাই হৃদয়গ্রন্থি। আপনিই আপনি ভাবই স্বরূপ—এইটুকু বুঝিতে পারিলেই, অদ্বৈতটি সত্য এইটি, ধারণা করিতে পারিলে সর্ব্বসিদ্ধি।

১৩। স্বরূপটি ধারণা করিয়া আমিই সেই, পূর্ণভাবে ইহাতে বিশ্বাস করিলেও কখন কখন পরম সন্তোষ লাভ হয় না। হৃদয়গ্রন্থি বিনষ্ট হইলেও প্রারব্ধ-কর্ম্ম দোষে ইচ্ছাদি জন্মে: পাপীরও অদ্বৈত বোধ জন্মে কিন্তু তাহাতে সন্তোষ হয় না। তাহার পাপই প্রারব্ধরূপে প্রতিবন্ধক হয়। পাপই অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করায়। ইহা কাটিয়া গেলেই স্থিতিলাভ হয়। হরি হরি করিয়া প্রারব্ধের কটা দিন কাটানই পাপা অদ্বৈতপরায়ণের কর্ম্ম। প্রবৃত্ত কর্ম্মেরও দ্বেষ নাই, নিবৃত্ত কর্ম্মেরও আকাঙ্ক্ষা নাই। উদাসীন নহে উদাসীনবৎ স্থিতিই এইরূপ সাধকের কার্য্য। কিন্তু আপনিই আপনি ভাব স্মরণই কার্য্য—সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ।

সমালোচনা।

১। আহ্নিককৃত্য। ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড একত্রে দশম সংস্করণ। মূল্য বিলাতি বাঁধা ॥৵০, কাগজে বাঁধা ॥০। ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড একত্রে মূল্য ১।০। চণ্ডী বাঙ্গলা পদ্য। মূল্য ॥৵০ আনা। ৫ম সংস্করণ। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন প্রণীত যে সমস্ত পুস্তকের অনেকগুলি সংস্করণ হয় সেগুলি সমাজে যে বিশেষরূপে আদৃত সে বিষয়ে সংশয় নাই। সন্ধ্যা আহ্নিক না করিয়া ব্রাহ্মণ থাকা যায় না একথা এখন ইংরাজী শিক্ষিত যুবকেও কতক কতক বুঝিতেছেন। ভাবনা বাক্য ও কর্ম্মে যে সমস্ত ব্যভিচার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, বক্তৃতায় দেবতা আর কর্ম্মে শয়তান এই যে দ্বিবিধ চরিত্র ভ্রষ্টাচারী মানুষ উপার্জ্জন করিতেছে—সেই সমস্ত মারাত্মক দোষ সংশোধন করিতে হইলে স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ভিন্ন যে অন্য উপায় আর নাই ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইতেছে। কারণ কর্ম্মশূন্য জ্ঞানালোচনার ফল নাস্তিকতা আর জ্ঞানশূন্য কর্ম্ম করায় গোঁড়ামি—আধুনিক সমাজের এই প্রবল দোষদ্বয় হইতে আধুনিক সমাজের প্রায় সমস্ত সাজ্ঘাতিক রোগ উৎপন্ন হইয়াছে।

কবিরত্ন মহাশয়ের আহ্নিক কৃত্য পুস্তকখানি একদিকে নাস্তিকতা নিবারণ জন্য যেমন কর্ম্ম করিবার শাস্ত্রীয় পন্থা দেখাইয়া দিতেছে অন্যদিকে সমাজকে গোঁড়ামী হইতে রক্ষা করিবার জন্য কর্ম্মের লক্ষ্য যে অর্থাবধারণ পূর্ব্বক জ্ঞান লাভ করা তাহাও প্রদর্শন করিতেছে। এই জন্যই এই পুস্তকখানি সমাজে বিশেষরূপে আদৃত। সন্ধ্যা আহ্নিকের মন্ত্রগুলি সংশোধন করিতে এবং সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের অর্থ করিতে যে কঠোর পরিশ্রম কবিরত্ন মহাশয়কে করিতে হইয়াছে তজ্জন্য আধুনিক সমাজ যে তাঁহার নিকট বিশেষরূপে ঋণী এ কথা হিন্দু সমাজের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। সন্ধ্যাভাবগুলি কাহার পরে কি আসিল এখনও সমাজে ইহা বুঝিবার চেষ্টা প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু মন্ত্র ও মন্ত্র অর্থ সম্বন্ধে সন্ধ্যা আহ্নিকের যতগুলি পুস্তক এই সময়ে প্রচলিত তন্মধ্যে এই পুস্তকখানি যে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট একথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। যাঁহারা সন্ধ্যা আহ্নিক করিয়া ব্রাহ্মণ থাকিতে চান আমরা তাঁহাদের সকলকেই এই পুস্তকখানি ক্রয় করিতে বলিয়া আসিতেছি এখনও বলিয়া থাকি। ৪র্থ ও ৫ম খণ্ডে কবিরত্ন মহাশয় কতকগুলি নিত্য পাঠ্য স্তোত্র ব্যাখ্যাসহ, এবং বিদ্যারম্ভ, জন্মতিথি, দীক্ষা, পুরশ্চরণ, প্রতিমা পূজা, শ্রাদ্ধমন্ত্র, বিবাহ মন্ত্র ইত্যাদি নিতান্ত আবশ্যকীয় কর্ম্মের মন্ত্র ও ব্যাখ্যা দিয়া কর্ম্মকাণ্ডের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা যে সকল হইয়াছে তাহা সাধু প্রকৃতির সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। চণ্ডীর বাঙ্গালা কবিতা সুন্দর হইয়াছে। গোপাল চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা এবং চণ্ডী পাঠক্রম এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়া কবিরত্ন মহাশয় এই পুস্তক খানিকেও সময়ের উপযোগী করিয়াছেন। আমরা নিরপেক্ষ ভাবে যতদূর বিচার করিতে পারিয়াছি তাহাতে এই মাত্র বলি কবিরত্ন মহাশয়ের এই পুস্তকগুলি যাঁহারা হিন্দুভাবে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের সকলের পাঠ করা উচিত; শুধু পাঠ নহে অর্থ বুঝিয়া শাস্ত্রমত কর্ম্ম করা একান্ত কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন অন্য উপায়ে সমাজের মঙ্গল সাধিত হইবে না।

পরিশেষে আহ্নিক তত্ত্বে দুই একটি বিষয়ের মীমাংসা জন্য আমরা কবিরত্ন মহাশয়কে অনুরোধ করি। (১) যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যা প্রয়োগে প্রাণায়ামে নাভী, হৃদয় ও ললাটে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরের ধ্যান করিতে হয়, কিন্তু গায়ত্রী ধ্যানে মধ্যাহ্নে রুদ্রাণী এবং সায়াহ্নে বৈষ্ণবী এইরূপ হওয়ায় যেন ক্রমভঙ্গ মত বোধ হয় ইহা কেন হইয়াছে

(২) যতগুলি সন্ধ্যার পুস্তক আমরা দেখিয়াছি সকল গুলিতেই পাই যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং…অহস্তদবলুম্পতু। মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের সন্ধ্যা-প্রয়োগ এবং ব্রাহ্মণ কণ্ঠাভরণ পুস্তকে বন্ধনীমধ্যে রাত্রিস্তদবলুম্পতু পাঠও আছে। কবিরত্ন মহাশয় বন্ধনীর অংশটুকু বাদ দিয়াছেন এবং নারায়ণ উপনিষদের প্রমাণ দিয়াছেন। দ্বিতীয় নারায়ণোপনিষদে রাত্রির পাপ দিনের সন্ধ্যায় এবং দিনের পাপ রাত্রির সন্ধ্যায় নষ্ট হউক ইহা পাওয়া যায়। ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যও গায়ত্রীহৃদয়ে বলিতেছেন প্রাতরধীয়ানো রাত্রিকৃতং পাপং নাশয়তি। সায়মধীয়ানো দিবসকৃতং পাপং নাশয়তি ইত্যাদি। এরূপ স্থলে প্রচলিত পাঠ পরিবর্ত্তন না করিলে দোষ কি? বিশেষ দুইই যখন শ্রুতিবাক্য তখন বন্ধনীমধ্যে উভয় পাঠ ধৃত করিলে কোন ক্ষতি ছিল কি?

আমরা বাহুল্যভয়ে এবং স্থানাভাবে অন্য দুই চারিটি বিষয় উল্লেখ করিতে পারিলাম না। কবিরত্ন মহাশয় প্রতি নূতন সংস্করণে সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনের শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়া সন্দেহ দূর করিতেছেন। সন্ধ্যাদি যে ভাবে চলিতেছে তাহাতে লোকের সর্ব্বপ্রকার সন্দেহ তুলিয়া তাহা নিবারণ জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

২। পঞ্চ মকার বা পঞ্চাঙ্গ যোগ। শ্রীযাত্রামোহন দাস। সীতাকুণ্ড চন্দ্রনাথ। মূল্য।• আনা। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র। কিন্তু ইহাতে তন্ত্রশাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা আছে। যে তন্ত্র দেবতাদিগের জন্য ইহা তাহারই ব্যাখ্যা। তন্ত্রের যে ভাব অসুরদিগের জন্য এই পুস্তকে তাহা বাছিয়া লইয়া বর্জ্জন করিতে বলিতেছেন। সকলেরই ইহা পাঠ করা উচিত।

আর এক বৎসর।

যদিও সময় আছে ভাবিতেছ কিন্তু তৈল ও বর্ত্তিকা থাকিতে থাকিতেও অনেক সময়ে প্রদীপ নিবিয়া যায়।! বিশেষ সমস্ত দরজা খোলা আছে। কখন কোন্ দরজা দিয়া ঝট্‌কা বাতাস আসিবে, আসিয়া প্রদীপ নিবাইয়া দিবে

তাহার স্থিরতা কি আছে? দিন থাকিতে প্রস্তুত হও। সময় থাকে থাক—প্রস্তুত হইয়া অন্য কর্ম্ম কর তাহাতে আপত্তি কি?

কিরূপে প্রস্তুত থাকিতে বলিতেছ?

শেষকালে যাহা করিবে বলিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছ তাহা একবারে শেষ করিয়া ফেল। মনে যেন না উঠে অমুক কর্ম্ম কিছুদিন পরে করিব। এই ভাবে কাজগুলি সারিয়া অন্য কতকগুলি বিষয়ে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে হইবে।

যখন দেখিবে তোমার আর বন্দোবস্ত করিবার কিছুই নাই তখন তুমি প্রস্তুত হইয়াছ। তারপর যে কয়েকদিন জীবন থাকে তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টার কতকগুলি কার্য্য লইয়া থাক। এই সমস্ত কার্য্য করিতে করিতে জীবন শেষ হইলেও তোমার কোন দুঃখের কারণ নাই। বরং উন্নতিই হইবে।

এক বৎসর ধরিয়া চেষ্টা কর :—

(১) কাহারও দোষ উল্লেখ করিব না।

(২) লোকের গুণ উল্লেখ করিতে আনন্দিত হইব। যদি যথার্থ দোষ কাহারও থাকে তথাপি নিন্দা করিব না। যে অন্যায় করে তাহার অন্যায়-ব্যাপার লোককে বলিলে ত নিন্দা হয় না। ইহা করাও কি উচিত নয়?

যদি পবিত্র হইতে চাও তবে কাহারও নিন্দা করিও না। শ্রীভাগবত বলেন, যে পরের গুণে দোষারোপ করে না, যে কাহারও নিন্দা করে না, যে অন্যের প্রশংসা করিতে আনন্দ পায় আর যে ব্যক্তি সর্ব্বজীবে দয়া করে ভগবান্ তাহার হৃদয়ে উদয় হয়েন।

এই ত শাস্ত্রপ্রমাণ দেওয়া গেল। এখন যুক্তিও দেখ।

স্ত্রীলোক হউক বা পুরুষ হউক তুমি যেন কাহারও চরিত্রে নিন্দাবাদ তুলিও না। আগে দেখ তোমার চরিত্রে কোনপ্রকার দোষ আছে কিনা? যে দোষের জন্য অন্যের চরিত্রে তুমি কলঙ্ক রটনা করিতেছ সেই প্রকার দোষ এক সময়ে তোমাতেও যদি থাকিয়া থাকে তবেত তুমি কখন লোকের নিকট কাহারও ঐপ্রকার দোষ প্রকাশ করিতে পার না। কারণ ভগবান্ যদি তোমার দোষ ক্ষমা করিয়া থাকেন—যুবাকালে যে দোষ করিয়াছ এখন হয়ত আর সে দোষ তোমার নাই—ভগবান্ ক্ষমা করিয়াছেন দেখিয়া তুমিও অন্যকে ক্ষমা করিতে শিক্ষা কর। অন্ততঃ নিজের অপরাধ স্মরণ করিয়া পরের দোষ আর রাষ্ট্র করিও না।

আর এক কথা লক্ষ্য কর। এখনত পাপ করিতেছ না কিন্তু পূর্ব্ব পাপের স্মৃতি ত তোমায় ছাড়ে নাই। যতদিন না তুমি পাপের স্মৃতিও ভুলিতেছ ততদিন ত তোমার নিজের কাজ অনেক আছে। অন্যের সমালোচনা করিবার সময় তোমার কথায়?

গত পাপের স্মৃতি ভুলিব কিরূপে?

উপস্থিত লইয়া থাক। গত বিষয়ও স্মরণ করিও না এবং ভবিষ্যতেও কি হইবে তাহাও ভাবিও না।

উপস্থিত লইয়া থাকিব কিরূপে? উপস্থিত লইয়া থাকিতে গেলে পাপ ও ভবিষ্যৎ দণ্ড কি বাধা দেবে না?

উপস্থিত কার্য্যটি ধরিয়াই গত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় এবং ভবিষ্যতের আশা রাখিতে হয়।

একটা দৃষ্টান্ত দাও।

মনে কর তোমার সর্ব্বদা করিবার কাজটি নাম জপ। এই নাম জপে তুমি এরূপ ভাবে একাগ্র হও যাহাতে আর তোমার কিছুই মনে না থাকে। নিত্য তিন বেলাত অভ্যাস করিবেই, তদ্ভিন্ন গায়ত্রীপুটিত করিয়া সর্ব্বদা নাম জপ কর। কখন বা শুধু নাম কর। এই ভাবে বেশী বেশী জপ না করা পর্য্যন্ত তোমার চিত্ত জপে একাগ্র হইবে না। জপ করিতে বসিলে যখন অন্য কথা মনে আসিবে তখনই জপের বিঘ্ন হইবে। এই বিঘ্নটি ধরিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর। স্মরণ করিলেও ঐ কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করা হইল। যাহা করিয়াছি তাহা ক্ষমা কর; আর তোমাকে না জানাইয়া কোন কর্ম্ম করিতে আমার ইচ্ছা নাই—ভগবান্ আমি তোমার হইলাম তুমি আমায় নির্ম্মল করিয়া দাও। আমি তোমার নাম জপ করিতে করিতে এই বার কার এই তনু শেষ করি। এই ভাবে স্মরণ কর। কখন বা পুনঃ পুনঃ প্রণাম প্রদক্ষিণ করিতে করিতে স্মরণ কর। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর দেখিবে আর বিঘ্ন উঠিবে না।

জপে একাগ্রতা হইলে ধ্যানে একাগ্রতা অভ্যাস কর। বক্ষের উপর চরণ কমল—কোথাও হৃদয় কমলে চরণ কমল ইহা ধ্যানের পক্ষে বিশেষ সুবিধা। কখন চরণ কমল দেখিয়া দেখিয়া মুখ কমল ধ্যান কর বড় সুন্দর লাগিবে। কিছু দিন কর বলিতে পারিবে "ডুবল আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে" ইত্যাদি।

ধ্যানে একাগ্রতা অভ্যাস করিতে করিতে পরে আত্মবিচারে একাগ্রতা অভ্যাস করিতে হইবে। এই শেষ। আত্মবিচারের শেষ ফল হইবে দৃশ্য মার্জ্জন। এই জগৎ ও এই দেহ উভয়েই থাকিবে না। প্রথমে বোধ হইবে মন টাই, দেহ হইতেছে, জগৎ হইতেছে।

মনের চঞ্চলতা ছাড়াইতে পারিলে দেহ ও নাই জগৎও নাই। মনটা আকাশের মত নামেই আছে। ইহার রূপ নাই। সত্য আত্মার উপরে একটা মনোমায়া ভাসে মাত্র। বাস্তবিক মন বলিয়া কিছু নাই। মনই যখন মিথ্যা তখন মন হইতে জাত এই বিচিত্র সৃষ্টি আবার কোথায় থাকিবে? এইভাবে বিচার করিতে করিতে যতদিন না আত্মতত্ত্বে একাগ্র হইতেছ ততদিন আপনি আপনি ভাবে স্থিতি লাভ করিতে পারিতেছ না।

আর এক বৎসরের জন্য জপে একাগ্রতা, ধ্যানে একাগ্রতা ও আত্মবিচারে একাগ্রতা অভ্যাস কর না কেন? শেষে নিরোধ আসিবেই।

কাহারও নিন্দা করিও না, অন্যের প্রশংসাতে আনন্দিত হইও—ইহার জন্য একাগ্রতা অভ্যাস কর। একাগ্রতা অভ্যাস ভিন্ন গত পাপের স্মৃতি মুছিয়া যাইবে না। যখন বিচারটি ঠিক হইবে তখনই পাপের স্মৃতি একবারে লোপ পাইবে।



নিকট এই শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করি। এই ভাগবত জ্ঞান লাভ করিয়াই আমি কৃষ্ণের প্রিয় হইয়াছি।”

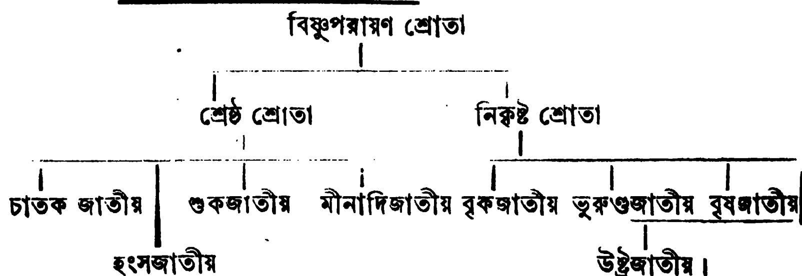
উদ্ধব আবার রাজা পরীক্ষিৎকে বলিতে লাগিলেন, হে বিষ্ণুরাত! বৃহস্পতি যে আখ্যায়িকা কীর্ত্তন করেন, যাহার শ্রবণে ভাগবত শ্রবণের সাম্প্রদায়িক জ্ঞান নিশ্চিত হয় এক্ষণে তাহা শ্রবণ কর। যাহা বলিলেন তাহা সংক্ষেপে এই :—

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সৃষ্টির পরে আদিপুরুষ নারায়ণকে স্তব করেন। তাঁহাদের ভক্তি দর্শনে নারায়ণ কৃষ্ণ ইঁহাদিগকে শ্রীভাগবত উপদেশ করেন। ভাগবত উপদেশ পাইয়া ইঁহারা যথাক্রমে সৃষ্টি স্থিতি লয় শক্তি প্রাপ্ত হয়েন।

বৃহস্পতির নিকট ইতে শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া উদ্ধব বলিতে লাগিলেন—আমি হৃষ্ট হইলাম এবং মাসমাত্র ভাগবত সেবা করিলাম। তুমি শ্রীশুকদেব হইতে এই ভাগবত প্রাপ্ত হইবে এবং তোমার অনুগ্রহে ভারতভূমে অনেক মানব শ্রীভাগবত লাভ করিয়া সুখী হইবে।

শ্রীভাগবতের উৎপত্তি ও প্রচার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। এক্ষণে শ্রীভাগবতের শ্রোতা নিরূপণ করিয়া আমরা এই অবতরণিকা সমাপ্ত করিব।

(৭) শ্রীভাগবতের শ্রোতা নিরূপণ :—



(১) চাতকজাতীয় :—চাতক যেমন অখিল জল ত্যাগ করিয়া জলদজলের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ এই জাতীয় শ্রেষ্ঠ শ্রোতাগণ নিখিল বিষয়সেবা উপেক্ষা করিয়া একমাত্র ভাগবত শ্রবণেই ব্রতী।

(২) হংসজাতীয় :—হংস যেমন একত্র মিলিত দুগ্ধ ও জল হইতে সারাংশ অমল দুগ্ধ পান করে, তদ্রূপ এই জাতীয় শ্রেষ্ঠ শ্রোতাগণ বিবিধ কথা শুনিয়াও তন্মধ্য হইতে সারমাত্র গ্রহণ করেন।

(৩) শুকজাতীয় :—এই জাতীয় শ্রেষ্ঠ শ্রোতা শুক পক্ষীর মত সুষ্ঠু ও মিতভাষী। ইঁহাদিগকে দেখিলে পাঠক ও শ্রোতৃগণ সুখী হয়েন। ইঁহারা সুপঠিত বিষয় সকল অবিকল শিক্ষা দেন এবং পার্শ্বস্থিত ব্যক্তিগণকে সৎশিক্ষা-দানে সুখী করেন।

(৪) মীনজাতীয় :—ক্ষীরসমুদ্রের মীন যেমন স্নিগ্ধ, কদাচিৎ চঞ্চল হইয়া আস্ফালন করে না, অনিমিষ লোচনে আস্বাদ করিয়া করিয়া রস গ্রহণ করে—ইঁহারাও তদ্রূপ ভাগবত শ্রবণকালে কদাচিৎ কথা কহেন না, অনিমিষ নয়নে ইঁহারা হরিকথার রসাস্বাদ করেন এবং ইঁহারা স্নিগ্ধ।

নিকৃষ্ট শ্রোতার বিবরণ।

(১) বৃকজাতীয় :—বংশী শ্রবণে রসাসক্ত মৃগকে বৃক যেমন পীড়িত করে তদ্রূপ এই বৃকজাতীয় অজ্ঞ শ্রোতাগণ রোদন দ্বারা অন্য শ্রোতৃবর্গকে ব্যথিত করে।

(২) ভুরণ্ডজাতীয়:—হিমালয় শৃঙ্গবাসী ভুরণ্ডনামক বিহগগণের ন্যায় ইহারা অন্যকে শিক্ষাপ্রদান করে, কিন্তু নিজে কোনই সাধু আচরণ করে না।

(৩) বৃষজাতীয় :—বৃষের নিকটে যেমন স্বাদু দ্রাক্ষা ও সর্ষপকল্কের পার্থক্য নাই তদ্রূপ এই অল্পবুদ্ধি শ্রোতা কি সার কি অসার শ্রুত বিষয় সমস্তই গ্রহণ করে অর্থাৎ ভালমন্দ বিচার করে না।

(৪) উষ্ট্র জাতীয় :—উষ্ট্র যেমন আম্র পরিত্যাগ করিয়া নিম্ব ভক্ষণ করে—সেইরূপ এই জাতীয় শ্রোতাগণ মধুর দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া বিপরীত বস্তুতে রতি প্রদর্শন করে।

এতদ্ভিন্ন মৃগজাতীয়, গর্দ্দভজাতীয় বহু শ্রোতা আছে তাহাদের ভেদ কীর্ত্তিত হইল না। তাহাদের প্রকৃতিগত আচার অবলোকন করিয়া লক্ষণ স্থির করা যায়। ফলে যে শ্রোতা শ্রবণ সময়ে কৃতাঞ্জলি ও নম্র হইয়া সম্মুখে অবস্থান, বিধিবৎ প্রণাম, অন্য কথা পরিত্যাগ, শ্রীহরির লীলা চিন্তন ও অভীষ্ট বিষয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন এবং যিনি শিষ্ট, বিশ্বাসবান্, চিন্তাপরায়ণ, প্রশ্নে অনুরক্ত, নিত্যশুচি, কৃষ্ণজনপ্রিয়—শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ এইরূপ শ্রোতাকেই উত্তম শ্রোতা বলিয়া অভিহিত করেন। যিনি ভগবানে রত, অনপেক্ষ, দীনজনের সুহৃৎ ও অনুকম্পা-কারী—বহুজ্ঞানপ্রধান চতুর মুনিগণ তাঁহাকে সম্মানিত করেন।

শ্রীভাগবত।



মঙ্গলাচরণ।

বিষয়চিন্তাই সমস্ত দুঃখের মুল। শ্রীভগবানের চিন্তা করিতে পারিলে বিষয়চিন্তা দূর হয়। সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তির উপায় পাওয়া যায়। ভগবান্ ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলাচরণে আপনি ঈশ্বরচিন্তা করিয়া জীবকে ঈশ্বরচিন্তা করিতে শিক্ষ দিতেছেন।

এই মঙ্গলাচরণে যে ঈশ্বরচিন্তাটি আছে তাহা সাধকের নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইহা যথ সাধ্য বুঝিতে চেষ্টা করাতে কোন প্রয়োজন কি সিদ্ধ হইবে?

করিবার কথাটি এখানে বলিয়া রাখা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মঙ্গলাচরণটির সুন্দররূপে অর্থাবধারণ করিয়া সাধক একান্তে গিয়া স্থির সুখ আসনে উপবেশন করিয়া ঐ চিন্তাটি অভ্যাস করিতে থাকুন -করিতে করিতে তিনি কিছু একটু অপূর্ব্ব ভাব লক্ষ্য করিবেনই। কোটিকল্প ধরিয়া পুস্তক পাঠে কোন ফল নাই যতক্ষণ না অধীত বিষয়ের ভাবটি একান্তে অভ্যাস করা হয়। এখন যাহার যাহা ইচ্ছা। এখানে মঙ্গলাচরণটি বুঝিবার চেষ্টা হইতেছে।

পরং ধীমহি—ধ্যায়েম চিন্তা করি। পরব্রহ্মকে ধ্যান করি।

কিরূপে?

পরমব্রহ্ম আপন স্বরূপে যাহা তাহার চিন্তাতেও ধ্যান হয়, তিনি তটস্থে যাহা তদ্ভাবনা দ্বারাও ধ্যান হয়।

স্বরূপ চিন্তায় ও তটস্থ চিন্তায় পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে ইহা শ্রীভাগবতের মঙ্গলাচরণে দেখা যায়। অন্য কোন শাস্ত্রে কি ইহা আছে?

বেদে ইহা আছে। বেদের শিরোভাগে উপনিষদ্। উপনিষদের যেখানে নির্গুণব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে সেইখানেই সগুণব্রহ্মের কথাও বলা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই সগুণব্রহ্ম ব্যতীত নির্গুণব্রহ্মে স্থিতিলাভ হইতেই পারে না। বেদে ইহা আছে বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রেই ইহা দৃষ্ট হয়।

অন্য শাস্ত্র হইতে ইহা না দেখাইয়া তন্ত্রশাস্ত্র হইতে ইহার আলোচনা হইতেছে। হিন্দুশাস্ত্রের সমস্ত দেবদেবীর কথা, সমস্ত মন্ত্রের কথা, পূজার কথা, প্রাণায়ামের কথা, ন্যাসের কথা তন্ত্রশাস্ত্রে পাওয়া যায়। তন্ত্রশাস্ত্র সকল অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ করিতেছেন। এই তন্ত্রশাস্ত্র হইতে স্বরূপ ও তটস্থে ঈশ্বর-ভাবনার কথা দেখাইলে সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রের শিক্ষাই যে ইহা তদ্বিষয়ে কোন সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ করিবার কিছুই থাকিবে না।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে তৃতীয়োল্লাসে ৬।৭ শ্লোক।

জ্ঞেয়ং ভবতি তদ্ব্রহ্ম সচ্চিদ্বিশ্বময়ং পরম্।
যথাবৎ তৎস্বরূপেণ লক্ষণৈর্ব্বা মহেশ্বরি॥
সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং অবাঙ্মনসগোচর।
অসৎ ত্রিলোকীসদ্ভানং স্বরূপং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্॥

মহেশ্বরি! সেই নিত্য, চৈতন্যস্বরূপ বিশ্বময় পরমব্রহ্মকে স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা ও তটস্থ লক্ষণ দ্বারা জানিতে হয়। যাঁহার সত্তামাত্র উপলব্ধি হয় যিনি নির্ব্বিশেষ, যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, যিনি মিথ্যাভূত তিনলোকে সৎস্বরূপে প্রতিভাত হন তিনিই পরমব্রহ্ম। ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র স্বরূপ লক্ষণ বলিয়া পরে তটস্থ লক্ষণ উল্লেখ করিতেছেন :—

যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ সর্ব্বাণি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তদ্‌ব্রহ্মলক্ষণৈঃ॥ ৯॥

যাহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা দ্বারা অবস্থান করিতেছে আবার যাঁহাতে সমুদায় বিশ্ব লয় পাইতেছে তিনিই ব্রহ্ম। ইহাই ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ।

এই উভয়বিধ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মের ধ্যান হয়।

তন্ত্র পুনরায় বলিতেছেন :—

স্বরূপ বুদ্ধ্যা যদ্বেদ্যং তদেব লক্ষণৈঃ শিবে।
লক্ষণৈরাপ্তুমিচ্ছূনাং বিহিতং তত্র সাধনম্॥ ১০॥

শিবে! স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা যে ব্রহ্মকে জানা যায়, তটস্থ লক্ষণ দ্বারাও তাঁহাকেই জানা যায়। তবে যাঁহারা তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্ম পাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের সাধনা করা চাই। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র এই সাধনার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক

—মন্ত্রোদ্ধার, মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রচৈতন্য, প্রয়োগ বা ঋষিন্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, প্রাণায়াম, ধ্যান, মানস পূজা, মন্ত্র জপ ও ফল অর্পণ, বাহ্যপূজা, পুনর্ব্বার মন্ত্র জপ, স্তোত্রপাঠ, কবচপাঠ, প্রণাম ইত্যাদি -সমস্তই সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীভাগবতে স্বরূপলক্ষণে পরমব্রহ্মের ধ্যান কিরূপ তাহাই দেখান হইতেছিল।

স্বরূপ লক্ষণে ব্রহ্মকে ধ্যান কিরূপে করিতে হইবে?

সত্যং পরং ধীমহি।

সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে আমরা চিন্তা করি!

তিনি সত্য—ইহাতে চিন্তা কিরূপ হইল?

তিনিই সত্য। তিনি ভিন্ন অন্য যাহা কিছু তাহাই মিথ্যা।

তিনি ভিন্ন অন্য যাহা কিছু ইহাতে কাহাকে লক্ষ্য করা হইতেছে?

ব্রহ্মই সত্য এবং এই জগৎ মিথ্যা।

এই জগৎ যদি মিথ্যাই হইল তবে এই জগৎকে সত্যমত বোধ হয় কেন?

যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা।

পরব্রহ্মে অবস্থিত বলিয়া সত্ব রজ ও তম এই ত্রিগুণের সৃষ্টি, স্বরূপতঃ মিথ্যা হইয়াও সত্যবৎ প্রতীত হয়। মূলে যিনি আছেন তিনি মাত্র সত্য, তাঁহার উপরে যে মিথ্যা সৃষ্ট জগৎ ভাসিয়াছে তাহা মিথ্যাই।

ভাল করিয়া বুঝিলাম না। দৃষ্টান্ত দিলে ভাল হয়।

"তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ'।

মরীচিকায় জল ভ্রম হয়; জলে কাচ ভ্রম হয়; কাচে জল ভ্রম হয়। মৃগগণ মরীচিকাকে জল মনে করিয়া প্রাণ হারায়; রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে কাচে জল ভ্রম করিয়া কাপড় তুলিয়া রাজা দুর্য্যোধন বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হন। শাস্ত্রের অন্য দৃষ্টান্ত, রজ্জুতে সর্প ভ্রম। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত সাহায্যে বুঝা যায় যে, একমাত্র সত্য বস্তু ব্রহ্ম—তিনিই আছেন। তাঁহাকেই মিথ্যা দৃশ্যপ্রপঞ্চরূপে ভ্রম হইতেছে। যিনি এই মিথ্যা প্রপঞ্চকে, মিথ্যারূপে জানিয়াছেন তিনিই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারিয়াছেন।

জগৎ মিথ্যা ইহা কি তন্ত্রশাস্ত্রেও আছে?

বেদ বলিতেছেন জগৎ মিথ্যা। কাজেই সর্ব্বশাস্ত্রেই জগৎকে মিথ্যা বলিতেছেন।

শ্রীগীতা, শ্রীভাগবতাদি পুরাণ, মহাভারতাদি ইতিহাস—জগৎ মিথ্যা বলিতেছেন ; বেদান্ত শাস্ত্র ত বলিবেনই। তন্ত্রও বলিতেছেন :—

যথা সত্যমুপাশ্রিত্য মৃষাবিশ্বং প্রতিষ্ঠতি।
আত্মাশ্রিত তথা দেহো জানন্নেবং সুখী ভবেৎ॥
মহানির্ব্বাণ। অষ্টমোল্লাস। ২১৮

যথা সত্যং পরমাত্মানমেবোপাশ্রিত্যাবলম্ব্য মৃষা মিথ্যাভূতমপি বিশ্বং প্রতিষ্ঠতি সত্যবদাস্তে তথৈবাত্মানমাশ্রিতো মিথ্যাভূত এব দেহঃ প্রতিষ্ঠতি এবং জানন্ সন্ন্যাসী সুখীভবেৎ॥

এই জগৎ স্বরূপতঃ মিথ্যা হইয়াও যেমন একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া এই মিথ্যা দেহও সত্যবৎ প্রতীত হইতেছে। সন্ন্যাসী ইহা জানিয়া সুখী হইয়া থাকেন। এখানে আরও একটু জানা আবশ্যক যে, জগতে এই যে নানা প্রকারের কার্য্য চলিতেছে, এই যে ইন্দ্রিয়সমূহ ও তাহাদের রাজা মন সর্ব্বদাই কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত আছেন—আর জীব সর্ব্বদা আমি করিতেছি, আমি যাইতেছি, আমার সুখ হইতেছে, আমার দুঃখ হইতেছে, এইরূপে নিরন্তর ভাবনা, বাক্য ও কর্ম্মে ব্যস্ত রহিয়াছেন এই সমস্তই ত মিথ্যা।

এত মিথ্যার মধ্যে থাকিয়া পরমাত্মা অবিকৃত কিরূপে থাকেন? মিথ্যার সংসর্গে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর আপনি আপনি ভাবে—নির্লিপ্ত ভাবে—কিরূপে থাকেন? নির্লিপ্ত কি থাকেন?

"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকম্"। সেই প্রভু আপন মহিমায় সদা মণ্ডিত। আপন গৌরবে সদা গৌরবান্বিত। মিথ্যা মায়ার কুহক সর্ব্বদাই ইনি নিরস্ত করিয়া আপনি আপনি ভাবেই সর্ব্বদা বিরাজমান। মায়া তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বহু ইন্দ্রজাল তুলিতেছেন সত্য, তাঁহাকে কিন্তু কিছুতেই মুগ্ধ করিতে পারিতেছেন না। মহামৎস যেমন নদীর উভয় কূলে সঞ্চরণ করিয়া বেড়ায় সেইরূপ ব্রহ্মও মায়া অবলম্বনে জাগ্রৎ স্বপ্ন এই দুই কূলে বিচরণ করেন। পরে সুষুপ্তিকালে গভীর জলে ডুবিয়া তলাইয়া যান। এ সমস্ত করিলেও তিনি আপনিই আপনি ভাবে সর্ব্বদা শান্ত। "কুহকমত্র মায়োপাধিকৃত ভ্রমপরাভবঃ"।

মায়া পরমাত্মাতে যে কোন প্রকার কুহক তুলিতে পারেন না—ইহা শাস্ত্রে

আছে বলিয়া না হয় বিশ্বাস করিলাম কিন্তু ইহা অনুভব করা যায় কিরূপে ? স্বরূপ লক্ষণে তিনি যাহা তাহার অনুভব কিরূপে হইবে ?

ইহার জন্যই সাধনা। সন্ন্যাসী না হইতে পারিলে ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করা যায় না। এখানে সংক্ষেপতঃ কর্ম্মন্যাসীর কার্য্য উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথমেই জানা আবশ্যক :—

ইন্দ্রিয়াণ্যেব কুর্ব্বন্তি স্বং স্বং কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্।
আত্মা সাক্ষী বিনির্লিপ্তো জ্ঞাত্বৈবং মোক্ষভাক্ ভবেৎ ॥
মহানিঃ অষ্ট. ২৭৯,

চক্ষু কর্ণ মন ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গণই আপন আপন কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নির্ব্বাহ করিতেছে। আত্মা কিন্তু সাক্ষী এবং নির্লিপ্ত। তিনি ইহাদের কর্ম্মে কিছুতেই লিপ্ত নহেন। এইটি জান তবেই তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া মোক্ষভাগী হইতে পারিবে।

মোক্ষলাভ করিতে যাঁহার তীব্র ইচ্ছা জন্মিয়াছে তিনি টাকা কড়ি বা কোনরূপ ধাতু পরিগ্রহ করিবেন না ; পরনিন্দা, মিথ্যা ব্যবহার, স্ত্রীলোকের সহিত ক্রীড়া, শুক্রত্যাগ, অসূয়া [পরের প্রশংসায় দোষারোপ] এই সমস্ত পরিত্যাগ করিবেন। তিনি দেবতা, মনুষ্য, কীটে সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইবেন। "সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিঃ স্যাৎ কীটে দেবে তথা নরে"। সন্ন্যাসীর আরও কর্ত্তব্যঃ—

"সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানীয়াৎ পরিব্রাট্ সর্ব্বকর্ম্মসু" মিথ্যা প্রকৃতি কর্ম্ম করিতেছেন। সর্ব্ব কর্ম্মে সমস্তই ব্রহ্ম ইহাই তিনি জানিবেন। তন্ত্র যে উপদেশ দিতেছেন শ্রীগীতাও তাহাই বলিতেছেন "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ—কর্ম্মে যিনি অকর্ম্ম অর্থাৎ বিশ্রাম, তুষ্ণীভাব বা সাক্ষীস্বরূপ পরব্রহ্মকে দেখেন তিনিই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনিই সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়াছেন। অবধূত বা সন্ন্যাসী সর্ব্বদা অধ্যাত্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন এবং আত্মতত্ত্ব বিচার করিবেন। এই সমস্ত সাধনা দ্বারা সত্য পরব্রহ্ম যে "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকম্" ইহা অনুভব করা যাইবে। শুধু বিশ্বাসের ধর্ম্মে থাকিলে ব্যবহারিক জগতে কখনই ইহা স্মরণ থাকিবে না। ব্রহ্ম সত্য আর এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় ব্যাপার সমস্তই মিথ্যা ইহা কখনই অনুভব হইবে না। বিশ্বাসের ধর্ম্মকে অনুভবের ধর্ম্মে পরিণত না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দপ্রাপ্তি হইতেই পারে না। মিথ্যা জগৎ, মিথ্যা মন যতদিন না মিথ্যা বলিয়া জানা

যাইবে, ততদিন প্রকৃত বৈরাগ্য আসিবে না, কাজেই মিথ্যা দৃশ্য প্রপঞ্চরূপ মায়িক লীলারও কখন অন্ত হইবে না।

স্বরূপ লক্ষণে ব্রহ্মধ্যান কিরূপ বলা হইল। এক্ষণে তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মচিন্তা কিরূপ তাহাই দেখাইতেছেন।

তটস্থ কথার অর্থ কি ?

তটে সমীপে তিষ্ঠতি স্থা-ক। তটস্থ অর্থে সমীপস্থ। স্বরূপটি হইতেছে বস্তুটি যাহা তাহাই। তটস্থ হইতেছে সমীপে দাঁড়াইয়া বস্তুর নির্দ্দেশ করা। সত্য জ্ঞান অনন্ত ইত্যাদি ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। তিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা ইহা তটস্থ লক্ষণ।

তটস্থ লক্ষণে তাঁহার ধ্যান কিরূপ ?

"জন্মাদ্যস্য যতঃ' অস্য বিশ্বস্য জন্মাদি জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ ভবতি। যাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ হইতেছে আমরা তাঁহাকে ধ্যান করি।

সৃষ্টি ও লয় কিরূপ হইতেছে তাহার ধারণা শাস্ত্রের সর্ব্বস্থানেই দেখা যায়। ব্যবহারিক জগতেও ইহা শীঘ্র অনুভবে আইসে। কিন্তু তাঁহা হইতে বিশ্বের স্থিতি হইতেছে শাস্ত্র এসম্বন্ধে কি বলেন ?

ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার গীতাভাষ্যের প্রথমে জগৎস্থিতির কথা-শাস্ত্রমত এইরূপ বলিয়াছেন :—

স ভগবান্ সৃষ্ট্বেদং জগৎ তস্য চ স্থিতিং চিকীর্ষুর্ম্মরীচ্যাদীনগ্রে সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্মং গ্রাহয়ামাস বেদোক্তম্, ততোঽন্যাংশ্চ সনকসনন্দাদীনুৎপাদ্য নিবৃত্তিধর্ম্মং জ্ঞান বৈরাগ্য লক্ষণং গ্রাহয়ামাস।

সেই ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তিমে চতুর্দ্দশ ভুবন ও সপ্তদ্বীপা এই মেদিনী সৃজন করিয়া এই জগতের স্থিতি ইচ্ছা করিয়া মরীচ্যাদি প্রজাপতি সৃষ্টি করেন এবং তাঁহাদিগকে বেদোক্ত প্রবৃত্তিলক্ষণধর্ম্ম গ্রহণ করাইলেন। পরে সনক সনন্দাদি অন্য প্রজাপতি উৎপন্ন করিয়া বেদোক্ত জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণযুক্ত নিবৃত্তি ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে গ্রহণ করাইয়াছিলেন।

দ্বিবিধো হি বেদোক্তোধর্ম্মঃ। প্রবৃত্তি লক্ষণো নিবৃত্তি লক্ষণশ্চ। তত্রৈকো জগতঃ স্থিতি কারণম্।

বেদোক্ত ধর্ম্ম দুই প্রকার। প্রবৃত্তি লক্ষণ ও নিবৃত্তি লক্ষণ বিশিষ্ট। প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মই জগৎস্থিতির কারণ দীর্ঘকাল এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে

উৎসব।



স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৮ম বর্ষ।] ১৩২০ সাল, জ্যৈষ্ঠ। [২য় সংখ্যা।

জয় গুরু।

প্রার্থনা।

হে গুরো, হে পতিতের পরম ঈশ্বর,
রাখ মোরে সদা তব অভয়-দ করে
সম্পদে বিপদে প্রভো! হে মোর গোঁসাই,
চাহি শুধু শ্রীচরণে এতটুকু ঠাঁই।
সংসারের কোলাহল কামনার রাশি
আর যেন নাহি উঠে হৃদি-মাঝে আসি—
বিস্তারি সহস্রফণা কালিয়ের মত।
হে দেব, হে জগন্নাথ, দাঁড়াও সতত,
রাখি তব শ্রীচরণ 'মম হৃদি' পরে,
সদা মত্ত কলুষিত কাম যা'ক ম'রে।
বিশ্বমূর্ত্তি তুমি দেব, এ অশান্ত হিয়া

আমি কি দুঃখী।

লোকে বলে আমি দুঃখী। আমি জিজ্ঞাসা করি কেন? সবাই বলে আমার সাজান সংসার ছিল, এখন কেউ নাই তাই আমি দুঃখী। কিন্তু আমি ত তা বলি না। আমি বলি আমি দুঃখী কৈ? আমার যে "কেউ" আছে। আমি সেই "কেউ" এর সঙ্গে কথা ক'য়ে কত সুখ পাই।

আমার কথা ক'বার দু'জন আছে। এরাই আমার কেউ। কখন এর সঙ্গে কথা কই, কখন ওর সঙ্গে কথা কই।

কত লোকের কত কথা আমার কাণে আসে। কখন সে সব কথা উড়াইয়া দি, কিন্তু কখন কখন আমার অজ্ঞাতসারে ঐ কথাগুলি আমার মধ্যে আসিয়া আমার ছোট কেউকে বশ করে। তখন দেখি আমি পরের কথার শওয়াল জবাব করিতেছি। কত কথাই তখন কই। যদি ঐ সব কথার তরঙ্গে ছোট কেউ ডুবিয়া যায়, তাহা হইলে ত আর তাহাকে ধরা যায় না। কিন্তু কতক্ষণ পরের কথায় থাকিয়া ইহার চমক ভাঙ্গে। এ তখন একবার বুড়ী ছুঁইতে আসে। নইলে এ কর্ম্ম করিবার বল পায় না। বুড়ী ছুঁইতে আসিয়া এ ধরা পড়ে। তখন ইহার সহিত আমি কথা কহিতে লাগিয়া যাই। আমি আমার কেউকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি হঁ্যাগা—একি তুমি করিতেছ। পরের কথায় তোমার মাথা-ব্যথা কেন? বিশেষ কতদিন ত পরের কথা লইয়া কত কি করিলে। ইহাতে তোমারই বা কি হইল আর পরেরই বা তুমি কি করিলে বল? পর কি তোমার পরামর্শ শুনিল? তবে তুমি পরের কথা আর কেন তুলিবে বল। একি রোগ তোমার? এই কি তোমার সময়ের সদ্ব্যবহার করা গা? এই করিলে কি তুমি দুঃখ-সংসার-সাগর পার হইতে পারিবে? আমি আমার কেউ এর সঙ্গে যখন এইরূপ কথা কই তার পরেই আমার কেউ পরের কথা ছাড়িয়া চুপ করে। আর কোন বাজে কথা কয় না। তখন সে একবারে তার শান্তভাবে প্রবেশ করে। করিয়া স্থির হইয়া যায়। স্থির হইলেই আমি তারে আলিঙ্গন করিয়া ফেলি। আলিঙ্গন করিবা মাত্র আমার শান্ত কেউ ও আমি তখন এক হইয়া যাই, গিয়া আমার আর একটি কেউ যে আছে তার সঙ্গে কথা কই।

সে কথা বড় সুন্দর। আমি বলি দেখগো আমি যে তোমারই। কখন কি "আমি তোমারই" ভাল করিয়া অভ্যাস করিয়াছ? আহা এই এক কথায় যে কি আনন্দ ভরা আছে তাহা যে না অভ্যাস করিয়াছে সে জানিবে কিরূপে। তোমায় বিশ্বাসে জানিয়া বলি আমি তোমারই। তুমিই আমার সর্ব্বস্ব। তুমিই আমার সকল সাধের সমষ্টি। তুমিই আমার কলিজার হার, তুমিই আমার হাতের দর্পণ, তুমিই আমার আঁখির তারা। তুমি আমার সকল ভালবাসা। সংসার যত পারে পীড়ন করুক। তাও আমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলের ভোগ মাত্র। শত যাতনায় পড়িয়াও যখন ভাবি আমি যে তোমার, তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব তখন ত জুড়াইয়া যাই। এই শরীর দিয়া তোমার সেবা করিতে পারি না। নাই পারি—এ শরীরের উপর সংসার দাবী করে—ইহার স্বাধীনতা কিছুই নাই। কিন্তু আমার মনের উপর কর্ত্তৃত্ব ত কাহারও নাই। আমি মন লইয়া ত তোমার সেবা করিতে পারি। আমি ভাবনাতে ত তোমার কাছে থাকিতে পারি। ভাবনাতে ত তোমার সেবা করিতে পারি ভাবনাতে ত তোমার পূজা করিতে পারি। ভাবনাতে ত সকল তীর্থে তোমার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারি। ভাবনাতে ব্যথিতের অন্নবস্ত্রের ক্লেশ দূর করিতে পারি। এইরূপ নিত্য ভাবনা করিতে আমি তোমারই হইয়া তোমার সেবা ও ব্যথিত জীবে তোমায় দেখিয়া তুমি বোধে তাহাদের সেবা করিতে পারি। কত সুখ ইহাতে। আবার ব্যবহারিক জগতে তোমার ভাব যথায় তথায় আরোপ করিয়া আমি একটা ভাবরাজ্যে নিত্য থাকিতে পারি। আমি চিরদিন রূপের কাঙ্গাল। আমি জনম ভরিয়া তোমার রূপ দেখিতেই আছি, আমার আঁখি ত তৃপ্ত হইল না। সংসারে যদি কারও প্রেমভরা আঁখি দেখি—আমি তাতে তোমার আরোপ করি, করিয়া তোমাকে যা বলিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া আমার সাধ মেটে না—তাই বলিয়া একবার, দুইবার, তিনবার, কত শতবার তোমায় ডাকি; ডাকিয়া কত সুখ পাই তা কিরূপে বলিব? জগতে কোন ভাল বস্তু দেখিলে তুমিই যে সে এই ভাবিয়া তোমাকেই ডাকিয়া ডাকিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া যাই। আকাশ, বায়ু, বায়ুর শব্দ, বালক বালিকা, যুবক যুবতী সকলে তোমাকে আরোপ, করিয়া কত সুখ পাই। কখন বা ডাকিয়া ডাকিয়া চুপ করি; করিয়া বলি আমিই শুধু তোমাকে ডাকিব, তোমার কি একবার আমাকে ডাকিতে নাই। লোকে বলে তুমিও আমাকে ডাক, নইলে কি আমি তোমার জন্য এত ব্যাকুল হইতে পারি? তুমি আমার

ডাক—ইহা বিশ্বাস করিয়া আমি ভাবি আমি কেন তোমার ডাক শুনিতে পাই না? দশজন বালকে বেদ পাঠ করিতেছে—সকলের শব্দের সঙ্গে শ্রীহরির শব্দটিও মিশিয়া আছে। সেই শব্দটি শুনিতে হইলে যেমন খুব শান্ত হইতে হয়, সেইরূপ সকল ডাকের সঙ্গে যে তোমার ডাকটি আছে তাহা ধরিতে গেলে সকল স্বর হইতে মনটিকে সরাইয়া লইতে হয়। আমি কত নির্জ্জনে কতবার তোমার ডাক শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকি। শুধু মনে হয় এই বুঝি শুনিলাম; কিন্তু মনের মতন করিয়া কৈ পাইলাম। তোমার রূপ দেখিতেও সাধ হয়। সকল রূপে রূপ মিশাইয়া তুমিই ত আছ। সকল রূপে তোমার রূপ, সকল ডাকে তোমার ডাক—এই ভাবনা করিয়া যখন স্থির হই, তখন আমার কত সুখ! তাই বলি লোকে কেন বলে আমি দুঃখী! আমার ত দুঃখ নাই। আমার যে কেউ আছে। রে দুঃখী জীব! এই কেউ ত তোমাদেরও আছে। তবে তোমাদের দুঃখ কি? তোমরাও আমার মত এই "কেউ" এর সঙ্গে কথা কওনা। কহিয়া দেখ দেখি সুখ পাও কি না? নিশ্চয়ই পাইবে।

ঋষিগণের পদানুসরণ।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

যিনি জীবের পরমগতি, প্রথমেই ঋষিগণ তাঁহাকেই স্মরণ করিতে বলেন। পরমপদই জীবের পরম গতি। বিন্দু যেখানেই উদয় হউক না কেন, কোন্ অজানিত দেশে, কোন্ অজানিত নদীবক্ষে জলবুদ্‌বুদ্ উঠিয়াছে, শতবার নদীবক্ষে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে—কিন্তু ইহা মিশিবে সেই সাগরে। যতক্ষণ না সীমাশূন্য সাগরে মিশিয়া সে সাগর হইয়া যাইতেছে ততক্ষণ তাহার চলার বিরাম নাই, ভাঙ্গা ভাসার বিরাম নাই। জীবেরও তাই। পরমপদ ভিন্ন স্থায়ী বিশ্রাম ইহার নাই। তাই লক্ষ্যের কথা আগে স্মরণ।

কিন্তু সেই পরমপদে মিশিবার শক্তি কি জীবের আছে? জীব পারে যদি কৌশল করিতে পারে তবে। সৃষ্টির মধ্যে এমন বস্তু কোথাও নাই যাহার মধ্যে

তাহার উৎকৃষ্ট তেজ সেই পরমপদের দিকে ছুটিতেছে না। বরণীয় ভর্গ সেই পরম-পদে মিশিতে ছুটিতেছে। গঙ্গা, হিমালয়ে উঠিয়াও সাগরে মিশিতে ছুটিতেছে। গঙ্গার শত শত প্রবাহ শত শত মুখে যায় সত্য, কিন্তু সার প্রবাহ সাগরাভিমুখ-গামিনী। সেইরূপ সৃষ্টবস্তু সমূহের মধ্যে তাহাদের উৎকৃষ্ট তেজ ব্রহ্মপথ-গামিনী। এই বরণীয় ভর্গই গায়ত্রী। গায়ত্রী সর্ব্বত্র আছেন। তোমার মধ্যেও আছেন। ইঁহাকে চিন, ইঁহাকে ধর, ধ্যান আপনা হইতে হইবে। ধ্যান হইলেই তোমার মধ্যের সেই ভর্গ পদার্থ আপন স্বরূপ যে গায়ত্রী তাহার সহিত মিশিয়া রমণীয় দর্শনের সহিত মিলিবে।

কিরূপে উপাসনা করিবে ?

যে যাহার উপাসনা করে সে তাহার শুভ কার্য্য দেখিতে থাকে, শুভকার্য্য আলোচনা করিয়া শুভগুণে শোভাপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার কৃপাদৃষ্টি লাভ করে।

তুমি গায়ত্রীর কল্যাণ কর, কার্য্য আলোচনা কর। আর নানা ভাবে তিনি যে কল্যাণ করিতেছেন তাহা জানিয়া নিজের জন্য ও অন্য সকলের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা কর।

এই গায়ত্রী রসরূপে জগতের শোভা বর্দ্ধন করেন। রস আবার জলরূপে প্রত্যক্ষ হইতেছেন। এই জল মরুভূমিতে, জলময় দেশে, সমুদ্রে, কূপে দৃষ্ট হয়। সর্ব্বস্থানেই ইনি কল্যাণ করেন। এস আমরা এই জলরূপী নারায়ণ বা রসময়ী গায়ত্রীর কাছে আমাদের পাপ ধৌত করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করি। যতদিন জীবন থাকিবে, ততদিন মা'র কাছে জানাই মা অন্নের সংস্থান করিয়া দাও ও শেষে সেই রমণীয়-দর্শনের সহিত মিলন করাইয়া দাও। জননী যেমন স্তন্যরসে সন্তানের পুষ্টিসাধন করেন, সেইরূপ তোমার অমৃত-বলে আমাদের বলীয়ান্ কর যাহাতে আমরা সেই রমণীয়-দর্শনের সহিত মিলিতে পারি।

তোমায় ডাকিয়া তোমার মত হইয়া আমরা সেই রমণীয়-দর্শনের সহিত মিলিব ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

এই প্রার্থনাও সম্পূর্ণ নহে। মন প্রবল শত্রু। ইহাকেও গায়ত্রীর আরও ব্যাপার শুনাইতে হইবে। গায়ত্রী কিরূপে এই জগৎ সৃজন করিলেন মনকে তাহা চিন্তা করাইতে হইবে।

কল্যাণের প্রার্থনা যে করিলে তাহা আরও একটু রস দিয়া না বলিলে এই অসাড় হৃদয় ত স্পন্দিত হয় না। শ্রীভগবান্‌কে ডাকিব অথচ হৃদয় নাঁচিয়া,

উঠিবে না ইহাতে ত ঠিক ডাকা হয় না। আচ্ছা অন্যভাবে পূর্ব্বের কথা আলোচনা করা যাউক।

সেই পরম পদ! রমণীয়-দর্শনের সেই পরম পদ! না জানি কতই সুন্দর। যে একবার তাহারে দেখে, সে আর কোথাও স্থির থাকিতে পারে না। যেথানে তারে রাখ, যে অবস্থায় তারে রাখ, সে সেই পরমপদ দেখিতে ছুটিবেই। সে পদে আশ্রয় গ্রহণ করিলে যে জীবের সকল শোক, সকল তাপ, সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়, সকল দাগা মিলাইয়া যায়। সেই মধুর নয়নভঙ্গী যে একবার দেখিয়াছে, সে ত আর অন্য দেখা দেখিতে চায়না।

ব্রহ্মাদি দেবতা অনিমিষ নয়নে সেই পরমপদ সর্ব্বদা দেখেন।

তুমি তারে দেখিবে? চলনা—চল। দেখিবে? একবার দেখিলে সকল জ্বালা জুড়াইয়া যাইবে।

এই যে পাগলের মত সদাই কত কি অসম্বন্ধ প্রলাপ বক, এই যে উদ্যমহীন হইয়া জড়ের মত পড়িয়া থাক, এই যে উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া গ্রাম্যকুকুরের মত যেথানে সেথানে ছুটাছুটি কর—তোমার এই সব ভাল হইয়া যাইবে। তোমার সকল শোকের অবধি হইয়া যাইবে। নিরন্তর সেই আনন্দ-হিল্লোলে হেলিয়া দুলিয়া যখন সেই রমণায়-দর্শনের পাদমূলে তুমি পৌঁছিলে, তখন যে কি সুখ তাহা কে বলিবে?

যাইবে? চলনা। প্রথম যুবতী যখন স্বামীসঙ্গে মিলিতে যায় তখন সে কি করে?

স্বামী-সোহাগিনী? সে ত ভাবনায়। কখন ত দেখে নাই। লোকের মুখে শুনিয়াছে স্বামী রমণীয়-দর্শন। মরম সখী চিত্তপটে পলক রাখিয়া রূপ আঁকিয়া দেখাইয়াছে। চিত্তপটে রূপ আঁকিয়া দেখাইতে সে-রূপ হিয়ায় পশিয়াছে। তারে ত আর ভুলিতে পারে না। ভোলা ত যায় না। সংসার তারে নানা প্রলোভনে ভুলাইয়া রাখিতে চায়, কিন্তু যা তা শুনিয়া যা তা দেখিয়া তার সেই সুখের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। সংসার আরও লোভ দেখায়। কেহ কেহ প্রলোভনে ভুলিয়া যায় সত্য, কিন্তু শ্রীভগবান্ শোকরূপে আসিয়া তাহাকে আকর্ষণ করেন। নানান জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া আবার তাহারা তাহাদের রমণীয়-দর্শনের কথা শুনিতে পায়, শুনিয়া শুনিয়া আনন্দে ভরিয়া যায়।

কখন দেখে নাই। শুধু নাম শুনিয়া ভাল বাসিয়াছে। সকল জ্বালায় জ্বলিয়া

আবার যখন তার নাম শুনে, যখন তার গুণের কথা শুনে, তখন তার নাম করে আর বলে আমি যে তোমারই। তুমিই যে আমার সর্ব্বস্ব।

কত লোকের সঙ্গে কত কথাই ত কও। বলনা কোন্ কথায় গ্লানিশূন্য রস পাও। নির্জ্জনে বসিয়া একবার তারে বল দেখি আমি যে তোমারই; তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব। তুমিই যে আমার সকল সাধের সমষ্টি। বলিয়া দেখনা কথাতেই রস আছে কি না ?

সাধ কি যায় না ? সাধ ত সকলেরই আছে ? যে ব্যভিচার করিয়া ফেলিয়াছে তারও ত সাধ আছে। যে যত পতিত হউক, যে যত পাপী তাপী হউক, সাধ ত কারও যায় না। সাধ ত সবাই করে। চলনা। তার কাছে গেলে তোমার সকল সাধ মিটিবে। আর কোথাও মিটিবে না। কোথাও না। যাবে তার কাছে ? চলনা।

কে লইয়া যাইবে ? কেন যার তার কাছে যাইতেছ, তাদের সঙ্গেই চল। যাইতে পারিবে।

কিন্তু একটু প্রস্তুত হইতে হইবে। যাবে যদি একটু সাজিয়া যাইতে হইবে। সে যে সকল শোভার আধার। তার কাছে কি কুৎসিত হইয়া যাইতে ইচ্ছা করে ? তার কাছে যাবে একটু শোভা ধারণ কর। শরীর একটু শোভা ধারণ করুক, আর মন ? মনটাও একটু শোভা ধারণ করুক।

প্রকৃতি যখন পুরুষের কাছে যায় তখন কত শোভা ধারণ করে।

চৈত্রমাস। মধুমাস। এই মাসে প্রকৃতি পুরুষের সঙ্গে মিলিতে যায়। তাই প্রকৃতির এত শোভা। চিরদিন প্রকৃতি এইরূপ করিতেছে। অন্য ঋতু ধরিয়া আয়োজন করে, আর এই বসন্ত ঋতুতে সকল শোভা ধরিয়া তার সঙ্গে মিলিতে যায়।

কবে ভগবান্ বাল্মীকি এই চৈত্রের শোভা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। চৈত্রঃ শ্রীমানয়ং মাসঃ পুণ্যঃ পুষ্পিত কাননঃ। চৈত্রমাসে কি যেন একটা মিলন হয়, তাই চারিদিকে সুখের চিহ্ন ফুটিয়া উঠে। তাই ইহা পুণ্যমাস। এই মাস বড় সুন্দর শোভা আনয়ন করে।' একবার চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া আইস—প্রকৃতির পুষ্পিতকাননে কত শোভা বিরাজ করিতেছে। বৃক্ষে বৃক্ষে লতায় লতায় পাতায় পাতায় কত শোভা। পাখীর ডাকে, ভ্রমরের গুঞ্জনে কত আনন্দ। মধুমাস চারিদিকে যেন মধু ছড়াইতেছে।

প্রকৃতি যে সাজে সজ্জা করে তাহার কি কোন অর্থ নাই? যে সৌগন্ধ-ভরা বস্ত্র পরিধান করে, যে সুন্দর অলঙ্কার পরে, তাহার ঝলকেই ত চারিদিকে শোভা ছড়াইয়া পড়ে। চারিদিকে মধু বর্ষিত হয়।

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে। মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধীঃ।
ওঁ মধুনক্তমুষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুদ্যৌরস্তু ন পিতাঃ।
ওঁ মধুমান্ নো বনস্পতির্ম্মধুনা অস্তু সূর্য্যঃ
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥

এইটি প্রার্থনা। বায়ু সকল মধুক্ষরণ করুক। নদী সকল, সমুদ্র সকল মধুক্ষরণ করুক। ওষধী সকল আমাদের পক্ষে মধুময় হউক। রাত্রি সকল ও দিন সকল মধুময় হউক, পৃথিবীর রজ মধুযুক্ত হউক। পিতৃলোকের স্বর্গ মধুময় হউক। বনস্পতি আমাদের জন্য মধুযুক্ত হউক। সূর্য্য মধুযুক্ত হউক, ধেনু সকল আমাদের জন্য মধুময় হউক।

বলনা এই চৈত্রে ঋষিদিগের এই প্রার্থনা পূর্ণ হয় কি না?

তাই বলিতেছি পরমপদে আশ্রয় লইতে যাইবে একটু শোভা ধারণ কর। তুমি ত অনেক কদর্য্য কার্য্য করিয়া শরীরকে শোভাশূন্য করিয়াছ। তোমার শরীর ত শোভাশূন্য হইয়াছে। ইহাতে যেন আর রস নাই। কাজেই মনও রসশূন্য হইয়াছে। ভাবনায় একটু সুন্দর হও।

এই এই শোভা পাইবার জন্য, শরীর ও মনকে শোভিত করিবার জন্য—যিনি এই শোভার আধার তাঁহার কাছে একটু প্রার্থনা করি।

বৃক্ষের শোভা আনয়ন করে কে? প্রকৃতিকে রসযুক্ত করে কে? প্রকৃতির রস কোথায়? রমণীয়-দর্শনের ভাবনাতেই প্রকৃতি রসযুক্ত হয়। সে যে

রসস্বরূপ। "রসো বৈ সঃ"। শ্রুতি যে তাঁহাকে রসস্বরূপ বলেন।

রসরূপে তিনি জগৎকে শোভা দান করেন। জলরূপী নারায়ণ প্রকৃতির শোভা দিতেছেন। এসনা সেই জলরূপী নারায়ণের কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করি।

সম্মুখে পঞ্চপাত্রে ত জল রহিয়াছে। এই জলের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ইহাতে জলরূপী নারায়ণের ভাবনা কর।

জল কি শুধুই জল? তোমার দেহ কি শুধুই দেহ? চৈতন্য না এই দেহ

ধারণ করিয়াছেন ? জলও যে তাঁহার দেহ। দেহ কি দেহশূন্য হইয়া থাকিতে পারে ? জলময় দেহ যাঁর তিনিই ত নারায়ণ। তবে জলের দেবতা নারায়ণের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা না কর কেন ? এস এস জলরূপী নারায়ণ যেখানে যেরূপ ভাবে থাকিয়া জগতের কল্যাণ করিতেছেন—সেই সর্ব্বব্যাপী নারায়ণের নিকট কল্যাণ জন্য, শোভার জন্য প্রার্থনা করি।

তুমি স্বামী-দর্শনে যাইবে ? ভাল বস্ত্র, অলঙ্কার দিয়া তোমার শরীর সাজাইতে হইবে। ভাল ভাবে তোমার মন সাজাইতে হইবে।

শরীর পবিত্র করিবার জন্য সকল প্রকার জলের নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করা হইল। এখন মনটাকে পবিত্র করিবার জন্য, একবার সৃষ্টিতত্ত্ব চিন্তা করিতে হইবে।

পরম পদ যিনি প্রথমে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া পরে মায়া-অবলম্বনে তিনি যখন সগুণ হয়েন, হইয়া সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করেন,—সেই সগুণ ব্রহ্মকে, সেই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুরূপী গায়ত্রীকে স্থূলে ও সূক্ষ্মে একটু ধারণা করিতে হইবে।

সৃষ্টিতত্ত্ব সূক্ষ্ম চিন্তা। আমরা এক্ষণে ইহার আলোচনা করিব।

ক্রমশঃ—

শান্তি।

মন সদা অশান্ত, আত্মা সদা শান্ত। মন সর্ব্বদা সকল্প বিকল্প তুলিয়া অশান্ত. আর আত্মা সর্ব্বদা সকল কার্য্যের সাক্ষীরূপে থাকেন বলিয়া শান্ত।

যাহাকে জিজ্ঞাসা কর সেই বলিবে আমি জুড়াইতে চাই। আর জ্বলিতে পুড়িতে পারি না, আর ভাবিতে পারি না, আর ভুগিতে পারি না। আমি শান্তি চাই, আমি বিশ্রান্তি চাই।

সবাই আমরা শান্তি চাই। গানে বলে শান্তি-নিকেতন ছাড়ি কোথা শান্তি পাবে বল ? তবে একটি শান্তি-নিকেতন আছে যেখানে চিরশান্তি বিরাজিত।

কোথায় সেই শান্তি-নিকেতন ? শ্রীভগবান্‌ই সেই শান্তি-নিকেতন। তাঁহাকে

আশ্রয় কর শান্তি পাইবে। স্মরণ রাখ মনের সত্তা যাহা তাহাই শ্রীভগবান্। শ্রীভগবান্ মন্ত্ররূপী হইয়াও মনকে মনন হইতে ত্রাণ করেন।

কর্ম্ম না করিয়া মানুষ ত এক দণ্ডও স্থির থাকিতে পারে না। সঙ্কল্প বিকল্প না তুলিয়া মানুষের মন সজ্ঞান অবস্থায় এক দণ্ডও ত শান্ত হইয়া থাকিতে পারে না—তবে শান্তি কিরূপে পাইবে? মন শান্ত না হইলে যদি শান্তি না পাওয়া যায় আবার মনের স্বভাবই যখন হইতেছে সংসার আড়ম্বর তোলা, তখন মন কিরূপে শান্ত হইবে?

মন সর্ব্বদাই একটা না একটা লইয়া জ্বলিতেছে সত্য। ভিতরে সঙ্কল্প বিকল্প আর বাহিরে স্থূল সঙ্কল্প পুঞ্জীকৃত হইয়া এই প্রকৃতির বিশাল তাণ্ডব নৃত্য। বাহিরের জগতের ঘটনাপুঞ্জ একদিন সঙ্কল্পই ছিল, পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনে ভিতরের বস্তু বাহিরে আসিয়া স্থূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভিতরে বাহিরে প্রকৃতির নৃত্য, বল শান্তি এখানে কোথায়?

কর্ম্ম ত ছাড়িতে পারি না। কর্ম্ম আজকালকার জগৎ ছাড়িতেও চায় না। কিন্তু শান্তিও চাই। কি হইবে?

শ্রীগীতার শরণাপন্ন হও। শ্রীগীতা বলিতেছেন কর্ম্মের ভিতরে একটি বিশ্রাম আছে—অশান্তির মধ্যে একটি চিরশান্তি রহিয়াছে। তুমি যদি ইহা ধরিতে পার, তবে কর্ম্ম করিয়াও তুমি শান্ত থাকিতে পারিবে।

"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" কর্ম্মে যিনি অকর্ম্ম দেখেন, তিনি সর্ব্বকর্ম্ম শেষ করিয়া শান্ত হইয়াছেন। এখন দেখ অকর্ম্ম কি? অকর্ম্ম বলে তুষ্ণীম্ভাবকে। তুষ্ণীম্ভাবই বিশ্রাম। বিশ্রামই সন্তুষ্টভাব। ইহাই কর্ম্মশূন্য অবস্থা। ইহাই বিশ্রান্তি।

কিরূপে ইহা বুঝিব?

একটু বিচার কর বুঝিতে পারিবে। মন সঙ্কল্প বিকল্প তুলিতেছে। মনটি সূক্ষ্ম প্রকৃতি। আবার স্থূল প্রকৃতি বাহিরে শত শত ঘটনা ঘটাইতেছে। এই দুই প্রকৃতি তোমার পশ্চাতে লাগিয়াছে, তাই তুমি জুড়াইতে পার না।

কেন জুড়াইতে পারনা জান? তুমি ভাব তুমি প্রকৃতির তাড়নাই পাইতেছ। কিন্তু যেখানে প্রকৃতি আছেন সেইখানেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই শান্তিনিকেতন পুরুষ আছেন। সেই পুরুষ সদাই শান্ত; সেই পুরুষ, প্রকৃতির দ্রষ্টা; সেই পুরুষ সর্ব্বসাক্ষী। তিনি উদাসীনের মত প্রকৃতির কার্য্য মাত্র

দেখেন। তুমি শুধু প্রকৃতিকে যতক্ষণ দেখিবে ততক্ষণ তোমার সব ভুল হইয়া যাইবে। কিন্তু পুরুষকে যদি দেখ, তবে দেখিবে প্রকৃতি এই পুরুষকে কিছুতেই মুগ্ধ করিতে পারেন না। প্রকৃতির সে শক্তি নাই। "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং" তিনি আপন মহিমায় মায়ার সমস্ত কুহক নিরস্ত করিয়া আপন গৌরবে সদা গৌরবান্বিত—তিনি আপন গরবে আপনি বিরাজিত—আপন শান্তিতে আপনি চিরশান্ত। তুমি এই দ্রষ্টা পুরুষের দিকে একবার চাহিতে শিক্ষা কর, তুমি এই সর্ব্বসাক্ষী পুরুষের আশ্রয় একবার গ্রহণ কর—দেখিবে প্রকৃতি আর তোমাকে অশান্ত করিতে পারিবে না।

সহজ ভাবে বল কি করিয়া এই পুরুষকে দেখিব? প্রথমে মোটামুটি এই তত্ত্ব শুনিয়া বিশ্বাস কর—প্রতি কর্ম্মের মূলে এই অকর্ম্ম বা তূষ্ণীম্ভাব রহিয়াছে। মনের সত্তাটিই এই পরম শান্ত তূষ্ণীম্ভাব। ইহাই শ্রীভগবান্। চঞ্চল তরঙ্গের কোলে স্থির সাগর রহিয়াছে। স্থিতি ভিন্ন গতির খেলিবার স্থান নাই। বিশ্বাস রাখ পরম পুরুষ সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে বিরাজিত।

দ্বিতীয় কথা যখন নিজে তাঁহাকে বুঝিতে পারনা তখন তাঁহাকে প্রণাম করিতে শিক্ষা কর। শুধু প্রণাম করা অভ্যাস করিতে পারিবে না। তিনি অবতার গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভক্তকে উপদেশ করেন মাং নমস্কুরু। তাঁহার নাম জগতে প্রচারিত হইয়াছে। প্রণব বীজ ও নাম লইয়া মন্ত্র। মনন হইতে ত্রাণ করেন বলিয়াই তিনি মন্ত্র। মন্ত্র জপ কর, আর প্রণাম অভ্যাস কর।

মন্ত্র জপে সর্ব্বদা প্রণাম অভ্যাস কর। কোথায় তিনি নাই? এই আকাশ, এই বায়ু, এই পৃথিবী, এই জল, এই অগ্নি এই অসংখ্য জীব, অসংখ্য তরুলতা—এই বিশ্বের যেখানে যা আছে,—শত্রু মিত্র, সুন্দর কুৎসিত সকলের মধ্যেই যখন তিনি আছেন তখন সর্ব্বদা তাঁহার নাম লও, আর মনে মনে প্রণাম কর—এই মূল সাধনা দ্বারা বিশ্বাসের ধর্ম্ম ছাড়াইয়া ভক্তির ধর্ম্মে যাইতে পারিবে, ক্রমে ভক্তির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানে পৌঁছিবে।

শাস্ত্রও বলেন সর্ব্বজীবে নারায়ণ আছেন। তুমিত ইহা মনে রাখিতে সকল সময়ে পার না। কতবার ভাবিয়াছ মনে রাখিবে আবার কতবার ইহা ভুলিয়া গিয়া রাগদ্বেষের কাজ করিয়া ফেলিতেছ। তাই বলি অল্পে অল্পে সাত্ত্বিক আহারটী অভ্যাস কর। কারণ শ্রুতি বলেন, আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্ব-শুদ্ধাই ধ্রুবা স্মৃতি। আবার নূতন করিয়া আরম্ভ কর। আর প্রথমেই তোমার

উপাস্য দেবতার একটি মূর্ত্তি নিজের সাধনা-গৃহে রাখ। রাখিয়া নিত্যক্রিয়া অন্তে তাঁহাকে মন্ত্র জপ দ্বারা বহুক্ষণ প্রণাম অভ্যাস কর। বাহিরে যখন আসিবে, তখন যে বস্তু বা যে মনুষ্যকে দেখিতে পাইবে তাহাকে দেখিয়াই ভাবনা কর কোথায় তুমি? কোথায় তুমি প্রভু! বলিয়া তাঁহাকে খুঁজিতে থাক। আর মন্ত্র জপ করিতে করিতে প্রণাম করিতে থাক। মনে মনে প্রার্থনা কর—বিশ্বাস করি তুমি সর্ব্বত্র আছ কিন্তু দেখিতে ত পাই না। তাই নিরন্তর তোমার নাম লইতে চাই, আর তোমায় প্রণাম করিতে চাই। তুমি প্রসন্ন হও—হইয়া আমার গতি কর। হে প্রভু! আর আমি কিছুই চাই না তুমি প্রসন্ন হও ইহাই আমার প্রার্থনা। আমি যেন এক ক্ষণকালও তোমায় ভুলিয়া না থাকি। বায়ু যেমন একদণ্ডও আপন স্পন্দভাব ত্যাগ করে না সেইরূপ আমি যেন এক ক্ষণকালও তোমার নাম করিতে করিতে তোমাকে প্রণাম করা বিস্মৃত না হই।

প্রণাম কর আর নাম কর। নিরন্তর কর, যাহা দেখ তাহাই তিনি ভাবিয়া সর্ব্বদার কর্ম্মটি লইয়া থাক। কর্ম্মে অকর্ম্ম এই ভাবে অভ্যাস করিয়া চল। শুভ হইবে। শান্তি পাইবে।

"আমি তোমার"।

আমার আর কেহ নাই। কেবলমাত্র তুমিই আছ তাই তোমারই সেবা করি। আমার আর অপর কোন কর্ম্ম নাই। কর্ম্মের মধ্যে কেবল তোমার সেবা করা, তোমার আদেশ পালন করা, তোমার যখন যাহা প্রয়োজন হয় তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করা। তোমাকে কোন প্রকারে সন্তুষ্ট রাখা ইহাই আমার কাজ। যখন কোন কাজ তুমি না দেও, তখন নিশ্চিন্ত হইয়া তোমাকে স্মরণ করিয়া, তোমারই পা দু'খানি ধ্যান করিয়া থাকি। আমি আর কাহাকেও চিনি না, আর কেহ এখানে আছে কি না তাহা জানি না, জানিবার আবশ্যকও নাই। আমি তোমার, কায়মনবাক্যে তোমার, আমার অপরের সংবাদে প্রয়োজন কি?

আমি তোমাকে সেবা করি কারণ তাহা ছাড়া আর আমি করিব কি।

তুমি ছাড়া যে আমার আর কেহ নাই। আমার জীবনের সমস্ত সুখ তোমাকে লইয়া। তোমার সুখেই আমার সুখ, তোমার দুঃখেই আমার দুঃখ। আমার দেহ মন প্রাণ সবই তুমি। তুমি কাছে থাক, আমি বেশ থাকি। তুমি ছাড়িয়া গেলে আমি মরিয়া যাই। আমি আর আমি থাকি না, তোমার সঙ্গে সঙ্গে মনপ্রাণ কোথায় উড়িয়া যায়, কেবলমাত্র শরীরটী যেন স্পন্দহীন শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের মত পড়িয়া থাকে। দেখ, তুমি আমাকে কখনও ছাড়িয়া যাইও না। তুমি আমাকে যেমন বলিবে আমি তেমনি হইব। না পারি তুমি জোর করিয়া তেমনি করিয়া লইও, আপনার মতটি করিয়া আপনার কাছে রাখিও, ছাড়িও না। আমি অন্য সুখের আশা রাখি না, আর কিছু চাহি না। চাহি কেবল তোমার কাছে কাছে থাকিতে, তোমার চরণ সেবা করিতে। ইহাতে ত আমার অধিকার আছে। তুমি আমাকে ইহা হইতে বঞ্চিত করিও না। আমি কাছে থাকিয়া তোমাকে দেখিব। তোমাকে দেখিলে আমার প্রাণ আনন্দে নৃত্য করে। যখন তুমি কৈলাসের সুবর্ণময় সর্ব্বোচ্চ শিখরদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরি আসন বদ্ধ করিয়া উপবেশন কর, তোমার অঙ্গজ্যোতিতে যখন চারিদিক্ ঝলমল করিতে থাকে, তখন তোমাকে দেখিয়া আমার প্রাণে কত কি জাগিয়া উঠে। তোমার চতুর্দ্দিকে চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহতারাগণ সভয়ে ধীরে ধীরে তোমাকে প্রদক্ষিণ করেন এবং নিম্নে অতিদূরে দেবতাগণ, ঋষিগণ, যক্ষগণ গন্ধর্ব্বগণ, যুক্তকরে তোমাকে স্তব ও প্রণিপাত করিতে থাকেন। বায়ু তখন তোমাকে মন্দ মন্দ ব্যজন করেন, আকাশ তোমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেন, সপ্তসমুদ্র একে একে আসিয়া ধীরে ধীরে তোমার চরণযুগল প্রক্ষালন করিয়া অপসৃত হন, বসুন্ধরা তোমার অঙ্গস্পর্শ করিতে ভীতা হইয়া পৃথিবীরূপ চন্দনপাত্র নিকটে রাখিয়া প্রস্থান করেন—সেই সময়ে তোমার যে অপূর্ব্ব শোভা হয় তাহা আমি বলিতে পারি না। দেখিতে দেখিতে আমার নয়নযুগল যেন বিস্ফারিত হইতে থাকে। আমি সাগ্রহে তোমার বদনকমলের দিকে চাহিয়া থাকি। দেখি তোমার আয়ত-লোচনদ্বয়, তোমার বিশাল জটাবেষ্টিত অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিত সুপ্রশস্ত ললাট মধ্যে তৃতীয় লোচনে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে! ওষ্ঠদ্বয়ের ভাব দেখিয়া মনে হয় যেন হাসিয়াও হাসিতেছ না। সমস্ত অঙ্গ, কর্পূরের ন্যায় শুভ্র; কেবল কণ্ঠের মধ্যস্থল ঈষৎ নীলাভ। গলদেশে, বাহুতে ও

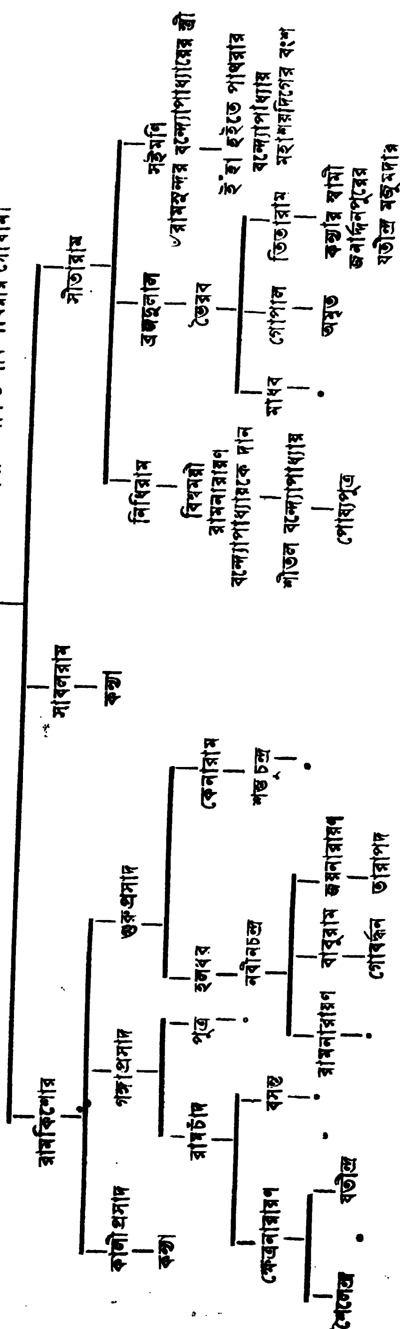
মণিবন্ধে হিরণ্ময় রুদ্রাক্ষের হার পরিবেষ্টিত। সমস্ত শরীর যেন কি এক ভাবে বিভোর। জানি না তখন তুমি কাহার ধ্যান কর। তোমার চারিদিকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই উপস্থিত দেখিতে পাই। তুমি যাঁহাকে ধ্যান করিবে এমন ত কেহ ইহার ভিতর দেখিতে পাই না। অথবা আমি সকলকেই দেখিতেছি, কেবল তাঁহাকেই দেখিতে পাইতেছি না। তোমার ধ্যেয়বস্তু অবশ্যই সাধারণের দেখিবার সামগ্রী নহে। সাধারণের না হইতে পারে, কিন্তু তোমার কাছে আমি ত সাধারণের মধ্যে নহি। তাই বলিয়া আমি তোমাকে বিরক্ত করিতে চাহি না। কি উপায়ে দেখিতে পাইব তাহা তুমি বলিয়া দিয়াছ। আমি তোমার উপদেশে চলিতেছি। যখন সময় হইবে তখন একবার দেখাইও। আমার বড় ভয় হয় পাছে আমার ভুল হয়। সেই ভয়ে আমি সর্ব্বদা তোমার কাছে কাছে থাকিতে চাই। আমি দেখি আমার প্রায়ই ভুল হইয়া যায়। আমি সাবধান থাকিতে চেষ্টা করি কিন্তু আমার চেষ্টাতে কি হইতে পারে। আমার আপনার চেষ্টায় হয় না তাই তোমার নিকট একটু করুণা ভিক্ষা করি। আমি আপনি পারি না তাই প্রার্থনা করি তুমি একটু আমায় চালাইয়া লও। আমি আর অন্য আকাঙ্ক্ষা রাখি না। আমি ঐশ্বর্য্য চাই না, বিভূতি চাই না, সিদ্ধি চাই না। চিত্তশুদ্ধি হউক, লয়বিক্ষেপ দূর হউক, আমি ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করি, ধ্যান, ধারণা, সমাধি আমার আয়ত্ত হউক, আমি ইহারও আশা করি না। আমার একটা কিছু হউক এ ভাবনা আমার মনে আসে না। আমি জানি আমি অতি দুর্ব্বল, আমি সর্ব্ববিষয়ে অক্ষম, আমি সর্ব্বাপেক্ষা হীন। সুতরাং আমার প্রার্থনা করিবার কিছু নাই। তুমি যেমন বলিয়াছ আমি শুধু তাহাই করিব। ভাল করিয়া করিতে পারি ভালই, না পারি, যাহা পারি তাহাই করিব; একেবারে না পারি, তোমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিব, তুমি দেখিবে আমি চেষ্টা করিলাম কিন্তু পারিলাম না। ইহাই আমার যথেষ্ট। ইহা ছাড়া আমার অপর কোন কর্ম্ম নাই। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একটু কাছে কাছে থাকিও, একটু কাছে কাছে রাখিও, নচেৎ বড় ভুল হইয়া যায়। একটু দয়া করিয়া দৃষ্টি রাখিও যেন তোমাকে না ভুল হয়। দেখিও যেন কাম ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া তোমায় না ভুলি, ইন্দ্রিয়াদির প্রলোভনে পড়িয়া তোমায় না ভুলি। দেখিও যেন

সুখদুঃখের মধ্যে তোমায় না ভুলি, ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে গিয়া তোমাকে না ভুলি, মানুষ দেখিয়া তোমায় না ভুলি। দেখিও যেন তোমায় ভুলিয়া কোন কর্ম্ম না করি, তোমায় ভুলিয়া যেন পরের না হই, তোমাকে ভুলিয়া যেন পরকে আপন না মনে করি। তোমার স্মৃতি, ইহাই আমার সম্বল। ইহাই আমার অমূল্যরত্ন। দেখিও যেন আমাকে ইহা হইতে বঞ্চিত করিও না। তোমাকে পাইবার আশা আমি করি না, না পাই তাহাতেও দুঃখ নাই, কিন্তু তোমার স্মৃতিটুকুর আশা আমি কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। মরিতে বল তাহাতেও প্রস্তুত আছি, কিন্তু তোমার স্মৃতি যেন সঙ্গে থাকে। মরা অপেক্ষা অধিক ক্লেশকর এই সংসার করা—কিন্তু ইহাতেও কোন কষ্ট থাকে না যদি তোমাকে না ভুলিয়া যাই। তোমাকে স্মরণ রাখিতে চাই, কারণ ইহা অপেক্ষা অধিক সুখ আর আমার কিসে হইবে। এই সুখটুকুর জন্য সংসারের সকল দুঃখই সঁহ্য করিতে পারি। যাহা বলিবে তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। জীবনের প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত দিন যাহা বলিবে তাহাই করিব, তাহাতে যদি কষ্ট হয় তবে সে কষ্টকে কষ্ট মনে করিব না। মনে মনে তোমার মুখপানে চাহিয়া সমস্ত দিন প্রাণপণে তোমার সংসার-করিব। যদি সুখের কিছু পাই তোমাকে আগে তাহার ভাগ দিব আর যদি কষ্ট পাই তবে তাহার প্রতীকারের জন্য তোমাকে বিরক্ত করিব না, তোমাকে আসিতে বলিব না, দেখিতেও বলিব না। কিন্তু সন্ধ্যাকালে যখন সংসার খেলা শেষ হইবে, ঘুমে শরীর ঢুলিয়া আসিবে, যখন তোমার স্মৃতিটুকুও অপহৃত হইবে, যখন চারিদিক্ অন্ধকার হইবে, আর পথ চেনা যাইবে না, খেলার সাথীরা যখন আপন আপন গৃহে চলিয়া যাইবে যখন আর তোমাকে ডাকিবার ক্ষমতা থাকিবে না, তখন একবার দয়া করিয়া আসিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া, হাত ধরিয়া তুলিয়া লইয়া যাইও ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা, ইহা ছাড়া আর আমি কিছুই চাহি না।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

কেবলরাম [রঘুনাথের বংশ। পাথরা পুরাতন বাটী। দ্বিতীয়া স্ত্রী হইতে]

- রামজয়
  - শম্ভু
  - মধু
    - নারায়ণ
      - কান্ত
      - ক্ষুদিরাম
        - অবিনাশ
          - লিপদ
          - ভুবন
        - প্রমথ
        - ভূতনাথ
    - যদু
    - অন্নদা
      - গৌরী
  - যাদব
    - রাজকুমার
      - ইন্দুকুমার নাবালক পিসী ক্ষুদুমণি
  - নীলমণি
  - মাধব
    - রামকৃষ্ণ
    - অতুলকৃষ্ণ
    - পূর্ণ
      - পশুপতি
      - ভূপতি
  - পদ্মলোচন
- গঙ্গানারায়ণ
  - বিশ্বনাথ
  - রামকিঙ্কর
    - হারাধন
      - প্রবোধ
      - তিনকৌড়ী
      - পরেশ
      - মনু
      - বৃন্দাবন
    - পঞ্চানন
  - রাজকুমার
    - দুর্গাচরণ বিধবা স্ত্রী নিস্তারিণী
    - অযোধ্যারাম
    - অক্ষয়
      - হরিচরণ
      - রামচরণ নাবালক
    - নীলমাধব
      - রাখাল নাবালক
    - বেণীমাধব বিধবা স্ত্রী চঞ্চলাদেবী
  - রামরতন
    - রাম
    - শিব
    - কৃষ্ণ
      - রাজরাজেশ্বর
      - মণিমোহন। নাবালক রক্ষক মাতা শৈলবালা
    - বলাই
- রামহরি
  - রামদাস
  - কালিদাস বিধবা স্ত্রী নবীনকালী
    - রাজলক্ষ্মী
      - সতীশ
      - সন্তোষ
  - ভাগবত বিধবা স্ত্রী শ্যামাসুন্দরী
    - কন্যা
      - রাজেন্দ্র
        - ব্রজ
        - কন্যা
      - নগেন্দ্র
        - বিজয়
        - কন্যা
  - হরপ্রসাদ


রত্নেশ্বরের ৪র্থ পুত্র কৃষ্ণদেব ।
কন্যার স্বামী রামচরণ চট্টোপাধ্যায় কুলভঙ্গ পণ্ডিতরত্নী বাটীতে বাস উপাধি পাথরার গোস্বামী
রামকিশোর
সাবলরাম
সীতারাম
কালীপ্রসাদ
গঙ্গাপ্রসাদ
গুরুপ্রসাদ
কন্যা
নিধিরাম
ব্রজদুলাল
সইমণি
৺রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী
কন্যা
রামচাঁদ
পুত্র
হলধর
কেনারাম
বিশ্বময়ী
রামনারায়ণ
বন্দ্যোপাধ্যায়কে দান
ভৈরব
ইঁহা হইতে পাথরার
বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশয়দিগের বংশ
ক্ষেত্রনারায়ণ
বসন্ত
নবীনচন্দ্র
শম্ভুচন্দ্র
শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়
মাধব
গোপাল
তিতারাম
শৈলেন্দ্র
যতীন্দ্র
রামনারায়ণ
বাবুরাম
জয়নারায়ণ
পোষ্যপুত্র
অমৃত
কন্যার স্বামী
জনার্দ্দনপুরের
যতীন্দ্র মজুমদার
গোবর্দ্ধন
তারাপদ

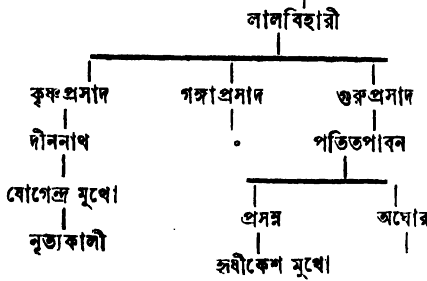
পাথরার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের বংশ

রামসুন্দর বন্দ্যো—সইমণি

- রাজীবলোচন
  - অভয়চরণ
    - অখিল বা ঋাঁতু বাবু
      - হরিনারায়ণ
  - গিরীশ
    - কন্যা — গিরিশ মুখো
    - কন্যা — যোগেন্দ্র চট্টো
    - কন্যা — নরেন্দ্র মুখো
- পদ্মলোচন
  - রাধাচরণ
    - কামিনী
      - কন্যা
        - বেণী
- যাদবেন্দ্র
  - দুর্গাচরণ
    - অক্ষয়
      - •
    - অমৃত
      - কালিদাস
      - রামার্চ্চন
        - গোপাল (উকীল) খোকা
        - দুঃখভঞ্জন
      - সুবোধ
    - বসন্ত
      - •
    - প্যারী
      - প্রফুল্ল
    - প্রমথ
      - রামকৃষ্ণ
  - রামচরণ
    - লক্ষ্মীনারায়ণ
      - তিনকড়ী
        - পশুপতি
      - রামগোপাল
        - •
      - নৃত্যগোপাল
      - যতীন্দ্র
        - বিধবাপত্নী উমাশশী
      - সুরেন্দ্র
        - •
  - সীতাচরণ
    - •
  - উমাচরণ
    - হেমচন্দ্র
      - ফটিক
      - সাধন
      - প্রফুল্ল
    - পঞ্চানন
      - নগেন্দ্র
      - পুত্র
    - ললিতমোহন
      - •
- রামমোহন
  - ছোট তিতু
    - রাখাল
      - কন্যা
    - পরেশ বা পরি বাবু
  - বড় করালী
    - শীতল
      - সতোশ্বর
      - শশধর
      - শ্যামনারদ
- পুত্র
  - •

পাথরা ও জনার্দ্দনপুরের আদিপুরুষ রত্নেশ্বরের ৩য় পুত্র শিবনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র জগন্নাথের পুত্র ছকুরাম রায় মহাশয়ের জনৈক বন্ধু পাথরায় বাস করেন তাঁহার বংশ।

ছকুরাম রায় মহাশয়ের বন্ধ রঘুনাথ



স্বর্গীয় প্রবোধচন্দ্রের স্মৃতি। (প্রাপ্ত)

উৎসবের পাঠক পাঠিকাকে বোধ হয় জানাইতে হইবে না যে ৺প্রবোধ চন্দ্র কে? তিনি অধ্যাপক নীলকণ্ঠ বাবু ও রামদয়াল বাবুর সহোদর হইলেও বিদ্বৎ সমাজে তাঁহাদের মত খ্যাতিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন না। কিন্তু, তাহা হইলে কি হইল? তিনি যে চরিত্রাদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আজকালকার দিনে সমাজে বড়ই দুর্লভ। আজীবন কৌমার্য্য ব্রত পালন, ও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা, বড় যে সে একটা শক্তির পরিচায়ক নহে। ইহা তিনি আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্যানুকরণে চিরকুমার অথবা চিরকুমারী থাকিয়া, একটা দেশহিতকর মহৎ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার সাড়া এ দেশেও পড়িয়াছে। এ আদর্শ অবশ্যই কিছু চাকচিক্য জড়িত। গৌরব ও অহমিকা ইহার ভিত্তি। কিন্তু, প্রবোধচন্দ্র আমাদের সম্মুখে যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ কামনা বর্জ্জিত, ও সাত্বিক। শুভ্র যূথিকাস্তবকের মত ইহা স্বতঃই উন্মুক্ত ও আনন্দবর্দ্ধক।

প্রবোধচন্দ্রের বাল্যজীবনে, কিংবা সাধনজীবনে, এমন কিছু বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই, যাহাতে তিনি মহাজন পদবাচ্য; বা তাঁহার একটা জীবনী লিখিয়া রাখিবার উপযুক্ত। তবে যে এ কালি-কলমের সাহায্যে, সময়ের অপব্যয়

করিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে যা কিছু একটা খাড়া করিতেছি, তাহা উৎসবের কলেবর পুষ্টি নিমিত্ত নহে। কেবল মাত্র হৃদয়ের তাড়নে।

সে আজ প্রায় ৫।৬ বৎসরের কথা, তাঁহার সহিত আমার রাজসাহী জেলার একটী গ্রামে প্রথম পরিচয়। পরিচয়টা যে কেমন হইয়াছিল, তাহা অপরকে আমি কি বুঝাইব? নিজে এখনও ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। লোকের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে একটা নাম ধামের খবর লওয়ার প্রথা, সেই আবহমান কাল থেকে চলিয়া আসিতেছে। আধুনা যদিও তাহা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ, তথাপি এ পর্য্যন্ত সেরূপ পরিচয় লইতে আমার কোথাও আটকায় নাই। কিন্তু, সত্য সত্যই প্রবোধচন্দ্রের বেলায় এ বিষয়ে আমি হার মানিয়াছিলাম। শেফালিকা বৃন্তের মত তাঁহার সরস, পুষ্ট দেহের গঠন দেখিয়া আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার অবসর আমার আদৌ ছিল না। সাধারণে হয়তো আমার এ কথাগুলি অতিশয়োক্তি মনে করিবেন; কিন্তু, আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা প্রয়োগ করিতেছি না—ইহাই আমার ধারণা। কবিরা স্ত্রীলোকের রূপের যেরূপ মাদকতা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, আমার মনে হয় তাহা ছত্রে ছত্রে মিথ্যা। বিদ্যাসুন্দরের কবি "শারদ-শশীকে" যেরূপ অপমানিত করিয়া ফেরৎ পাঠাইয়াছেন, তাহা অপেক্ষা শশধরের শত কলঙ্করেখালাঞ্ছিত বপুও সভ্যসমাজে সুশোভন হইত। কিন্তু ইহা একেবারে অসহ্য।

প্রবোধচন্দ্র যে মহাকালী পাঠশালার অধ্যক্ষ, সে কথা আমি জানিতাম। কলিকাতার মহাকালী পাঠশালার কথা আমার পূর্ব্বেও শোনা ছিল। সে একটা যে মহৎ আদর্শ, তাহা আমি মনে মনে অনেক সময়ে চিন্তা করিতাম।

মহাকালী পাঠশালার অধ্যক্ষকে সশরীরে আমার নিকটে উপস্থিত দেখিয়া যে আমি কতদুর আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা কাহাকেও বুঝাইবার নহে। প্রবোধ বাবু ঘাড় নাড়িয়া আস্তে আস্তে যে কয়েকটী কথা আমাকে বলিয়াছিলেন, তাহা এখনও শেলসম আমার প্রাণে বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মাতাজি পরলোক গমন কালে মহাকালী পাঠশালার ভার তাঁহার মত একজন "অযোগ্যের উপর রাখিয়া যাইয়া যেন তিনি ভাল করেন নাই। প্রবোধ বাবুর ইহাই আমার নিকট প্রথম উক্তি। আমারও মনে হইয়াছিল, মাতাজির অভাব কি প্রবোধবাবুর দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে? তিনি ছিলেন একজন সংসার-

স্পৃহাবর্জ্জিতা নির্লিপ্তা তপস্বিনী, আর ইনি একজন অপরিণত-বয়স্ক অবিবাহিত যুবক। এই চিন্তাই আমাকে বড় আকুল করিয়াছিল। কিন্তু, তাঁহার তাৎকালিক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সকরুণ মুখখানি দেখিয়া আমার অনেক ভরশাও হইয়াছিল। বলিতে কি, প্রবোধ বাবু সত্য সত্যই একজন প্রিয়দর্শন ছিলেন।

তাঁহার প্রধান একটি গুণ ছিল যে, তিনি অল্পভাষী ও বিনয়ী। পথে চলিতে চলিতে আমরা কত দার্শনিক তত্ত্বজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া চলিতাম। প্রবোধ বাবুর সে বালাই ছিল না। তাঁহার দৃষ্টি থাকিত যেখানে বড় বড় শ্যামালতা, সহকার-শাখে ফণিনীর মত দুলিত। আর যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপের উপর বিজয়ী বুলবুলি, তাহার স্বজাতি-শত্রুকে পরাজিত করিয়া পুচ্ছ-প্রসারণে ব্যঙ্গ করিত, সেখানেও তাঁহার দৃষ্টি নিরবরুদ্ধ থাকিত। জঙ্গলের লতা পাতার উপর আমারও একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। কিন্তু, আমি তাহাদের লতা পাতা ছিঁড়িয়া শোভা সম্পদ্ নষ্ট করিতাম। আর তিনি বাধা দিয়া বলিতেন —"কাহাকেও শ্রীভ্রষ্ট করিতে হয় না—বৃক্ষের পত্রপুষ্পও বিনা প্রয়োজনে কর্ত্তন করিতে আর্য্য শাস্ত্রে নিষেধ আছে।"

প্রবোধ বাবুর আত্মপর অভেদ জ্ঞান ছিল। ফুটবল খেলায় একটী ছেলের পা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, একদিন তাঁকে অশ্রু মোচন করিতে দেখিয়াছিলাম। পর-দুঃখকাতর এমন আর একটী হৃদয় বোধ হয় আমার চক্ষে পড়ে নাই। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে জননী জন্মভূমির অঞ্চল হইতে যে একটী মাণিক্য খসিয়া পড়িয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

আমরা মানুষ চিনি না, তাই মানুষ খুঁজিয়া মরি। প্রেমিক কবি সত্য সত্যই গাহিয়াছেন "মনের মানুষ বলিস্ যারে, কেমনে ধর্‌বি তারে। সে যে রয় ধরাময়, ধরা না যায়—অধর চাঁদ কে ধর্ত্তে পারে?" সত্য সত্যই সে অধর চাঁদকে কেহ চিনিতে পারে নাই, ধরিতেও পারে নাই। অনন্ত আকাশতলে, কোথায় কোন্ অন্ধকার চতুর্দ্দশীর উষায় একেবারে নিঃশব্দে সে চাঁদ মিলাইয়া গিয়াছে। সম্মুখে মহাকালী পাঠশালায় ঘোর অমাবস্যা।

প্রবোধ বাবুর আর একটী সারগর্ভ কথা আমার মতে এখনকার আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত। তিনি বলিয়াছিলেন "আমরা মাতৃহারা সন্তান। আমাদের দেশে এখন উপযুক্ত মায়ের আবাদ হওয়া প্রয়োজন।" সত্য সত্যই দেশে মা, চাই; নতুবা, সুসন্তান জন্মিবে কেমন করিয়া? উল্লিখিত কয়েকটী

কথার সার তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াই বোধ হয় তিনি মহাকালী পাঠশালার ভার লইয়াছিলেন।

কাল সকল দেশের সকল সময়ের পরিমাপক। নিক্তির ভারকেন্দ্রে থাকিয়া কাল, সৎ অসৎ বাছিয়া নিত্য পৃথক করিতেছে। তাই বোধ হয়, কলির শেষে এই ঘোর দুর্দ্দিনে মহাত্মাগণ ক্ষণপ্রভার মত মুহূর্ত্ত মাত্র উজলিয়া আবার কোথায় ঘোর অন্ধকারে মিশিয়া যাইতেছেন। লাভের মধ্যে কেবল অন্ধকারই বাড়িয়া যাইতেছে। এ অন্ধকারে আবর্জ্জনা রাশি ঠেলিয়া প্রকৃত পথ বাহির করা দুঃসাধ্য। বেশী দিনের কথা নহে, একজন কবি গাহিয়া গিয়াছেন—"না জাগালে এই ভারত ললনা এ সমাজ বুঝি জাগেনা জাগেনা।" কিন্তু, এই প্রগাঢ় নিদ্রার মধ্যে ভারত ললনাকে জাগাইবেন কে? যিনি জাগাইতে যাইবেন, তিনিই ঘুমাইয়া পড়িবেন। ভ্রমর বন্দার বৈতালিক গীতে, কিংবা মধুমক্ষিকার গুনগুন্ নহবতে এখন আর ভারত মহিলার নিদ্রাভঙ্গ হইবার আশা নাই। ঢকা নিনাদের আবশ্যক হইয়াছে।

প্রবোধ বাবুর মৃত্যুর পর অবশ্যই একজন মহাকালী পাঠশালার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন; তিনি যে প্রবোধ বাবুর মত হইবেন একথা স্বীকার করা যায় না। সংসারে যেমন যায়, তেমন আর আসে না। যদিও শূন্য আসন অবশ্যই পড়িয়া থাকে না—কিন্তু, অভাব থাকিয়া যায়।

মাতাজী মৃত্যুকালে যে কঠোর কর্ত্তব্যের ভার প্রবোধ বাবুর উপর দিয়া গিয়াছিলেন, তিনিও আজীবন তাহা প্রতিপালন করিয়াছিলেন। শেষে তাঁহার সাধের মহাকালী পাঠশালার জন্য একবিন্দু তপ্ত অশ্রু রাখিয়া বোধ হয় তাঁহাকে এ ধরাধাম পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে।

মহাকালী পাঠশালার গতি এখন কোন্ দিকে যাইবে, তাহাই চিন্তার বিষয়। কেবল বাহিরের আড়ম্বর ও চাকচিক্য দেখিয়া প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করা যায় না। বরং বাহিরের জাঁকজমক ভিতরের সত্য গোপন করিবার একটা কৌশল মাত্র; যাহা প্রকৃত সত্বভাবাপন্ন, তাহাতে বাহ্যাড়ম্বরের গন্ধও নাই। তাহা কেবল নির্ম্মল আনন্দস্বরূপ।

প্রবোধ বাবু মৃত্যুকালে বড়ই যন্ত্রণা পাইয়া গিয়াছেন। ইহাতে অনেকের মনে হইতে পারে, যিনি আজীবন যতিধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহার মৃত্যুকালে এ ব্যাধি-যন্ত্রণা কেন? আমার বিশ্বাস দুঃখের শেষ মহাদুঃখে, এবং তাহার পরিসমাপ্তি

অনন্তসুখে। যদি ইহজীবনের পরে কিছু অবস্থান্তর থাকে, তবে সে অবস্থা তাঁহার পক্ষে মহাসুখের হইয়াছে; একথা বিশ্বাস করা যায়। এখন একটা কথা বিচার্য্য,—ইহজীবনে তিনি যে দুরারোগ্য ব্যাধি-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক তাঁহার পক্ষে দুঃখ কি না? যাঁহারা ভগবানে, আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহাদের সুখদুঃখ কিছুই থাকে না।

সেরূপ অবস্থা সুখদুঃখের অতীত শুদ্ধ আনন্দ মাত্র। এরূপ অবস্থা তাঁহার হইলে, সে দুঃখ যে তিনি ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহাও বিচিত্র নহে। আর তাহা না হইলেও সম্মুখের অনন্তকাল যে তাঁহার পক্ষে সুখের অঙ্কুর ও ভাণ্ডার ইহা বিশ্বাসযোগ্য।

প্রবোধ বাবু চিরউদাসীন ও চিরকুমার হইলেও গার্হস্থ্যধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। রীতিমত কুলপ্রথা অনুসারে কুলাচার্য্যের নিকট তিনি দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, অন্তিমেও "ওঁ গঙ্গানারায়ণব্রহ্ম" স্মরণে ইহজগৎ হইতে সরিয়া পড়িয়াছেন। ইহা একজন মহাপুরুষের লক্ষণ।

শ্রীহ—(বরঘরিয়া)
(মালদহ)

বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্র-নন্দন সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য।

আমরা এই "বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্র-নন্দন" প্রবন্ধে দেখাইব বৈষ্ণবেরা কি ভাবে ভগবান্‌কে উপাসনা করেন এবং তাঁহাদের এই ভজন-প্রণালী কত সরল।

বৈষ্ণবেরা শ্রীভগবান্‌কে রসিকশেখর বলিয়া জানেন। এই রসময় ভগবানের ভজন জন্য, তাঁহারা চতুঃষষ্টি রসের কোন একটি রসও পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু এই রসপুষ্টি স্বকীয়া না হইয়া পরকীয়া হইয়াছে। তাই

বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের রসিকশেখরের ভজন উদ্দেশে পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া রাখিয়াছেন—

"ব্রজ বিনা এ রসের নাহিক বিকাশ" কিন্তু এই পরকীয়া রসাস্বদনের অধিকারী খুব কম, তাই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রস আস্বাদন।
বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥

যে হেতু এই পরকীয়া ভাবে শ্রীভগবানের ভজন-প্রণালী বড়ই সুগভীর! উপযুক্ত গুরুর শরণাপন্ন না হইলে, ইহার ভিতর প্রবেশ করা যায় না। কিন্তু ভজন-প্রণালী যাহাই হউক, মূল উদ্দেশ্য ঠিক থাকিলে এরূপ স্বকীয়া পরকীয়াতে বাধে না, বরং যেটি সরস ও মধুর, প্রাণ সেইটিই গ্রহণ করিতে চায়, দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাইতে পারি বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাসই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কবি,—ইঁহাদের ভজন-প্রণালী পরকীয়া হইলেও উদ্দেশ্য কিন্তু অন্য প্রকার। বিদ্যাপতির একটী পদ শুনুন,

দূতী শ্রীরাধিকা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণকে উপদেশ দিতেছেন—

গণইতে মোতিম হারা।
ছলে পরশিবি কুচভারা ॥

শিরীষ কুসুম জিনি তনু।
থোরি সহাবি ফুলধনু ॥ (ইত্যাদি)

আবার এই বিদ্যাপতিরই একটি প্রার্থনার পদ শুনুন—

তাতল সৈকতে, বারিবিন্দু সম,
সুত মিত রমণী-সমাজে।
তোঁহে বিসরি মন, তাহে সমাপিনু,
অব মঝু হ'ব কোন কাজে ॥

মাধব! হাম পরিণাম নিরাশা।
তুঁহু জগতারণ, দীন দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিসোয়াশা ॥

আধ জনম হাম, নিদে গোঙাইনু,
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী, রসরঙ্গে মাতিনু,
তোহে ভজব কোন বেলা॥

কত চতুরানন, মরি মরি যাওত
না তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুনঃ, তোহে মিলাওত
সাগর-লহরী সমানা॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন ভয়ে,
তুয়া বিনা গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক, জগতে কহায়সি,
অবতারণ ভার তোহারা॥

টীকা নিষ্প্রয়োজন। পাঠক বুঝিয়া দেখিবেন, বিদ্যাপতির উপাসনা কি প্রকার এবং তিনি কি ভাবের উপাসক। তবে আমি এ কথা বলিতেছি না যে, এই বৈষ্ণবগণের মধ্যে সকলেই বিদ্যাপতির ন্যায় অদ্বৈতবাদী; কিন্তু এ কথা খুব নিশ্চয় যে বৈষ্ণবেরা একমাত্র দ্বিভুজ-মুরলীধারী অর্থাৎ বৃন্দাবনের ব্রজেন্দ্র-নন্দকেই ভজন করিয়া থাকেন। এই ভজন-প্রণালী গোপীভাবের ভজন। এই গোপাঙ্গনাগণের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকাই সর্ব্বপ্রধানা—বৈষ্ণবভক্তগণ এই রাধিকার ভাবই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বৃন্দাবনে এই পঞ্চপ্রকার ভাবের উল্লেখ থাকিলেও, একমাত্র মধুর ভাবই শ্রেষ্ঠ; যেহেতু মধুর ভাবের মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত ভাব-চতুষ্টয়ের বিদ্যমানতা দেখা যায়।

কিন্তু এই ভজন স্বকীয়া না হইয়া পরকীয়া হইয়াছে, পতি না হইয়া উপপতি হইয়াছে—এই বিষয় লইয়া বৈষ্ণবদিগের মধ্যেই মতদ্বৈধ চলিতেছে; একদল স্বকীয়ার এবং অন্যদল পরকীয়ার পক্ষসমর্থক, আমরা এখানে সে মীমাংসা করিতে প্রস্তুত নহি; পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মূল উদ্দেশ্য ইহাতে আসিয়া যায় না। তবে মনে হয়, পূর্ব্বরাগ বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা যেন স্বকীয়া অপেক্ষা পরকীয়াতেই অধিক পরিস্ফুট। যাহা হউক, আমরা এই প্রবন্ধে শ্রীমতী রাধিকার প্রথম দর্শন হইতে প্রথম মিলন, অভিসার, স্বপ্নমিলন,

খণ্ডিতা, মান, কলহান্তরিতা এবং পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনে বিরহ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে বুঝিতে চেষ্টা করিব। এতদ্ব্যতীত ইহাও দেখাইব যে, বৈষ্ণব কবিরা প্রেমতত্ত্ব, প্রেমরঙ্গ এবং প্রেমরহস্য বিষয়ে যে প্রকার গভীর গবেষণা এবং চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন,—স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি ইদানীন্তন এই উপন্যাস-প্লাবিত বিংশ শতাব্দীতে এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখকই তাহার শতাংশের একাংশও প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই। সেই মধুর প্রেমলীলা একে একে প্রকাশ করিব, ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্র-নন্দন।

প্রথমদর্শনে।

শ্রীমতী রূপ দেখিয়াছেন, দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছেন। কি সাধনা করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়, এই চিন্তাই এক্ষণে সার হইয়াছে। সেই যমুনাপুলিনে তাঁহাকে দেখিয়া আসা অবধি এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির হইতে পারিতেছেন না। বেশ বুঝিয়াছেন যে, সেই রমণীয়দর্শনকে না পাইলে, তাঁহার সেবা করিতে না পারিলে এ জীবনধারণই বৃথা হইবে; সেই মদন-মোহনের প্রতি সর্ব্বেন্দ্রিয় আকৃষ্ট হইতেছে। চক্ষু সর্ব্বদা সেই কালরূপ দেখিতে চায়, কর্ণ তাঁহার সেই মধুর বংশীধ্বনি ছাড়া আর কিছু শুনিতে চায় না, নাসিকা তাঁহার অঙ্গগন্ধ আঘ্রাণ করিতে চায়, রসনা সর্ব্বদা সেই নাম জপ করিতে চায়। হৃদয় সেই মধুরমূর্ত্তির আলিঙ্গন জন্য অধৈর্য্য হইতেছে এবং হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে কে যেন বলিতেছে "নয়নে দেখিয়া রূপ ঐছন করল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়"। বুঝি সেই স্পর্শমণির স্পর্শে কত লৌহদেহ কাঞ্চন হইয়াছে। সখি! আমার ভাগ্যে কি তাহা হইবে না? আমি কি সেই নয়নরঞ্জন শ্যামসুন্দরকে পাব না? কেন আমি যমুনায় গেলাম, কেন আমি সেই অতুলনীয় রূপরাশী দর্শন করিলাম? সখি! তিনি কোথায় থাকেন? তোমাদের করে ধ'রে ব'লছি একবার আমাকে সেইরূপ দেখাও;

একবার আমি সেই নয়নানন্দ কালাচাঁদের সম্মুখে আমার এই হা হুতাশ-পূর্ণ প্রাণ ল'য়ে মর্ম্মের কথা প্রকাশ করি।

যত রূপ তত বেশ, ভাবিতে পাঁজর শেষ,
চিতে আর নিবারিতে নারি।
কিবে যশ অপযশ, নাহি ভায় গৃহবাস,
তিলে আধ পাসরিতে নারি॥

মাথে ল'য়ে কুলডালা, ঘুঁচাব কুলের জ্বালা,
তবহু পূরবে মনঃসাধ।
সদয় হইবে বিধি, সাধিব মনের সিধি,
কবে হ'বে কালা পরিবাদ॥

কুল ছাড়ে কুলবতী, সতী ছাড়ে নিজপতি,
সে যদি নয়ন-কোণে চায়।
স্বরূপে দড়ান্থ মন, জাতি যৌবন ধন,
নিছিয়া ফেলিব শ্যাম-পায়॥

মনে করি এই সাধ, যদি হয় পরিবাদ,
জীবন সফল করি মানি।
জ্ঞান দাসেতে কয়, এমত যাহার হয়,
ত্রিভুবনে তাহার নিছনি॥

সখি! আমার লজ্জাভয় দূর হইয়াছে—যে গুরুগঞ্জনার ভয়ে বাহিরের দিকে দৃষ্টি করিতেও ভয় হইত, সেই গুরুগঞ্জনাকেও আমি উপেক্ষা করিয়াছি। তাঁহাকে না পাইলে কিছুতেই আমি এ জ্বালাময় জীবন ধারণ করিতে পারিব না। সেই কালবরণ আমার সুখ দুঃখ, মান অপমান সব লইয়াছে; সেই শ্যাম-অনুরাগ, আমার মন-অরণ্য-মাঝে শার্দ্দূলের ন্যায় প্রবেশ করিয়াছে।

সখি!

কানু অনুরাগ, বাঘ যব পশিল
মন বন কানন মাঝ।

মান গজেন্দ্র, দরশন দূরে রহু,
গন্ধে ভাগল করিয়ায় ॥

ধরম কুরঙ্গ, রঙ্গ করি ভখিল,
কুল হয় পলাওল ত্রাসে।
ধৈরজ মেষ, দেশ তৈছে ছোড়ল,
সোয়ামী বরত অজা নাশে ॥

পড়শিক বাক্, কাক সম কলকলি,
ননদিনী জম্বুকী বোলে।
গুরুজন জাল, মাল তহি ঘেরল,
কুরঙ্গন নয়ান বিশালে ॥

নিরমম বোল, ঢোল সম ঘোষই,
নিন্দা ত্রিশূল সম হানে।
শার্দ্দূল চিত, ভীত নাহি হোয়ত,
কবি বিদ্যাপতি ভণে ॥

শ্রীনি—

সরমা এইরূপ বলিয়া প্রতিগমন করেন। পরিশেষে ইন্দ্র পণিগণের অধিনায়ক বলনামক অসুরকে বিনাশ করিয়া দেবগুরুর গোধন উদ্ধার করেন। ইহাই পণিগণ হৃত গোধন উদ্ধারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বৎস! এই আমি তোমাকে শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট অঙ্গিরোগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বলিলাম, এক্ষণে এ বিষয়ে মহাভারতের দুই একটী কথা উল্লেখ করিয়া এই বিষয়ের উপসংহার করিব।

মহাভারতে অঙ্গিরবংশ] মহাভারতে আছে—মহর্ষি অঙ্গিরা আপন আশ্রমে তপোনিরত হইয়া অগ্নি অপেক্ষা সমধিক তেজ লাভ করেন এবং তপস্যার জন্য অগ্নিজল মধ্যে প্রবেশ করিলে অঙ্গিরাই জগতে তেজোদানরূপে অগ্নিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হন। তাহা অবগত হইয়া দেব অগ্নি ভীতভাবে অঙ্গিরার নিকট উপস্থিত হইলে অঙ্গিরা তাঁহাকে স্বীয় অধিকার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন, প্রত্যুত্তরে অগ্নি অঙ্গিরাকে প্রথম অগ্নি অর্থাৎ সূত্রাত্মা হইতে বলেন এবং স্বয়ং বিরাট্ হইতে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন, কিন্তু পরিশেষে অঙ্গিরার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বাধ্য হইয়া অগ্নিকে স্বীয় অধিকার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। অঙ্গিরার বৃহস্পতি উতথ্য ও সম্বর্ত্ত নামে তিন পুত্র এবং ভানুমতী, রাগা প্রভৃতি আটটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তারানাম্নী ভার্য্যার গর্ত্তে বৃহস্পতির অগ্নিস্বরূপ ছয় পুত্র এবং একটী কন্যা জন্মগ্রহ করে। দর্শ পূর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞে যে সমুদয় অগ্নি পূজিত হইয়া থাকে তাহারা প্রায় সকলেই অঙ্গিরোবংশীয় বৃহস্পতি প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন। এইজন্য পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ঋ, স, ১।৩১।১১ শ্রুতিতে অগ্নিকে অঙ্গিরঃ পুত্র বলা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মহাভারতে (বনপর্ব্ব ২১৬ অঃ—২২১ অঃ) অঙ্গিরোবংশের কথা আরও বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। উহা অধ্যয়ন করিলে তুমি অঙ্গিরাবংশের সহিত অগ্নিসমূহের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবে।

দ্বিতীয় সূক্ত।

মধুচ্ছন্দাঋষি, গায়ত্রীচ্ছন্দ দেবতা প্রথম মন্ত্রত্রয়াত্মক তৃচের বায়ু, দ্বিতীয় তৃচের ইন্দ্রবায়ু, তৃতীয় তৃচের দেবতা মিত্রাবরুণ। প্রউগ শস্ত্রে (১) এই সূক্তের বিনিয়োগ।

বায়বায়াহি দর্শতেমে সোমা অরং কৃতাঃ। তেষাং পাহি শ্রুধী হবম্॥ঃ

পদানুসরণী] দর্শত হে দর্শনীয় বায়ো (এতস্মিন্ কর্ম্মণি) আয়াহি, আগচ্ছ। (ত্বদর্থম্) ইমে সোমা অরং কৃতাঃ, অলঙ্কৃতাঃ অভিষবাদিভিঃ সংস্কারৈঃ সংস্কৃতা ইতি যাবৎ। তেষাং তান্ সোমান্ (যদ্বা তেষাম্ একদেশ মিত্যধ্যাহারঃ) পাহি স্বকীয়ং ভাগং পিব ইত্যর্থঃ। তৎপানার্থঞ্চ হবম্ অস্মদীয়মাহ্বানং শ্রুধী শৃণু।

পদনিষ্যন্দিনী] বায়ো (হে বায়ুদেব!) আয়াহি (আগমন কর) দর্শত (হে দর্শনীয়) ইমে সোমাঃ (এই সোমরস) অরংকৃতা (অভিষবাদি সংস্কার-বিধানে সংস্কৃত হইয়াছে) তেষাম্ (সেই সোমরসের মধ্যে স্বকীয় ভাগ) পাহি (পান কর) শ্রুধী (শ্রবণ কর) হবম্ (আমাদিগের আহ্বানবাণী)।

অনুবাদ] হে দর্শনীয় দেব বায়ো! তুমি এই যজ্ঞভূমিতে পদার্পণ কর। এই যে তোমার জন্য সোমরস যথাবিধি সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছে। উহার মধ্য হইতে স্বীয় ভাগ গ্রহণ কর, এবং তাহা পান করিবার জন্য আমরা তোমাকে যে আহ্বান করিতেছি তাহাতে কর্ণপাত কর।

গূঢ়ার্থ-সন্দিপনী।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্! দর্শত' এই পদের অর্থ দর্শনীয়, ইহা বায়ুর বিশেষণ, কিন্তু বায়ু কি দর্শনীয়?

আচার্য্য] বৎস! কেবল রূপবিষয়ক চাক্ষুষ জ্ঞানকে দর্শন বলে না, সাধারণ জ্ঞানকেও দর্শন বলে, তদ্ভিন্ন মানস জ্ঞানবিশেষকেও দর্শন বলে নচেৎ 'আত্মা বা হরে দ্রষ্টব্যঃ' এখানে দৃশ্ ধাতুর প্রয়োগ হইত না। সুতরাং বায়ু চাক্ষুষ না হইলেও ত্বগিন্দ্রিয়ের অনুভবনীয় ত বটেন? অপিচ এবিষয়ে আরও একটি বিশেষ কথা আছে, সাধারণ জীব যে উপায়ে এবং যে ভাবে বায়ুকে অনুভব করে, যাজ্ঞিক চিত্ত-বিশুদ্ধির ফলে তদপেক্ষা বিশিষ্ট উপায়ে এবং বিশিষ্ট ভাবে বায়ুদেবকে দর্শন বা অনুভব করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্! এখানে আমার দুইটী প্রশ্ন—আপনি সর্ব্বত্রই

(১) প্রশ্নোত্তরে প্রউগ শাস্ত্রে বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

যাজ্ঞিককে. বিশুদ্ধ-চিত্ত ধরিয়া মন্ত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেছেন, কিন্তু যজ্ঞের অনুষ্ঠান পরম্পরা না হইলে ত যজমানের চিত্ত-শুদ্ধি হয় না, এরূপ অবস্থায় প্রথম যজ্ঞদীক্ষিত যজমান কিরূপভাবে দেবতা দর্শন করিলে তাহার চিত্তশুদ্ধি-ঘটিতে পারে? আর আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই বিশুদ্ধ-চিত্তই বা কিরূপ বিশিষ্ট উপায়ে এবং বিশিষ্ট ভাবে দেবতা দর্শন করিয়া থাকেন?

আচার্য্য] বৎস! প্রথম যজ্ঞদীক্ষিত অধিকারী দেবতার স্থূলমূর্ত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবেন। কিন্তু একটী বিশেষ কথা মনে রাখিও—যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বিবিধ, কেবল কর্ম্ম এবং সমুচ্চিত কর্ম্ম। যাহারা নিম্নাধিকারী—মন্ত্রময় স্বরূপ ভিন্ন দেবতার অন্য স্বরূপ যাহাদের নিকট প্রতিভাত নহে, তাহাদের তদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদিক্রিয়াকে কেবল কর্ম্ম বলা হয়, আর যাহারা দেবতার মন্ত্রময় স্বরূপ মননে অভ্যস্ত হইয়াছেন এবং ক্রমে দেবতার আধিদৈবিক হিরণ্যগর্ভ স্বরূপ বিজ্ঞানে অধিকার লাভ করিয়াছেন, এবং বায়বে স্বাহা, সূর্য্যায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণকালে হিরণ্ময়বপু জ্যোতির্ম্ময়পুরুষের বিজ্ঞান সহকারে যাঁহারা কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের এবংবিধ কর্ম্ম সমুচ্চিত কর্ম্ম নামে অভিহিত। কেবল কর্ম্মের ফলে যাজ্ঞিক ধূমাদি-মার্গে পিতৃলোক বা চন্দ্রলোক লাভ করেন, এবং কর্ম্মক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্তলোকে আগমন করেন। আর হিরণ্যগর্ভবিজ্ঞান-সহকৃত সমুচ্চিত কর্ম্মের ফলে যাজ্ঞিক দেবলোক বা ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া আচার্য্য ব্রহ্মার নিকট শ্রবণ মননাদি অনুষ্ঠানপূর্ব্বক জ্ঞান-প্রাপ্তি দ্বারা মুক্তিলাভ করেন।

শ্রুতি বলিলেন—কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকো দেবলোকোবৈ লোকানাং শ্রেষ্ঠস্তস্মাদ্বিদ্যাং প্রশংসন্তি। (বৃঃ আঃ উঃ ১।৫।১৬) অর্থাৎ যাজ্ঞিক অগ্নিহোত্রাদিরূপ কেবল কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক (চন্দ্রলোক) লাভ করেন, এবং বিদ্যা বা হিরণ্যগর্ভবিজ্ঞান সহকৃত সমুচ্চিত কর্ম্ম দ্বারা যাজ্ঞিক দেবলোক লাভ করেন। দেবলোক লোক সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং পণ্ডিতগণ বিদ্যার প্রশংসা করিয়া থাকেন। কেননা, কর্ম্ম এই বিদ্যার মহিমায়ই দেবলোক প্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে।

যাহা হউক বলিতেছিলাম — প্রথম যজ্ঞ-দীক্ষিত অধিকারী অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দেবতার স্থূলমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবেন। এই স্থূল মূর্ত্তি মন্ত্র-ময় বা স্থূল ধ্যান মন্ত্রদ্বারা অভিধেয়। যেমন অগ্নির ধ্যান—

পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ-জঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ॥

প্রথম অধিকারী এইরূপ স্থূল অবলম্বনে চিত্তধারণ পূর্ব্বক তৎতৎ দেবতার প্রীতির জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্! চিত্তশুদ্ধি অর্থে চিত্তের কোন্ অবস্থা, আমি ভাল রূপ বুঝিতে পারিতেছি না, আপনি অনুগ্রহ করিয়া একটু বিশ্লেষণপূর্ব্বক চিত্ত-শুদ্ধির অবস্থা সম্বন্ধে আমায় উপদেশ করুন।

আচার্য্য] বৎস! রজঃ ও তমোরূপ মল বিগলিত হইবার পর চিত্তের নির্ব্বাধ স্বাভাবিক সত্ত্বস্ফুরণকে সত্ত্বশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধি বলে। কথাটি আরও পরিস্ফুটরূপে বুঝিতে চেষ্টা কর—তমঃপ্রধান প্রকৃতি বা অবিদ্যা হইতে তদুপহিত চৈতন্য বা প্রাজ্ঞের ভোগের জন্য প্রথমতঃ আকাশাদি অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়, তৎপর আকাশাদির পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বাংশ হইতে কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং আকাশাদির সম্মিলিত সত্ত্বাংশ হইতে মন ও বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। অনন্তর আকাশাদির পৃথক্ পৃথক্ রাজসিক অংশ হইতে বাক্ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং সম্মিলিত রাজসিক অংশ হইতে পঞ্চ-প্রাণ উৎপন্ন হয়। এইরূপে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণ, অপঞ্চীকৃত মহাভূত হইতে এই সপ্তদশ অবয়ব লিঙ্গশরীর সৃষ্ট হইল এবং এই লিঙ্গশরীরে অভিমানী-চৈতন্য হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত হইলেন। এই হিরণ্যগর্ভই প্রথম জীব (হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে—শ্রুতি) বিশুদ্ধ সত্ত্বই ইহার দেহ, বিশুদ্ধসত্ত্ব তেজোময় বা জ্যোতির্ম্ময়, পার্থিব কোন জ্যোতি বা তেজের সহিত এই জ্যোতির তুলনা হয় না, তথাপি স্থূলদর্শীর চিত্তধারণার জন্য ইহাকে হিরণ্ময়বপু হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যকেশ বলা হইয়াছে। ইহার সর্ব্বাবয়ব জ্যোতিদ্বারা গঠিত, ইহা বুঝাইবার জন্য 'আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ' (নখাগ্র পর্য্যন্ত সমস্তই সুবর্ণময়) এইরূপও বলা হইয়াছে (ছাঃ উঃ ১।৬।৬)। এই সমষ্টি লিঙ্গশরীরী জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষেরই মধ্যে এই ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তী দেব তির্য্যক্ মনুষ্যাদি যাবতীয় জীব বর্ত্তমান। এবং ইঁহারই লিঙ্গশরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ গ্রহণ করিয়া জীবের লিঙ্গশরীর গঠিত ইঁহারই চিত্তসত্ত্ব হইতে জীবের চিত্ত-সত্ত্ব, ইঁহারই প্রাণ হইতে জীবের প্রাণ এবং ইঁহার দশ ইন্দ্রিয় হইতে জীব

দশ ইন্দ্রিয় লাভ করিয়াছে। হিরণ্যগর্ভরূপ জ্যোতির সাগরে আপন আপন কর্ম্মময় ঘট ডুবাইয়া দিয়া জীব আপন আপন ঘটের আয়তন অনুসারে লিঙ্গ-শরীর-গত প্রকাশের অধিকারী হইয়াছে, অপিচ এইরূপে লিঙ্গদেহধারী জীবগণ আপন আপন কর্ম্মফল অনুসারে বিভিন্ন লোক এবং বিভিন্ন দেহ ধারণ করিয়াছে ; তন্মধ্যে বায়ুলোকবাসী জীবগণ বায়বীয় দেহ, সৌরলোকবাসী জীবগণ তেজোময় দেহ, বরুণলোকবাসী জীবগণ জলময় দেহ এবং পৃথিবীলোকবাসী মর্ত্ত্যগণ পার্থিবদেহ ধারণ করিয়াছে। কর্ম্মরচিত এইরূপ বিভিন্ন দেহে অনুপ্রবিষ্ট ঐ লিঙ্গশরীরগত জ্যোতি কোথাও সূর্য্যকান্ত-মণিচুম্বিত সৌরকিরণেরন্যায় স্ফীত, সর্ব্বতঃ প্রসৃত ; আবার কোথাও বা স্ফটিকপ্রতিফলিত সূর্য্যকিরণের মত অপ্রতিহত, কোথাও বা নিবিড় অন্ধকারপুঞ্জমধ্যগত দীপালোকের মত কবলিত ও বাধাপ্রাপ্ত। এইরূপে কর্ম্মের বৈচিত্র্য অনুসারে জীব বিচিত্র দেহ ধারণ করিয়া বিভিন্ন অবস্থায় বর্ত্তমান। কিন্তু যে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, মোক্ষরাজ্যে যাইতে হইলে মোক্ষদ্বারের দ্বারপালস্থানীয় এই হিরণ্যগর্ভের সাক্ষাৎকার ভিন্ন গতি নাই, এবং ইঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলেও ব্যষ্টি-ভাবে যে চিত্ত-সত্ত্ব জীবের দেহপিণ্ডে লুক্কায়িত রহিয়াছে, ঐ সত্ত্বাংশকে রাজস তামস বাধা হইতে নির্ম্মুক্ত করা আবশ্যক। শাস্ত্র বিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম ও শাস্ত্রানুমোদিত লৌকিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে এই রাজস তামস বাধা বিগলিত হয়, তখন রাহুর-গ্রাস-নির্ম্মুক্ত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় চিত্ত আপন স্বাভাবিক সত্ত্ব প্রকাশ লইয়া আবির্ভূত হয়, চিত্ত-সত্ত্বের এইরূপ রজোগুণ ও তমোগুণ মুক্ত অবস্থাই চিত্তশুদ্ধি নামে অভিহিত। পিঞ্জর-বদ্ধ বিহগশিশু দুঃসহ বন্ধন-যাতনা ভোগ করিবার পর কোন দয়ানিধির অনুগ্রহে উদ্ধার লাভ করিয়া চিরপরিচিত আকাশলাভে যেমন আনন্দ লাভ করে, বিশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তি দেহেন্দ্রিয় পাশচ্ছেদনে তদ্রূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করে। স্বল্প শিশির-বিন্দু যেমন নবোদিত সূর্য্য প্রতিবিম্বে অনুরঞ্জিত হয় তদ্রূপ বিশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তির হৃদয়-দর্পণ ও হৃদয়াকাশস্থিত হিরণ্ময়বপু পুরুষের প্রতিবিম্বে উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে, আর যাজ্ঞিক তখন আপন হৃদয়ে নববিকসিত অভূতপূর্ব্ব সুষমা দর্শনে প্রণিহিত হইয়া থাকেন, এইরূপে পুনঃ পুনঃ হৃদয়-গুহাশায়ী হিরণ্ময়বপু পুরুষের ভাবনার ফলে চিত্ত যখন তাঁহার ব্যাপক সত্তা ধারণের উপযুক্ত হয় তখন অনন্ত শোভাময় এই সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ তাহার অচির-বিকসিত তৃতীয় নয়নের তৃষ্ণা নির্ব্বাপণ করিতে করিতে তাহার

নিকট উপস্থিত হয়েন, বৎস! বিশুদ্ধ-চিত্ত জীব এইরূপ বিশিষ্ট ভাবে ও বিশিষ্ট তৃতীয় নয়নে বায়ুকে দর্শন করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মচারী] বিশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তিকের এরূপ দৃষ্টি যে অনন্যসাধারণ, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু বায়ুই কি সেই হিরণ্যগর্ভ?

আচার্য্য] বৎস? বায়ুই সেই হিরণ্যগর্ভ। ইহারই অপর নাম সূত্রাত্মা। উপনিষদ্দেবী বলেন—বায়ুর্বৈ গৌতম! তৎসূত্রম্, বায়ুনা বৈ গৌতম! সূত্রেণায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সংদৃব্ধানি ভবন্তি।

(বৃঃ আঃ উঃ ৩।৭।২)

উদ্দালক! বায়ুই সেই সূত্রাত্মা। গৌতম! এই সূত্রস্থানীয় বায়ু দ্বারাই ইহলোক পরলোক এবং আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত ভূত-নিচয় গ্রথিত। সূত্রে যেমন মণিমালা গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ এই হিরণ্যগর্ভস্বরূপ বায়ুতে এই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড গ্রথিত। এই সূত্রই তোমার মধ্যে মুখ্য প্রাণরূপে বর্ত্তমান। এই জন্য, সূত্র বিগলিত কুসুম-শ্রেণী যেমন নিরাশ্রয় ও বিশ্লিষ্ট হইয়া নষ্ট হয়, তদ্রূপ প্রাণবিযুক্ত দেহাদি সংঘাতও পরস্পর বিযুক্ত হইয়া বিনষ্ট হয়। জীব-সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভের প্রাণস্থানীয় এই বায়ু, সুতরাং প্রধানতঃ ইঁহাকেই হিরণ্য-গর্ভ বলা যায়।

বৎস! এখন তুমি বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ, কেন বায়ুকে দর্শনীয় বলা হইয়াছে?

ব্রহ্মচারী] ভগবন্! এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি। আহা এমন দর্শনীয় আর কে আছে? স্থূল-দর্শিগণের অলঙ্কার-প্রিয় দৃষ্টির ক্ষুধা নির্ব্বাপণের জন্য যাঁহার জ্যোতির্ম্ময় বিরাট্ অঙ্গ সমুদ্রমেখলা হিমাদ্রিকিরীটিনী শস্য-শ্যামলা পৃথিবীকে পদদেশে স্থাপন করিয়া সৌরকিরণমালালঙ্কৃত দ্যুলোককে শীর্ষদেশে পরিণত করিয়া, অগণিত নক্ষত্রমালালঙ্কৃত চন্দ্রতারাহারসুশোভিত মধ্যদেশে সুশোভিত হইয়া বিরাজমান, সে দৃশ্যের তুলনা হয় না। কিন্তু ভগবন্! কি উপায়ে আমি এই অবস্থা লাভ করিব? কি উপায়ে আমি দেহেন্দ্রিয়-সংস্কার মুছিয়া ফেলিয়া হৃদয়কমল মধ্যে আপন স্বরূপ উপনীত হইব, এবং এই বিশ্ব-প্রাণস্বরূপ হিরণ্যগর্ভের দর্শন লাভে সমর্থ হইব?

আচার্য্য] বৎস! তুমি একবার তোমার অবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও—তাঁহার করুণায় তোমার শ্রেয়োলাভ ঘটিবে। একবার ভাব দেখি

তাঁহার কত করুণা! তুমি অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় যখন তাঁহার বিরাট্ সত্ত হইতে বিস্মৃতি দ্বারা বিচ্যুত হইয়া ক্ষুদ্র দেহ-কূপে পতিত হইলে তখন হইতেই ঐ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষও তোমার ভোগ ও অপবর্গের সাহায্য জন্য তোমার গ্রহণীয় বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, এবং আপন চক্ষুস্বরূপ সূর্য্যদ্বারা তোমার নয়নদ্বয়কে আপন হৃদয়রূপ চন্দ্রদ্বারা তোমার হৃদয়কে আপন প্রাণরূপ বায়ুদ্বারা তোমার প্রাণকে সাহায্যদানে অনুগৃহীত করিতেছেন আর তুমি কত অকৃতজ্ঞ ও অজ্ঞান। তুমি প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসের জন্যও এই মহাপুরুষের নিকট অনুগৃহীত হইয়াও একবার অনুগ্রাহকের প্রতি দৃষ্টিপাত কর না। এইরূপে তুমি নানা ছিদ্র বিশিষ্ট ঘটের মধ্যবর্ত্তী দীপালোকের ন্যায় চক্ষু কর্ণাদি ছিদ্রে বৃত্তিরূপে বহির্গত হইয়া এবং আপন আলোকে বাহ্যবস্তুসমূহ উদ্ভাসিত করিয়া তৎসমুদয় ভোগে উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছে, এবং আপন সৌন্দর্য্য দর্শনেও উদাসীন রহিয়া আপনারই সৌন্দর্য্যে সৌন্দর্য্যান্বিত রূপরসাদি ভোগে জীবন যাপন করিতেছ। কিন্তু তোমার মনে নাই, যখন এই স্থূলদেহধারণোপযোগী কর্ম্ম দেখিতে দেখিতে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে ক্রমে জরাজীর্ণ দেহ যখন বৃন্ত-চ্যুত কুসুম-দলের মত ঝরিয়া পড়িতে থাকে কর্ম্ম-প্রসাদিত হিরণ্যগর্ভ যখন কর্ম্মক্ষয় বশতঃ অনুগ্রহ-দানে উদাসীন হইতে থাকেন, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-নিচয় যখন স্ব স্ব শক্তি ক্রমে হারাইতে থাকে দেহ যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়, যখন অনুগ্রাহক হিরণ্যগর্ভের ইন্দ্রিয়স্বরূপ সূর্য্যাদি দেবতাগণ সম্পূর্ণরূপে অনুগ্রহ-দানে পরাঙ্মুখ হইয়া হিরণ্যগর্ভের অঙ্গে আপন শক্তি প্রত্যাহার করিয়া লন, জীব তখন নিদারুণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ছট্ ফট্ করিতে থাকে, ভোগচ্ছারূপ দেদীপ্যমান বহ্নি রূপরসাদি আহার না পাইয়া শত বৃশ্চিক দংশনে জীবকে দংশন করিতে থাকে, বৎস! একবার চিন্তা করিয়া দেখ, কি অসহনীয় যাতনাই না জীবে ভোগ করে, জীব বলিতে কেবল অন্যের কথা বুঝিওনা, তুমি আমি এই যাতনাই জন্মে জন্মে ভোগ করিয়া আসিতেছি। এই জন্যই সন্তানের যাতনা স্মরণে আকুল হইয়া শ্রুতি শতমুখে আপন সন্তানকে প্রেত হইয়া তাহার অমৃতময় কোলে যাইতে বলিতেছেন, বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই মরিয়া যাইতে বলিতেছেন। এই জন্মের তুমি, পূর্ব্বজন্মের মাতা পিতা ইত্যাদি বন্ধুবর্গ লইয়া কথোপকথন করিবার সুবিধা পাইয়া কথোপকথন করিতে থাকিলে অথবা ভূতাবিষ্ট হইয়া ভৌতিক আনন্দ ভোগ করিতে থাকিলে তোমার এই জন্মের মা যেমন সে উপেক্ষা সহ্য করিতে পারেন না,

এবং নানা কথায় তোমার বর্ত্তমান জন্মের স্মৃতি যেমন জাগাইয়া দেন, তদ্রূপ দ্বিজ তুমি; তোমার দ্বিতীয় জন্মের জননী সাবিত্রী তোমাকে স্থূলজন্মের স্থূলসংস্কার ভুলিয়া যাইতে বলিতেছেন এবং সময় থাকিতে থাকিতে না ভুলিলে তোমার জন্য যে অসহনীয় অবস্থা আসিতেছে, তাহার ভীষণ চিত্র তোমার সম্মুখে ধরিতেছেন। বৎস! তুমি এই বিভীষিকা দর্শনে এই মররাজ্যের প্রতি বীত-স্পৃহ হও, হইয়া অমর সত্বরাজ্যে উপনীত হও। এই রাজ্যে উপনয়ন করিবার জন্য তোমার উপনয়ন-সংস্কার হইয়াছে।

বৎস। তোমার কি মনে আছে, যখন তুমি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনের জন্য আমার নিকট উপনীত হইয়াছিলে, তখন আমি বস্ত্র, মেখলা, যজ্ঞোপবীত, কৃষ্ণাজিন ও পালাশ দণ্ড দান করিয়া তোমাকে যাহা বলিয়াছিলাম?

ব্রহ্মচারী] ভগবন্! আমার চিত্ত অসংস্কৃত সুতরাং আপনি সংস্কৃত দেবভাষায় নরাধমকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার মনে নাই, আপনি আমায় পুনরায় তাহা উপদেশ করুন, আহা, আমি আপনার এই অমৃতময় উপদেশ শ্রবণে কি হইয়া যাইতেছি।

আচার্য্য] তুমি উপনীত হইতে আসিলে আমি তোমাকে প্রথম বস্ত্র পরিধান করাইয়াছিলাম কিন্তু কি সে বস্ত্র! বৃহস্পতি ইন্দ্রকে যে বিধানে যে অমৃতময় বস্ত্র পরিধান করাইয়াছিলেন, ব্রহ্মচারিন্! আজ আমি সেই বিধানে সেই অমৃতময় বস্ত্র তোমায় পরাইতেছি—এই বলিতে বলিতে শুধু শনের বস্ত্র তোমায় পরাই নাই এ বস্ত্র অমৃত, এ বস্ত্র নবজীবন দান করে, ধারণ কারীকে দীর্ঘায়ু, বল ও তেজ দান করে। বৎস তুমি প্রবাসাগত, আমি তোমাকে তৈজস অবস্থায় উপনীত করিয়া হিরণ্যগর্ভরূপে প্রবাসাগত তোমাকে আপন রাজ্যের তেজোময় (শুদ্ধসত্বময়) আচ্ছাদন করিয়াছিলাম। এই শুদ্ধসত্বময় বসন বস্তুতঃই অমৃতময়, এ বসন প্রকৃতই নবজীবন দান করিয়া দীর্ঘায়ু, বল ও তেজ দান করে। তার পর, মেখলা ও যজ্ঞোপবীত দানেও সেই কথাই প্রকারান্তরে বলিয়াছি। এইরূপে নূতন সজ্জায় সুসজ্জিত করিয়া তোমাকে বলিয়াছিলাম— প্রাণস্য ব্রহ্মচার্য্যসি'। (আঃ গৃঃ সূঃ ১।২০।৭) বৎস! তুমি আজ হইতে প্রাণ অর্থাৎ বিশ্বপ্রাণ হিরণ্যগর্ভের ব্রহ্মচারী হইলে। বৎস! এই তেজোময় আচ্ছাদনে আবৃত হইয়া হিরণ্যগর্ভের জ্যোতির্ম্ময়স্বরূপে অন্তর্দৃষ্টি স্থাপন কর, তুমি চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।

অর্জ্জুন—তোমা অপেক্ষা পরতর অন্য কিছুই নাই—ইহার অর্থ ত বহুপ্রকার হইতে পারে?

ভগবান্—হাঁ। (১) পরতর অর্থে শ্রেষ্ঠ, পরমার্থ সত্য। অপরা প্রকৃতি হইতে পরা প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ। আবার পরা প্রকৃতি হইতে আমি শ্রেষ্ঠ। আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ আমি। আমাতে স্বভাবতঃ চলন বা স্পন্দন উঠিলেই চলন বা স্পন্দন যে অধিষ্ঠানে উঠিল, সেই অধিষ্টান-চৈতন্য খণ্ডমত বোধ হয়। অথচ আমি সর্ব্বদা স্বস্বরূপে থাকিয়াই এইরূপ খণ্ডিত মত হই। খণ্ডমত হওয়া, এই জন্য মায়িক ব্যাপার। দর্পণে বাহিরের প্রতিবিম্ব যখন পড়ে, তখন যেমন প্রতিবিম্বটিই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বাহ্য বস্তুটি নড়িলে চড়িলে দর্পণ-দৃশ্যমান-প্রতিবিম্বটিই নড়িতে চড়িতে থাকে—প্রতিবিম্বাবৃত দর্পণাংশ দৃষ্টিপথে পড়ে না—সেইরূপ চিদ্দর্পণের ভিতর হইতে স্বভাবতঃ যে চলন উঠে তাহা চিদ্দর্পণের উপরে প্রতিবিম্বিত হয়—হইয়া উহা প্রতিবিম্বের আধার চিদংশকে ঢাকিয়া রাখে এবং নিদ্রাকালে মনের মধ্যে যাহা কিছু দেখা যায় তাহা যেমন বাহিরে দেখিতেছি বলিয়া বোধ হয় সেইরূপ চিৎদর্পণের অন্তর্গত প্রতিবিম্ব চিত্তের আত্মমায়া প্রভাবে বাহিরে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়। পরমেশ্বর চিৎস্বরূপ। তাঁহার চলনটি কল্পনা মায়া। এই জন্য পরমেশ্বরই পরমার্থসত্য। মায়ার যে সত্যতা তাহা ব্যবহারিক—একটা বলিতে হয় বলিয়া বলা হয়। যতদিন অজ্ঞান থাকে ততদিন মায়িক ব্যাপার জগদাদির একটা ব্যবহারিক সত্যতা থাকে—মায়া পরমার্থ সত্য না হইলেও—মায়া বা প্রকৃতির যে স্পন্দন তাহাও নিয়মমত হয়। এই জন্য জগতের একটা ব্যাপার—চেষ্টাও শাস্ত্রে দেখা যায়। ব্রহ্মই উপাদান, তাঁহার উপরেই এই ইন্দ্রজাল। সমুদ্রই আছেন—তাহার উপর যে তরঙ্গ ভাসে ভাঙ্গে তাহা জল হইলেও—সমুদ্র হইলেও, নামরূপে মাত্র বিভিন্ন। 'সমুদ্রের তরঙ্গ' এইরূপ বলা হয়, কিন্তু 'তরঙ্গের সমুদ্র বলা' হয় না। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একটা মায়িক ব্যাপারে নামরূপবিশিষ্ট হইয়া বাহিরে দেখা যাইতেছে—কিন্তু ইহা চিদ্দর্পণের অন্তর্গত স্পন্দন প্রতিবিম্ব ভিন্ন কিছুই নহে। এই কারণে ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কিছুই আর নাই। পরমার্থ সত্য যে পরমেশ্বর তিনি ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। এই শ্লোকের প্রথমাংশের অর্থ এই। শুধু ব্রহ্মই আছেন এইটি সত্য হইলেও বাহিরে একটা জগৎ যে দেখা যায় তৎসম্বন্ধে বলা হইতেছে যে, জগৎটা যাহাই হউক—এটা প্রতিবিম্বসমূহ যেমন দর্পণে প্রতিফলিত সেইরূপ ভাবে ব্রহ্মে প্রতিফলিত। প্রতিবিম্বসমূহ দ্বারা যেমন দর্পণ আবৃত হয় সেইরূপ দৃশ্যপ্রপঞ্চ দ্বারা পরমেশ্বর যেন আচ্ছাদিত। মণিমালা সূত্রেই গ্রথিত। মণিমালার মত এই জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মসূত্রে গ্রথিত হইয়া ঝুলিতেছে। সূত্রটি দেখা যায় না, মালাই দেখা যাইতেছে। সূত্রে মণিমালা গ্রথিত—এই গ্রথিত অংশেই এখানে দৃষ্টান্তের সাদৃশ্য। ব্রহ্মসত্তাতে ব্রহ্মমত, ব্রহ্মস্ফুরণে স্ফুরণ মত—এই জগৎ মায়া দ্বারাই কল্পিত। মণিমালা ও সূত্রের সহিত যদি পূর্ণ সদৃশ্য দেখাইতে হয়, তবে এই বলিতে হয় যে, হিরণ্যগর্ভ আত্মাতে স্বপ্নদৃশ্যজাত বিচিত্র রচনা মণিসমূহের মত সূত্রে গ্রথিত। কনক হইতে যেমন কুণ্ডল হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে জগৎ হয়। সূত্র হইতে কিন্তু মণিসমূহ হয় না, এজন্য এখানে সূত্রে মণিগণা ইবেতি

দৃষ্টান্তস্ত্র গ্রথিত্বমাত্রে নাতু করণত্বে। কনকে কুণ্ডলাদিবৎ—এই দৃষ্টান্ত এখানে যোগ্য দৃষ্টান্ত হইতে পারে।

(২) দ্বিতীয় অর্থ যাহা হইতে পারে তাহা এই:—পরমেশ্বর অপেক্ষা কারণান্তর অন্য আর কিছুই নাই। আমিই জগৎকারণ। জগৎকারণ আর কিছুই হইতে পারে না। আমিই যখন একমাত্র কারণ, তখন কারণস্বরূপ আমাতে সমস্ত কার্য্যজাত যে এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ তাহা গ্রথিত।

(৩) তৃতীয় অর্থ:—এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে বলা হইতেছে সৃষ্টিসংহারের কথা। আমা হইতে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিসংহারের স্বতন্ত্র কারণ আর কিছুই নাই। শ্লোকের নিম্নার্দ্ধে স্থিতির কথা বলা হইতেছে। আমাতেই এই জগৎ স্থিতিলাভ করিতেছে।

(৪) আরও বহু অর্থ বহু জনে করেন—আমি সর্ব্বকারণের কারণ। জগৎটা কার্য্যেরই মূর্ত্তি। আমি শক্তিমান জগৎটা শক্তির ব্যক্ত অবয়ব। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। এই হেতু বলা হইতেছে আমা হইতে—শক্তিমান হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। চিজ্জড়াত্মক এই জগৎটা আমার কার্য্য, আমি কারণস্বরূপ। কার্য্য ও কারণ অভেদ বলিয়া বলা হই-তেছে—আমা ভিন্ন আর কিছুই পরতর নাই। আমা ভিন্ন যাহা আছে বলিয়া মনে হয় তাহা আমাতেই গ্রথিত (উর্দ্ধ শ্লোকার্দ্ধে সর্ব্বাত্মকত্ব ও নিম্নে সর্ব্বান্তর্যামিত্ব বলা হইতেছে।

তুমি যে ভাবে পার ধারণা কর—আমিই পরমাত্মা। অদ্বৈত তত্ত্বই আত্মতত্ত্ব। দ্বৈত যাহা তাহা অজ্ঞান কল্পিত। এ অজ্ঞানও ব্রহ্মের স্বভাবতঃ কল্পনা মাত্র। আমি যাহা তাহাই আছি। মণির ঝলকের মত স্বভাবতঃ আমাতে ঝলক হয়। সেই ঝলকে আমি ইহা বা ইহা নহি বোধ ভাসে। "আমি ইহা" এই নিশ্চয় হইতে ক্রমে প্রকৃতির বিকৃতি ঘটে। সূচির শত-পত্র ভেদ মত সৃষ্টিতত্ত্বে যখন মহামন পর্যন্ত সৃষ্টি হয়, তখন স্বভাবতঃ যাহা পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে তাহার প্রকাশ হয়। বালক বহু কর্ম্ম করিয়া শেষে জ্ঞান হইলে আপন কর্ম্ম কি হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করিতে পারে। অদ্বৈত হইতে দ্বৈত-প্রকাশ ব্যাপারও সেইরূপ ॥ ৭ ॥

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়! প্রভাঽস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥

শ
কেন কেন ধর্ম্মেণ বিশিষ্টে ত্বয়ি সর্ব্বমিদং প্রোতম্? ইত্যুচ্যতে
শ যা শ
রস ইতি। হে কৌন্তেয়! অপ্সু জলেষু অহং রসঃ অপাং যঃ
আ ম
সারং রসস্তস্মিন্ রসভূতে মধুররসে কারণভূতে ময়ি সর্ব্বা আপঃ

শ নী
প্রোতাইত্যর্থঃ। যথা রসোঽপ্সু একমপ্যপ্ পরমাণুমপরিত্যজ্যানু-
নী
স্যূতো দৃশ্যতে, অতো রসরূপে ময়ি আপঃ প্রোতা ইতিভাবঃ।
নী ঘা ম আ
এবং শশিসূর্য্যয়োঃ চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ অহং প্রভা প্রকাশং অস্মি চন্দ্রাদিত্য-
আ ন
য়োর্যা প্রভা তদ্ভূতে ময়ি তৌ প্রোতাবিত্যর্থঃ, প্রকাশ সামান্যরূপে
ম শ্রী
ময়ি শশিসূর্য্যৌ প্রোতাবিত্যর্থঃ। সর্ব্ববেদেষু সর্ব্বেষু বেদেষু
শ্রী শ শ
বৈখরীরূপেষু অহং তন্মূলভূতঃ প্রণবঃ ওঙ্কারঃ তস্মিন্ প্রণবভূতে ময়ি
শ শ শ শ
সর্ব্বে বেদাঃ প্রোতা ইত্যর্থঃ। তথা খে আকাশে শব্দঃ সারভূতঃ
শ শ শ্রী শ
শব্দরূপে ময়ি খং প্রোতম্ শব্দতন্মাত্ররূপোঽস্মি। তথা নৃষু পুরু-
শ্রী নী
ষেষু অহং পৌরুষং পুরুষস্য ভাবঃ পৌরুষমুদ্যমোঽস্মি সর্ব্বপুরুষেষু
নী ম ম
সারং পৌরুষং শৌর্য্যধৈর্য্যাদিরূপং পুরুষত্বসামান্যং যদনুস্যূতং তদহং।
বি শ শ ম
সফলউদ্যমরূপে ময়ি পুরুষাঃ প্রোতাঃ। সামান্যরূপে ময়ি সর্ব্বে
বিশেষা প্রোতাঃ ॥ ৮ ॥

হে কৌন্তেয়! জলে রস আমি, শশি-সূর্য্যে প্রকাশ আমি, সর্ব্ববেদে ওঁকার, আকাশে শব্দ, পুরুষ মধ্যে পৌরুষ রূপে আমি বিরাজ করিতেছি ॥ ৮ ॥

অর্জ্জুন—অবাঙ্ মনস্ গোচর তুমি গুণসংযোগে গুণবান্ মত যখন হও তখন তোমাতে সমস্ত প্রোত এই ত বলিতেছ? আচ্ছা কোন্ কোন্ ধর্ম্মবিশিষ্ট তোমাতে এই সমস্ত মালার আকারে গ্রথিত হয়?

ভগবান্—সকল পদার্থের সার যাহা তাহাতে আমি অধিষ্ঠান করি। আমি স্বস্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও বস্তুর সাররূপে বিবর্ত্তিত হই। জলসমূহের সার রস। মধুর রস স্বরূপে আমি বিবর্ত্তিত হই। রসস্বরূপ আমাতে সমস্ত জল প্রোত। এইরূপ প্রভাস্বরূপ আমাতে শশিসূর্য্য প্রোত, প্রণবস্বরূপ আমাতে বেদ গ্রথিত, শব্দস্বরূপ আমাতে আকাশ প্রোত, সকল-উদ্যমস্বরূপ আমাতে সমস্ত পুরুষ প্রোত।

অর্জ্জুন—তুমি এক থাকিয়াও এত বিভিন্ন আকার ধারণ কর?

ভগবান্—আমি আপনাকে আপনি প্রকাশ করিবার জন্য অব্যক্ত বাক্য মনের অগোচর অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আসিবার জন্য মায়াময় হই—হইয়া বহুরূপে আপনাকে আপনি আস্বাদন করি। যেমন যেমন প্রকৃতি প্রাপ্ত হই—আমার সান্নিধ্যে প্রকৃতি যেমন যেমন বিকার প্রাপ্ত হইতে থাকে—প্রকৃতি যত যত রূপ ধারণ করে আমিও তাহাকে, সূত্র যেমন মণিমালা গাঁথিয়া রাখে—সেইরূপে গাঁথিয়া গলায় পরি। তাই বলিতেছি আমিই মানুষের সকল উদ্যম, আকাশের শব্দ, চন্দ্রসূর্য্যের প্রভা, বেদের ওঁকার এবং জলের রস।

অর্জ্জুন—তোমার প্রকাশ সর্ব্বত্র দেখা যায় না কেন?

ভগবান্—বৃক্ষপত্রে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে না, কিন্তু জলে ভাসে। নির্ম্মল আধারেই আমার প্রকাশ লক্ষ্য হয়।৮॥

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯ ॥

যা ম শ শ
পৃথিব্যাং ভূমৌ পুণ্যঃ সুরভিরবিকৃতো গন্ধঃ চাহং তস্মিন্ ময়ি

শ ম ম
গন্ধভূতে পৃথিবী প্রোতা চকারো রসাদীনামপি পুণ্যত্বসমুচ্চয়ার্থঃ।

ব শ বি
বিভাবসৌ বহ্নৌ তেজঃ চ দীপ্তিঃ যদ্বা সর্ব্ববস্তুপাচনপ্রকাশন শীত-

বি ব
ত্রাণাদিসামর্থ্যরূপঃ সারঃ চ শব্দাদ্বায়ৌ যঃ পুণ্যঃ স্পর্শ উষ্ণ স্পর্শ

উৎসব।



স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৮ম বর্ষ।] ১৩২০ সাল, আষাঢ়। [৩য় সংখ্যা।

পিয়াসী—"ফটিক্‌জল"।

ফটিক্‌জলের পিয়াস যাহার
জাগাও পরাণ মাঝারে,
তাহার পিয়াসা মেটে কি কখনো
নদ নদী হ্রদ পাথারে?

ওগো তৃষাহারি! বিনা ঘন-বারি,
তৃষিতে কেমনে রাখিবে নিবারি?
যদিও শুষ্ক, দীর্ণ কণ্ঠ তাহারি,
বারিদে মাগে—"ফটিক্‌জল"।

হোক্ সে অপার অতল জলধি;
স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ তটিনী বারি।
চাতকী মেঘের চির-অনুগতা,
তাহারি পরশ ভিখারী।

অরূপে রূপের মাধুরী নেহারি
নবঘন-প্রিয় গগন-বিহারী,
দীর্ণ কণ্ঠে হাঁকে সে পরাণ পানে
বারিদে চাহি—"ফটিক্জল" ॥

মৃঃ—

মহাত্মা কবিরের সাধনা।

ভূমিকা।

কবে তোমার আমার সে দিন হইবে যখন আমরা ঋষিগণের যে সকল কথা উচ্চারণ করিব তাহা আমাদেরই মনের কথা হইবে। ঋষিগণের কথা তাঁহাদের মনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঋষিগণের মনই বাক্যরূপে বাহির হইয়াছিল। আমরা আবার সেই কথা শুনিতেছি। শুনিয়া শুনিয়া কবে আমাদের মন সেই ভাবে গঠিত হইবে; হইয়া কবে আমাদের উচ্চারিত বাক্য তোতার বুলির মত ওষ্ঠের কথা না হইয়া মন-গলা কথা হইবে। এ প্রার্থনা করি কেন? কত কাল ধরিয়া শাস্ত্র-বাক্য মনের মধ্যে প্রবেশ করাইতেছি, কত কাল ধরিয়া ভগবানের নাম মনের মধ্যে প্রবেশ করাইতেছি—তথাপি মন ত শাস্ত্রবাক্যমত গঠিত হইল না। তথাপি মনত জপময় হইল না। কৈ তোমার আমার মন তেমন হইল—যখন ইহার উচ্চারিত বাক্যই ভগবানের নাম বা ভগবানের ভাবের কথা? কৈ তোমার আমার মন অসম্বন্ধ প্রলাপ ছাড়িল? কতদিন ত সন্ধ্যা আহ্নিক জপ পূজা করিতেছ, কৈ তোমার আমার উচ্চারিত বাক্যই মন-গলা সন্ধ্যা-আহ্নিক মন্ত্র?

কখন কি বাক্ মনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কি তাহা সত্য বুঝিয়াছিলে? বুঝিয়াছিলে বৈকি? যদি কাহাকেও কখন ভাল বাসিয়া থাক, তবে বুঝিবে তুমি ইচ্ছা কর বা না কর—মন কিন্তু আপনা হইতে প্রিয় নাম উচ্চারণ করে, হস্ত কিন্তু আপনা হইতে প্রিয় নাম লিখিয়া ফেলে, আবার তাড়াতাড়ি তাহা মুছিয়া ফেলে পাছে কেউ দেখে। একবার পুছিয়াও হয় না—দুইবার তিনবার

ভাল করিয়া লেখা ধৌত করে, তবু মনে হয় লেখা আছে। ইহার নাম প্রেম। সেই প্রেম যতক্ষণ না হইতেছে ততক্ষণ তোমার আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। কাজেই হস্তিস্নানের মত সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেছ, জপ করিতেছ, কিন্তু ঐ ঐ সময়ে ত মন কতই করিবে; পরে কাজ সারা হইলে মন যাহা তাহাই রহিয়াছে দেখিবে। তাই বলি প্রেম না হওয়া পর্য্যন্ত বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হইবে না, মনও বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে না। শুধুই বলা "আবিরাবির্ম্ম এধি"। শুধুই বলা তুমি এস। প্রত্যহ মন ও বাক্য এক করিবার জন্য সাধনা করিবে. আর প্রত্যহ যাহা তাহা আচরণ করিবে, যাহা তাহা আহার করিবে, যে সে লোকের সঙ্গ করিবে, এইরূপ করিলে অনন্তকাল তপস্যা করিলেও তোমার হইবে না। প্রেম যে একবারেই নাই তাহা নহে, আছে। উদয়ও হয় কিন্তু কু-সঙ্গ, কু-আচার, কু-আহার, যার তার হাতে আহার করিয়া প্রত্যহ তাহাকে তাড়াইয়া দিতেছ। লোক-সঙ্গ ত্যাগ কর, কু-আহার কু-আচার ত্যাগ কর, দেখ হইবে।

প্রেম বস্তুটিই আছে। কাম যাহা তাহা যেন কোন একটা অসুন্দর বস্তুকে সুন্দর বলিয়া ভ্রম ভাবনা করা মাত্র। এই অসুন্দর বস্তুটা প্রেমের ঝলক মাত্র। যেমন মরীচিকায় জল ভ্রম হয়, সেইরূপ প্রেমে ঝলকের একটা ভ্রম হয়। এই ঝলকটা আপনিই উঠে। এটা স্বভাবতই হয়। ঝলকটা প্রেম হইতে উঠিয়া প্রেমকে ঢাকিয়া ফেলে; যেমন পানা জল হইতে উঠিয়া জলকে ঢাকে সেইরূপ। তাই মানুষ প্রেমকে দেখে না—দেখে প্রেমের ঝলক। প্রেমের ঝলকটাই কাম। যেমন নিত্য ভগবান্‌কে মানুষ বলে নাই আর অনিত্য জগৎকে বলে ইহাই আছে সেইরূপ। কামটা প্রেমের ঝলক। এই ঝলকেই প্রেম ঢাকা পড়িয়াছে। লোক কিন্তু কামই দেখে। জগতের সর্ব্বত্র সকল লোকে কামের ভিতরেই আছে। যেমন মানুষ মায়ার ভিতরে আছে সেইরূপ। কামটা ভুল। ভুল হইলেও ভুলের একটি রূপ আছে, তাহা প্রেমের দিকেই ছুটে। এইটি ধরিতে পারিলে ভুলের মধ্যে পড়িয়াও ভুল অতিক্রম করা যায়। কামের মধ্যে পড়িয়াও প্রেমে পৌঁছান যায়। মহাত্মা কবিরের সাধনায় নিত্য প্রেমে কোন্ সাধনায় যাওয়া যায় তাহার ক্রমগুলি আছে। তাহাই আমাদের আলোচ্য। কবিরের গুরু রামানন্দ; তাঁহার গুরু রামানুজ। গুরু মুখ হইতে কবির রাম মন্ত্র পাইলেন। সিদ্ধ হইলেন হইয়া যাহা বলিলেন তাহা এই:—

প্রথমেই রামের কথা শুনা চাই। শুনিয়া বিশ্বাস করা চাই রামই সেই পরমপদ। যে পদ পাইবার জন্য ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্য করেন, বেদ যে পদ অন্বেষণ করেন, মুনি ঋষি যে পদ ধ্যান করেন—রামই সেই পরম পদ। এই পদই তুরীয় পদ। এই রামই সৎচিৎ সুখ স্বরূপ। এই রামই পরমহংসদিগের গতি। ইনিই প্রত্যহ প্রতি মুহূর্ত্তে স্বপ্নজাগরসুষুপ্তি অবস্থাতে ক্রীড়া করিয়াও আপনি আপনি ভাবে সর্ব্বদা শান্ত। কেহ বলেন ক্রীড়া করিবার জন্য ইনি মায়াশক্তির সৃজন করেন, কেহ বলেন মায়া স্বভাবতঃ মণির ঝলকের মত রাম হইতে উঠে। সমুদ্রে যেমন তরঙ্গ উঠে সেইরূপ, অথবা জল হইতে যেমন পানা উঠিয়া জলকে ঢাকিয়া রাখে সেইরূপ। এই রামের কথা প্রথমে শোনা চাই। এই রাম সর্ব্বত্র, এই রাম অন্তরে বাহিরে, এই রাম আকাশ ছাইয়া, এই রাম হৃদয় ভরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এই পর্য্যন্ত শুনিয়া তুমি রাম রাম শব্দ লইয়া সর্ব্বদা থাকিতে চাও, তবেই রামের কৃপা হইবে। রামের কৃপা হইলে গুরু মিলিবে। "যব গোবিন্দ কৃপা করি তব গুরু মিলি যায়"। রামো জ্ঞানময়ঃ শিবঃ। রামই জ্ঞানময় শিব। রামই গোবিন্দ। রামই সীতা। রামই কালী। রামই দুর্গা। রামই জগদ্ধাত্রী। রামই গায়ত্রী। রামই প্রণব। সর্ব্বদা শব্দে যে রাম লইয়া থাকে সে রামের কৃপায় গুরু পায়। গুরু পাইলেই সব পাওয়া হইল। প্রথমে শব্দে সর্ব্বদা রাম লইয়া থাকিও, তাহার পরেই গুরু মিলিবেন।

ক্রমশঃ—

তোমার কথা।

শুনি কিন্তু বুঝিতে পারি না। তবু মনে হয় কথা তোমারই নিত্যকর্ম্ম সারিয়া জপ করি—জপের শব্দে যখন মন ভরিয়া যায় তখন যেমন ভাবি "আমিই শুধু ডাকিব তুমি একবার ডাকিবে না" অমনি সময়ে সময়ে মহাকাশে কোন শব্দ শুনি। শুনি বাতাসের কি এক রকম শব্দ বা পাখীর ডাক বা পশুর স্বর। এ স্বরে কি তোমার স্বর মিশান আছে? এ স্বরে কি তুমি কথা কহিতেছ?

কেমন করিয়া বুঝিব কওনা? তুমি সর্ব্বব্যাপী। তুমি অন্তর্যামী। তোমার কোন আকার নাই। কিন্তু তুমি সব আকার ধর। প্রথমেই শব্দরূপে স্পন্দিত হইয়াছিলে। তুমি ত সর্ব্বস্থানেই আছ। ইচ্ছা হইলেই যাহা কিছু ঘটে তাহা ধরিয়াই যে ডাকে তাহার কাছে এস। কখন কাহাকেও শব্দ করাইয়া শব্দরূপে এস। যদি ইহা না হয় তবে স্থির হইয়া মন ভরিয়া জপ করিতেছি, পাখীর ডাকে বা পশুর রবে বা বাতাসের শব্দে চক্ষে জল আসে কেন? মনে হয় আমি যে মনে মনে ডাকিতেছি আর বলিতেছি তুমি একবার ডাক—তা তুমি শব্দে মিশিয়া আমার ডাকার সাড়া দিয়া গিয়াছ? শব্দ করিয়া কি বলিলে তাহা বুঝিলাম না কিন্তু চক্ষের জলে, হৃদয়ের কম্পনে বুঝিলাম এ তুমি।

সে দিন চিরন্দীতে তোমার ডাক শুনিতে পাইব মনে করিয়া সেখানে বসিয়াছিলাম। দুই দিকে দুই খানা বড় বড় পাহাড়ে পাথর। মধ্যে ছায়া। চারিদিকে রৌদ্র ও বায়ু বিষম ভাবে উৎপাত করিতেছে। আমি আর একটি লোকের সঙ্গে ঐখানে বসিলাম। তাহাকে বলিলাম কেমন স্থির ভাব দেখ। আচ্ছা সংসার-চিন্তা করিতে পার কি না দেখদেখি? এত স্থির, এত শান্ত যে অন্য চিন্তা করাই যায় না। এখানে বসিলে যেন কোন রসে মত্ততা জন্মায়, স্থির হইয়া, শান্ত হইয়া বসিয়া থাকা হইয়া যায়। এখন বুঝিতেছি সে তুমি। তুমিই চিরন্দীর একান্ত ভাব ধরিয়া কোলে করিয়াছিলে, তাই মন চুপ করিয়া শান্ত হইয়া তোমার কাছে ছিল।

তুমি এত গোপন কর কেন? গোপনে কি তোমার সুখ বাড়ে? একবার খোলাখুলি ভাবে দুটো কথা কহিলে কি তোমার জাত যায়? একবার খোলাখুলি ভাবে দেখা দিলে কি তোমার ধর্ম্ম নষ্ট হয়? কখন কাহারও নৃত্যে, কখন কাহারও কথার স্বরে, কখন পাহাড়ের নিস্তব্ধতায়, কখন নীল আকাশ ভরা নক্ষত্রমালার হার যার গলায় তাহাতে, কখন কাহারও উপরে মাতৃভাব আরোপে, কখন পশুপাখীর ডাকে, কখন পটের ছবিতে, কখন শালগ্রাম শিলায়, কখন মন্দিরের প্রতিমূর্ত্তিতে—এই কি চিরকাল করিব? তুমি গোপনে আসিবে আর আমি ভাবিব আরোপে ডাকিতেছি? কেন একবার কি আসিতে নাই? এলে কি হয়? আমার দুঃখটা তখন আর থাকে না? সেটা কি উচিত নয়? বুঝি উচিত নয়। আমার দুঃখ না থাকিলে জগতের দুঃখ বুঝি বুঝা যায় না। সকল শোক ত পাইয়াছি। তবুত কালে কালে

শোক নরম পড়িয়া যায়। হাহা হুহুতে মন পড়ে। তুমি ইহা নিবারণ জন্য বুঝি সর্ব্বদা শোকরূপী হইয়াছ। প্রতিমুহূর্ত্তেই ত পুত্র-বিয়োগ, কন্যা-বিয়োগ, স্বামী-বিয়োগ, স্ত্রী-বিয়োগ, পিতৃ-বিয়োগ, মাতৃ-বিয়োগ হইতেই আছে। শুধু ভাবিয়া লইলেই হয়। হায়! এখন আমার শোক নাই সত্য কিন্তু শত শত লোক সেইরূপ পুত্রকন্যা-শোকে এই মুহূর্ত্তেই লুটাইতেছে। আহা! ইহাদের কত দুঃখ। হা ভগবান্! আমি একদিন এই শোক জানিয়াছি। ইহা ভাবিবা মাত্র সেই শোক নূতন হইয়া উদয় হয়। তাহাতে বৈরাগ্য জন্মে। তখন কাতর ভাবে তোমায় ডাকা ভিন্ন আর কোন প্রতিকার নাই। বুঝি এই জন্যই তুমি নিত্য শোকরূপে জগতে বিহার কর। এ ভিন্ন মানুষ বুঝি তোমাকে লইয়া থাকিতে পারে না?

সবই ত প্রচ্ছন্ন? কবে একটু খোলাখুলি পাইব? পাইব কি? যাহা তোমার ইচ্ছা তাই হউক। খোলাখুলি ত আসিবে না। কি জানি তোমারও বুঝি কুল আছে। কুলের ভয় বুঝি তুমিও কর। তা নাই এস। এই ভাবেই নিত্য থাক। পশুপক্ষীর ডাকে, আকাশের নিস্তব্ধতায়, রাত্রির অন্ধকারে যেখানে সেখানে, বৃক্ষলতার দাঁড়াইবার ভঙ্গীতে, ফুলেফলে, বাতাসে, সূর্য্যে, চন্দ্রে, তারায়, জলে—সকলে আরোপে আরোপেই এস আর হৃদয়ের রাজা হইয়া না হয় বিশ্বাসেই সর্ব্বদা ডাক শুনিও। ডাকে সাড়া দিও। কি আর বলিব? তোমায় সর্ব্বদা নমস্কার করি।

বন্ধন ও মুক্তি।

প্রকৃতিই পুরুষকে বন্ধন করে। প্রকৃতি হইতে পুরুষের উদ্ধারকেই বলে মুক্তি।

প্রকৃতির হাতে পড়িয়া পুরুষ আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মমহত্ত্ব হারাইয়া ফেলেন। ভুলিয়া যাওয়াই হারান। আবার স্মরণে চৈতন্য হয়। তাহাই পাওয়া।

আত্মা বা পুরুষকে আপনার স্বরূপ স্মরণ করানই মুক্তির প্রথম কার্য্য।

পুরুষ আপনাকে আপনি স্মরণ করিয়া জীবাত্মাতে পরমাত্মার ধ্যান করুন। ধ্যানেই মুক্তি। ধ্যানেই আত্মা স্মরণ করেন তিনিই পরমাত্মা।

আত্মার স্বরূপ স্মরণ করায় কে?

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমুক্তয়োঃ।

প্রকৃতির বিকারই মন। জীব এই মনের সহিত যুক্ত হইয়াছে!

মন দুই অবস্থা লাভ করিতে পারে। জীব মন দ্বারা বদ্ধ হইলেও আপন স্বরূপ ভুলে না। জীবাত্মা যখন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে অভিমান করেন, তখন সেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি মনকে বৈরাগ্য উপদেশ দেয়। রে মন! সমস্তই ক্ষণস্থায়ী জানিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন কর। ইহা বুদ্ধিযুক্ত আত্মার উপদেশ।

মন বৈরাগ্যযুক্ত হইলে আবার আত্মাকেই তাঁহার স্বরূপ স্মরণ করাইয়া দেয়। আর বিষয়যুক্ত হইলে আত্মাকে সর্ব্বদা সুখে দুঃখে চঞ্চল করে। আত্মা সর্ব্বদা আপন স্বরূপে থাকিয়াও অহং অভিমানে আপনাকে সুখী দুঃখী ভাবনা করেন।

সাধকের কার্য্য প্রথমে মনকে বৈরাগ্য উপদেশ করা। যতদিন না বৈরাগ্য দ্বারা মন বিষয় হইতে আপনাকে প্রত্যাহার না করে ততদিন উপদেশ করা চাই —কি দেখিবে, কি চাইবে, কিই বা শুনিবে—সব ভোগইত করিয়া দেখিয়াছ, দুঃখ ভিন্ন সুখ ত পাও নাই। তবে আর কেন? বিষয় দেখা ছাড়, একবার আত্মাকে দেখ।

প্রথমে বৈরাগ্য উপদেশ দ্বারা বিষয়ে অনাস্থা জন্মাইয়া নিজের স্বরূপ স্মরণ করাও। আত্মদর্শন কর।

এই আত্মদর্শন জন্য প্রথম কার্য্য শ্রবণ। বেদান্ত বা উপনিষদ্ বাক্যে আত্মার কথা শ্রবণ কর; পরে যুক্তি দ্বারা তাহা যে নিশ্চয় তাহা স্থির কর। ইহা হইল মনন। শ্রবণ ও মনন ঠিক হইলেই হইবে ধ্যান। ধ্যান অর্থে এখানে আত্মভাবে স্থিতি।

আর এক প্রকার ধ্যান আছে। যোগী ইহার অনুষ্ঠান করেন। জ্ঞানী আত্মার কথা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিয়া আত্মদর্শন করেন। ইহা উপর-কার ক্রম।

যোগীর ক্রম নিম্ন হইতে। চিত্ত বিষয় লইয়া থাকে বলিয়া প্রথমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা উপেক্ষা অভ্যাস দ্বারা সুখে মিত্রভাব, দুঃখে করুণা, পুণ্যে মুদিতা

এবং পাপের প্রতি উপেক্ষা—ভাবনা কর। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা অভ্যাস দ্বারা চিত্ত ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট হইবে না—একভাবে একটা প্রসন্ন অবস্থায় থাকিবে। পরে প্রাণায়াম দ্বারা ইহাকে চঞ্চলতা-শূন্য কর, পরে প্রত্যাহার দ্বারা বৈরাগ্য অভ্যাস করাও। যতবার বিষয়ে যাইতে চাহিবে, ততবার ইহাকে বৈরাগ্য স্মরণ করাইয়া বিষয়-বিমুখ কর। চিত্ত যখন আর বাহিরে যাইতে চাহিবে না, তখন ইহাকে শরীর মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক প্রদেশে—যেমন নাভীচক্রে বা হৃদয়পদ্মে বা নাসাগ্রে বা ভ্রূমধ্যে অথবা হৃদয়-কমল-মধ্যবর্ত্তী ভবগৎমূর্ত্তিতে বন্ধন কর। ইহাই হইল ধারণা। চিত্তকে সর্ব্বদা ধ্যেয়বস্তুতে বন্ধন কর। হৃদয়-পুণ্ডরীকে যে শূন্য আকাশ আছে তাহাতে সগুণ ব্রহ্ম চিন্তা করিতে হয়। ইহা দহরবিদ্যা।

ধারণা গাঢ় হইলেই ধ্যান। গাঢ় ধ্যানই সমাধি। সমাধিভঙ্গে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে মুক্তি।

মুক্তি হইলে প্রকৃতি আর ভুলাইতে পারিবে না। প্রকৃতি কত হাব ভাব দেখাইবে, কত চেষ্টা করিবে আপনার পুরুষকে মুগ্ধ করিতে আর পুরুষ দেখিবে শুনিবে, সব করিবে সত্য; কিন্তু এ দেখাশুনায় আর মুগ্ধ হইবে না।

বেশ্যার ভিতরটা একবার দেখিয়া ফেলিলে, বেশ্যা যেমন আর মুগ্ধ করিতে পারে না সেইরূপ। প্রকৃতির যা কিছু কার্য্য সকলই ক্ষণস্থায়ী সমস্তই দোষযুক্ত ইহা দেখিলে আর প্রকৃতি ভাল লাগিবে না।

একদিকে আপনাকে আপনি দেখার সুখ অনুভূত হইয়াছে আর একদিকে কাপড়ে বেশভূষায় ভিতরের ঘা লুকান বেশ্যা দেখা হইতেছে, আর পুরুষ মুগ্ধ হইবে কিসে? যখন আপন সুন্দর স্বরূপ দেখিয়া দেখিয়া ডুবিয়া যাইতেছেন তখন আত্মধ্যানে সমাধি। আবার সমাধি ভাঙ্গিলে ঘা ঢাকা বেশ্যা ভিন্ন দেখার কিছুই নাই—কাজেই আবার অন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বরূপ দর্শন। এইরূপে আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ—শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

উৎপাত নিবারণ।

গোলমালে ত কোন কর্ম্ম হয় না। বিশেষ যিনি শান্ত হইলে আমি নির্ব্বিঘ্নে কর্ম্ম করিতে পারি, তিনি সর্ব্বদা উৎপাত করিতেছেন—আমার রাম রাম করা হইবে কিরূপে ?

যিনি উৎপাত করিতেছেন তিনি আমার সহধর্ম্মিণী মতি। আমি নির্জ্জন স্থানে বসিয়া রাম রাম করিব ইনি কাণের কাছে নানা কথা কহিবেন—আমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বিষম জঞ্জাল আনিবেন। ইঁহাকে শান্ত না করিয়া ত্যাগ করিতেও পারা যায় না। "কি আপদ্ তবু ভূত সঙ্গে সঙ্গে আসে" আমারও তাই।

যেখানে যাইব ইনি সঙ্গে যাইবেন। ছাড়িবার যো নাই। গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিলাম, মস্তক মুণ্ডন করিলাম, তবুও ইনি দূর হইবেন না। দণ্ড ধারণ করিলাম,—কাশীবাসী হইলাম—কিন্তু কি কষ্ট, দণ্ড দেখিয়াও ভয় নাই ; মতি সঙ্গ ছাড়িল না। আজকালকার মানুষ সন্ন্যাস লইয়াও যেমন গৃহস্থাশ্রমে মনকে রাখিয়া আসে না—যেখানে যায় মনকে সঙ্গে লইয়াই যায়—আমারও তাই। আমার স্ত্রীই আমার সংসার। এই স্ত্রী কিছুতেই ছাড়ে না। রাম রাম করিতে বসিব, স্ত্রী আসিয়া সংসারের কথা—কতদিনের পুরাতন কথা তুলিয়া জ্বালাতন করিবে। এখন উপায় কি ? এখন কিসে হইবে ?

এতদিন টাকা উপায় করা গেল—ইহার জন্য কত করা গেল তথাপিও ইহার হইল না।

বুঝিতেছি ইহার ব্যবস্থা না করিয়া আমি কিছুই করিতে পারিব না। স্ত্রীকে শান্ত করিতে হইবে—মতিকে বুঝাইয়া ঠিক করিতে হইবে।

শাস্ত্রও বলিতেছেন "মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ" শান্তি চাও মতিকে নিবৃত্ত কর।

বুঝাইতে আরম্ভ করিলাম। দেখ পুরাতন কথা তুলিয়া কিছুই লাভ নাই, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার ত আর চারা নাই। তোমার সহিত অনেক ব্যভিচার করা হইয়াছে—সে দোষ আমি স্বীকার করিতেছি। কিন্তু এখনও

তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। সংসার সংসার ত এতদিন করিলে—বহু-লোকের কথা কহিলে, এ ভাল নয়, ওর সংসার সুখের, এ সমস্তই ত শুনিলাম, কিন্তু মতি তুমিইত দেখিতেছ কেহই সংসারে সুখী নহে—ঐ যে যুবা, স্ত্রী লইয়া সুখে আছে বলিতেছ, চল উহার বাড়ীতে—জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ ও সুখ পাইতেছে—না সুখগন্ধি দুঃখই ভোগ করিতেছে—দেখ, স্ত্রীর জন্য, পুত্রের জন্য কত খাটিতেছে—অর্থ সঞ্চয় করিবার জন্য প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল, সায়ংকাল হইতে আবার প্রভাত পর্য্যন্ত কতই পরিশ্রম করিতেছে—ঐ দেখ বিদ্বান্ লোকটি বই লিখিতে লিখিতে বৃদ্ধ হইল, যাহাতে অর্থ উপায় হইবে তাহাতেই লক্ষ্য—ধর্ম্মের কথা কহে, লোকশিক্ষার কথা কহে, কিন্তু শকুনি যেমন খুব উপরে আকাশে উঠিলেও লক্ষ্য তাহার ভাগাড়ে—সেইরূপ ইহারও লক্ষ্য কিরূপে অর্থ হইবে? ছেলেপুলে বড় হইল তবুও সংসার ছাড়ে না;—ছেলে বলিলেও বলে—তোমরা যদি সংসার করিতে পারিতে জানিতাম, তবে ৺কাশী-বাসী হইতাম।—এ সব প্রতারণা বাক্য। নিজেই আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং ছাড়িতে পারে না। রাজা রাণী সবাই এইরূপ, সুখ কোথাও নাই। দুঃখ-ময় সংসারে আস্থা করিবার বস্তু নাই। দেশের উপকার, দশের উপকার বলিয়া যিনি চিৎকার করিতেছেন—তিনি অর্থবান্ হইলেও আরও অর্থ যাহাতে হয় তাহারই ফিকিরে ঘুরিতেছেন। যাহা আছে তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন, কিসে বাড়িবে তাই চেষ্টা। তুমি দুঃখময় সংসারের কথা আর তুলিও না—ইহাতে তোমারও কোন উপকার নাই পরন্তু আমিও বিশেষ ক্লেশ পাই। সহধর্ম্মিণীর ইহা উচিত নহে। যাহা দোষ ঘটিয়াছে তজ্জন্য ক্ষমা চাহিতেছি; এখনও সময় আছে এখনও রাম রাম করি আইস।

এইরূপ উপদেশে মতি এক এক বার শান্ত হইতে লাগিল কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভ্যাস বশতঃ আবার সেই সংসার কথা। আমি রাম রাম করিব, স্ত্রী আমার বলিতে থাকিবে—এমন সংসারে পড়িয়াছি জন্মাবধি হাড় ঝালাপালা হইল—একদিনও চাকর দাসীর সুখ নাই খাটিয়া খাটিয়া প্রাণান্ত হইল। এ সমস্ত যখন ঠিক হইল, তখন বলিতে লাগিল সংসারের ভার যাহার উপরে দি সেই চাল চালে। আমি মেয়ে মানুষ সংসার-রাজত্ব করিব কিরূপে?

আমি আবার উপদেশ দিতে লাগিলাম। সংসার মানেই গোলমাল। ইহা কখন ঠিক হইবে না। ইহার সমস্তই অস্থায়ী। ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোন্

কত মরিল—মরিবার ক্লেশ কত দেখিলে, তবু কেন সংসার সংসার টাকা টাকা করিয়া ক্ষিপ্ত হইতেছ। যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া রাম রাম করিতে থাক। যতটুকু সময় সংসার কর, কর কিন্তু সব সময় রাম রাম কর—সংসারও হইবে ভগবান্‌ও পাইবে।

প্রত্যহ এইরূপ করিতে করিতে মতির বৈরাগ্য আসিতে লাগিল; কিন্তু তথাপি গত সংস্কার ছাড়ে না। বিষম লয় বিক্ষেপ।

তখন আমি আর এক উপায় করিলাম। মতিকে একটু বৈরাগ্য-পথে আনিয়া মনে ভাবিলাম—এটা যা পারে করুক, আমি ভগবানে আশ্রয় লইয়া ইহাকে উপেক্ষা করিব।

আমি নাম গ্রহণ করিলাম। মতি গোলমাল তুলিলেই আমি নামকে বলিতাম, প্রভু! নামীও তুমি—রাবণ, কুম্ভকর্ণ,ইন্দ্রজিৎ বিনাশ করিয়াছ,সর্ব্বশক্তি তোমার আছে; প্রভু আমি শত অপরাধী হইলেও শ্রীচরণে আশ্রয় লইলাম। আমি তোমার হইলাম;—আমার আর কোন শক্তি নাই তোমার নাম করিবার জন্য আমি নিয়ম করিয়া বসিব—তুমি আমার কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়া দাও। বৈরাগ্য ও অভ্যাস ক্রমে আয়ত্ত হইল।

মতির নাশ হইল। আর আমি দেখিলাম মনচোর এতদিন আমার আত্মরত্ন হরণ করিয়া রাখিয়াছিল—চোরের নাশ হইল। আমি তখন আমার সাত রাজার ধন মাণিক লইয়া দেখিতাম। যত দেখিতাম ততই দেখিতাম—এমন সুন্দর আর কোথায়?

এখন আমার আবার নূতন সংসার হইল। পিতা মাতা আমি ও আমার স্ত্রী এই লইয়া আমার সংসার হইল।

আমার নাম জীবানন্দ, পিতার নাম সহজানন্দ। মাতার নাম মায়ারাণী, স্ত্রীর নাম শ্রীমতী।

পূর্ব্বেও এই সবই ছিল। তখন কিন্তু সেই গানের কথা পিতা মাতার অনৈক্য ছিল; পিতা থাকিতেন সপ্তম মঞ্চে, মা থাকিতেন নীচের ঘরেঃ অভিমানে কপট নিদ্রায়। পিতা সহজানন্দ পুরুষ—কপট মূর্ত্তি ধরিয়া মাকে সাধিতে আসিতেন। মাও আমার চতুর। সবই বুঝিতেন কপট নিদ্রা ছাড়িতেন না। আমি বড় কষ্টে ছিলাম। যে সংসারে পিতা মাতার ঘোর অনৈক্য, সে সংসারে সন্তানের সুখ কোথায়? ঘরে কখনও সাঁজের বাতী পর্য্যন্ত পড়িত না। ঘর আমাদের সর্ব্বদা

অন্ধকার—কখনও আমি জীবনে আলো দেখিতাম না। তার উপর আবার স্ত্রীর যন্ত্রণা।

স্ত্রী যখন শান্ত হইল তখন পিতামাতারও বিবাদ ভাঙ্গিয়া গেল। মাতার অভিমান ভাঙ্গিল, মাতা পিতার বাম পার্শ্বে সপ্তম মঞ্চে মনোহর বেশে গিয়া বসিলেন। আমি ও আমার সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে সেই নয়নে নয়নাবদ্ধ রত্নসিংহাসনস্থ মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে বিভোর হইয়া যাইতাম; কখনও দেখিতাম: পিতাও নাই মাতাও নাই, আমরাই নয়নে নয়নাবদ্ধ করিয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া যেন কি এক আনন্দসাগরে ডুবিয়া রহিয়াছি। কখন বা দুই নাই এক। যেন অর্দ্ধনারীশ্বর। মহাদেব যেমন নিজশক্তি উমাকে দেখিয়া সর্ব্বদা আনন্দে বিভোর থাকেন, আমিও আমার নিজশক্তি দেখিয়া তেমনই সর্ব্বদা আনন্দে থাকি।

আমরা কত খেলা করি। আমাদের খেলা—শক্তি সর্ব্বদা আমায় ভুলাইবে আমিও কিছুতেই ভুলিব না। শক্তিই মনরূপ ধরিত, মন সর্ব্বদা কত কি করিয়া আমায় ভুলাইতে চেষ্টা করিত। আমার বক্ষে দাঁড়াইয়া যেন অন্যের সহিত রঙ্গ করিতেছে দেখাইত, যেন ব্যভিচার করিতেছে দেখাইত—কত মূর্ত্তি ধরিত কত বেশ পরিধান করিত আর আমি তাহাকেই দেখিতাম। এ খেলাও সুন্দর, আবার খেলা ভাঙ্গিয়া অর্দ্ধনারীশ্বর—আবার তাহা ভাঙ্গিয়া এক সীমাশূন্য আনন্দ জ্ঞান হইয়া যাইতাম। যখন সীমাশূন্য ভাবে স্থিতি হইত, তখন বলিবার কেহ নাই। সেই অবস্থার কথা, খেলা করিতে নামিয়া বলিতে পারা যাইত। যেমন স্বপ্নকালে মানুষ স্বপ্নের কথা বলিতে পারে না, কিন্তু স্বপ্নভঙ্গে বলিতে পারে—আমরা সেইরূপ খেলা করিতে নাবিয়া সীমাশূন্য স্থিতির কথা বলিতাম। চিদাকাশ, চিত্তাকাশ, মহাকাশ—এই তিন স্থানে যাওয়া আসাই ব্রহ্ম ঈশ্বর মায়া-মানুষের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থার খেলা ও স্থিতি। হে ভগবান্—আমি মূর্খ কত কি ভাবি, কিসে কি হয় জানি না; যাহাতে হয় তুমি করিয়া দাও, আমি তোমার আশ্রিত আমি তোমারই।

মৃত্যুর পরে।

প্রাণ দেহ ছাড়িল—ছাড়িবা মাত্র দেহ সমস্ত সহ্য করিতে পারিল। গৃহের মধ্যে চারিদিক্ বন্ধ করিয়া চিকিৎসা করা হইতেছিল পাছে দেহে বাহিরের বায়ু লাগে। তখন প্রাণ, দেহ আশ্রয় করিয়াছিল। প্রাণ দেহে ছিল—কিন্তু প্রাণ দেহকে শান্ত করিতে পারিতেছিল না—ঘোর পিপাসায় দেহ দগ্ধ হইতেছিল—জ্বরের উত্তাপে দেহে অগ্নি জ্বলিতেছিল, সর্ব্বশরীরে বিষের কার্য্য—মস্তক স্থির রহিল না—হস্তপদ একস্থানে পড়িয়া রহিল না—হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইতেছিল—শয্যা কণ্টকাকীর্ণ মত লাগিতেছিল—শুইয়া শুইয়া উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিলে—শীতল গঙ্গাতীরে যাইতে চাহিতেছিলে কত করুণ বিলাপ করিতেছিলে—কেমন আছ জিজ্ঞাসা করিলে বিকারে বলিতেছিলে, বেশ আছি—আবার জ্ঞান আসিলে বলিতে, বড় জ্বালা, প্রাণ বড় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে! কখনও বলিলে বৃক্ষতলে আছি—কখন বলিলে আমাকে উপরে শীতল স্থানে লইয়া চল। আহা প্রাণ তখনই কতই না যাতনা ভোগ করিতেছিল। শেষে মস্তক ও কণ্ঠা হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। হস্ত পদ শীতল হইয়া ঘর্ম্মাক্ত হইল—পরে উত্তপ্ত শরীরও ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া গেল—সংজ্ঞা আর নাই—শেষ মুহূর্ত্ত আসিল—প্রাণ দেহ ছাড়িবার সময় একবার চৈতন্য হইল—মা! মা! মা! বলিতে বলিতে পবিত্র কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মোক্ষ ক্ষেত্রে প্রাণ দেহ ছাড়িয়া গেল। ১৩১৬ সালের আষাঢ় মাস একাদশী মঙ্গলবারে জ্বর হইয়াছিল, শ্রাবণ মাসের ৮ই শনিবার সূর্য্যোদয়ের পরে প্রাণ দুই তিন বার শব্দ করিয়া জগজ্জননী মাকে ডাকিতে ডাকিতে বাহির হইল। প্রাণ বাহির হইল আর দেহ সবই সহ্য করিতে পারিল। এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যখন আনা হইয়াছিল তখন কত সতর্ক হইতে হইয়াছিল, কিন্তু এখন আর সতর্কের দরকার হইল না। মুড়িয়া সুড়িয়া বিছানার সহিত দেহ নীচে আনা হইল। খাটের উপরে শোয়াইয়া বাঁধা হইল। কেদারেশ্বরের ঘাটে গিয়া দেহ রাখা হইল। কত বাতাস লাগিল, কতই রৌদ্র লাগিল, তখন কিন্তু দেহ আর কোন করুণ শব্দ করিল না। শেষে নৌকা করিয়া মণিকর্ণিকাতে আনা হইল। চিতা

শয্যা হইল। বুকের উপরে কত কাষ্ঠ চাপান হইল। দীর্ঘদেহ চিতাশয্যায় আঁটিল না। পা মুড়িয়া গুটাইয়া চিতার মধ্যে রাখিল। মুখ উর্দ্ধদিক্ করিয়া চিতায় শয়ন করিলে—দেহত আর চঞ্চল হইল না; বড় বড় কাষ্ঠের ভারেও কিছু বলিলে না। শেষে অগ্নি দেওয়া হইল—অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—মস্তক দগ্ধ করিয়া ভিতর হইতে রক্তাক্ত ঘৃতের মত কত কি বাহির হইল—দেখিতে দেখিতে কতকগুলি অঙ্গার ও কতকগুলি অস্থি মাত্র রহিল—ঐ সুন্দর দেহ সব পুড়িয়া গেল।—কতকখানা মাংসপিণ্ড মত যাহা অগ্নি-দগ্ধ অবস্থায় একস্থানে পিণ্ডীকৃত রহিল—দাহকারীগণ বিলম্ব না করিয়া পবিত্র মণিকর্ণিকার গঙ্গাজলে তাহা ভাসাইয়া দিল। শেষে চিতা নির্ব্বাণ করিয়া এক কলসী গঙ্গাজল লইয়া অন্যদিকে মুখ করিয়া কলসি ভাঙ্গিয়া বল হরি হরি বোল বলিয়া সকলে চলিয়া আসিল।

প্রলাপের সময় কত ধর্ম্ম-কথা কহিয়াছিলে, কতবার বলিয়াছিলে হিমালয়ের নির্জ্জন প্রদেশে সাধনা করিব; তোমরা ঘর ছাড়িয়া যাও আমি নির্জ্জনে ডাকি, মা আসিয়া খাইতে দেয় খাইব নতুবা খাব না। কখন জয় সীতারাম জয় জয় রাম, কখন জয় মহাবীর, কখন জয় গৌরাঙ্গ হরি, কখন দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে, কখন ভূর্ভুবস্বঃ কতই স্তব স্তুতি করিলে—সবাই বলিত ৺কাশীধাম মোক্ষক্ষেত্র, এই ভাবে যার জীবন গেল তার কি মুক্তির আর বিলম্ব থাকে? কেহ কিন্তু স্বচক্ষে কিছু দেখিল না অথবা জ্ঞান-চক্ষুতেও কিছু দেখিল না—শাস্ত্র বলিয়াছেন তাই বিশ্বাস করিয়া বলিল—কিন্তু কি হইল তথাপি যেন জানিবার ইচ্ছা রহিয়া গেল। শুধু বিশ্বাসে মনটা ঠাণ্ডা করা হইল। কিন্তু জ্ঞান আসিল না কেন? জ্ঞান-চক্ষে দেখা যায় না কেন—তুমি কোথায় গিয়াছ, দেহ ছাড়িয়া রহিলে কোথায়?

২

প্রাণ দেহ ছাড়িয়া গেল কোথায়? প্রাণ দেহ ছাড়িলে দেহ সব সহ্য করিতে পারে এটা দেখা গেল, কিন্তু, আবার শাস্ত্র বলেন প্রাণ দেহে থাকিতে থাকিতেও যে সব সহ্য করিতে পারে সেই মুক্ত—হায়! মুক্ত পুরুষ কবে দেখা দিবেন?

থাক্ প্রাণত গেল—গেল কোথায়? প্রাণ যাইবার সময় কি লইয়া গেলেন?

এ সংবাদ ত কেহ দিতে পারে না—শাস্ত্র জ্ঞান-চক্ষে এ সংবাদ দিতেছেন; তাই শাস্ত্র আমার বড়ই প্রিয়।

৩

স্কন্দ পুরাণ মৃত্যু ও মৃত্যুর পরের কথা যাহা বলিতেছেন তাহাই আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। মূল শ্লোকের অনুবাদ বঙ্গবাসীর স্কন্দ পুরাণ হইতে গ্রহণ করা হইল।

জীবন-স্থাপক কর্ম্ম ক্ষীণ হইলে মরণকাল উপস্থিত হয়। দেহী সর্ব্বথা স্বকর্ম্মাধীন বলিয়া তখন তদীয় কর্ম্মানুসারে যমকিঙ্করগণ তাহাকে আকর্ষণ করিতে থাকে। পঞ্চতন্মাত্র, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার সমন্বিত জীব তখন স্বীয় পাপ-পুণ্যময় পাশদ্বারা বদ্ধ হইয়া দেহত্যাগ করে। পুণ্যকর্ম্মাদিগের উর্দ্ধাঙ্গের সপ্তছিদ্র দ্বারা, পাপীদিগের নিম্নাঙ্গের ছিদ্রসমূহ দ্বারা এবং যোগীদিগের ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা জীব বহির্গমন করিয়া থাকে। সে নির্গত হইয়াই স্বীয় প্রাণ-বিনির্ম্মিত অঙ্গুষ্ঠ মাত্র আতিবাহিক দেহ পরিগ্রহ করে। জীব সেই আতিবাহিক দেহে প্রবিষ্ট হইলে, যমদূতগণ তখন তাহাকে বন্ধন পূর্ব্বক সবেগে যাম্য পথ দিয়া লইয়া যায়।। মহীতল হইতে সেই যমপুরী ষড়শীতি সহস্র যোজন। সেই পথ কোথায়ও উত্তপ্ত ভর্জ্জন পাত্র তুল্য, কোথায়ও উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড-তুল্য, কোথায়ও প্রতপ্ত বালুকাপূর্ণ এবং কোন স্থলে অত্যুত্তাপ হেতু তাম্র-পাত্রবৎ প্রতীয়মান হয়। যমদূতগণ পাপীকে সেই পথে আকর্ষণ পূর্ব্বক সবেগে লইয়া যায়। সেই পথের কোথায়ও অত্যন্ত শীত, কোন স্থান অতীব দুর্গম এবং কোথায়ও গাঢ় অন্ধকার। যাহাদিগের দংশনে অগ্নিস্পর্শবৎ দারুণ ক্লেশ জন্মে, তাদৃশ ভীষণ কাক, কাকোল, শৃগাল, মক্ষিকা, দংশ, মশক, সর্প ও বৃশ্চিকাদি জন্তুগণ সেই পাপীকে মুহুর্মুহুঃ দংশন দ্বারা নিপীড়িত করে। তাহাদিগের দ্বারা জীব ভক্ষ্যমাণ হইয়াও মরে না, কিন্তু দারুণ যাতনাই ভোগ করিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে ঘোর রাক্ষসগণ কখনও আকর্ষণ, কখনও বা ভক্ষণ করিয়া থাকে। সেই পথে এই ভাবে কখন অতিঘোর উত্তপ্ত সিকতাময় পথে সবেগে আকৃষ্ট হইয়া সেই অতি দুস্তর দীর্ঘ পথে কেবল মাত্র দ্বাদশ মুহূর্ত্তে নীত হয়। জীব, অত্যন্ত ক্লেশানুভব করে বলিয়া তৎকালে সেই সামান্য সময়ও বহুবর্ষ বলিয়া বোধ করে। ইহার পর আবার পূয়-শোণিত-বাহিনী কেশ-শৈবালাপূর্ণ ঘোরা বৈতরণী নদী পার হইতে হয়। তারপর

যমকিঙ্করগণ জীবকে লইয়া যমসমীপে উপস্থাপিত করে। তখন পাপারা সেই ধর্ম্মরাজ যমকে অতি ঘোরাকার ও কালান্তকাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং পুণ্যাত্মারা অতীব সাম্যরূপ দর্শন করিয়া থাকে। মনুষ্যগণই মরণান্তে যমপুরে যায়, অপরাপর জন্তু যমলোকে যায় না; পরন্তু তাহারা মরণান্তে অবিলম্বে অপর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপ শুনা যায় যে, মনুষ্যগণই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়, অন্য জন্তু প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় না। মরণান্তে ধার্ম্মিকগণ সসম্মানে এবং পাপীরা পাশবন্ধনে যমলোকে নীত হইয়া থাকে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি যে পথে যমলোকে যায়, তাহার বিবরণ শুনুন—আমি বলিতেছি। উদ্যান প্রদাতা জনগণ ফলপুষ্পশোভিত পথে, ছত্র-প্রদাতা ছায়াসমন্বিত পথে, পাদুকাদাতা যানারোহণে, খাত সরোবরাদিদাতা তৃষ্ণাবিহীন হইয়া, যান—শয্যা আসনাদিদাতা বিমানযোগে, এবং ভক্ষভোজ্যদাতা উত্তম ভোজনে তৃপ্ত হইয়া যমলোকে গমন করিয়া থাকে। দীপদাতা সুপ্রশস্ত পথে যায়, এবং গো-প্রদাতা জনগণ সুখে বৈতরণী নদী পার হয়। যাহারা শ্রীসূর্য্য, শ্রীমহাদেব ও শ্রীপুরুষোত্তমের প্রতি আজন্ম ভক্তিমান্, যমদূতগণ তাহাকে সসম্মানে লইয়া যায়। যাহারা ভূমি, গো, সুবর্ণ, লৌহ, তিল, কার্পাস, লবণ ও সপ্তবিধ ধান্য দান করে, তাহারা সুখেই সেই পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। পাপী বা পুণ্যাত্মা যাহারাই যেখানে যাউক, চিত্রগুপ্ত তাহাদিগের বিষয় যমরাজকে নিবেদন করেন। সেই মানব এক বৎসর উক্ত প্রেতলোকেই বাস করে; সেই এক বৎসরে তাহার দেহ সম্যক্ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বান্ধবগণ যে সকল কুম্ভ অন্নাদি দান করে, জীব তাহা ভোজন করিয়া দিনে দিনে পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে; জীব ইহলোকে যাহা দানাদি করে, প্রেতলোকে তৎসমস্ত উপভোগ করিয়া থাকে। আর যাহারা ইহলোকে দান করে নাই, কিংবা যাহাদিগকে কোন বান্ধবাদিও অন্নজল দান করে না, তাহারা উক্ত প্রেতলোকে ক্ষুধাতৃষ্ণায় নিরত পীড়িত হয়। বান্ধবগণ যে জল দান করে, তাহা নদীরূপে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সমীপস্থ হয়। ইহলোকে যাহার উদ্দেশে মাসিকাদি ষোড়শ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত না হয়, তাহার প্রেতত্ব হইতে মুক্তি হয় না। মানুষলোকের দিনের ও প্রেতলোকের দিনের পরিমাণ তুল্য; সুতরাং সংবৎসর যাবৎ প্রতিদিনই প্রেতের উদ্দেশে অন্নজল প্রদান করা কর্ত্তব্য। যমের যে শ্মাশানিক নামে ভয়ঙ্কর অনুচরগণ আছে, তাহারা পাপীকে শীতবাতাতপোৎপাৎ স্থানে রক্ষা

করিয়া থাকে। ইহলোকে যেমন বন্দীব্যক্তি রক্ষিগণে রক্ষিত হয়, প্রেতলোকেও জীব তদ্রূপই প্রেতত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে। যাহার উদ্দেশে ষোড়শ শ্রাদ্ধ ও প্রেতপিণ্ড প্রদত্ত না হয়, বহুযুগেও তাহার প্রেতত্ব হইতে বিমুক্তি হয় না। পরন্তু সংবৎসরান্তে বান্ধবগণ সপিণ্ডীকরণানুষ্ঠান করিলে সেই জীব সম্পূর্ণ দেহপ্রাপ্ত হয়। পাপাত্মা ঘোরাকার এবং পুণ্যাত্মা সুন্দর দিব্য দেহ লাভ করে। অতঃপর সেই জীব স্বীয় কর্ম্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে গমন করে। রৌরবাদি নরক সমস্ত পাতালতলে প্রতিষ্ঠিত। আর ভূঃ প্রভৃতি সত্যলোক পর্য্যন্ত উর্দ্ধভাগে বিরাজিত। ইতিহাস পুরাণ বেদ স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে শুনা যায় যে, পুণ্যকর্ম্মে স্বর্গ আর পাপকর্ম্মে নরকপ্রাপ্তি হয়। সেখানেও দেশকালানুসারে কর্ম্মানুরূপ সুখ-দুঃখভোগ হইয়া থাকে। একবৎসরের মধ্যেও যদি সপিণ্ডীকরণ অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি জীব এক বৎসরযাবৎ প্রেতযোনিতেই বাস করে, ইহা সুনিশ্চিত। যাহারা অশ্বমেধাদি তিনটি যজ্ঞ করে, যাহারা শিবাদি দেবত্রয়ের অর্চ্চনা করে, আর যাহারা সম্মুখসমরে নিহত হয়, তাহারা প্রেতলোকে যায় না। বিশুদ্ধপুণ্যে বিশুদ্ধস্বর্গ, বিশুদ্ধপাপে তাদৃশ ঘোর অন্ধ-তমঃ এবং মিশ্রকর্ম্মে স্বর্গ ও নরক উভয়ই ভোগ করে; তত্তৎকালে তাহার দেহও তত্তৎ ফলভোগযোগ্যই হইয়া থাকে।

জনার্দ্দনপুরের মজুমদার বংশের বিবরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে মজুমদার বংশের আদিপুরুষ রাঘবরাম ঘোষালের জ্যেষ্ঠপুত্র বিদ্যানন্দ নবাবসরকারে চাকুরী করিয়া মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জয়রাম কিরূপে ত্যজ্যপুত্র হয়েন তাহাও বলা হইয়াছে। বিদ্যানন্দের দ্বিতীয়া স্ত্রীর পুত্র রত্নেশ্বর। রত্নেশ্বরের তৃতীয়পুত্র শিবনারায়ণ। শিবনারায়ণের প্রথমপৌত্র জীতরাম মজুমদার। আদি বাসস্থান পাথরাগ্রাম। এখান হইতে উঠিয়া আসিয়া ইনি বেড়-জনার্দ্দনপুর গ্রামস্থাপন করেন।

বেড়-জনার্দ্দনপুর যে ভাবে স্থাপিত হয় তৎসম্বন্ধে যে জনপ্রবাদ পাওয়া যায় তাহা এই স্থানে সন্নিবেশিত করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

পাথরার মজুমদারবংশ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় জীতরাম পাথরা মোকামে বসবাসের উপযুক্ত স্থান পান নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কংসাবতী নদীর উত্তর তীরে পাথরাগ্রাম। জীতরাম বসতবাটীর জন্য উপযুক্ত স্থান অন্বেষণার্থ একাকী বাহির হইয়া কংসাবতী নদী পার হইলেন, হইয়া ঐ নদীর দক্ষিণ দিকে চলিলেন। এই সমস্ত স্থানের যে স্থানে মনুষ্যের বাস সেইখানেই মুসলমান। অন্যত্র জঙ্গল। মধ্যে মধ্যে বড় বড় বন্যবৃক্ষ। শুনা যায় জীতরাম অশ্বারোহণে আসিয়াছিলেন। এক স্থানে আসিয়া এক বটবৃক্ষে অশ্ব বন্ধন করিয়া তিনি স্থানপরিদর্শন করিতেছেন। সঙ্গে লোকজন ছিল না। অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল তাঁহার অগ্রে একজন মানুষ পথ দেখাইয়া চলিতেছে। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন নীলকমল! তুমি কখন আসিলে?

নীলকমল মজুমদার বংশের বাস্তুদেবতা শ্রীমৎ লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর টহলদার। নীলকমল বিশেষ কিছু উত্তর না করিয়া একটি জঙ্গলের চারিদিক পরিবেষ্টন করিলেন। বেলা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। উভয়ে তখন পরিশ্রান্ত হইয়া অশ্ব বন্ধনের স্থানে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। "নীলকমল!" জীতারাম বলিতে লাগিলেন "এই স্থানটি আমার মনোনীত হইয়াছে। তুমি কি বল?" এই স্থানেই আপনি বসতবাটী নির্ম্মাণ করুন। নীলকমল ইহাই উত্তর করিল। জীতরাম পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। নীলকমলকে তামাকু সাজিতে আদেশ করিলেন। পরক্ষণেই দেখিলেন কেহ কোথাও নাই। তখন অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং বিস্ময়ে বহুবিধ জল্পনা করিলেন। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া প্রথমেই নীলকমলকে ডাকাইয়া পূর্ব্বোক্ত ঘটনা জানাইলেন। বলিলেন তুমি কি আমার সঙ্গে গিয়াছিলে? ব্রাহ্মণ ভীত হইয়া উত্তর করিল হুজুর! আমি ইহার কিছুই জানি না। জীতরাম ভক্ত ছিলেন। তাঁহার আর বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। তিনি তখন লক্ষ্মীজনার্দ্দন ঠাকুরের মন্দিরে গিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। শ্রীভগবানের অনুমতি হইয়াছে জানিয়া তিনি বাস্তুবাটীর চারিদিকে প্রথমেই গড়বন্দী করিলেন; চারিদিকে গড় আছে বলিয়া এবং লক্ষ্মীজনার্দ্দন ঠাকুর স্থান নির্দ্দেশ করেন বলিয়া জনার্দ্দনপুরকে এখনও বেড়জনার্দ্দনপুর বলে। জনার্দ্দনপুরের চারিদিকে এখনও সেই আদিগড় দৃষ্ট হয়। সে গ্রাম কতই উন্নতি করিয়াছিল, যে গ্রাম নরনারীতে পূর্ণ ছিল, বালকবালিকার ক্রীড়াশব্দে যে

গ্রাম সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত আজ আবার সেই গ্রাম নিস্তব্ধ হইয়াছে। যে গ্রামের চারিধারে বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী, স্থানে স্থানে প্রশস্ত ক্রীড়াস্থান, বড় বড় প্রাসাদ, অতি বৃহৎ দেবালয়, নানাস্থানে শিবমন্দির এখন আবার প্রকৃতি লোকালয় উঠাইয়া লইতেছেন। মন্দিরগুলি ভগ্নদশায়, বড় বড় বাড়ীর উপরে অশ্বত্থ বটবৃক্ষ জন্মিয়াছে, দ্বিতল ত্রিতল বাটীর উপরকার জানালা দরজা খসিয়া পড়িয়াছে, বিধবা স্ত্রীলোকের ন্যায় আভরণশূন্য হইয়া বাড়ীর অবস্থা এরূপ হইয়াছে, দেখিলেই মনে হয় যেন কালকামিনী রাক্ষসীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দর্শককে গ্রাস করিতে আসিতেছে। আদিম অবস্থায় যেরূপ বনজঙ্গল ছিল চারিদিকে তাহাই আবার মজুমদারদিগের কীর্ত্তি লোপ করিয়া অঙ্গবিস্তার করিতেছে। এই বংশের কৃতিপুরুষের কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে দেবালয়াদির সংস্কারে প্রয়াস পাইয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের বসেনাও সম্পূর্ণ না হইতে হইতে তাঁহারা কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। ৺কালীনাথ মজুমদার, ৺রামদাস মজুমদার ৺বাবুরাম বন্দোপাধ্যায়, ৺রমাপতি মজুমদার, ৺নীলকণ্ঠ মজুমদার ইঁহারা আপন আপন বাটী প্রস্তুত করিয়া এবং যথাসাধ্য গ্রামের উপকার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। প্রাচীনের আর মধ্যে কেহই নাই। আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিহারীলাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয় আপন বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া, পুষ্করিণী খনন করিয়া বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তাঁহাকেও স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাস করিতে হইতেছে। এখনও আমরা তাঁহার নিকটে এই বংশের অনেক প্রাচীনকাহিনী শুনিয়া ধন্য হই। ভগবান্ ইঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন ইহাই প্রার্থনা।

কালকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নাই। আর যে গ্রামের কখন উন্নতি হইবে তাহার কোন আশা নাই। এই বংশের যাঁহারা এখনও অবশিষ্ট আছেন তাঁহারা প্রাচীনকীর্ত্তি দোল দুর্গোৎসব বৎসরে বৎসরে করিতেছেন সত্য কিন্তু সে দিন আর নাই। প্রাচীন মহাপুরুষদিগের সুবন্দোবস্তজন্যই ক্রিয়াকলাপ চলিতেছে। অধিক আর কি বলিব ভগবান্ এই বংশের কোন পুরুষকে শক্তি দিয়া যদি তাঁহার সেবার জন্য উপযুক্ত করেন, ইহা যদি তাঁহার অভিপ্রেত হয় তবে হয় ত কোনকালে আবার ইহার সংস্কার হইতে পারে। নতুবা ইহা বনজঙ্গলে পরিণত হইবে।

শরণাগত।

যেমন রাখ্‌বে তেম্‌নি থাকব, যেমন করাবে সেইরূপ কর্‌ব। আমার আর নিজের কোন ইচ্ছা থাকবে না। ইহার নাম শরণাগত। মুখে বলা সহজ কিন্তু কাজে করা?

মনে কর কোন দিন ভারি গ্রীষ্ম। তুমি নিয়ম মত ও সংখ্যামত প্রাণায়াম করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও পারিলেনা। তুমি কি বলিবে তোমার ইচ্ছা নয় আজ আমি কিছু করি। চেষ্টা করিয়াও যখন পারিলাম না তখন ইহাও তোমার ইচ্ছা ইহা কি বলিব না?

আমার ইচ্ছা নয় যে তুমি ভাল কাজ করিতে কখন অলস হও। ভাল কার্য্যে আলস্য অনিচ্ছা এ কেন আমার ইচ্ছা হইবে?

তুমি যত্ন করিতেছ তথাপি যখন হইতেছে না তখন তোমার যত্ন বিষয়েই দোষ আছে। তবেই দেখ শরণাগত কে?

যিনি সমস্ত সৎ কার্য্যে সর্ব্বদা উদ্যোগী তিনি শরণাগত।

যিনি সমস্ত সৎকার্য্যে সর্ব্বদা আলস্যশূন্য তিনি শরণাগত।

যিনি সৎ কার্য্য জন্য মৃত্যুকেও অগ্রাহ্য করেন তিনি শরণাগত।

যিনি আমার মত সর্ব্বদা আলস্য শূন্য, নিদ্রা শূন্য, অনিচ্ছা শূন্য, ইচ্ছা শূন্য, আসক্তি শূন্য, সর্ব্বদা আমার ভাবে স্থিত হইয়াও যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত তিনিই শরণাগত। যিনি শরণাগত তিনি জীবন্মুক্ত।

শরণাগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা জীবন্মুক্তি আর শরণাগতের সাধারণ অর্থ যিনি আমাকে গোপন করিয়া কোন ভাবনা কোন বাক্য এবং কোন কার্য্য করিতে পারেন না অথবা করিতে ভাল বাসেন না তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করেন তিনিও শরণাগত।

শরণাগতের সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় জ্ঞানী। শরণাগতের প্রথম অবস্থায় হইতেছে নিষ্কাম কর্ম্ম।

যখন আসক্তিজন্য বিবেকবিজ্ঞান হীনশক্তি হইয়া পড়ে তখন অধর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মও অভিভূত হইয়া পড়ে। সেই সময়ে জগতের স্থিতি পালন আদির কর্ত্তা নারায়ণাখ্য বিষ্ণু, বর্ণাশ্রম, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা জন্য অবতার গ্রহণ করেন।

যদিও জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও লয় মায়ামাত্র তথাপি ব্যবহারিক মায়িক জগতের স্থিতিজন্য শ্রীভগবান্ অবতার গ্রহণ করেন। সেইজন্য বলা হইতেছে যাঁহা হইতে এই মিথ্যাবিশ্বের উৎপত্তি হয়, যিনি ইহার পালন জন্য লোকপালাদি নিযুক্ত করেন এবং যাঁহাতে এই মিথ্যাবিশ্ব মহাপ্রলয়ে বিলীন হয় সেই পরমেশ্বরকে তটস্থলক্ষণে আমরা ধ্যান করি।

কিরূপে সৃষ্টিস্থিতি লয় হইতেছে? কাহারই বা সৃষ্ট্যাদি হইতেছে?

যিনি সৎ তিনি আপনস্বরূপে নিত্যই আছেন। তাঁহার সৃষ্টিস্থিতি লয় নাই। তিনি ভিন্ন যাহা কিছু তাহাই অনিত্য, তাহাই মিথ্যা। মিথ্যারই সৃষ্টি হয়, স্থিতি হয় ও লয় হয়। এই মিথ্যাসৃষ্টবস্তুরও কতকগুলি সত্যমত দেখাইতেছে যেমন ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অন্যান্য বস্তু। আর কতকগুলি বস্তু নামেমাত্র আছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের কোন সত্তা নাই; যেমন খপুষ্প, শশশৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্র।

যিনি সৃষ্টিস্থিতি লয় করিতেছেন তাঁহাকে ধ্যান করি কেন?

"অর্থেষু কার্য্যাকার্য্যেষু অন্বয়াদিতরতঃ চ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সদ্রূপেণ যঃ অস্তি। অন্বয়েন তস্যৈব কারণত্ববোধকঃ ব্যতিরেকেণতদকার্য্যস্যাসত্ত্ববোধকো জ্ঞেয়ঃ। সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে পরমেশ্বরের সৎরূপে অন্বয় এবং খপুষ্পাদি অকার্য্যে ব্যতিরেকহেতু।

যেখানে পরমেশ্বর অন্বিত, অনুস্যূত সেইস্থানে জন্মস্থিতিভঙ্গরূপ ব্যাপার কার্য্যরূপে প্রতীয়মান হয়, আর যেখানে অননুস্যূত-ব্যাবৃত্ত সেখানে বস্তুর সত্তা নাই, বস্তু অলীক।

জন্মাদিকার্য্য (অকার্য্য নহে) যাঁহা হইতে হইতেছে সেই পরমব্রহ্মই কারণ-স্বরূপ। প্রতিকার্য্যের কারণস্বরূপে তিনি অন্বিত-অনুস্যূত। যেমন কারণ যাহা তাহা কার্য্যে আছে কিন্তু কার্য্য যাহা তাহা কারণে নাই, সেইরূপ ব্রহ্ম জগতে কারণরূপে আছেন কিন্তু জগৎ, কারণে নাই। যেমন কার্য্যরূপ ঘটে, ঘটের কারণ মৃত্তিকা আছে কিন্তু মৃত্তিকাতে ঘট নাই সেইরূপ। বলা হইল সদসৎ সর্ব্ব পদার্থে সদসৎরূপে ইঁহারই সত্তার উপলব্ধি হয়।

তটস্থলক্ষণে সগুণব্রহ্ম চিন্তা করিয়া আমরা আরও জানিতে পারি যঃ অভিজ্ঞঃ স্বরাট্ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান্। তিনি সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ তিনি সর্ব্বজ্ঞ। তিনি স্বরাট্। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। স্বেনৈব রাজতে যস্তং স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান মিত্যর্থঃ। যিনি আপনিই আপনি, যিনি স্বতঃসিদ্ধ, যিনি অন্য কাহারও দ্বারা প্রমাণের বিষয় নহেন।

তিনি আর কিরূপ?

য আদিকবয়ে ব্রহ্মণে ব্রহ্ম বেদং হৃদা মনসৈব সঙ্কল্প মাত্রেনৈব তেনে-প্রকাশিতবান্—বিস্তারিতবান্। যে পরমেশ্বর মনদ্বারাই অর্থাৎ সঙ্কল্পমাত্রেই আদি কবি ব্রহ্মার হৃদাকাশে বেদপ্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা তটস্থলক্ষণে তাঁহাকে ধ্যান করি।

বেদের উদয় করিয়া দেওয়া কি এত কঠিন?

মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ। যৎ যস্মিন্ ব্রহ্মণি [বেদে] সূরয়োপি মুহ্যন্তি। যে বেদবিষয়ে জ্ঞানিগণও মোহপ্রাপ্ত হয়েন সেই বেদ যিনি সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মার হৃদয়ে স্ফুরণ করিয়া দিয়াছিলেন সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি।

স্বরূপলক্ষণে চিন্তা অত্যন্ত কঠিন কিন্তু তটস্থলক্ষণে চিন্তা কি সহজ?

জ্ঞানিগণ স্বরূপে চিন্তা করেন, ভক্তগণ তটস্থে চিন্তা করেন। যিনি সঙ্কল্পমাত্রে জ্ঞানের স্ফুরণ করিয়া দিয়া থাকেন তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলে, ভক্তি করিতে পারিলে তিনিও আমার হৃদয়ে জ্ঞানের স্ফুরণ করিয়া দিয়া আমার সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ স্থিতি প্রদান করিবেন এই আশায় আমরা তাঁহাকে ভজনা করি। ভক্ত তাঁহার উপরে নির্ভর করেন। সেই ভক্তিদ্বারা জ্ঞান বা স্বরূপ স্থিতি হয়।

এই শ্লোকের কি অন্য অর্থ হয়?

হয়। ইহাতে গায়ত্রীর উপাসনা ও কৃষ্ণলীলাও লক্ষ্য করা হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামী ক্রমসন্দর্ভে বলিতেছেন :—

মৎস্যপুরাণে পাওয়া যায় :—

যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীংবর্ণতেধর্ম্মবিস্তরঃ
বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে ॥

যে পুরাণের প্রারম্ভে গায়ত্রীর অর্থসূচিত নানা ধর্ম্মের কথা এবং বৃত্রাসুরবধ আছে তাহাই শ্রীভাগবত। বামনপুরাণেও আছে

"গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈভাগবতং বিদুঃ"

শ্রীজীব গোস্বামী ক্রমসন্দর্ভ টীকায় এই শ্লোকের গায়ত্রীপক্ষে অর্থ করিতেছেন :—

১। ওঁ জন্মাদ্যস্য যত ইতি প্রণবার্থঃ। যাঁহা হইতে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হইতেছে তিনিই প্রণব। প্রণবের অ উ ম এই তিন অক্ষরে সৃষ্টিস্থিতি লয় ও তৎ তৎ কর্ত্তা ইঁহাদের কথা পাওয়া যাইতেছে। তুরীয়ব্রহ্ম—আপনা হইতে স্বভাবতঃ উত্থিত আত্মমায়া আশ্রয় করিলে তাঁহা হইতেই সৃষ্টিশক্তি স্থিতিশক্তি ও লয়শক্তি জন্মিতেছে। তিনিই শক্তি অবলম্বনে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর-রূপী পুরুষোত্তম। এই পুরুষোত্তমই প্রণবের বাচ্য।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি ইত্যাদি শ্রুতিতেও সগুণব্রহ্ম পুরুষোত্তমের কথাই বলা হইয়াছে। ইনিই সত্যস্বরূপ। অনু-গীতায় ৩৫ অধ্যায়ে ভগবান্ ব্যাসদেব এই শ্রুতি ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—

সত্যাদ্ভূতানি জাতানি স্থাবরাণি চরাণি চ
তপসা তানি-জীবন্তি ইতি তদ্বিত্তসুব্রতাঃ ॥৩২॥

২। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ। যত্র ত্রিসর্গমৃষেতি ব্যাহৃতিত্রয়ার্থঃ

যে পরমসত্যকে আশ্রয় করিয়া ভূঃ ভুবঃ স্বঃ অথবা পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ অথবা ভূত ইন্দ্রিয় দেবতা অথবা স্থূল সূক্ষ্ম কারণরূপ ত্রিবিধ বিষয় সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

৩। ভর্গ। স্বরাট্—সবিতৃ প্রকাশক পরম তেজোবাচি স্বরাড়িতি।

ভর্গকেই পরম তেজ বলা হয়। সবিতার বরণীয়ভর্গ বলিতে শুদ্ধসত্ত্ব-গুণান্বিত চৈতন্যপুরুষকেই বুঝায়। শুদ্ধসত্ত্বগুণ যাহা তাহাই ভর্গ। ইহা আদিত্যপথ গামিনী। রজ ও তমগুণকে পরাভূত করিয়া যখন শুদ্ধসত্ত্ব উদয় হয়েন তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার জন্যই গমন করেন। সমস্ত দেবতাই শুদ্ধসত্ত্ব গুণযুক্ত। ইঁহারা ব্রহ্মে মিলিত হইতে যাইতেছেন বলিয়া যে কেহ ইঁহাদের কাহারও ভজনা করে ইঁহারা সেই সাধককে সেই রমণীয় দর্শনের সহিত মিলিন করাইয়া দিয়া থাকেন।

"সবিতার ভর্গ"—ইহার ব্যাখ্যায় কেহ বলেন যেমন রাহুর শির বলিতে

রাহুকেই বুঝায় অর্থাৎ রাহুর আর কিছুই নাই শুধু শিরই আছে সেইরূপ সবিতার ভর্গ অর্থে শক্তি ও শক্তিমানের একত্বই বুঝাইতেছে। বরণীয়ভর্গ ই ব্রহ্ম। এইখানে এইমাত্র বলা উচিত যে বরণীয়ভর্গ যখন ব্রহ্মে মিলিত হয়েন তখন ব্রহ্মই থাকেন এই অর্থে শক্তি ও শক্তিমান এক বলা হয়, নতুবা নহে।

৪। ধীয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ। তেনে ব্রহ্মহৃদেতি বুদ্ধিপ্রেরণা প্রার্থনা সূচিতা। তদেবং কৃপয়া স্বাধ্যয়নায় বুদ্ধিবৃত্তিং প্রেরয়তাদিতিভাবঃ। তচ্চ তেজস্তত্র অস্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাদিত্যাদি সংপ্রতিপন্ন যন্মূর্ত্তং তদাদ্যনন্তমূর্ত্তিমদেব ধ্যেয় মিতি। ভর্গরূপী শ্রীভগবানই আদিজীব ব্রহ্মার বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীভাগবতের প্রথম শ্লোকটিকে শ্রীকৃষ্ণপক্ষে মিলাইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সত্যং শ্রীকৃষ্ণং ধীমহি। নরাকৃতি পরংব্রহ্মেতি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণাৎ। স্বেন ধাম্না শ্রীমথুরাখ্যেন। মথ্যতে তু জগৎ সর্ব্বংব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা। তৎ সারভূতং যদ্‌যস্যা মথুরা সা নিগদ্যতে। ইত্যাদি। অন্য একজন ব্যাখ্যাকর্ত্তা যাহা লিখিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল :—শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি। তাঁহা হইতেই আদ্য অর্থাৎ রতিভাব জন্মিয়াছে। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্। ব্রহ্মা বৎস হরণ করিয়া, তদীয় স্বরূপ জিজ্ঞাসায় সমুদ্যত হইলে তিনি সঙ্কল্পমাত্রেই তাঁহাকে নিজরূপ প্রদর্শন করেন। ব্রহ্মাদি দেবগণও তাঁহার স্বরূপ-পরিজ্ঞানে সমর্থ নহেন। সেই ব্রহ্মা যেমন তেজ জল মৃত্তিকা এই ত্রিবিধ উপাদান সহকারে ভূত সকলের সৃষ্টি করেন, তিনিও যেমন অপহৃতমাত্র বৎস গোপাল ও তাহাদের উপকরণ এই তিনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মা ঐরূপে ঐ তিন হরণ করিয়া যে অপরাধ করেন তিনি তাহা ক্ষমা করিয়াছিলেন। অধিক কি, তিনি আত্মতত্ত্ব, সত্তা ও স্বীয় অসামান্য প্রভাব দ্বারা ব্রহ্মার বিহিত উল্লিখিত কপট পরাহত করেন।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র শাস্ত্রী কৃত শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়—আদ্যস্য আদিভূত সনাতন শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টনিগ্রহ ও শিষ্ট পালনার্থ (যতঃ) বসুদেবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু (ইতরতঃ) ব্রজপতি নন্দরাজগৃহে (অন্বয়াৎ) পুত্রভাবে গমন করিয়া তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। (অর্থেষু অভিজ্ঞ) তথায় গোপগোপীগণের সর্ব্বানন্দকারী লীলা দ্বারা চিত্তবিনোদন করতঃ কংসাদিকে

ব্যাকুলানামাপ্যায়কঃ সোঽহমিতি বোধ্যম্। তথা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বেষু প্রাণিষু জীবনং যেন জীবন্তি সর্ব্বাণি ভূতানি তজ্জীবনং প্রাণধারণমায়ুরহমস্মি তদ্রূপে ময়ি সর্ব্বে প্রাণিনঃ প্রোতা ইত্যর্থঃ। তপস্বিষু নিত্যং তপোযুক্তেষু বানপ্রস্থাদিষু তপঃ দ্বন্দ্বসহনং চ অস্মি তস্মিন্ তপসি ময়ি তপস্বিনঃ প্রোতাঃ। চকারেণ চিত্তৈকাগ্র্যমান্তরং জিহ্বোপস্থাদি নিগ্রহলক্ষণং বাহ্যঞ্চ সর্ব্বং তপঃ সমুচ্চীয়তে ॥ ৯ ॥

(আমি) পৃথিবীতেও পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতেও তেজ, সর্ব্বপ্রাণীতে জীবন (আয়ু) এবং তাপসগণের তপ (দ্বন্দ্বসহনসামর্থ্য) হই ॥ ৯ ॥

ভগবান্—পৃথিবীর তন্মাত্রা হইতেছে পবিত্র গন্ধ। গন্ধভূত আমি—আমাতে পৃথিবী প্রোত।

অর্জ্জুন—পবিত্র গন্ধটি তুমি? কিন্তু অপবিত্র গন্ধও ত আছে?

ভগবান্—বিকারপ্রাপ্ত না হইলে গন্ধ সর্ব্বত্রই পবিত্র। বিকারে বিকৃত ভাবটি এত প্রকাশ হয় যে, আমি সর্ব্ববস্তু মধ্যে থাকিলেও বিকারের আবরণে আমার প্রকাশ হয় না।

অর্জ্জুন—তোমার আরও কত বিভূতি আছে?

ভগবান্—গন্ধের পবিত্রতা যেমন আমি, সেইরূপ শব্দস্পর্শরূপরস—ইহাদের পবিত্রতাও আমি। অগ্নির তেজও আমি। অগ্নির যে তেজে পাক হয়, আলো হয়, তাপ হয়, উজ্জ্বলতা যাহাতে আছে—সে তেজও আমার রূপ। আবার অগ্নিজ উষ্ণস্পর্শের মত বায়ুর শীতলস্পর্শও আমি। প্রাণিগণের আয়ুও আমি। অথবা—ভূতগণের জীবনস্বরূপ অমৃতাখ্য অন্নাদি রসও আমি। তপস্বিগণের দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতারূপ তপস্যাও আমি।

সহ্য করাকে যেমন তপস্যা বলে, সেইরূপ নিগ্রহশক্তিকেও তপস্যা বলে। চিত্তনিগ্রহ, জিহ্বা-উপস্থাদি নিগ্রহ—এই দুই প্রকার অন্তর্ব্বাহ্যনিগ্রহ শক্তিও আমি। আমি যেমন রসময়—যেমন আমাতে জল প্রোত—সেইরূপ গন্ধময় আমি আমাতে পৃথিবী প্রোত। তেজস্বরূপ আমি,—আমাতে অগ্নি গ্রথিত। জীবের প্রাণস্বরূপ আমি—প্রাণে সর্ব্বভূত গ্রথিত। তপস্যা অর্থাৎ শীত, উষ্ণ, বর্ষা, আতপ, দুর্গন্ধ, সুগন্ধাদি সমানভাবে সহ্য করা অথবা ভিতরে চিত্ত-নিগ্রহ করা এবং বাহিরে জিহ্বা ও বাক্যনিগ্রহ করা রূপ তপস্যা—তপস্যাস্বরূপ আমি—আমাতে তপস্বিগণ প্রোত।

অর্জ্জুন—যাঁহারা তপস্বী, যাঁহারা সাধু, যাঁহারা ভক্ত—তাঁহাদের মধ্যে তোমার প্রকাশ কিরূপ?

ভগবান্—আমি ভাবের বিষয়। সূর্য্যের তেজ আকাশ হইতে আসিতেছে, কিন্তু আকাশে কোন প্রকাশ দেখা যায় না। কোন ভিত্তিতে নিপতিত হইলে দেখা যায়। মৃত্তিকাতে দেখা যায়, আবার জলে ভালরূপ দেখা যায়। নিরবয়ব ব্রহ্ম—মানব দেহে প্রতিফলিত দেখা যায় না, কিন্তু যাঁহার অন্তর পবিত্র—তাঁহার সুমিষ্ট স্বরে, ভক্তের অঙ্গভঙ্গীতে দেখা যায়। ভক্তের ভাবপূর্ণ বাক্যে আমার প্রকাশ আছে—সেই জন্য ঐগুলি এত চিত্তাকর্ষক ॥৯॥

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ! সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহং ॥ ১০ ॥

হে পার্থ! মাং সর্ব্বভূতানাং স্থাবরজঙ্গমানাং সনাতনং চিরন্তনং নিত্যং বীজং প্ররোহকারণং কার্য্যারম্ভসামর্থ্যং বিদ্ধি জানীহি বীজে ময়ি পিণ্ডাদিকম্ প্রোতম্ কনকে কুণ্ডলাদিবৎ অতো যুক্তমেকস্মিন্নেব ময়ি সর্ব্ববীজে প্রোতত্বং সর্ব্বেষামিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বুদ্ধিমতাং বিবেকশক্তিমতাং অহং বুদ্ধিঃ চৈতন্যস্যাভিব্যঞ্জকং তত্ত্বনিশ্চয়সামর্থ্যং অস্মি বুদ্ধিরূপে ময়ি সর্ব্বে বুদ্ধিমন্তঃ প্রোতাঃ তথা তেজস্বিনাম্ প্রাগলভ্যবতাং অহং তেজঃ প্রাগলভ্যং পরাভিভবসামর্থ্যং পরৈশ্চাপ্রধৃষ্যত্বম্। তেজোরূপে ময়ি তেজস্বিনঃ প্রোতা ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

হে পার্থ! আমাকে সর্ব্বভূতের সনাতন (নিত্য) বীজ বলিয়া জানিও। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি এবং তেজস্বিগণের তেজ আমিই হইতেছি ॥ ১০ ॥

অর্জ্জুন—তুমি সর্ব্বভূতের বীজ কিরূপে? ভৌতিক পদার্থসমূহ আপন আপন স্বতন্ত্র বীজেইত প্রোত? তবে তোমাতে সর্ব্বভূত প্রোত কিরূপে? আরও দেখ অঙ্কুর উৎপন্ন হইলে বীজ নষ্ট হয়, কিন্তু জগদ্বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া গেলেও—তুমি যে অবিনাশী সেই অবিনাশীই থাক। তবু তুমি সকলের বীজ কি জন্য বলিতেছ?

ভগবান্—মেঘ হইতে যখন বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি যত মাটীর নিকটবর্ত্তী হয়, ততই খণ্ড এবং বিভিন্ন আকার ধারণ করে; কিন্তু উপরে এক খণ্ড বৃষ্টিই থাকে। সেইরূপ এক আদি বীজ বা কারণ যতই স্থূল হয়, ততই ভিন্ন ভিন্ন আকার ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধারণ করে। আম, জাম, কাঁটাল ইত্যাদি বীজগুলি স্থূলভাবে দেখিতে গেলে ভিন্ন বটে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে সকল বীজেই বৃক্ষ-উৎপাদনের একটি শক্তিমাত্রই আছে। সেই শক্তিটি আবার কি? না অনাদিসঞ্চিত বাসনার পুঞ্জীকৃত অবস্থা মাত্র। সেই জন্য বলা হয়, মূল বাসনা—"অহং বহুস্যাম্" হইতেই এই বিচিত্র জগৎ আসিয়াছে। একমাত্র আমিই আছি। আমি এক। "বহু হইব" এই সঙ্কল্পে বহু মত হইয়াছি। বহু হওয়া তবে কাল্পনিক। তথাপি বাহিরেও যে সত্য সত্যই বহু দেখ, এটা কি যদি জিজ্ঞাসা কর—ইহার উত্তর এই যে, স্বপ্নকালে এক মনই বহু ভাবনা করিয়া, বহু সঙ্কল্প তুলিয়া যেমন বহু বস্তু রূপে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু মূলে সেই এক মনই থাকে—(বহু হওয়াটাই মিথ্যা) সেইরূপ আমি ভিতরে সর্ব্বদা এক থাকিয়াও আত্মমায়া দ্বারা বাহিরে বহু মত হইতেছি। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখা যায়, ততক্ষণ হাতী, ঘোড়া, বাঘ, পুরুষ, স্ত্রী কতই দেখা যায়; কিন্তু স্বপ্নটি ভাঙ্গিলেই সেই এক মন মাত্রই থাকে; অন্য কিছুই থাকে না—এই সৃষ্টিবৈচিত্র্যও সেইরূপ। দীর্ঘ স্বপ্নে বহু দেখা যাইতেছে। স্থূল সৃষ্টি যত দেখিবে, ততই বহু; কিন্তু উপরে চল একই আছে। পঞ্চমহাভূতের পঞ্চীকরণে বহুর সৃষ্টি। পঞ্চমহাভূত আবার পঞ্চতন্মাত্রা স্থূল হইয়া হইয়াছে। তন্মাত্রা আবার ত্রিবিধ অহংকার হইতে, ত্রিবিধ অহংকার আবার এক মহত্তত্ত্ব হইতে, মহত্তত্ত্ব আবার প্রকৃতি হইতে, প্রকৃতি আবার পুরুষ হইতে। তবেই দেখা গেল, এক শক্তি হইতেই সমস্ত,—আবার সেই শক্তি শক্তিমানের। সাধারণতঃ লোকে বলে স্বপ্ন অলীক, ইহার কোন নিয়ম নাই। জগৎ স্বপ্ন কিন্তু স্বপ্ন হইলেও নিয়মমত হইতেছে। জড়ই নিয়মে চলিতেছে, চৈতন্যের কোন নিয়ম নাই। এই জন্য বলা হয়, মূলে একমাত্র জীবস্বরূপ আমিই আছি।

স্থূল বীজ সম্বন্ধে দেখা যায়, অঙ্কুর উৎপন্ন হইলে বীজ নষ্ট হয়; কিন্তু মূল বীজস্বরূপ আমা হইতে মিথ্যা ব্রহ্মাণ্ড-বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষই নষ্ট হইয়া যায়। আমি কিন্তু সনাতন—সর্ব্বদা থাকি। আবার দেখ, যে বুদ্ধি দ্বারা বুদ্ধিমান্‌গণ নিত্য, অনিত্য, এক, বহু বিচার করেন—সে বুদ্ধিও আমি। যে তেজে তেজস্বী অন্যকে পরাভব করেন এবং নিজে অন্যের নিকট দুর্দ্ধর্ষ থাকেন সে তেজও আমি ॥১০॥

বলং বলবতাঞ্চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম্ ।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥১১॥

হে ভরতবর্ষভ ! বলবতাং সাত্ত্বিকবলযুক্তানাং সংসারপরাঙ্মুখানাং কামরাগবিবর্জ্জিতং কামশ্চ রাগশ্চ কামরাগৌ কামস্তৃষ্ণা অসন্নিকৃষ্টেষু বিষয়েষু ; রাগোরঞ্জনা প্রাপ্তেষু বিষয়েষু ; তাভ্যাং কামরাগাভ্যাং বিবর্জ্জিতং বিশেষেণবর্জ্জিতং দেহাদিধারণমাত্রার্থং বলং সাত্ত্বিকং বলং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্যং চ অহং অস্মি তদ্রূপে ময়ি বলবন্তঃ প্রোতা ইত্যর্থঃ। চ-শব্দস্তু শব্দার্থে ভিন্নক্রমঃ। কামরাগবিবর্জ্জিতমেব বলং মদ্রূপত্বেন ধ্যেয়ম্, নতু সংসারিণাং কামরাগকারণং বল-মিত্যর্থঃ। ক্রোধার্থো বা রাগশব্দো ব্যাখ্যেয়ঃ। কিঞ্চ ভূতেষু প্রাণিষু ধর্ম্ম-অবিরুদ্ধঃ কামঃ ধর্ম্মেণ শাস্ত্রার্থেন অবিরুদ্ধঃ, প্রতিষিদ্ধঃ, ধর্ম্মানুকূলঃ স্বদারেষু পুত্রোৎপাদনমাত্রোপযোগী শাস্ত্রানুমত জায়াপুত্রবিত্তাদি-বিষয়োঽভিলাষঃ অহং অস্মি শাস্ত্রাবিরুদ্ধকামভূতে ময়ি তথাবিধ কামযুক্তানাং ভূতানাং প্রোতত্বমিত্যর্থঃ ॥১১॥

হে ভরতর্ষভ ! আমিই বলবানগণের (সাত্ত্বিকবলযুক্ত সংসার-পরাঙ্মুখ ব্যক্তিগণের) কাম রাগ শূন্য (ধর্ম্মানুষ্ঠানে ধাবিত) সাত্ত্বিক বল। প্রাণিগণের ধর্ম্মের অবিরোধী (শাস্ত্রমত স্বদারে পুত্রোৎপাদনমাত্রোপযোগী) কামও আমি ॥১১॥

৪র্থ সর্গঃ।

সন্ধ্যা হইতেছে। বেলা মুহূর্ত্তমাত্র অবশিষ্ট। ভগবান্ বাল্মীকি শ্রীভরদ্বাজকে বলিতেছেন বৎস! ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের উৎকৃষ্ট বচন পরম্পরা শ্রবণে শ্রোতাগণ একরস প্রাপ্ত হইয়া মৌন রহিয়াছেন। সভা নিস্তব্ধ। এত নিস্তব্ধ যে সভাস্থ জনগণের কটিতটস্থিত কিঙ্কিণীজালরব শান্ত; পিঞ্জরে হারীত শুক ক্রীড়াবিরত, ললনাগণ বিলাসবিস্মৃত—সভাস্থ সকলে যেন চিত্রভিত্তিতে ন্যস্ত চিত্রের ন্যায়। রবিকিরণের সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক ব্যবহার অস্তভাব ধারণ করিতেছে; উৎফুল্ল পদ্মগন্ধবাহী সুখস্পর্শ সান্ধ্যসমীরণ মন্দ মন্দ বহিয়া যেন শ্রবণার্থমিবাগতাঃ। দিবস রচনা জন্য ভ্রমণকার্য্য ত্যাগ করিয়া সূর্য্যদেবও যেন শ্রুতবিষয়ের চিন্তা জন্য নির্জ্জন গিরিতটে অস্তগমণ করিলেন। তুষারপাতে বনভূমিও অবিষমতাপ্রাপ্ত হইয়া শান্তভাব ধারণ করিয়াছে—যেন শান্তিদেবী জ্ঞানোপদেশ শ্রবণে অন্তঃশীতল হইয়া সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। সভাস্থ জনগণের কাহারও কোন চেষ্টা নাই, সকলেই একাগ্র। সকল বস্তুর ছায়া দীর্ঘ হইয়াছে যেন বশিষ্ঠদেবের বাক্য শ্রবণ বাসনায় তাহারা স্কন্ধ উন্নমিত করিয়াছে।

এমন সময়ে প্রতিহার—দ্বারপাল—প্রধান রাজভৃত্য—আসিল, আসিয়া নম্র হইয়া বলিল মহারাজ! সান্ধ্যস্নান ও পূজার সময় অতীত হয়। বশিষ্ঠদেব সেদিনকার মত মধুরবাক্যের উপসংহার করিলেন। বলিলেন মহারাজ! অদ্য এই পর্য্যন্ত রহিল। "প্রাতরন্যদ্বদিষ্যামি" প্রাতে অবশিষ্ট বলিব বলিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন।

তখন রাজা "তাহাই হউক" বলিয়া ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি জন্য দেব, ঋষি, মুনি ও দ্বিজগণকে পুষ্প পাদ্যার্ঘ্য দক্ষিণা দান, সম্মান দ্বারা সাদরে পূজা করিলেন।

সভাভঙ্গ হইল সকলে সকলকে সম্মান করিতে লাগিলেন। রাজাদিগের আভরণ রত্নপ্রভায় সভা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রাজাদিগের মস্তকে কুসুমদাম তাহার উপর ভ্রমরঝঙ্কার—যেন কেশকলাপ মৃদুমধুর ধ্বনি করিতেছে। দিঙ্মণ্ডল সুবর্ণসদৃশ সমুজ্জ্বল হইল। আহ্নিককৃত্য করণার্থ বিমানচারিগণ বিমানে, ভূতলবাসীগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

ধীরে ধীরে শ্যামা যামিনী আগমন করিলেন—জনসঙ্ঘাদ্বিনির্মুক্তা গৃহে বালাঙ্গনা যথা। মধ্যযৌবনা বালা জনসঙ্ঘ ত্যাগ করিয়া যেমন ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে সেইরূপ। আর "দেশান্তরং ভাসয়িতুং যযৌদিবসনায়কঃ দিবসনায়ক সূর্য্যও অন্যদেশে আলোক বিতরণার্থ গমন করিলেন। সৎ-পুরুষের ব্রতই আলোক দানকরা।

ক্রমে উৎফুল্ল কিংশুক-কাননা বসন্ত শোভার ন্যায় তারকানিকরধারিণী সন্ধ্যা আসিলেন। পক্ষিগণ চূতকদম্ব ও নীপবৃক্ষের পত্রান্তরালে, গ্রামে, চৈত্যে এবং গৃহাভ্যন্তরে নিলীন হইল। যেমন চিত্তবৃত্তি সকল নিদ্রাবৃত হইলে নিলীন হয় সেইরূপ।

ভানোর্ভাসাভূষিতৈর্মেঘলেশৈঃ
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কুষ্কুমচ্ছায়য়েব।
পাশ্চাত্যোদ্রিঃ পীতবাসাঃ স মেঘৈঃ
স্তারাহারঃ শ্রীযুতং খং সমেতঃ॥

অস্তগিরির চারিধারে মেঘখণ্ড সমূহ অস্তোন্মুখ দিবাকরের কিরণজালে কুষ্কুমবর্ণ ধারণ করিল, উপরে নীল আকাশে নক্ষত্রামালা তারাহারের মত শোভা পাইল। শ্রীমান্ পশ্চিম পর্ব্বত যেন সূর্য্যকিরণরূপ পীতবস্ত্র ও তারা-হার পরিধান করিয়া সাধকের হৃদয়াকাশে পীতবাস শ্রীবিষ্ণুর উদয়ের মত আকাশে প্রবেশ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা—আপন পূজাভাগ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করি-লেন আর ভীষণ অন্ধকার, দেহধারী বেতালের ন্যায় চারিদিক্ আচ্ছাদন করিল। তখন হিমকণাবাহী শীতল সমীরণ কুমুদগন্ধ মাখিয়া পল্লবসমূহকে সঞ্চালন করিতে করিতে বহিতে লাগিল। এখনও চন্দ্র উঠে নাই। নক্ষত্রও ফুটে নাই। তারকাবৃন্দ নীহারপাতে আচ্ছন্ন। বোধ হইল যেন দিগাঙ্গনাগণ দীর্ঘকৃষ্ণকেশ-শালিনী পতিবিয়োগবিধুরা বিধবা রমণীর ন্যায় দিবাকর-বিরহে কাতর হইয়া নীহাররূপ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে অন্ধতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে আকাশ ক্ষীরসাগরের মত দুগ্ধ প্রবাহে প্রপূরিত হইল। অমৃত-ময় চন্দ্রদেব তখন চারিদিকে জ্যোৎস্না ছড়াইতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে অন্ধকার কোথায় পলায়ন করিল কেহ দেখিতে পাইল না। জ্ঞানোপদেশ শ্রবণে অজ্ঞান যেরূপ পলায়ন করে সেইরূপ। ঋষিগণ,

দ্বিজগণ, রাজগণ তখনও আপন আপন আশ্রমে বিশ্রাম করিতেছেন। ক্রমে যম-কাদ্যোপমা তিমিরমাংসলা শ্যামবর্ণা বিভাবরী অপসৃতা হইল আর মিহিকাস্ফারা—তিমিরবহুলা উষা ধীরে ধীরে আগমন করিলেন। আকাশে আর তারা নাই। প্রভাতপবনে বৃষ্টিনিপতিত কুসুমের ন্যায় আকাশ হইতে প্রদীপ্ত নক্ষত্রনিচয় অন্তর্হত হইল। আপন প্রভায় প্রাণিগণের চক্ষু উন্মীলন করিয়া সূর্য্যদেব আকাশে উঠিলেন—মহাত্মাদিগের অন্তঃকরণে নবোদিত বিবেকবৃত্তি যেরূপে উদয় হয় সেইরূপ। উদয়গিরি এখন অস্তগিরির সান্ধ্যমেঘ মণ্ডিত হওয়ার মত উদয়োন্মুখ দিবাকরের কিরণমণ্ডিত মেঘসমূহ দ্বারা পরম শোভা ধারণ করিলেন।

নভশ্চর, মহীচরগণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া রাজসভায় সমবেত হইলেন। সভা পূর্ব্ববৎ নীরব ও নিস্পন্দ। সরোবরে বায়ুস্পর্শশূন্যা পদ্মিনী সমূহের শোভা যেরূপ সভার শোভা সেইরূপ হইল।

শ্রীরামচন্দ্র তখন বাগ্মীশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেবকে মধুর বাক্যে বলিলেন "ভগবন্ মনসোরূপং কীদৃশং বদ মে স্ফুটম্" হে ভগবন্! যে মন হইতে এই বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে, এই দৃশ্যদর্শন ফুটিয়া উঠিয়াছে সেই মনের স্বরূপ কি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ—আচ্ছা বল দেখি মনের স্বরূপ জানিতে কেন চাও?

রাম—আপনি আপনিভাবে থাকাই মুক্তি। উৎপত্তিপ্রকরণের প্রথম হইতেই এই আপনি আপনিভাবে স্থিতি বা স্বস্বরূপে স্থিতি বা ব্রাহ্মীস্থিতি কিরূপে লাভ হইবে তাহাই বুঝাইতেছিলেন। আপনি আপনিভাবে স্থিতি হয় না কেন? কারণ দৃশ্যজ্ঞান যতদিন আছে ততদিন কেবলভাব থাকিতেছে না অন্য কিছুও আছে। দ্বিতীয় থাকিলেই ভয় থাকিল। শ্রুতিও বলিতেছেন "দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি"। তবেই হইল দৃশ্যজ্ঞানটি যাহাই হউক—সৎবস্তুবিষয়ক দৃশ্যজ্ঞানই হউক বা অসৎবস্তুবিষয়ক দৃশ্যজ্ঞানই হউক—দ্রষ্টাতে দৃশ্যজ্ঞান থাকিলেই বন্ধন হইল। দর্পণে কোন কিছুর আকৃতি দেখা গেলেই সেই ছায়া দ্বারা দর্পণ আবৃত থাকিল। ততদিন দর্পণ আপন স্বচ্ছ-স্বরূপে থাকিতে পারিল না। কিন্তু দৃশ্যজ্ঞানটা যদি নিতান্ত অলীক হয় তবে ইহা থাকা বা না থাকায় দর্পণের স্বরূপতঃ কিছুই ক্ষতি হইল না। কিন্তু দর্পণটা জড়বস্তুমাত্র। ইহাতে বস্তুর ছায়া পড়িলে ইহার কোন ক্ষতি

হয় না। কিন্তু আত্মা চেতন। ইহাতে দৃশ্যজ্ঞান জন্মিলেই [যদিও দৃশ্য-জ্ঞান মিথ্যা] একটা অধ্যাস ব্যাপার ঘটে। এই অধ্যাসে আত্মা আপনার আপনি আপনিভাব ভুলিয়া দৃশ্যজ্ঞানই আমি এই ভ্রমজ্ঞানে বদ্ধভাব পাওয়ার মতন হয়েন। তাহা হইতেই জগতের জনন মরণ আধি ব্যাধিরূপ দুঃখের উৎপত্তি হয়।

তবেই হইল দ্রষ্টাতে দৃশ্যজ্ঞানই বন্ধের কারণ। ইহাই সর্ব্বপ্রকার দুঃখের মূল। দৃশ্যজ্ঞান মার্জ্জনা না হওয়া পর্য্যন্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইবে না।

কিন্তু দৃশ্যজ্ঞান মার্জ্জন কিরূপে হইবে? যতদিন মন আছে ততদিন দৃশ্যজ্ঞান আছেই। মন না থাকিলেই আর শোক দুঃখ জরা আধি ব্যাধি কিছুই থাকিল না। মন না থাকিলেই দৃশ্যপ্রপঞ্চ থাকিল না। সুষুপ্তিতে যখন মন থাকে না তখন আত্মা আপনি আপনি ভাবে থাকে না।

মনোনাশই মুক্তি। জ্ঞানমার্গে মনের আত্যন্তিক নাশ হয়। ভক্তিমার্গে মন প্রবৃত্তিমার্গে না গিয়া যখন নিবৃত্তিমার্গে শুদ্ধ সত্ত্ব ভাবে থাকে তখনও ইহা ক্রম মুক্তির পথে চলে। অর্থাৎ মনটা যখন ঈশ্বর ভাবে আকারিত হয়, মন যখন বিষ্ণু উপাসনায় বিষ্ণু ভাব বা ব্যাপক ভাব প্রাপ্ত হয় তখন ইহা মনের অধীশ্বর হন। মন বা মায়ার অধীশ্বর হইতে পারিলেও জীবের ঈশ্বর ভাব প্রাপ্তি ঘটে। এই অবস্থায় সর্ব্বশক্তি সম্পন্নও হওয়া যায়। কাজেই আপনি আপনি ভাবে থাকার শক্তিও ইনি তখন লাভ করেন। ইহাই ক্রম মুক্তি দ্বারা আপনি আপনিরূপ সদ্যোমুক্তি লাভ করা। এই অবস্থায় মনের নাশ হইবেই।

সেই জন্য বলিতেছি মনের নাশ হউক বা না হউক যদি আমি মন হইতে পৃথকরূপে থাকি তবেই আপনি আপনি ভাবে থাকিতে পারিলাম। মনই যখন দৃশ্যজ্ঞানের মূল তখন মনের স্বরূপ জানিলেই ইহাকে ত্যাগ করা সহজ হইবে তাই মনের স্বরূপ জানিতে চাই।

বশিষ্ঠ—রাম! তুমি সর্ব্বপ্রকারে জ্ঞান লাভের যোগ্য পাত্র। তোমার বুদ্ধি নিতান্ত নির্ম্মল হইয়াছে। মনের স্বরূপ কি তাহা বলিতেছি মনোযোগ করিয়া শ্রবণ কর।

রাম—ভগবন্ বলুন। আমিও দৃশ্যজ্ঞান মার্জ্জনা করিয়া সুস্থ হই।

বশিষ্ঠ—মণিতে ঝলক যেমন স্বাভাবিক সেইরূপ পরমাত্মাতে মায়াও স্বাভাবিক। পরমাত্মাতে মায়া যেমন স্বাভাবিক আত্মাতে মনও সেইরূপ নৈসর্গিক।

উৎসব।



স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৮ম বর্ষ।] ১৩২০ সাল, শ্রাবণ। [৪র্থ সংখ্যা।

মা।

আমি সহজ জ্ঞানে আমার প্রাণে
পাব কি তোমায়?
যেমন অবোধ শিশু মায়ের শুধু
মুখ পানে চায়।

জানেনা কারণ তার তবু হাঁসে বারে বার,
পলক বিচ্ছেদ হলে কেঁদে সারা হয়।
তবে আমি তেম্‌নি ক'রে কাঁদিব মা তোমার তরে
তখন, স্নেহ আলিঙ্গন দিয়ে জুড়াবে আমায়॥

(গিরিডি)—

উচ্ছ্বাস।

ছুটিল জাহ্নবী যবে কি আবেগ ভরে—
মিশাতে আপন কায়া সিন্ধু কলেবরে ;
কি গভীর উদ্দীপনা, এক লক্ষ্য করি—
লভিল সাগর বক্ষ ; আমিও হে হরি,—
তোমাতে মিশাতে চাই ; তাই এ উচ্ছ্বাস,—
তাই এ মিনতি প্রভো, হব কি নিরাশ ?
নাশ মোহ অন্ধকার, ভেঙ্গে দাও ভুল,—
শান্ত হব চিরতরে লভি পদমূল।

শ্রীমতী সরোজিনী দেবী,
মুক্তাগাছা।

ঈশ্বরানুসন্ধান।

হৃদয়ের রাজা হৃদয়ে আছেন। জীবন্ত ভাবে সদা জাগ্রত আছেন। সত্য সত্যই আছেন। এটা শুধু কথার কথা নয়। দুগ্ধের মধ্যে ঘৃত যে ভাবে থাকে সেই ভাবে সবার মধ্যে তিনি আছেন। যেমন সমুদ্রমন্থনে অমৃত উঠিয়াছিল, সেইরূপ চিত্তসমুদ্রমন্থনে সেই হৃদয়ের রাজা আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন। শাস্ত্রও বলেন "ভক্তচিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ" রামায়ণ কিষ্ক ৫।২৫। প্রথমে তাঁহাকে বিশ্বাস কর, করিয়া গুরুদত্ত সাধনা দ্বারা তাঁহাকে খুঁজিতে থাক। যতদিন না জীবন্ত ভাবে পাও, ততদিন তোমার বিশ্রাম নাই। প্রথমে নিজের হৃদয়ে লাভ কর তবেই সর্ব্বত্র লাভ হইবে। ধ্রুব নিজের হৃদয়ে লাভ করিবার পরে সর্ব্বত্রে লাভ করিয়াছিলেন। দৃঢ় বিশ্বাসে "আমি তোমার" সাধনা কর, পরে যখন ডাকিলেই পাইবে তখন বলিও "তুমি আমার"। "তুমি আমার" এই পর্য্যন্ত উঠিলে আর ভয় নাই। নতুবা আছে। ২।১৪।২০ বুধবার।

অন্বেষণ।

ওগো! এতদিন শুধু জানিনা কি মোহে—
ছুটেছি আপন মনে;
সাগরে, প্রান্তরে, পথে, গিরি, গুহা, গেহে,
সজনে, নির্জ্জনে বনে।

মুগ্ধ আপন গন্ধে কস্তুরী মৃগ ফিরি—
বনপথে হয় সারা;
কোন অজানিত বাসে মদির-বাতাসে
তেমনি পাগল পারা।

শ্রান্ত চরণ, মানেনিক' বাধা—মানসে
কভু দেয়নি বিরাম;
অবসাদে আঁখি পড়েছে ঢ়লিয়া, ক্লান্ত
পরাণ মাগি বিশ্রাম।

তবু দূর হতে দূরে এসেছি সরিয়া—
মর্ম্ম বাঁধন খুলিনি;
ওগো! আপনার মাঝে আপনার প্রেম
তাহার মর্ম্ম বুঝিনি।

আজি কে দেবে মুছায়ে মোহের অঞ্জন,
আঁধার কুহেলি' ঢাকা!
ওগো! দিবসের আলো কে দিবেগো আনি,
অরুণ কিরণ মাখা?

সেথা সোনা হয়ে যাবে সকল পরাণ
স্পর্শ মুনির পরশে;
সরসে ফুটিবে হিয়ার কমল
তব চরণ চুম্বি হরষে॥

মৃঃ—(ভবানীপুর)

তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পাবি? ইত্যাদি

এইত কাল সন্ধ্যার সময় "কিছুই ভাল লাগে না" "কিছুই ভাল লাগে না" এই কথা যাকে তাকে বলিতে বলিতে লোকের কান ঝালাপালা করিয়া তুলিয়াছিলে! কত কি যে করিলে কিছুতেই সে এলনা। আর আজ?

আজ এত আনন্দ যে বলিয়া শেষ করিতে পার না। বল তোমার ভাব কি? আচ্ছা বল দেখি যখন আনন্দ পাও তখন কিসে আনন্দ পাও?

শুনিবে? একধার হইতে বলিয়া যাই শোন। যেমন যেমন মনে আসিতেছে তেম্‌নি তেম্‌নি বলিয়া যাইব—দোষ ধরিও না।

আচ্ছা বল।

(১) তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পাবি এই কথায় আমার বড় আনন্দ।

এ ত ৺কৃষ্ণকমল গোস্বামীর গানের কলি। ইহাতে আনন্দ কেমন?

আনন্দ ত ভাবনায়। যখন ভাবি কৃষ্ণানুরাগে পাগলিনী হইয়া শ্রীমতী অতি দুর্ব্বল শরীরে বড় দ্রুত চলিতেছেন, আর ললিতা প্রভৃতি সখীরা বলিতেছে ধীরে চল্, তোর যে চলিতে চরণ কাঁপে—তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পাবি? আমাদের কাঁধে হাত দিয়া চল্—কেন এত পাগলিনী হইলি? ধীরে চল্—এই কথায় যে ছবি মনে জাগে তাতে আমার চক্ষে জল আসে। আমি ত কখন এমন ক'রে যাইনি; তবু মনে হয় বুঝি আমার ভিতরে এমনি একজন কেউ আছে—সে যেন এম্‌নি ক'রে তার কাছে যেতে চায়। অথবা আমি ভাবনায় বুঝি এম্‌নি হইতে চাই। এমনি করিয়া দুর্ব্বল দেহেও যেন তার কাছে ছুটিয়া যাইতে চাই। এতে আমার কত যে আনন্দ তা আমি বলিতেও পারি না—লেখাত তার কিছুই প্রকাশ করিতে পারে না। বলনা কেন এমন হয়?

আবার সব দিন ত সর্ব সময়ে এমন থাকে না। এখন ইহা যে ভাবিলাম তাহাতে যেন প্রাণে ব্যথা পাই। এই ভাব থাকিবার সময় মনে ভাবিতেছি ইহা আমার কখন ছুটিয়া যাইবে না। তাই কি হ'বে? এখনকার ভাব কি সব সময়ে থাকিবে? এখন ত আছে—থাকিবার কালে কেন ভাবি অন্য সময়ে থাকিবে না। ইহাত আমি বুঝি না। তুমি যদি জান ত বল আমি কি করিব?

"তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পাবি" ইহার ভাবটিই আমার আনন্দ।

(২) ঐকান্তিক ধর্ম্ম। ভক্তগণ নারায়ণপরায়ণ হইয়া—একান্ত ভক্তি সহকারে তাঁহাকে নিরন্তর চিন্তা করিয়া আপনাদের অভীষ্ট প্রাপ্ত হয়েন। নারায়ণের অনুগ্রহ ভিন্ন মুক্তি লাভ হয় না—পরমানন্দপ্রাপ্তি ঘটে না। নারায়ণই ইঁহাদের যোগক্ষেম বহন করেন। এইটি মহাভারত শান্তিপর্ব্বে ৩৪৯ অধ্যায়ে আছে। শ্রীগীতার ৩য় অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকের ব্যাখ্যায় ১৭৭ পৃষ্ঠায় ইহা ধৃত হইয়াছে। ইহাতে আমার আনন্দ।

আমি কি ভক্ত? আমি কি নারায়ণপরায়ণ? আমি কি নারায়ণের অনুগ্রহ কখন পাই? এ সব ত আমি বুঝি না। তবে যখন গ্লানিশূন্য আনন্দ পাই তখন মনে হয় বুঝি সে অনুগ্রহ করিয়াছে, নতুবা আনন্দ কে দিল?

মনে করি কত কঠোর বুঝি করি। সবাই বলে নিত্যক্রিয়া করা উচিত। সন্ধ্যা আহ্নিক তিন বেলায় করা উচিত। তাই করি। মন্ত্রের অর্থ বুঝি না। তবু নিত্য ক্রিয়ার সময় মনে করি "তুমি প্রসন্ন হও" আমি ত নির্ব্বোধ—আমি ত ভাল লোক নই। কত মন্দ কার্য্য ত আমাদ্বারা হইয়া গিয়াছে। আমি ত কোন কিছুই দমন করিতে পারি না। আমি সব দিকে চেষ্টা করি বটে, কিন্তু তাও যেন চেষ্টার মত চেষ্টা—তীব্র চেষ্টা নহে। লোকেত কত কঠোর করে। আমি বেশী সাধন ভজন ত পারি না। তবু যখন আনন্দ পাই, তখন বুঝিতে পারি না তুমি কেন আমার উপর অনুগ্রহ করিবে? আমি কি তোমার অনুগ্রহের পাত্র? তোমার অনুরাগে আমি কি কোন কিছু ত্যাগ করিয়াছি? ক্ষুধা থাকে না তাই অল্প আহার করি। আবার বেশী ক্ষুধা পাইলে বেশী আহার হইয়া যায়। তার পরের দিন পরিপাক হয় না বলিয়া—পেট খালি থাকে না বলিয়া কষ্ট পাই। উদর ভারি থাকিলে নিত্য ক্রিয়ায়—তোমার আজ্ঞা পালনে—বাধা পাই। নানা অসুবিধা হয় তাই অল্প আহার। কৃষ্ণ-অনুরাগে আহারে বিরাগ কি আমার হয়? তাহা হইলে ত বাঁচিতাম। বলনা কি দেখিয়া সে আমায় অনুগ্রহ করিবে? এসব আমি আর বলিব না। বলিয়া কি হইবে?

আচ্ছা বলিয়া কাজ নাই। আর দু' একটা আনন্দের কথা বল।

ছাড়িবে না? আচ্ছা!

(৩) সন্ধ্যার ভাব। এই প্রাতঃসন্ধ্যার সময় মনে হয় সবাই তার আরতি করে। সবাই আরতি করিতেছে এই ভাবনায় আমার বড় আনন্দ হয়। প্রকৃতি

বড় সুন্দর সাজে সাজিয়া দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে আকাশের গায়ে মেঘের রং-ফলান মত কাপড় পরিয়া যখন প্রতিদিন তিন বেলায় তাঁরে আরতি করে—তাঁর গায়ে সকাল বেলায় কত ফোটা ফুলের গন্ধ বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া চারিদিক্ আমোদিত করে—যখন প্রকৃতি এই বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপে আঁচল দুলাইয়া পঞ্চ প্রদীপ লইয়া চারিদিকে গন্ধ ছড়াইয়া তাঁরে আরতি করিতে আসেন—এই ভাবনায় আমার বড় আনন্দ হয়। আমার ইহা বড় ভাল লাগে।

তখনও আকাশে দুই দশটা নক্ষত্র থাকে; অল্পে অল্পে অন্ধকার ভেদ করিয়া সুন্দর আলোক ফুটিতে থাকে। প্রকৃতি তন্ময়ী হইয়া নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাঁহার কাছে যায়; ক্রমে পূজা সারিয়া, আরতি করিয়া যখন স্তব স্তুতি করে, আহা! সে মধুর স্বর আমার বড় ভাল লাগে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পাখীর গানে, সাধকের সুললিত স্বরে আমি প্রকৃতির স্তবস্তুতি ভাবনা করিয়া বড় আনন্দ পাই। সূর্য্য যে উঠেন আমার মনে হয় তাতে অন্ধকার সরানার একটা ভারি কার্য্য হয়। যেমন সাধকের লয় বিক্ষেপ কাটাইয়া রমণীয়-দর্শনকে পাওয়া—সেইরূপ। মন্দেহা রাক্ষসসমূহ, গায়ত্রীমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জল দ্বারা বিনষ্ট হয়—লয় বিক্ষেপ রূপ রাক্ষসের রক্তে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের পরে সমস্ত আকাশ যেন রঞ্জিত হইয়া যায়, তার পরে উষার আলোক স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে। "সূর্য্যো দেবীমুষসং রোচমানা, মর্য্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ" মানুষ যেমন যুবতীস্ত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, সেইরূপ দীপ্তিশালিনী উষাদেবীর পশ্চাৎ সূর্য্য আগমন করেন। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে, ভাবিতে ভাবিতে নিজের সহিত মিলাইয়া লইতে আমার বড় আনন্দ হয়। আর সূর্য্যকে আমরা দেখি কিরূপে? শুধু চক্ষু চাহিলাম আর দেখিতে পাইলাম এ ত বড় মোটা কথা। কিন্তু ইহার ভিতরে আরও কথা আছে। আগে সূর্য্যরশ্মি জগৎকে প্রকাশ করে আবার সেই রশ্মিই সূর্য্যকে প্রকাশ করে। যদি কতকগুলি রশ্মি সূর্য্যের দিকে না ছুটিত, তবে সূর্য্য দেখা যাইতেন কিরূপে? তবেই হইল আদিত্যপথগামী বরণীয় ভর্গই সূর্য্যকে প্রকাশ করেন।

দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্। রশ্মিগুলি সূর্য্যকে ঊর্দ্ধে ধারণ করেন বিশ্বকে প্রকাশ জন্য। বল না এসব চিন্তায় আনন্দ কেন আইসে? কিন্তু এসব বলিয়া কি হইবে?

তবু আর একটু বল।

আচ্ছা আর একটী মাত্র বলিব। আর বলিব না।

আচ্ছা।

রামায়ণে শ্রীসীতা যখন শ্বশুর বাড়ীতে আসিলেন—ছোট বৌ—কৌশল্যা রাণী নিত্য নূতন সাজে তাঁর রামের বধূকে সাজান—আর সেই সুন্দর সাজে সাজিয়া তিনি অযোধ্যার রাজ-বাড়ীর অন্তঃপুরে ওখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ান। শ্বাশুড়ীদের আনন্দ ধরে না। আবার সকলের সাক্ষাতে যখন রাম আসেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া সেই কচি বৌ একটু ঘোমটা টানিয়া যেন একটু লজ্জা পান। আর কৌশল্যা রাণী তখন সীতাকে কাছে লইয়া রামকে কাছে ডাকেন—বলনা তখন কেমন হয়? এই সব ভাবনায় আমার চক্ষে জল আসে। আমি বুঝিতে পারি না কেন কাঁদি। সীতা আমার কে? রামই বা আমার কে? আমি কেন কাঁদি? এই ভাবে একটীর পর একটী করিয়া রামায়ণের ছবি ভাবিয়া আমি যেন কি পাই—কি যেন হইয়া যাই। বলনা আমার ভিতর কি তখন সীতারাম খেলা করেন? আমি আর বলিব না। আমার যা হয় তাই হয়। ২।১৫।২০

"তোমার ভাবনা।"

দেখে কি ছিলাম আমি তোমায় কখন?
ইন্দ্রনীলমণিপ্রভা, নখর সুঅঙ্গ-আভা,
একটী দুইটী মাত্র শোভিত দশন।
কটিতে কেয়ূর গাঁথা, কোমল অস্ফুট কথা,
বালক-স্বভাব অতি চঞ্চল যেমন।
কৌশল্যা ধরিতে যায়, হাসি দ্রুত ফিরে ধায়,
নবীন শৈশব-লীলা সুমিষ্ট কেমন!
কুণ্ডল-শোভিত কর্ণ, কণ্ঠে শোভে নানা বর্ণ,-
শার্দ্দূল-নখরযুক্ত মণিময় হার।

সুবর্ণ নূপুর পায়, হেলিতে দুলিতে তায়,
মধুর মধুর ধ্বনি শ্রুতিসুখসার ।
বিশ্বামিত্র প্রিয়বর, সর্ব্বযজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর,
সুবাহু-মারীচ-শত্রু, ধনুর্ব্বাণ-ধারী ।
অগণিত গুণধাম, দ্বিভুজ-সুন্দর রাম,
শঙ্খ চক্র গদাধর পাষাণ-উদ্ধারী ।
এসব পুরাণে গাঁথা, বহু পুরাতন কথা,
কি জানি পরাণে কেন ভাসে বা এখন ।
সেই যে পরম রঙ্গে, ব্রজ-বালকের সঙ্গে,
লইয়া পাঁচন-বাড়ী মাঠে গোচারণ ।
স্বেদযুক্ত চন্দ্রানন, দেখি সব শিশুগণ,
কেহ বা করিত কোলে কেহ বা বীজন ।
কেহ ফল দিত মুখে, কেহ বা ধরিত বুকে,
বলনা সে দিন সখে ! গিয়াছে কেমন ?
যদি না সরম হয়, আগাগোড়া সমুদয়,
বলিব কি সব কথা ! হক্ পুরাতন !
ঠল ঠল ছল ছল, যমুনার কাল জল,
ঘন শাখা পল্লবেতে চাঁদের কিরণ ।
সরস সবুজ পত্র, নীহারে হইয়া স্নাত
মলয় পবন ভরে পড়িত ঘুমিয়া।
সুস্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য রাশি, অম্বরে জাগিয়া শশী
ক্ষীণপ্রভ তারাহার গলায় পরিয়া,
রজনী তৃতীয় যাম, যমুনার তটে শ্যাম,
বাজাতে মোহন বাঁশী হয় কি স্মরণ !
ধীরে ধীরে অতি ধীরে, সুধার গম্ভীর স্বরে,
কাকে বা সঙ্কেত হরি ! করিতে তখন্ ।
রাধা, রাধা, রাধা রবে, আকুল পরাণে যবে,
ডাকিতে বলনা কারে ? সে নারী কেমন !
রূপ-গুণে-বংশীধারী, তোমা হতে সেকি হরি

আর কি জগতে আছে রূপ অতুলন ?
জপত যাহার নাম, নিশি দিশি তুঁহু শ্যাম,
হবে কি তোমার রাধা তোমার মতন ?
আবার যখন তুমি, ত্যজি সুখ ব্রজভূমি
নিদয় হইয়া কর মথুরা গমন,
তোমার সাধের রাধে, চরণে লুটায়ে কাঁদে,
ললিতা বিশাখা বৃন্দা যত সখিগণ !
অশ্রুজলে গোপবালা, ভাসে যেন পদ্মমালা
ভ্রমর-নিন্দিত আঁখি অরুণ বরণ।
বাক্যস্ফূর্ত্তি নাহি হয়, উর্দ্ধদৃষ্টি শূন্যপ্রায়
সে দৃশ্য দর্শনে বিশ্ব আঁধার যেমন।
আবার তেমনি হেসে, দাঁড়ালে কুবুজা-পাশে
করিলে কতই খেলা, শ্রীমধুসূদন !
তোমার লীলার শেষ, বল কোথা মথুরেশ !
কোন্‌টি বলিব আর, সবত মধুর।
বিরহে ঐশ্বর্য্য মাখা, জ্ঞানে মাত্র তুমি একা.
শোকে শান্তি, সুখে দেখি আনন্দ প্রচুর ;
যেন পরিচিত তুমি, কোথায় দেখেছি আমি,
বল কে তোমার আমি সখা কি স্বজনী ?
দাস কিম্বা দাসী হব, অন্তরঙ্গ কি মাধব ?
অথবা কি নন্দ পিতা, যশোদা জননী ?
পূর্ব্ব-স্মৃতি আসে যায়, স্বপ্ন সম ভাসে হায় !
হলনা আমার হরি ! নিশ্চয় ধারণ।
যদি দাও দয়াময়, কৃপা করি পরিচয়,
কি আর বলিব প্রভু ! তোমারি করুণা !
আবার বাজাও হরি, বাঁশীটা তেমনি করি,
মণিপুরে মনোহারী জগৎ রমণ।
স্বরে ও ভঙ্গিতে হরি, চিনিলে চিনিতে পারি,
ধ্বজ-ব্রজাঙ্কুশ চিহ্নে চিহ্নিত চরণ।

দাও হে হৃদয় মাঝ, তুলিয়া লইব ছাঁচ
অন্তরে অন্তরে চির-কালের মতন।
যে চরণে চির-শান্তি, পরশেতে মহামুক্তি,
ঘুচিবে এ মহাব্যাধি জনন মরণ।
যে চরণে গয়াধামে, পিণ্ড দেয় পূর্ণ কামে,
পিতৃলোক-মুক্তি হেতু এখনও নর ;
যে পদে জনমে সতী, পুণ্যবতী ভাগীরথী,
সে পদে প্রণমি পুনঃ পুনঃ গদাধর।

২১।১।২০

রা—

ঋষিগণের পদানুসরণ।

তৃতীয় প্রবন্ধ।

আমরা বলিতেছিলাম পরমপদই জীবের বিশ্রামস্থান। চিরশান্তি, সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তি, পরমানন্দপ্রাপ্তির ইহা ভিন্ন আর দ্বিতীয় স্থান নাই। বেদ বা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ; ইতিহাস, তন্ত্র সর্ব্বশাস্ত্র একবাক্যে এই পরমপদই যে একমাত্র বিশ্রামস্থান তাহা দেখাইতেছেন।

বলিতেছিলাম পরমপদে আশ্রয় লইতে হইবে? আশ্রয় লইতে হইলে এই পরমপদের অন্বেষণ করা চাই, পরমপদ দেখা চাই।

কিরূপে অন্বেষণ করিব?

স্মৃতি বলেন— অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলং
অসঙ্গ শস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা।
ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ॥ ইত্যাদি।

সুদৃঢ়-মূল এই সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে অসঙ্গ শস্ত্রে সমূলে ছেদন করিয়া,

তাহার পরে সেই পরমপদের অন্বেষণ করিবে। সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইলে, আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন নাই।

যদি মনে করিয়া থাক আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ, আত্মা বা পরমপদকে দেখা চাই। সেই জন্য আত্মার কথা শ্রবণ চাই, মনন চাই এবং ধ্যান চাই, তবে দর্শন হইবে; যদি ইহা সহজ মনে করিয়া থাক তবে তুমি ভ্রান্ত। শ্রবণাদিতে কোন ফল হইবে না, যতদিন না সংসার-বৃক্ষকে অসঙ্গ-শস্ত্রে দৃঢ়রূপে ছেদন কর, যতদিন না ভোগত্যাগ দৃঢ়ভাবে অনুষ্ঠান কর—সঙ্গত্যাগ বা বাসনাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণ মনন অভ্যাস করিতে হইবে। বাসনাত্যাগ, তত্ত্বজ্ঞান এবং মনোনাশ সমকালে অভ্যাস করা চাই তবে পরমপদের দর্শন মিলিবে। বাসনা যে মিথ্যা ইহা জানিয়া আমি নিঃসঙ্গ, আমার সহিত কোন কিছুর সঙ্গ হয় না, চেতনের সহিত অন্য কিছুরই সম্বন্ধ নাই, আপাততঃ আত্মার সহিত যাহার যে সম্বন্ধ পাতান হইয়াছে তাহা মায়িক, তাহা ভ্রম মাত্র—আত্মা আকাশের মত পূর্ণভাবে নিঃসঙ্গ ইহা প্রতিদিন অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত যখন ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া যাইবে, তখনই চিত্তক্ষয় বা মনোনাশ ঘটিবে। এই বিষয় বাশিষ্ঠগীতায় আমরা বিশেষরূপে আলোচনা করিব।

এখানে আমরা এইমাত্র বলিতে চাই যে, আত্মা যে নিঃসঙ্গ ইহা সত্য সত্য অনুভব করিতে হইলে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ পাওয়া চাই! শুদ্ধ সত্ত্বগুণ তাহার নাম—যে গুণে রজ ও তম কোন কার্য্য করিতে পারে না। মনকে লয়বিক্ষেপের হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারিলে, ইহা শুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রাপ্ত হইবেই। শুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রাপ্তি জন্যই ঋষিগণের পদানুসরণ প্রয়াস। ইহাই ঋষিগণের উপাসনার বস্তু। কারণ ইহাই আমাদিগকে পরমপদে পৌছাইয়া দিতে পারে। কিরূপে পারে পরে আলোচনা করা হইতেছে। দ্বিতীয় কথা হইতেছে পরম পদ কার? শ্রুতি বলেন, তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং। সেই সর্ব্বব্যাপীর পরমপদ। এখানে কখন কখন অর্থ করা হয় সেই বিষ্ণুই পরমপদ। যেমন রাহুর শির বলিলে শিরই রাহু বুঝায় সেইরূপ। শাস্ত্র এখানে শক্তি ও শক্তিমান্ যে এক তাহাই বলিতেছেন। আবশ্যক হয় এই বিষয় পরে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রুতিও বলেন বিষ্ণুর সেই পরমপদ লাভ ভিন্ন অন্য কিছুতেই জীবন্মুক্ত হওয়া যাইবে না।

সর্ব্বে বেদা যৎ পদ মামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥

সকল বেদ যে পদকে মনন করিতেছেন, সমস্ত তপস্যাও যে পরমপদের কথা বলিতেছেন, যে পরমপদ প্রাপ্তি ইচ্ছা করিয়া লোকে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করে, সেই পরমপদকে আমি সংক্ষেপে বলিতেছি। তিনি ওঁ।

বিষ্ণুর সেই পরমপদই তুরীয় পদ। তুরীয় ব্রহ্ম আপনা হইতে স্বভাবতঃ উত্থিত মায়া অবলম্বনে স্বপ্ন, জাগ্রৎ সুষুপ্তি অবস্থা নিত্য লাভ করেন। ব্রহ্ম একটা জড়ের মত অসাড় হইয়া পড়িয়া নাই। তিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থা আয়ত্ত করিয়া খেলা করেন। যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তমবৈতি নিত্যম্। খেলা করিলেও তিনি সর্ব্বদা আপনার আপনি আপনি ভাবরূপ স্বরূপে অবস্থিত। ইহা তাঁহার মহিমা। যুক্তিদ্বারাও বুঝা যায় ইহা তাঁহার পক্ষে অতি তুচ্ছ কার্য্য মাত্র। শ্রুতি আরও বলেন, মহামৎস্য যেমন নদীর উভয়কূলে বিচরণ করে অথচ কোথাও আসক্ত হয় না, সেইরূপ আত্মাও অবস্থাত্রয়ে বিচরণ করেন তথাপি কোন অবস্থাতেই আসক্ত নহেন। অবস্থার দোষগুণে তিনি সংস্পৃষ্ট হন না।

বলা হইল আত্মা পরমপদে সর্ব্বদাই অবস্থিত। এই পরমপদে কোথাও সংসার নাই। তুরীয় পদ পরম শান্ত। ব্রহ্মের যে অতিসূক্ষ্ম বিন্দুস্থানে মায়ার তরঙ্গ উঠিয়া অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিতেছে, তাহাই পরমপদে প্রবেশ দ্বার। মহাপ্রলয়ে ত্রিভুবন যে শব্দে লয় হয় আবার সর্ব্বশব্দ যে বিন্দুতে লয় হয়— সেই বিন্দুই পরমপদে প্রবেশ-দ্বার। পূর্ব্বে বলা হইল পরমপদে কোথাও সৃষ্টিতরঙ্গ নাই। সেই জন্য গীতা বলিতেছেন—অসঙ্গ শস্ত্রে সুদৃঢ়মূল সংসার ছেদন করিয়া সেই পরমপদ অন্বেষণ কর। ইহাই চিত্তশুদ্ধি, চিত্তের একাগ্রতা এবং চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিয়া ইহার চিরনিরোধ। শেষে জ্ঞান ও বিচারে স্থিতি।

এই পরমপদই ব্রহ্মের স্বরূপ। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তাঁহার নাম বিষ্ণু। জল যেমন মৃত্তিকা-পিণ্ডকে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া থাকে অথচ জল মৃত্তিকা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু, সেইরূপ ব্রহ্মও ওতপ্রোত ভাবে জগৎ ব্যাপিয়া থাকিলেও

জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ইহার ব্যাখ্যায় শ্রুতি বলেন, বিষ্ণোঃ সর্ব্বতোমুখস্য। স্নেহো যথা পললপিণ্ডমোতপ্রোতমনুব্যাপ্তং ব্যতিরিক্তং বাপ্নুত ইতি ব্যাপ্নুবতো বিষ্ণোস্তৎ পরমং পদং পরং ব্যোমেতি পরমং পদং পশ্যন্তী বীক্ষন্তে। সূরয়ো ব্রহ্মাদয়ো দেবাস ইতি সদা হৃদয় আদধতে। তস্মাদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বস স্তু তিষ্ঠতি ভূতেম্বিতি বাসুদেব ইতি।

সর্ব্বভূতে এই পরমপদ, এই বিষ্ণুর স্বরূপ, অবস্থান করিতেছেন। সংসার ছাড়িয়া ইঁহাকেই অবলম্বন করা চাই।

যে মনুষ্য সংসারকে দেখিয়াছে, সেই জানিয়াছে ইহা মৃত্যু-সংসার-সাগর। নিরন্তর জরামরণ সঙ্কুল এই ভীম ভবার্ণব পার হইতে যাঁহার তীব্র বাসনা জাগিয়াছে তাঁহারই আশ্রয়স্থান এই পরমপদ।

প্রথমে দর্শন তবে আশ্রয়। পরমপদ দর্শনই তবে মুমুক্ষু জীবের মুখ্য কার্য্য।

কিরূপে পরমপদের দর্শন হইবে? সর্ব্বোচ্য উপাসনা যাহা তাহাই পরমপদের দর্শনের উপায়। ঋষিগণ এই উপাসনা করিতেন। তাঁহাদের পদানুসরণ ভিন্ন এই উপাসনা বুঝা যাইবে না। ইহারই প্রয়াস পাওয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যিনি নদীর সাগরে মিলনের মত সর্ব্বদা সেই পরমপদে মিলিতেছেন, তাঁহার আশ্রয় ভিন্ন পরমপদের দর্শন অসম্ভব।

কে ইনি যিনি পরমপদে মিলাইতে পারেন? কে ইনি যিনি সেই পরমপদ দেখিয়া দেখিয়া পরমপদে মিলিয়া অন্যকে ইহা দেখাইতে পারেন, অন্যকে এই পরমপদে মিলাইতে পারেন? কে ইনি? ইনি কোথায় থাকেন? ইঁহার রূপ কি?

ইনি সেই পরমপদের, সেই পরম দেবতার, সেই সর্ব্বভাব প্রসবিতার উৎকৃষ্ট উপাসনীয় তেজ। ইনিই তাঁহার পরমা শক্তি; তাঁহার পরম জ্যোতি।

যে মানুষ ইঁহার নাম গান করেন, সেই তেজোরূপিণী, বলরূপিণী, আয়ুরূপা, দীপ্তিরূপা, মন্ত্ররূপাকে যে গায়, উচ্চারণ করে, তাঁহাকেই তিনি মৃত্যুসংসার-সাগর হইতে ত্রাণ করেন।

ইনি আদিত্যপথগামিনী, ইনি ব্রহ্মতেজ, ইনি দীপ্তিমতী, ইনি মুক্তিপ্রদা, ইনি চিন্তনীয়া, ইনি প্রণম্যা, ইনি দেবতাদিগের প্রিয় ঈশ্বরোপাসনার মন্ত্র। "প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনম্" ত্বং যদ্ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবিদো বিদুস্ত্বাং।

ইনি ব্রহ্মস্বরূপিণী। আবার বিশ্বমসি বিশ্বায়ুঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ুঃ। তুমি বিশ্ব; বিশ্বের আয়ুও। সমস্তই তুমি, তুমি সকলের আয়ু।

কে ইনি? যথাগ্নির্দেবানাং, ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণাং, মেরুঃ শিখরিণাং, গঙ্গা নদীনাং, বসন্ত ঋতূনাং, ব্রহ্মা প্রজাপতীনাং এবমসৌ মুখ্যা। অগ্নি যেমন দেবতাদিগের প্রধান, ব্রাহ্মণ যেমন মনুষ্যগণের প্রধান, সুমেরু যেমন পর্ব্বতগণের প্রধান, গঙ্গা যেমন নদীগণের প্রধান, বসন্ত যেমন ঋতুগণের প্রধান, ব্রহ্মা যেমন প্রজাপতিগণের প্রধান, ইনি সেইরূপ সকলের প্রধান।

কে ইনি?

ইনি দেবী; ইনি মহাদেবী—তেজোময়ী; ইনি সগুণ ব্রহ্মের তেজ। ইনি বিদ্যাস্বরূপিণী—তত্ত্বজ্ঞানময়ী; ইনি সন্ধ্যাস্বরূপিণী। এক দিকে অনন্তসীমাশূন্য পরমপদ—অন্য দিকে সূর্য্যকিরণে এসরেণু মত ভাসমান অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ইনি এই দুয়ের সন্ধিস্থান। ইনি সরস্বতী—সরসবতী; ইনি বেদমাতা; ইনি জরা-রহিত; ইনি মরণবর্জ্জিত। কি ইনি নন? যাঁহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, ইনি সেই প্রকৃতি। তমসস্তং পরং জ্যোতি—তমোগুণাতীত পরম পুরুষ যাঁহার সহিত নিত্য বর্ত্তমান, ইনি তিনিই। সমস্ত দেবদেবীরূপে যিনি বর্ত্তমান, ইনি তিনিই।

ইনি কোথায় থাকেন?

ঋষিগণ বলেন ইনি কোথায় না থাকেন? এই সগুণ ব্রহ্মশক্তি, এই ব্রহ্মতেজ না থাকেন কোথায়? সমস্ত বস্তুর উৎপাদনের হেতু কারণবারি হইয়া ইনিই আছেন; মণিপাষাণাদি ধাতুতে তেজরূপে ইনিই আছেন; তৃণ, বৃক্ষ, ওষধি ইত্যাদি স্থাবরে রসরূপে ইনিই আছেন; আবার অনন্ত অনন্ত প্রাণধারী জীবহৃদয়ে জ্যোতির্ম্ময়ী চেতনারূপে ইনিই আছেন।

ইনি থাকেন কোথায়? সর্ব্বত্রই ইনি থাকেন। বিশেষতঃ উত্তমে শিখরে দেবী ভূম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি। এই ব্রহ্মাণ্ড-দেহ ভূমিতে যে পর্ব্বত চূড়া তাহারই উত্তম শিখর স্বরূপ সহস্রার কমলে ইনি সদা বাস করেন।

কি ইঁহার রূপ?

ইঁহার রূপ বর্ণনা কে করিবে? এই অরূপের রূপ বর্ণনা করিতে কে পারে? সবরূপে রূপে মিশাইয়া যিনি আপনি নিরাকার, আবার আপনরূপ দিয়া যিনি তাঁর স্বরূপ ঢাকেন, স্বরূপেতে যিনি অরূপ তাঁবে যিনি রূপ ধরান—তাঁর রূপ বর্ণনা করিতে কে পারে?

কেহই পারে না। তবুও শ্রুতি বহুরূপে ইঁহার রূপ বর্ণনা করিতে চান। ঋগ্বেদ সংহিতা, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শ্রুতি বলেন :—

গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্।

পরমপদ হইতেছে পরমব্যোম। সেই পরমপদে বা পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত গৌরবর্ণা শব্দব্রহ্মাত্মিকা বাগ্‌দেবীই গৌরী। ইনিই সেই—যিনি সেই রমণায় দর্শনের সহিত মিলাইয়া দিতে পারেন। প্রলয়কালে ইনি পরমপদেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তখন শক্তি ও শক্তিমান্ এক থাকেন। আবার পুনঃসৃষ্টির আরম্ভে বর্ণ, পদ ও বাক্য সৃষ্টি করিয়া ইনিই শব্দ করিয়াছিলেন; সমস্ত বর্ণ, পদ ও বাক্যের মধ্যে অন্তর্যামিনীরূপে ইনিই প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহাতেই নিখিল শাস্ত্রের বিকাশ হইয়াছে। শব্দব্রহ্মাত্মিকা এই বাগ্‌দেবী কিরূপে নানা আকার ধরিয়াছেন,—ধরিয়া শাস্ত্র বিকাশ করিয়াছেন—শ্রুতি এক্ষণে তাহাই দেখাইতেছেন। বাক্‌দেবী ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রণবাত্মাতে একপদী হইয়া প্রথমে আবির্ভূতা হয়েন। এই জন্য ব্রহ্মা প্রণবের ঋষি। তৎপরে ব্যাহৃতি ও সাবিত্রীরূপে ইনি দ্বিপদী, তৎপরে বেদচতুষ্টয়রূপে ইনি চতুষ্পদী, তাহার পর ষট্ বেদাঙ্গ এবং পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা ইনি অষ্টাপদী, তৎপরে মীমাংসা-ন্যায়-সাংখ্যযোগ পাঞ্চরাত্র-পাশুপত-আয়ুর্ব্বেদ-ধনুর্ব্বেদ-ও-গান্ধর্ব্ববেদ দ্বারা নব-পদী এবং তদনন্তর অনন্ত বাক্‌সন্দর্ভদ্বারা ইনি অনন্তরূপে প্রকটিত হন। আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপের ব্যাখ্যা—পৃঃ ১৩১।

কি তাঁর রূপ?

সকল সময়ে ত একরূপ থাকে না। কখন কুমারী, কখন যুবতী, কখন বৃদ্ধা। কখন রক্তাঙ্গী, কখন শ্বেতাঙ্গী, কখন কৃষ্ণাঙ্গী। উষঃকালে রক্তা, মধ্যাহ্নে শ্বেতাঽপরাহ্নে কৃষ্ণা। কখন মায়া-মানুষ মায়া-মানুষী, কখন বিশ্বরূপ বিশ্বরূপিণী, কখন আপনি আপনি। আবার কখন দৃষ্টাদৃষ্টরূপধারিণী। তাই শ্রুতি একরূপের একরূপে বর্ণনা করেন না। ঋষিগণ কখন বলেন—

দ্যৌর্মূর্দ্ধি সলতান্তে, ললাটে রুদ্রঃ, ভ্রুবোর্মেঘঃ, চক্ষুষোশ্চন্দ্রাদিত্যৌ, কর্ণয়োশুক্রবৃহস্পতী, নাসিকে বায়ুদেবত্যৌ, দন্তৌষ্ঠাবুভয় সন্ধ্যে, মুখমগ্নি, জিহ্বা সরস্বতী, গ্রীবা সাধ্যানুগৃহীতিঃ, স্তনয়োর্ব্বসবঃ, বাহ্বোর্ম্মরুতঃ, হৃদয়ং পার্জ্জন্যং, আকাশমুদরং, নাভিরন্তরিক্ষং, কটিরিন্দ্রাগ্নী, জঘনং প্রাজাপত্যং, কৈলাসমলয়াবূরূ,

বিশ্বেদেবা জানুনী, জহ্নুকুশিকৌ জজ্ঘাদ্বয়ং, খুরাঃপিতরঃ, পাদৌ বনস্পতয়ঃ, অঙ্গুলয়ো রোমাণি, নখাশ্চ মুহূর্ত্তাস্তেহপি গ্রহাঃ কেতুমাসা ঋতবঃ সন্ধ্যাকালে স্তথাচ্ছাদনং সংবৎসরো, নিমিষ-মহোরাত্র আদিত্যশ্চন্দ্রমা। একবার স্থিরচিত্তে এই সর্ব্ব জড় ও জীব প্রকৃতি বিজড়িত বিশ্বমূর্ত্তির চিন্তা করিয়া দেখ দেখি কি পাও!

শ্রুতি কখন বলেন গায়ত্র্যাস্যেক পদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদ্য পদসি, ন হি পদ্যসে। নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজসে। ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিভুবন যাঁহার প্রথম পদ, ঋক্‌ যজু সাম এই তিন বেদ যাঁর দ্বিতীয় পদ, প্রাণ, অপান, ব্যান এই তিন বায়ু যাঁহার তৃতীয় পদ আর চতুর্থ পদ যাঁর সূর্য্য। তিনি আবার অপদ তাঁহারে সহজে পাওয়া যায় না। তাঁহার ঐ যে পরম রমণীয় রজোগুণের পর তুরীয়পদ তাঁহাকে আমরা প্রণাম করি।

কোথাও বলা হয় শ্বেতোবর্ণ: অগ্নির্মুখং, ব্রহ্মা শিরো, বিষ্ণু হৃদয়ং, রুদ্রে ললাটং, পৃথিবী কুক্ষি ত্রৈলোক্যং চরণঃ। ইনি ত্রিপদা, ষট্‌কুক্ষিঃ, পঞ্চশীর্ষা।

ইঁহার মুখ পাঁচটী। ব্যাকরণ মস্যা প্রথমং শীর্ষং ভবতি, শিক্ষা দ্বিতীয়ং, কল্পস্তৃতীয়ং, নিরুক্তং চতুর্থং, জ্যোতিষাময়নমিতি পঞ্চমম্॥ ইঁহার সাকার মূর্ত্তির রূপ ও কতভাবে বর্ণিত হইয়াছে বাহুল্যভয়ে তাহা এখানে বলা গেল না।

স্বরূপের কথা বলিতে গেলেই অনেক কথা বলিতে হয়। ইহার পরেই স্বরূপ বা পরমপদ দর্শনের কথা। এখানেও বুঝিবার কথা এবং তাহার পরে করিবার কথা বা সাধনা আছে। এই দুই রকমের কথা এখানে আলোচনা হইবে। দর্শনটি কিরূপে হইতে পারে তাহাই প্রথমে পরিষ্কার রূপে আলোচনা করা হউক।

কথা হইয়াছিল কে সেই পরমপদ দেখাইবে? মীমাংসা হইয়াছে যিনি সর্ব্বস্থানে থাকিয়াও পরমপদে মিলিতে যাইতেছেন তাঁহার অনুসরণ করিলেই সেই পরমপদের দর্শন হইবে।

পরমপদ ইঁহারই তুরীয়পদ। এই তুরীয়পদের সহিত সূর্য্যের বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অস্যা এতদেব তুরীয়ং পদং য এষ আদিত্যস্তপতি। শ্রুতি বলিতেছেন নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজসে। ব্যাখ্যায় বলা হইতেছে তে তব তুরীয়ায় পদায় আদিত্যরূপায় নমঃ। কীদৃশায়? দর্শতায় দর্শনীয়ায়—দুরাপত্বাৎ কেবলং দৃশ্যমানায়। পরো রজসে রজোগুণাতীতায় শুদ্ধ সত্ত্বময়ায়। ইহার

মধ্যে অনেক কথা রহিল। যাঁহারা বুঝিবেন তাঁহারা বুঝিয়া লইবেন। আমরা সহজ করিয়া পরিষ্কার করিয়া বলি।

যাঁহার উপাসনা করিলে পরমপদের দর্শন মিলিবে—সেই উপাসনার প্রধান অঙ্গ সূর্য্যদেবকে চিন্তা করা। এই সূর্য্য ও পরমপদরূপ জ্ঞানসূর্য্য একই—শাস্ত্র এই কথা বলেন।

আদিত্যই তুরীয় পদ ইহা বলা হইয়াছে। আবার বলা হইতেছে আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্। হৃদয়ে সর্ব্বভূতানাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি। সূর্য্যান্তর্গত যে জ্যোতির জ্যোতি উত্তমজ্যোতি তাহাই সর্ব্বপ্রাণী-হৃদয়ে জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন। সেই পরমপদই সূর্য্যের মধ্যে ও জীবরূপে আছেন। ইহাই বলা হইতেছে।

২

পরম পদ দর্শন।

সূর্য্যকে আমরা যেরূপে দেখি পরমপদকেও সেইরূপে দেখা যাইতে পারে।

সূর্য্য বাহিরের বস্তু, তথাপি ইঁহাকে আমরা সূর্য্যরশ্মি-সাহায্যেই স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখি। পরমপদ অন্তরেরও বস্তু। সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম। তাঁহাকে দেখিতে হইলে পরমপদের উৎকৃষ্ট তেজ বা বরণীয় ভর্গ সাহায্যেই দেখিতে হয়। স্থূল চক্ষুতে ইহা দেখা যায় না, দেখা যায় তৃতীয় চক্ষু দ্বারা। এই কথাই বিশদ করা যাইতেছে।

সূর্য্যরশ্মি-সাহায্যেই আমরা অন্য সকল বস্তু দেখি এবং রশ্মি-সাহায্যেই সূর্য্যকে দেখি। তবেই হইল কতকগুলি রশ্মি সূর্য্যাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। আমাদের চক্ষু তাহাদের দ্বারাই সূর্য্য দর্শন করে। শ্রুতি বলেন স্বরন্তু রসি, শ্রেষ্ঠোরশ্মির্ব্বর্চ্চোদাঅসি ইত্যাদি। শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের পুস্তকের ব্যাখ্যাতে পাওয়া যায়—সূর্য্যস্য সপ্তরশ্ময়ঃ সন্তি। চতুর্দ্দিক্ষু চত্বারঃ, এক উপরি, একঃ অধস্তাৎ, সপ্তমো মণ্ডলাভিমানী হিরণ্যগর্ভঃ পুরুষঃ। স শ্রেষ্ঠঃ। হে সূর্য্য! স ত্বম্ অসি। কূর্ম্মপুরাণ ৪র্থ অধ্যায়ে সূর্য্যরশ্মির কথা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

এবমেব মহাদেবো দেববেবঃ পিতামহঃ।
করোতি নিয়তং কালং কালাত্মা হৈশ্বরীতনুঃ॥

তস্ত যে রশ্ময়ো বিপ্রাঃ সর্ব্বলোকপ্রদীপকাঃ।
তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্তরশ্ময়ো গ্রহযোনয়ঃ।

প্রধান প্রধান রশ্মি গ্রহনক্ষত্র ভিন্ন লোকসমূহ পোষণ করে। এই সপ্ত শ্রেষ্ঠ রশ্মির নাম—

(১) সুষুম্ন সূর্য্যরশ্মি—তীর্য্যগূর্দ্ধ প্রচারোসৌ সুষুম্নঃ পরিগীয়তে। এই রশ্মি বক্রভাবে এবং উর্দ্ধদিকে প্রবাহিত।

অন্তগুলির নাম হরিকেশ, বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বব্যচা, সম্পদ্‌বসু, অর্ব্বাক্‌বসু ও স্বরাট্‌।

এবং সূর্য্যপ্রভাবেণ সর্ব্বা নক্ষত্র তারকাঃ
বর্দ্ধন্তে বর্দ্ধিতা নিত্যং নিত্যমাপ্যায়বন্তি চ॥
দিব্যানাং পার্থিবানাঞ্চ নৈশানাঞ্চৈব সর্ব্বশঃ।
আদানান্নিত্যমাদিত্যস্তেজসা তমসাং প্রভুঃ॥ ইত্যাদি

সবিতার বরণীয় ভর্গ যিনি, তিনি সর্ব্বদেবস্বরূপিণী। হিরণ্যগর্ভই প্রধান দেবতা। ইনিই গায়ত্রী, সাবিত্রী, সরস্বতী। ইনি ব্রহ্ম পথে গমন করিয়া তাঁহার সহিত মিশ্রিত হয়েন। যে সাধক ইঁহার ধ্যান করেন, তিনিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মে মিলিত হইতে পারেন।

যাঁহারা বুঝিতে যত্ন করেন, আমরা তাঁহাদের জন্ত অন্ত প্রকারে ইহা ধারণা করিতে চেষ্টা করিতেছি।

রাত্রির অন্ধকার অল্পে অল্পে অপসারিত করিয়া যখন আলোকরেখা ফুটিতে থাকে, ক্রমে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে চারিদিক্‌ শুভ্র আলোক দ্বারা প্রকাশিত হয়; আবার রৌদ্র-মুহূর্ত্তে ক্ষণকালের জন্ত আকাশে নানাবর্ণের মেঘমালার খেলা হয়, তাহার পরেই সমস্ত পৃথিবী আলোকরাশি-মণ্ডিত হইয়া উঠে; জলস্থল অম্বরতল, মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা আলোক-স্নাত হইয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর হয়—আমরা সমস্তই দেখি বটে, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি না কোথা হইতে এই আলোকরাশি আসিতেছে। শুধুই একটা জগৎব্যাপী আলোক আসিয়া অন্ধকার নাশ করিয়া সকল বস্তু প্রকাশ করে—ইহা মাত্রই দেখি। পরে যখন গগনতলে সূর্য্যদেবকে উঠিতে দেখি, তখন আমরা বুঝিতে পারি রশ্মিজাল কোথা হইতে আসিতেছে?

উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্‌। কেতবঃ

রশ্ময়ঃ জাতবেদসং তেজোময়ং তেজস্বরূপং সূর্য্যং বিশ্বায় বিশ্বপ্রকাশায় উদ্বহন্তি। জগতে প্রকাশ করিবার জন্য সূর্য্যরশ্মিসমূহ সূর্য্যদেবকে উর্দ্ধে ধারণ করিতেছেন। ইহার পরেই ঋষিগণ বলিতেছেন—মিত্র বরুণ অগ্নি প্রভৃতির প্রকাশক, স্থাবর জঙ্গমের অন্তর্যামী সূর্য্য আশ্চর্য্যরূপে উদিত হইয়াছেন এবং স্বর্গ মর্ত্ত আকাশকে স্বীয় রশ্মিজালে পরিপূরিত করিয়াছেন।

যেমন সূর্য্যের আলোক ধরিয়া অপেক্ষা করিতে করিতে তবে সূর্য্যদর্শন হয়, সেইরূপ পরমপদ-প্রসূত কোন কিছু ধরিলে, তবে আমরা পরমপদ দর্শন করিতে সমর্থ হই। ইহাই সেই বরণীয় ভর্গ।

শাস্ত্র জড়কে জড় বলেন আর চৈতন্যকে চৈতন্যই বলেন। আকারবিশিষ্ট বস্তুই যে চিজ্জড়ের মিশ্রণে জাত তাহা ঋষিগণ বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। চৈতন্য না থাকিলে জড়ের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যে থাকে না তাহা তাঁহারা বিশেষ রূপে প্রমাণ করিয়াছেন। সর্ব্বশাস্ত্রেই দেখা যায় জড় যেটা সেটা মায়িক, সেটা মিথ্যা, সেটা ইন্দ্রজাল মাত্র। যে শাস্ত্রে শ্রীভগবানের অবতার ও লীলা বিশেষরূপে বর্ণিত, সেই ভাগবত শাস্ত্রও জড় জগৎকে মিথ্যা ইন্দ্রজাল বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রীভাগবত বলিতেছেন, যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা। যত্র ভগবৎ-স্বরূপে ত্রিসর্গঃ ত্রয়াণাং মায়াগুণানাং তমোরজঃসত্ত্বানাং সর্গঃ কার্য্যবর্গঃ অমৃষা সত্যবৎ প্রতীয়তে। অত্র দৃষ্টান্তঃ তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ। রজ্জুতে যেমন সর্প বোধ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে এই জগৎ। সেই জন্য শাস্ত্র যখন সূর্য্যকে উপাসনা করিতে বলিতেছেন, তখন সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী যে চৈতন্য তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতেছেন। যখন বলিতেছেন সূর্য্যো দেবীমুষসং রোচমানাং, মর্য্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ—সূর্য্যঃ রোচমানাং দীপ্যমানাং দেবীং উষসং পশ্চাৎ অভ্যেতি তামভিলক্ষ্য গচ্ছতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ মর্য্যো ন যোষাং যথা কশ্চিন্মনুষ্যঃ শোভমানাবয়বং গচ্ছন্তীং যুবতিং স্ত্রিয়ং সততম্ অনুগচ্ছন্তি তদ্বৎ। পুরুষ যেমন সুন্দরী যুবতীর অনুগমন করে, সূর্য্য সেইরূপ দীপ্তিশালিনী উষাদেবীর অনুগমন করিতেছেন। আবার যখন বলিতেছেন ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্য্যস্য। চিত্রা এতগ্বা অনুমাদ্যাসঃ। নমস্যন্তো দিব আপৃষ্ঠমস্থুঃ পরি দ্যাবা পৃথিবী যন্তি সদ্যঃ—সূর্য্যের অশ্ব অর্থাৎ কিরণ সকল মঙ্গলময়, সর্ব্বব্যাপক, বিচিত্রবর্ণ এবং আমাদের যথাক্রমে স্তবনীয়। তাঁহারা আমাদের নমস্কার প্রাপ্ত হইয়া দ্যুলোকের উপরে আরোহণ করিতেছেন এবং তখনই স্বর্গ ও মর্ত্তকে ব্যাপ্ত করিতেছেন—এই

সমস্ত যখন বলিতেছেন তখন কোন জীবন্ত বস্তু লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি এই সমস্ত বলিতেছেন। শ্রুতি পরেই আবার বলিতেছেন তৎসূর্য্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যা কর্ত্তোর্বিততং সংজভার। সূর্য্যের তাহাই ঈশ্বরত্ব ও তাহাই মহত্ত্ব যে তিনি কর্ম্মের মধ্যে অর্থাৎ লোকের আরব্ধ কর্ম্ম সমাপ্ত হইতে না হইতেই স্বীয় বিস্তীর্ণ তেজ সংহার করেন—সূর্য্য অস্তগমন করিলে কেহ আর কর্ম্ম [যজ্ঞাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম] করিতে পারে না, সুতরাং আরব্ধ কর্ম্মও অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিতে বাধ্য হয়।

শ্রুতি কত প্রকারে সূর্য্যদেবের উপাসনা করিতে বলিতেছেন। আমরা সকল কথা এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। একটি কথা আমরা এই বলি যে, লোকে আলোক না থাকাকেই অন্ধকার বলে, কিন্তু শ্রুতি তাহা বলেন না। শ্রুতি বলেন—

অনন্ত-মন্যদ্রুশদস্য পাজঃ কৃষ্ণমন্যদ্ধরিতঃ সংভরন্তি। অস্য সূর্য্যস্য হরিতঃ রস-হরণশীলা রশ্ময়ঃ হরিদ্বর্ণা অশ্বা বা অনন্তম্—অবসানরহিতং কৃৎস্নস্য জগতো ব্যাপকং রুশৎ দীপ্যমানং, শ্বেতবর্ণং পাজঃ বলনামৈতৎ—বলযুক্তম্, অতিবলস্যাপি নৈশস্য তমসো নিবারণে সমর্থম্ অন্যৎ তমসো বিলক্ষণং তেজঃ সংভরন্তি অহনি স্বকীয়াগমনেন নিষ্পাদয়ন্তি। তথা কৃষ্ণং কৃষ্ণবর্ণং অন্যৎ তমঃ স্বকীয়াপগমনেন রাত্রৌঅস্য রশ্ময়োহপ্যেবং কুর্ব্বন্তি। ভাবার্থ এই—সূর্য্যের কিরণ সকল দিবসে এক প্রকার তেজ ধারণ করে, তাহা অনন্ত শুক্লবর্ণ ও অন্ধকার নিবারণে সমর্থ এবং রাত্রিতে আর এক প্রকার তেজ ধারণ করে তাহা কৃষ্ণবর্ণ। উপস্থিত সময়ে বেদবিশ্বাসী যে কোন বিজ্ঞানবিৎ সূর্য্য ও সূর্য্যরশ্মি সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করিবেন, তিনি ঋষিদিগের এই সমস্ত বাক্য যে বিজ্ঞানেরই কথা ইহা বিজ্ঞানের মত করিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে কতদূর যে উপকার হইবে তাহা বলা যায় না। গগনে উদিত সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া আমরা বরণীয় ভর্গ বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। আকাশের সূর্য্য যে ভাবে উদিত হয়েন, জ্ঞান-সূর্য্যও সেইরূপে মনুষ্যের মধ্যে প্রকাশিত হয়েন। জ্ঞান-সূর্য্যের তেজের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব তেজ যেটি সেইটিই বরণীয় ভর্গ। রজ ও তম যাহা তাহাই অন্ধকার—তাহাই কৃষ্ণতেজ। রজ ও তমের উদয়ে জ্ঞানের অপ্রকাশ; কিন্তু রজ ও তমকে অভিভূত করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব যখন উদিত হয়েন, তখনই উহা ব্রহ্মের সহিত মিলিতে পারেন। শ্রীগীতাও এই জন্য বলিতেছেন, যোগিগণ চিত্তশুদ্ধি জন্য

লয়বিক্ষেপ কাটাইয়া নিত্যসত্বস্থ থাকিতে প্রয়াস পান। নিত্যসত্বস্থ লাভের পরে গুণাতীত অবস্থা লাভ হয়। ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি। যত দেবতার নাম হিন্দুশাস্ত্রে পাওয়া যায়, সকলেই এই বরণীয় ভর্গ। ইহার উপাসনা দ্বারা পরমপদে স্থিতিলাভ হয়।

এই সমস্ত বিষয় অত্যন্ত দুজ্ঞের্য় অথচ ব্রাহ্মণদিগকে প্রত্যহ এই উপাসনা করিতে হয়। যাঁহারা এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমাদের প্রার্থনা—তাঁহারা ঋষিগণের উপাসনার ক্রমগুলি যদি সাধনার সহিত মিলাইয়া প্রদর্শন করেন তবে মৃত সমাজ আবার জীবিত হইতে পারে। উপযুক্ত লোকে এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করেন না বলিয়া, মুর্খলোকে যাহোক তাহোক করিয়া ইহা আলোচনা করে। উদ্দেশ্য মূর্খের মূর্খত্ব দেখিয়া যদি কোন জ্ঞানী সৎ উপদেশ প্রদান করেন।

কেহ কেহ উপাসনার মধ্যে এত জটিলতা আছে দেখিয়া হতাশ হইতে পারেন। আমরা বলি ঋষিগণ ইহাও জানিতেন মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়া, এবং এক মন্ত্রের পরে অন্য মন্ত্র কেন যোজনা করা হইয়াছে ইহা ধারণা করিয়া, সাধারণ লোকে ঋষিগণের উপাসনা করিতে সক্ষম হইবে না। না হইলেও হতাশ হইবার কিছুই নাই। জ্ঞানেই জীবন্মুক্তি হয় সত্য, কিন্তু জীবন্মুক্তির সাধক কয় জন? যাঁহারা জ্ঞানমার্গে যাইতে না পারেন, তাঁহারা ভক্তিমার্গে তিন বেলায় সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবেন। ভক্তিমার্গে এই সমস্ত কার্য্য করা সকলেরই আয়ত্তাধীন। কারণ যাঁহার উপাসনা করিতেছি তিনি জগজ্জননী। সন্তান শত অপরাধ করিয়াও মাতার নিকটে যাইতে পারে। মা! শত অপরাধ হইয়া গিয়াছে—মা! আর অপরাধ করিতে ইচ্ছা নাই। আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি যেমন আজ্ঞা করিয়াছ—আমি মূর্খ—তথাপি তুমি প্রসন্ন হও বলিয়া আমি ঋষিগণের পদানুসরণে কর্ম্ম করিয়া যাইব। আমার অন্য কোনই উদ্দেশ্য নাই। কোনরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা আমার নাই। শুধু তুমি আজ্ঞা করিতেছ বলিয়া—তোমার আজ্ঞা বলিয়াই আমি সন্ধ্যাবন্দনা করি। মা! তুমি প্রসন্ন হও। যাহাতে আমার শুভ হয় তুমি আমাকে সেই পথে লইয়া চল। যাহারা অজ্ঞ তাহাদের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত অন্য উপায় কি আছে? যাঁহারা মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়া উপাসনা করিতে পারেন তাঁহারা ত আনন্দের সহিত তোমার দিকে যাইতে পারেন। কিন্তু বুঝিবার চেষ্টা ত সকলকেই করিতে

হইবে—চেষ্টা করিয়াও যাহারা বুঝিতে পারে না—তাহারা শরণাপন্ন হইয়া কাতর ভাবে নিত্যকর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমে তাঁহার কৃপায় আনন্দ অনুভব করিবে এবং তাঁহারই কৃপায় তাঁহার দিকে তাঁহার দ্বারাই প্রেরিত হইবে।

মরণ ত আছেই। তবে কুক্কুর শৃগালের মত ডাকিয়া না মরিয়া যাহাতে তাঁহার আজ্ঞাপালন-প্রয়াসে মরিতে পারা যায়, সাধারণের সেই বিষয়েই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত। আমরা পরে এই উপাসনার অন্য বিষয় আলোচনা করিব। ২১১৮।২০

বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্র-নন্দন।

প্রথম দর্শনে।

দ্বিতীয় অংশ—শ্রীকৃষ্ণ।

সময়—পূর্ব্বাহ্ণ বেলা আট দণ্ড অতীত হইয়াছে।

স্থান— গোকুলের উপকণ্ঠবর্ত্তী ময়দান।

অদূরে কলনাদিনী যমুনা উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া সাগর-সম্মিলনে গমন করিতেছেন। শ্রীদাম সুদামাদি ব্রজ বালকেরা খেলা করিতেছিল, কিছুক্ষণ পরে শ্রীকৃষ্ণ সেখানে আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখখানি আজ যেন কিছু বিষাদময়; আনন্দময়ের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন আর কেহ লক্ষ্য না করিলেও, সর্ব্বদা একত্র থাকাতে সুবল কিন্তু তাঁহার প্রাণসখার এই মলিনভাব বুঝিতে পারিয়াছেন—তাই ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই কানাই! আজ তোমাকে এত বিমর্ষ দেখ্ছি কেন? এত দিন আমরা তোমার সঙ্গে গোচারণে আস্ছি, কিন্তু কৈ. কোন দিনই ত তোমাকে এত বিমর্ষ দেখি নাই? ভাই! একটু পূর্ব্বে দেখ্‌লাম তুমি যমুনার কূলে চলিয়া গেলে, তার পর সেখান হইতেই তো এখানে আসিয়াছ; এরই মধ্যে এমন কি দেখিয়াছ, যাহাতে তোমার সদা প্রফুল্ল মুখখানি এত মলিন হোলো? ভাই! তোমার একটু বিষাদ ভাব দেখে

আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। যদি কোন বাধা না থাকে, তবে তোমার পায়ে ধরি ভাই! আমাকে তোমার মনের কথা বল। আমাদ্বারা যদি তোমার কোন উপকার হয়, তবে তোমায় প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'লছি, আমার দেহে প্রাণ থাক্‌তে আমি পশ্চাৎপদ হইব না, বল ভাই! তোমার এই আকস্মিক মনোভাব পরিবর্ত্তনের কারণ কি?

সুবলের কথায় কোন উত্তর না দিয়া শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ভাই কানাইকে এইরূপ নিরুত্তর এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে দেখিয়া সুবল বড়ই ব্যথিত হইলেন। চক্ষে জল আসিল, সুবল কাঁদিতে লাগিলেন।

সুবলের চক্ষে জল দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কথা কহিলেন, যেন সুবলের সখ্যতার গভীরতা বুঝিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ চুপ করিয়াছিলেন। কহিলেন, ভাই সুবল! মনে আছে, যে দিন কালিয় দমন হইয়াছিল? সেই কালিয় সর্পের মস্তকোপরি দাঁড়াইয়া দেখিয়াছিলাম, কালীদহের তীরে শত শত ব্রজবালা একত্র হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু তন্মধ্যে স্থির সৌদামিনীর ন্যায় একজন অলোকসামান্যা ভুবনমোহিনী সুন্দরী আমার দিকে চাহিয়াছিল; আমি তাঁহার মুখপানে চাহিবা মাত্র তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় নত হইল, কিন্তু জানি না কি জন্য আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। পুনরায় আর আমি সেরূপ দেখিতে পাইলাম না; তার পর আর এক দিন যে দিন ক্রোধোন্মত্ত ইন্দ্র-কর্ত্তৃক ব্রজসহিত শিলাবৃষ্টি হইতে ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলাম, সেই দিন আবার পুনরায় সেই সুন্দর মূর্ত্তি আমার নয়নপথে পতিত হইয়াছিল। আমি বাম হস্ত ঊর্দ্ধ করিয়া পর্ব্বত ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছি,—দেখিলাম সেই মনোমোহিনী আমার পানে স্থিরনেত্রে চা'হয়া আছে; সেই অতি-সুন্দর নয়নের সুকোমল চাহনীতেও আমার হৃদয়ে কুসুম সর-সম বিদ্ধ হইল। এবারেও আমার সর্ব্বশরীরের সহিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বত পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। তার পর এ পর্য্যন্ত আর দেখিতে পাই নাই; আজ বহুদিন পরে যমুনা কুলে সেই ব্রজরমণীকে দেখিতে পাইলাম।

৬

অপরূপ দেখিনু রামা।
(যেন) কনক লতা, অবলম্বনে উয়ল
হরিণী হীন হিমধামা॥

নয়ন নলিনী দৌ, অঞ্জনে রঞ্জই,
ভাঙ বিভঙ্গি বিলাস।
চকিত চকোর, জোর বিধি বাধল,
কেবল কাজর পাশ॥
গিরিবর গুরুয়া, পয়োধর পরশিত
গীম গজমতি হারা।
কাম কম্বু ভরি, কনয়া শম্ভু পরি,
ঢারত সুরধুনী ধারা॥
পয়সি প্রয়াগে, যুগশত জপই,
সোহি পাওয়ে বহুভাগী।
বিদ্যাপতি কহ, গোকুল নায়ক
গোপীজন অনুরাগী॥

আহা কি সুন্দর! পূর্ব্বে দুইবার যাহা দেখা হইয়াছিল, সে অতি দূর হইতে স্থির সৌদামিনীর ন্যায় কেবল রূপই দেখিয়াছিলাম—আজ যমুনা-কিনারে অতি নিকটে যাহা দেখিলাম, তাহাতে দেখিলাম সেই ভুবনমোহিনীর প্রত্যেক অবয়বই বিধাতার অতুলনীয় সৃষ্টি। কিন্তু আজও আমার দেখিবার আশা মিটে নাই; আজও সেই মুখখানি দেখিয়াছি বটে, কিন্তু—

কাঞ্চন কমল, পবনে উলটায়ল,
ঐছন বদন সঞ্চারী।
সরবসলেই, পালটী পুনঃ বিঁধল,
রঙ্গিণী বঙ্ক নেহারী॥
হরি হরি কো দিল দারুণ বাধা।
নয়নক সাধ, আধ নহি পূরল,
পালটী না হেরিনু আধা॥
ঘন ঘন আঁচর, কুচ কনকাচল,
ঝাপই হাসি হাসি হেরি।
জনু মঝু মনহরি, কনয়া কুম্ভ ভরি,
রাখলহি করিয়ে চাতুরী॥
যব মন বাঁধল, ইন্দ্রিয় ফাঁফর,
তহি মিলন আন্ আন্।
কাঠক মূরতী, ঐছে মুরছায়ত,
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥

ক্রমশঃ—

পরমাত্মাই দ্রষ্টা, মায়া দৃশ্যবুদ্ধি। আমিই দ্রষ্টা মনই দৃশ্যবুদ্ধি। বলা হইতেছে দ্রষ্টাতে দৃশ্যবুদ্ধি নৈসর্গিক। কিন্তু নৈসর্গিক হইলেও—স্বাভাবিক হইলেও এই দৃশ্যবুদ্ধি অলীক। মৃগনদীতে জল যেমন অলীক, রজ্জুতে সর্প যেমন অলীক, স্বপ্নপুরীতে ভিত্তি যেমন অলীক দ্রষ্টাতে দৃশ্যবুদ্ধি সেইরূপ অলীক।

দৃশ্য সকল যে দ্রষ্টাতে এক হইয়া মিশিয়া থাকে তাহা আমি তোমাকে অচিরাৎ বুঝাইয়া দিতেছি। তুমি এখন মনের রূপ কি তাহাই দেখ।

মনসোরূপং ন কিঞ্চিদপি দৃশ্যতে। হে রাম! এই মনের কোন প্রকার রূপ দেখা যায় না। নাম মাত্রাদৃতে ব্যোম্নো যথা শূন্য জড়াকৃতেঃ। আকাশের কেবল নামটি মাত্র আছে। আকাশের কোন রূপও নাই, কোন আকারও নাই। অথচ আকাশটা নীল দেখায় এবং ইহার সর্ব্বব্যাপী একটা আকারও দেখায়। মনটা আকাশের মত। ইহারও রূপ নাই, আকারও নাই। ইহার রূপ ও আকার উভয়ই শূন্যাকার ও জড়। মনটা কি বাহিরে কি হৃদয়ে কোথাও বস্তুরূপে বিদ্যমান নহে। ন বাহ্যে নাপি হৃদয়ে সদ্রূপং বিদ্যতে মনঃ। কোথাও নাই অথচ এই মন আকাশের মত সর্ব্বত্র অবস্থিত।

ইদমস্মাৎ সমুৎপন্নং মৃগতৃষ্ণাম্বু সন্নিভম্। ইদং জগৎ অস্মাৎ মনসঃ—এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ এই আকাশ সদৃশ মন হইতে সমুৎপন্ন। মরুমরীচিকাতে যেমন জল দেখা যায় সেইরূপ মন হইতে এই জগৎ। তবেই দেখ একত মনটাই কোন বস্তু নহে—মৃগতৃষ্ণিকার মত এই অবস্তু হইতে যে জগৎটা জন্মিতেছে সেটা তবে কিরূপ? দ্বিচন্দ্র ভ্রমের মত ক্ষণসঙ্কল্প হইতেই ইহার একটা রূপ যেন দেখা যায়। আকাশের নীলবর্ণটা যেমন ভ্রম, মনের রূপও সেইরূপ ভ্রম মাত্র। বলিতেছি মনের যেটা রূপ দেখা যায় সেটা ভ্রম মাত্র। ভ্রমজ্ঞানই মনের আকার।

যদ্যপি মনোনামপরমার্থতো নাস্ত্যেব তথাপি শাস্ত্রীয় ব্যবহারোপযুক্তং কল্পিতং তৎস্বরূপম্। পরমার্থতঃ মনের রূপ কোন কিছু নাই কিন্তু ব্যবহারের উপযুক্ত একটা কল্পিত রূপ আছে। প্রকৃত পক্ষে মায়া সম্বন্ধে যাহা বলা যায় মন সম্বন্ধে তাহাই বলা হয়। মনের যথার্থ কোন রূপ আছে তাহাও বলা যায় না, কোন রূপ নাই তাহাও বলা যায় না। আছেও বলা যায় না, নাইও বলা যায় না কিন্তু একটা কল্পিত রূপ আছে।

মনের আকার কি?

পূর্ব্বেও মনের আকার ছিল না, পরেও মনের আকার থাকে না কিন্তু মধ্যে

যে বস্তুবিষয়ক বা অবস্তুবিষয়ক জ্ঞান তাহাই মনের আকার। অন্তরে বাহিরে বস্তুর আকারে যাহা প্রকাশ পায় তাহাই মন। ইহা ভিন্ন মনের অন্য আকার নাই।

ঐ যে বলা হইল "রূপন্তু ক্ষণসঙ্কল্লাৎ" ক্ষণসঙ্কল্প হইতেই ইহার একটা রূপ ভ্রমে দেখা যায় এই "সঙ্কল্পনং মনোবিদ্ধিসঙ্কল্পাত্তন্ন ভিদ্যতে"—স্পন্দনাত্মিকা সঙ্কল্পশক্তিটাই মন। বায়ু ও স্পন্দতা যেমন ভিন্ন নয়, জল ও দ্রবত্ব যেমন ভিন্ন নয়, মন ও সঙ্কল্প সেইরূপ ভিন্ন নয়। শক্তিমান্ ও শক্তি অভিন্ন সত্য কিন্তু শক্তিটি স্পন্দনাত্মিকা আর শক্তিমান্ যিনি তিনি চলন শূন্য। স্পন্দনাত্মিকা সঙ্কল্প শক্তি যখন চলন রহিত শক্তিমান্‌কে স্পর্শ করেন, শক্তি যখন শিবকে স্পর্শ করেন, তখন স্পন্দন বলিয়া কোন কিছু থাকে না একমাত্র পরমশান্ত আপনি আপনি ভাব মাত্র থাকে। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয় মহাপ্রলয়ে দ্বিতীয় কিছুই থাকে না একমাত্র পরমশান্ত আপনি আপনি ব্রহ্মই থাকেন। প্রকৃত পক্ষে তিনিই আছেন—শক্তি বা স্পন্দন যাহা তাহা মায়া মাত্র, তাহা অলীক।

মন তবে কি ?

সত্যমস্ত্বথবাসত্যং পদার্থ প্রতিভাসনম্।
তাবন্মাত্রং মনোবিদ্ধি তদ্‌ব্রহ্মৈব পিতামহঃ॥
আতিবাহিক দেহাত্মা মন ইত্যভিধীয়তে॥

পদার্থ যাহা দেখা যায় তাহা সত্যই হউক বা অসত্যই হউক কিন্তু পদার্থকারে প্রকাশ হওয়াই মন! এই মনই লোক পিতামহ ব্রহ্মা! আত্মা আতিবাহিক দেহ ধারণ করিলে যাহা হয় তাহাই মন, তাহাই ব্রহ্মা। আতিবাহিকটা কল্পনাময়। আতিবাহিক দেহধারী মনোব্রহ্মাই সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি সত্যসঙ্কল্প পুরুষ। ইনি যাহা সঙ্কল্প করেন তাহাই কালে স্থূল দেহ ধারণ করে। সঙ্কল্প প্রথমে সূক্ষ্মপ্রপঞ্চরূপে ভাসে। সূক্ষ্ম ভূত সকল দীর্ঘকাল একসঙ্গে থাকার পর পঞ্চীকৃত হয় তাহাই স্থূল আকার। সূক্ষ্মপ্রপঞ্চাত্মক মনই স্থূল প্রপঞ্চের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাই বলা হইল ব্রহ্ম আধিভৌতিকী বুদ্ধি বিধান করিলে—স্থূলদেহের উপর অভিমান করিলে স্থূল দৃশ্য প্রপঞ্চ সৃষ্ট হয়। অবিদ্যা, সংসার, চিত্ত মন, বন্ধন, মল, তমঃ এইগুলি দৃশ্যপ্রপঞ্চেরই পর্য্যায়।

উপরের বাক্যগুলি বিশেষরূপে আলোচনা কর, করিয়া নিশ্চয় কর, শশশৃঙ্গ যেরূপ একটি নাম মাত্র—যেমন ইহার রূপ কেহ কখন দেখে নাই—সেইরূপ

মন একটি নামমাত্র ইহার রূপ কেহ দেখে নাই। মনেরই যখন রূপ নাই তখন প্রকৃত কথা এই যে দৃশ্যও বাস্তবিক উৎপন্ন হয় নাই। রজ্জুই আছে সর্পটা ভ্রমজ্ঞানে ইন্দ্রজাল মত ভাসে মাত্র। দ্রষ্টাতে অর্থাৎ তুল্লক্ষ্য পরমাত্মায় দৃশ্য বুদ্ধি অলীক হইলেও ইহা নৈসর্গিক।

পূর্ব্বে বলিয়াছি অলীক দৃশ্য সকল দ্রষ্টাতে অভিন্ন ভাবে কিরূপে ভাসে তাহা তোমাকে বুঝাইব। দৃশ্য দেখে চিত্ত। চিত্ত যে জগৎ দেখে ইহাই চিত্তেরই মলিনতা। এই মল চিত্ত হইতে দূর করিতে পারিলেই আর দৃশ্য দর্শন হইবে না। চিত্ত তখন দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ হইবে।

দৃশ্য দর্শনের অভাব হইলেই দ্রষ্টা আপনি আপনি ভাবে কৈবল্য অবস্থায় স্থিতি লাভ করিবেন।

দ্রষ্টার অদ্রষ্টা হওয়াকেই তুমি কৈবল্য বলিয়া জানিবে।

রাম—দ্রষ্টা কিরূপে অদ্রষ্টা হইবেন ?

বশিষ্ঠ—বায়ুর স্পন্দন স্থগিত হইলে বনলতাদি যেমন নিষ্কম্প হয় সেইরূপ চিত্ত স্পন্দন অপগত হইলে আত্মা কেবল হইলেন।

রাম—চিত্ত স্পন্দন অপগত হইবে কিরূপে ?

বশিষ্ঠ—চিত্ত বহু বিষয়ে স্পন্দিত হইতেছে প্রথমে ইহাকে এক বিষয়ে স্পন্দিত কর। একাগ্রতা লাভ করিয়া যখন চিত্ত আত্মাতে একাগ্র হইবে তখনই চিত্তনিরুদ্ধ হইবে। চিত্ত নিরুদ্ধ হইলেই—চিত্ত নিরোধ অবস্থা লাভ করিলেই চিত্ত নাশ হইল। তখনই আত্মপ্রকাশ হইবে।

অসম্ভবতি সর্ব্বস্মিন্ দিগ্‌ভূম্যাকাশরূপিনী
প্রকাশে যাদৃশং রূপং প্রকাশস্যামলং ভবেৎ ॥

চৈতন্যময় জ্ঞানটি হইতেছে প্রকাশ। আর দিক্‌ভূমি আকাশ ইত্যাদি জ্ঞেয় বস্তুগুলি প্রকাশ্য। যে প্রকাশে প্রকাশ্য প্রকাশ পাইতেছে সেই প্রকাশ প্রকাশ্য হীন হইলে আত্মপ্রকাশ হইবে।

ত্রিজগত্ত্বমহঞ্চেতি দৃশ্যেঽসত্তামুপাগতে।
দ্রষ্টুঃ স্যাৎ কৈবলীভাবস্তাদৃশোবিমলাত্মনঃ ॥

যখন ত্রিজগৎ তুমি আমি প্রভৃতি দৃশ্য অসৎ বলিয়া বোধ হইবে, তখনই দ্রষ্টার কেবল ভাব হইবে। ইহারই নাম আত্মার আপনি আপনি ভাবে

থাকা। দর্পণে বাহিরের বস্তুর ছায়া না পড়িলে দর্পণ যেমন কেবল হয়, সেইরূপ দ্রষ্টায় তুমি আমি জগৎ ইত্যাদি ভাব না জাগিলেই দ্রষ্টার দৃশ্যদর্শন উন্মার্জ্জিত হইল।

রাম—দ্রষ্টাতে তুমি আমি জগৎ ভাব জাগিবে না কিরূপে?

বশিষ্ঠ—চিত্তকে কোন এক বিষয়ে স্পন্দিত করিয়া দেখ। যখন দেখিবে চিত্ত এক বিষয়েই একাগ্র হইয়াছে তখন উহাতেই তন্ময় হইয়া যাইবে। তখন তুমি আমি জগৎ ভাব কি থাকে? একাগ্র হইতে পারিলেই সব হারাইয়া নিরোধ অবস্থা পাইবে। জপে একাগ্র হও, পরে ধ্যানে পরে আত্মবিচারে সব হইবে। আত্মবিচারেই দৃশ্যদর্শন পূর্ণমাত্রায় দূর হইবে।

রাম—দৃশ্যদর্শন যে নাই তাহা জানিলেই যখন কেবল অবস্থায় থাকা যায়, তখন সেইটিই ভাল করিয়া বুঝিব।

বশিষ্ঠ—বল।

রাম—যাহা সৎ তাহা চিরদিনই থাকিবে, কখন নষ্ট হইবে না। যাহা অসৎ তাহা কখনও উৎপন্নও হয় নাই। ব্রহ্মই সৎ, অন্য সমস্ত অসৎ। দৃশ্যবস্তু যাহা তাহা অসৎ বলিতেছেন। অসৎ দৃশ্যই অশেষ-দোষ-প্রদায়ী। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, দৃশ্য বিশ্ব চারিদিকে ছড়াইয়া আছে—কিরূপে ইহাকে নাই বলিব?

বশিষ্ঠ—যদস্তি তস্য নাশোঽস্তি ন কদাচন রাঘব!

হে রাঘব! যাহা আছে তাহার নাশ কখনও হয় না। ব্রহ্মই আছেন—তাঁহার নাশ কিছুইতেই হয় না। অন্য কিছুই নাই। কিন্তু যাঁহারা বলেন যাহা কিছু জগতে আছে তাহার আত্যন্তিক নাশও কখন হয় না—এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে বস্তু সকল পরিবর্ত্তিত হয় মাত্র তাঁহাদের মতে দৃশ্যবস্তু অদৃশ্য হইলেও ঐ বস্তুর বীজ বা সংস্কার বুদ্ধিতে থাকে। ইঁহারাই বলেন, মহাপ্রলয়ে সকল বস্তুর বীজ প্রকৃতিতে থাকিয়া যায়। ঐ বীজ আবার চিদাকাশে সমস্ত দৃশ্য প্রকাশ করে। এই মত যদি ঠিক হয়, তবে মোক্ষ অসম্ভব। অথচ অনেক জীবন্মুক্ত দেবতা ঋষি আছেন। তবেই দেখ জগৎ যদি থাকিত, তবে কখন কাহারও মোক্ষ হইত না।

রজ্জুর উপরে যখন সর্প ভাসে, তখন সর্প আছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বাস্তবিক সর্প নাই। সেইরূপ ব্যবহার-দশায় একটা জগৎ দেখা যাইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক ইহা নাই; ব্রহ্মই আছেন। ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ বলিয়া একটা কিছু নাই।

ভ।

অর্জ্জুন—কাম রাগ বিবর্জ্জিত বল কি ?—ভাল করিয়া বল।

ভগবান্—কাম বলে তৃষ্ণাকে। যাহাকে নিকটে পাইতেছি না তাহার বিষয়ে যে তৃষ্ণা, তাহাকে বলে কাম। যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে যে আসক্তি, তাহাকে বলে রাগ বা অনুরাগ। যাহার অপ্রাপ্ত বিষয় পাইবার জন্য চিত্তলালসা নাই এবং যাহা পাইয়াছি তাহা রাখিবার জন্যও কোন চেষ্টা নাই—এইরূপ কাম রাগাদিশূন্য উৎসাহী পুরুষের যে সাত্ত্বিক বল,—যে পবিত্র সাত্ত্বিক বলে মানুষ কেবল শ্রীভগবান্‌কে পাইবার জন্য দেহাদি রক্ষা করিয়া যায়—সেই বলই আমার সত্ত্বা।

অর্জ্জুন—ধর্ম্ম অবিরুদ্ধ কামও তুমি কিরূপে ?

ভগবান্—শাস্ত্রবিধান মত ধর্ম্মানুকূলে জায়া, পুত্র, বিত্তাদি বিষয়ে যে অভিলাষ, তাহাও আমি। অতিথি সেবা, ঋতুকালে স্ত্রীসেবা, পুত্রকে সাধু, ধার্ম্মিক করিবার জন্য যে অভিলাষ—সেই কামও আমি। জীবের যে কাম ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত, তাহা আমিই। ধর্ম্মসঙ্গত অর্থ ও কাম আমিই। চতুর্ব্বর্গ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এইজন্য প্রার্থনার বিষয়।

শ্রীভগবানের সেবা জন্য যাহা অভিলাষ করা যায়, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। এই নিষ্কাম কামনাকেও আমার সত্ত্বা বলিতেছি।

অর্জ্জুন। তুমি স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া যাও—ত্রিভুবনে সর্ব্বত্রই আমি আছি। ত্রিভুবনরূপী আমি তোমাকে রক্ষা করিব। এইরূপে স্ত্রীজাতি সতীত্বরূপ স্বধর্ম্ম রক্ষা করুক ; ত্রিভুবন তাহাদের রক্ষা জন্য ॥ ১১ ॥

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

ম　　নী　　যা
সাত্ত্বিকাঃ শমদমাদয়ঃ ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাদয়ঃ সত্ত্বপ্রধানা

ম　　যা　　যা
যে চ এব ভাবাঃ চিত্তপরিণামাঃ সন্তি রাজসাঃ রজোগুণপ্রধানা যে চ

শ্রী　　নী　　যা　　যা
ভাবা হর্ষদর্পাদয়ঃ লোভপ্রবৃত্ত্যাদয়ঃ সন্তি তামসাঃ তমোগুণপ্রধানা

ম　　শ্রী　　নী　　যা　　শ্রী　　শ্রী
যে চ শোকমোহাদয়ঃ নিদ্রালস্যাদয় সন্তি অথবা প্রাণিনাং স্বকর্ম্মবশাৎ

শ্রী　　শ্রী　　শ্রী
জায়ন্তে তান্ সর্ব্বান্ মত্তঃএব জাতান্ ইতিবিদ্ধি মদীয় প্রকৃতি গুণত্রয়-

যা　　যা
কার্য্যসকাশাদেব জাতান্ জানীহি রূপরসতন্মাত্রাদিরূপাৎ সূত্রাত্মো

নী নী

নির্গতা ইতি বিদ্ধি। নম্বেবং তব সর্ব্ব-জগদাত্মনো বিকারিত্বাপত্ত্যা

নী শ

কৌটস্থ্যহানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ ন ত্বহং তেষু তে ময়াতি। যদ্যপি তে মত্তো

শ বি শ ম শ

জায়ন্তে তথাপি অহং তেষু তু ন বর্ত্তে তদধীনস্তদ্বশো ন ভবামি যথা

শ মা শ বি বি

সংসারিণঃ তে তু ভাবাঃ ময়ি মদ্বশামদধীনাঃ সন্ত এব বর্ত্তন্তে ॥ ১২ ॥

সত্ত্বগুণ প্রধান যে সমস্ত ভাব (ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, শম দমাদি), রজোগুণ প্রধান যে সমস্ত ভাব (লোভ, প্রবৃত্তি, হর্ষ দর্পাদি) এবং তমোগুণ প্রধান যে সমস্ত ভাব (নিদ্রা, আলস্য, শোক, মোহাদি) সে সমস্ত আমা হইতেই জাত জানিও। (সর্ব্বজগতের আত্মা আমি তবে কি বিকারী ? ইহাতে কি আমার কূটস্থ স্বরূপের হানি হয় ? যদি এই আশঙ্কা কর, তাহার উত্তরে বলি) (যদ্যপি সত্ত্বরজস্তম ভাবাদি আমা হইতে জাত তথাপি) আমি কিন্তু সে সকলে নাই, সেই সকল ভাবই আমাতে রহিয়াছে ॥ ১২ ॥

অর্জ্জুন—রস, শব্দ, গন্ধ, রূপ, তেজ ইত্যাদি যাহা বস্তু তোমা হইতে, আবার মানুষের আন্তরিক শক্তিও তোমার অধীন। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজ, ধার্ম্মিকের ধর্ম্মবল এবং মানুষের ধর্ম্মসঙ্গত কাম—ইহাদেরও নিয়ন্তা তুমি। আবার বলিতেছ—সত্ত্বপ্রধান, রজপ্রধান ও তমপ্রধান ভাবসকল তাহাও তোমা হইতে জাত। আরও বলিতেছ—জীব, সাত্ত্বিকাদিভাবের বশীভূত হইয়া পড়ে, তুমি কিন্তু তাহাদের বশে নও। সত্ত্বরজস্তমাদি ভাব ত প্রকৃতি হইতে জাত—তোমা হইতে জাত কিরূপে ? এই সমস্ত বিকারী বস্তু তোমা হইতে জন্মিতেছে, তবু তুমি বিকারী নও কিরূপে ?

ভগবান্—যত কিছু ভাব—ধর্ম্মজ্ঞান, বৈরাগ্য, শম দমাদি সাত্ত্বিক ভাব ; হর্ষ, দর্প, লোভ, প্রবৃত্তি ইত্যাদি রাজসভাব ; এবং নিদ্রা, আলস্য, শোক, মোহাদি, তামস ভাব—মানুষের স্ব স্ব কর্ম্মবশেই জন্মে। আবার কর্ম্ম যাহা কিছু তাহা প্রকৃতির গুণত্রয়েরই কর্ম্ম। প্রকৃতি আমারই শক্তি। আমারই মনোময়ী স্পন্দশক্তি। তবেই ত হইল সমস্ত ভাব আমা হইতেই জাত অর্থাৎ আমার শক্তি হইতে জাত। প্রকৃতিকে আশ্রয় করিবা মাত্র আমাতে যখন "আমি ভাব" ও তাহার কার্য্য হয়, তাহা যেন অখণ্ড চৈতন্যের খণ্ডিত অবস্থা। ইহাই জীব

ভাব। জীবভাবই পরা প্রকৃতি বা জীবাত্মক প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি হইতেছে জড়াত্মক ভাব। এই জীবাত্মক ও জড়াত্মক ভাব হইতেই স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

পরমাত্মার শক্তি হইতে নানাবিধ সৃষ্টিবিকার হইলেও পরমাত্মা কিন্তু অবিকৃত। রজ্জুতে সর্প অধ্যাস হইলেও রজ্জু, কখন সর্পত্ব বিকার দোষ দূষিত হয় না। যতই কেননা সঙ্কল্প উঠাও, তাহাতে তোমার বিকার কিছুই হয় না। পরমাত্মা স্বস্বরূপে সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিয়া এই মায়িক খেলা করিতেছেন ॥ ১২ ॥

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ ॥
মোহিতং নাভি জানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥১৩॥

গুণময়ৈঃ সত্ত্বাদিগুণপ্রচুরৈঃ এভিঃ পূর্ব্বোক্তৈঃ ত্রিভির্ভাবৈঃ ত্রিবিধৈঃ পদার্থৈঃ ইদং সর্ব্বং জগৎ চরাচরং প্রাণিজাতং মোহিতং অবিবেকতামাপাদিতং। এভ্যঃ সাত্ত্বিকরাজসতামসেভ্যো-ভাবেভ্যঃ পরং ব্যতিরিক্তং বিলক্ষণং এতেষাং নিয়ন্তারং অব্যয়ং অপ্রচ্যুতস্বভাবং সদৈকরূপং পরত্বে হেতুঃ অব্যয়ং, এতে ভাবাঃ পরিণামিত্বাৎ ব্যয়বন্তঃ। অহন্তু তদ্বিপরীতঃ সাক্ষী ইত্যব্যয়ঃ। মাং কৃষ্ণং নাভিজানাতি জ্ঞাতুং ন শক্নোতি। যথা রাজং সর্পভ্রমেণ ব্যাকুলঃ সর্পাৎ পরাং রজ্জুং ন জানাতি তদ্বৎ। ততশ্চ স্বরূপাপরিচয়াৎ সংসরতীবেত্যহো দৌর্ভাগ্যমবিবেকি জনস্যেত্যনুক্রোশং দর্শয়তি ভগবান্ ॥ ১৩ ॥

গুণময় পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ পদার্থ দ্বারা এই চরাচর প্রাণিজাত মোহিত হইয়া রহিয়াছে। এতাবতের অতিরিক্ত অব্যয় (ব্যয়শূন্য, সদা একরূপ) আমাকে উহারা জানে না ॥ ১৩ ॥

অর্জ্জুন—সকলের মধ্যেই তুমি আছ—মণিমালার মধ্যে যেমন সূত্র, তুমিও সেইরূপ সূত্রাত্মারূপে রূপরসাদি তান্মাত্রা মধ্যে বিরাজিত। তথাপি তোমাকে লোকে জানেনা কেন?

ভগবান্—সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক এই ত্রিবিধভাবে সমস্ত প্রাণিজাত মোহিত। মোহগ্রস্তের বিচার থাকে না। অবিবেকী জীব যত্ন করিয়া বিচার অভ্যাস করেনা বলিয়া, এই ত্রিগুণময়ী মায়ায় মোহিত হয়। তিন গুণে অতিশয় আসক্তি করিয়া ফেলে বলিয়া, সকলে উহা দ্বারাই উন্মত্ত। মত্ত জনের ভ্রম ত হইবেই। রজ্জুতে সর্পভ্রম যাহার জন্মিয়াছে সে যখন ভয়ে ব্যাকুল হয়, তখন তাহার বিচার থাকে না। ভয়ে অভিভূত হইলে যেমন বিচার থাকে না, সেইরূপ আবার আহ্লাদে বেহুঁস হইলেও বিচার থাকে না। লোকে আমার অঙ্গভূষা স্বরূপ বাহিরের এই প্রকৃতি দেখিয়াই মুগ্ধ হয়—সম্মুখেই প্রকৃতি হাব ভাব দ্বারা জীবকে মোহিত করে, কিন্তু যাহার অঙ্গে এই প্রকৃতিরূপ অলঙ্কার—সেই অলঙ্কার না দেখিয়া, যে অলঙ্কার পরিয়াছে তাহাকে যখন জীব দেখে, তখনই জীবের সদ্গতি হয়।

অর্জ্জুন—মোহ যাহাতে না আইসে তজ্জন্য কি করিতে হয়?

ভগবান্—ভিতরে আমি। কোটি সূর্য্য প্রতিকাশ, চন্দ্র কোটি সুশীতল—অনন্ত প্রভাময় সূর্য্য সদৃশ আমি—মনে কর আমি তোমার ভিতরে ঢুকিলাম। তুমি বাহিরে চাহিয়া আছ, কিন্তু ভিতরে আমাকে ভাবনা-চক্ষে দেখিতেছ—এখন দেখ দেখি! বাহিরে প্রকৃতির দিকে চাহিয়া থাকিয়াও তুমি প্রকৃতিকে দেখিতেছ না—আমাকেই দেখিতেছ। এখুনি করিয়া দেখ, ক্ষণকালের জন্য হইলেও বুঝিবে ধ্যানযোগ কি? এই ক্ষণটিকে সাধনা দ্বারা স্থায়ী কর—করিলেই আর কখন মায়া দ্বারা অভিভূত হইবে না ॥ ১৩ ॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥১৪॥

ব ম ম
মম অতিবিচিত্রানন্তবিশ্বস্রষ্টুঃ মায়াবিনঃ পরমেশ্বরস্য এষা
শ ব
যথোক্তা গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণত্রয়াত্মিকা। শ্লেষেণ ত্রিগুণিতা
ব নী
রজ্জুরিবাতিদৃঢ়তয়া জীবানাং বন্ধহেতুঃ মায়া মামহং ন জানামীতি
শ নী
সাক্ষিপ্রত্যক্ষত্বেনাপলাপানর্হা অনৃতস্য প্রপঞ্চস্যেন্দ্রজালাদেরিব
নী স শ
প্রকাশিকা যদ্বা মম মায়াবিনঃ পরমেশ্বরস্য সর্ব্বজগৎকারণস্য

উৎসব।



স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৮ম বর্ষ।] ১৩২০ সাল, ভাদ্র ও আশ্বিন। [৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শাস্ত্রীয় শরণাপত্তি।

ভক্তিপথের সাধনা সকল প্রকার সাধনা অপেক্ষা নিরুপদ্রব। শ্রুতিও ইহা বলেন। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, যোগ, জ্ঞান, যাহাই কেননা অবলম্বন কর, মূলে যদি ভক্তি না থাকে তবে কোন সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে না।

শরণাগতি বা শরণাপত্তিটি হইল ভক্তিপথের মূলে। এই শরণাগতির কথা বহুপ্রকারে বলা হইয়াছে। এখন আরএকবার শাস্ত্র এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাই দেখান যাইবে।

শ্রীগীতার ১৮ অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় যে শরণাপত্তির কথা লেখা হইয়াছে তাহাই এখানে প্রবন্ধাকারে দেওয়া গেল।

যে যাহার শরণাপন্ন হয় সে বিক্রীত পশুর ন্যায় শরণদাতার অধীন। শরণদাতা তাহাকে যাহা করান সে তাহাই করে, যেখানে রাখেন সেইখানেই থাকে, যাহা খাওয়ান তাহাই খায়—ইহাই শরণাপত্তি-লক্ষণ ধর্ম্মের তত্ত্ব। বায়ু পুরাণ ছয় প্রকার শরণাপত্তির কথা বলিতেছেন—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পং প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনং।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা॥
নিক্ষেপণমকার্পণ্যং ষড়্বিধা শরণাগতি॥

(১) অনুকূল বিষয়ের সঙ্কল্প—"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পম্"।

(২) প্রতিকূল বিষয়ের বর্জ্জন "প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্"।

(৩) রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাস "রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ।

(৪) রক্ষকত্বে বরণ "গোপ্তৃত্বে বরণং তথা"।

(৫) আত্মনিক্ষেপ "নিক্ষেপণম্"।

(৬) অকার্পণ্য "অন্য কাহারও নিকট দৈনভাব প্রকাশ না করা।

(১) অভীষ্ট দেবতার প্রতি যাহাতে রুচি বর্দ্ধিত হয় সেইরূপ সঙ্কল্প করার নাম অনুকূল বিষয়ের সঙ্কল্প। ইষ্টদেবতার সম্বন্ধে লীলা গ্রন্থ পাঠ, ইষ্টদেবতার ভক্ত যাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গ—ইহার দৃষ্টান্ত।

(২) ইষ্টদেবতার ভক্ত যাহারা নহে কিন্তু বিদ্বেষী তাহাদের সঙ্গত্যাগ। যেখানে ও যে লোক দ্বারা তাঁহার প্রতিবাদ হয়, সে স্থান ও সে লোক বর্জ্জন।

(৩) আমার ইষ্টদেবতা ও তাঁহার নাম আমাকে রক্ষা করিবেন এই বিষয়ে প্রবল বিশ্বাস।

(৪) প্রতিদিনের কার্য্যে, প্রতিদিনের প্রার্থনায় তাঁহাকে রক্ষকত্বে বরণ করা।

(৫) প্রতিদিনের সন্ধ্যাপূজা অন্তে অথবা তৎপূর্ব্বে নিজের সূক্ষ্মদেহ মন ও তদ্ভাবনাদি শ্রীমৎ ইষ্টদেবে অর্পণ। নিজের খণ্ডভাবকেও সেই অখণ্ডে অর্পণ করিয়া তাঁহার মত নিঃসঙ্গভাবে স্থিতিতে অভ্যাস। ইহা আত্মনিক্ষেপ।

(৬) কোন মানুষের নিকট দৈন্যভাব জ্ঞাপন না করা অর্থাৎ আমি তোমার শরণাগত—আমার শারীরিক বা মানসিক দুঃখের কথা আর কাহাকে জানাইব? তুমিই ত আমার রক্ষাকর্ত্তা। তুমিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমায় রক্ষা কর, অথবা যিনি রক্ষা করেন তিনি তুমিই, অন্যে নহে। ইহার নাম অকার্পণ্য।

এই ভাবে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারিলে, কোন প্রকার ধর্ম্মাধর্ম্মের

ভাবনা সাধকের থাকে না। সাধক শ্রীভগবানের উপরে এতই নির্ভর করে যে, প্রারব্ধবশে যে কর্ম্মই তাহাকে করিতে হউক না কেন, তাহার অন্তর সর্ব্বদা দয়াময়ের চরণ চিন্তা করে বলিয়া কর্ম্মে বা কর্ম্মফলে তাহার কিছুই লক্ষ্য থাকে না। একমাত্র শ্রীভগবানে লক্ষ্য থাকে বলিয়া সে ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন প্রকার বন্ধনে পড়ে না। শ্রীভগবান্ সেই জন্য এইরূপ শরণাগত সাধককে বলেন—

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

এইরূপ সাধকের যদি কখন মনে হয়—আমি যে বিহিত কর্ম্ম করিতে পারিলাম না অথবা আমা দ্বারা যে অবিহিত কর্ম্ম করা হইয়া গেল—ইহাতে বুঝি কতই পাপ হইল—যদি তাঁহার এরূপ কখন মনে হয়, তন্নিবারণ জন্য শ্রীভগবান্ বলেন তুমি শোক করিও না—আমি তোমাকে ধর্ম্মাধর্ম্ম করার যে বন্ধন—শুধু অবিহিত কর্ম্ম করার বন্ধনটি মাত্র নহে—কিন্তু বিহিত কর্ম্ম করার পুণ্যবন্ধন হইতেও মুক্ত করিয়া দিব। তুমি শারীরিক, বাচিক, মানসিক সকল কর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছ বলিয়া তিনি তোমার মধ্যে তাঁহার আত্মভাব প্রকাশ করিয়া দিয়া থাকেন। সাধক তখন তাঁহার মত সর্ব্বদা আপনি আপনি ভাবে থাকিয়াও সকল কর্ম্ম করিয়া তাঁহার প্রসাদে পরমপদ লাভ করে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে বায়ুপুরাণোক্ত শরণাগতি যিনি অভ্যাস করেন, তিনি কিরূপে জ্ঞানলাভ করেন?

শরণাপন্নের জ্ঞান ক্রম অনুসারেই হয়। এই ক্রমের তিনটি অবস্থা। (১) আমি তোমার, (২) তুমি আমার, (৩) তুমিই আমি।

(১) আমি তোমার অবস্থা। শরণাগত বিভীষণকে যখন প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণ, পরম শত্রু রাবণের ভ্রাতা বলিয়া বিনাশ করাই উচিত স্থির করিয়াছিলেন, তখন শ্রীভগবান্ বলিলেন—

সকৃদপি প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতৎ ব্রতং মম॥

রামায়ণ যুদ্ধকাণ্ড।

ভাবার্থ এই—যে সাধক "আমি তোমার" বলিয়া একবারও আমার শরণাগত হয়, হইয়া আমার নিকট অভয় যাচ্ঞা করে, সে যদি নীচ হইতেও নীচ হয়,

তথাপি আমি তাহাকে অভয় প্রদান করি—এই আমার ব্রত, এই আমার প্রতিজ্ঞা।

এখন প্রথম প্রকার শরণাপত্তির সাধনার কথা শ্রবণ কর। সংসার-নিষ্পেষিত সাধক কাতর প্রাণে আমার নিকট প্রার্থনা করেন:—

হে আমার দেবতা—আমি আর কার হইব? আমি তোমার হইলাম। আমি কত লোকের হইতে গিয়াছিলাম—কখন সংসারের হইয়াছিলাম, কখন স্ত্রীর হইয়াছিলাম, কখন পুত্রকন্যার হইয়াছিলাম, কখন বন্ধুবান্ধবের হইয়াছিলাম,—যেখানে যাহার কথা শুনিয়াছিলাম তাহাকেই ভালবাসিতে ছুটিয়াছিলাম, কিন্তু আমাকে অভয় দিতে কেহ পারিল না! তুমি ভিন্ন অভয়দাতা কে? তুমি ভিন্ন মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে কে পার করিতে পারে? তুমি ভিন্ন প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে আর কে পারে? হে ভগবান্! হে আমার প্রভু! আমি তোমার হইলাম। তোমার আমি—আমি আর কাহারও নই। আমি কাম ক্রোধের আর হইতে চাই না, আমি লোভ মোহের আর হইতে চাই না, রূপ রসের আর হইতে চাই না, আমি কোন প্রকার ভোগের আর হইতে চাই না। আমি তোমার। প্রারব্ধবশে আমায় যাহাই কেন করিতে হউক, "আমি যে তোমার" ইহা আর ভুলিব না। যাহা হয় সব সহ্য করিয়া যাইব। আমার একমাত্র থাকিবে তুমি। কর্ম্মস্রোতে যেখানেই ভাসিয়া যাই না কেন, বলিব সবই ত তুমি জানিতেছ—আমার যাতনা দূর করিয়া আমাকে তোমার করিয়া লইবার জন্যই তুমি আমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ভোগ করাইয়া দিতেছ। পূর্ব্ব কর্ম্মফলে আমার যাহাই কেন আসুক না, আমি অতিশয় যাতনা পাইলেও ইহা তোমার স্নেহ মনে করিতে চেষ্টা করিব। অপরাধের বিস্ফোটক অস্ত্র করিয়াদিতেছ মনে করিয়া যথাসম্ভব ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিব। তুমি আমায় নির্ম্মল করিয়া তোমার ক্রোড়ে তুলিয়া লইবার উপযুক্ত করিয়া লইতেছ ভাবিয়া কিছুতেই হতাশ হইব না। সব সহ্য করিয়া বলিব "আমি যে তোমার"।

এই সাধনা যে অত্যন্ত সহজ তাহা ভাবিও না। ইহা অপেক্ষা আর নিরুপদ্রব পথ নাই বটে কিন্তু ইহাতেও অটল বিশ্বাস চাই, বিলক্ষণ ধৈর্য্য চাই। শরীর দ্বারা, মন দ্বারা, বাক্য দ্বারা যে কর্ম্মই করা হউক না কেন, সকল কর্ম্মের আদিতে—সকল লৌকিক বা বৈদিক কর্ম্মের প্রথমেই বলিতে অভ্যাস কর

"আমি তোমার"। তুমি আমায় রক্ষা কর—আমি তোমার শরণাগত। আমি তোমার আজ্ঞামত তিন বেলায় নিয়ম করিয়া সন্ধ্যাপুজা, জপ, স্থিতি ইত্যাদির জন্য প্রাণপণ করি। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমার করিয়া লও। সাধক এই অবস্থায় শ্রীভগবানের উপর জোর করে না। শ্রীভগবানের সহিত এক হইতেও চায় না। সাধক "আমি তোমার" এই সাধনা অভ্যাস করিতে করিতে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করে—

অবিনয়মপনয়বিষ্ণো দময় মনঃ শময় বিষয়মৃগতৃষ্ণাম্।
ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসারসাগরতঃ॥

হে বিষ্ণু! আমার অবিনয় দূর কর। মন দমন কর। বিষয়তৃষ্ণা শান্তি কর। আমি যেন সর্ব্বভূতে দয়া বিস্তার করিতে পারি। হে প্রভু! আমাকে সংসার-সাগর হইতে ত্রাণ কর। প্রবন্ধের বাকী শ্রীগীতা তৃতীয় খণ্ড ৪১২।৪।

ডাকা।

যদি জানিতাম মনে নারায়ণে,
কভু কি তাঁরে ভুলিতাম।
ভুলিয়া তাঁহারে, এই হাহাকারে,
কভু কি তবে মজিতাম!।
সর্ব্বকালে সখা, না দিলেও দেখা,
ফের পাছে পাছে বুঝা যায়।
যে যাহা করুক, ডুবিয়া মরুক,
ডাকিলেই সদা ডাকা যায়॥
মহাপাপী-জনে, ডাকিবে কেমনে,
এটা মাত্র মনের ছলনা।
মরি ত মরিব, তবু ডেকে যাব,
এই জোর ক'রে দেখ না॥
জোরে জোর পাবে, ক'রে দেখ সবে,
সত্য সত্য আছে ঘোষণা।

বন্ধন যে করে, জোরে ধর তারে,
সেই খুলে দেবে দেখ না ॥
উপরে চন্দ্রমা, নীচে জলাশয়,
জল নাচে, ছায়া নাচিছে।
প্রণবের ছায়া, বীজেতে ভাসিয়া,
নামরূপে জেগে উঠিছে ;
জল শুকাইল, ছায়া মিশে গেল,
প্রতিবিম্ব বিম্বে কল্পনা।
জপিতে জপিতে, মন ম'রে গেলে,
কি হয় করিয়া দেখ না ॥
নাম নামী ভাই, কিছু ভেদ নাই
ডাকিলেই ডাকা আসিবে।
উঠিতে বসিতে, চলিতে ফিরিতে,
ডাক সদা, প্রেম জাগিবে

আশীর্ব্বাদ।

কিছুই ত করিতে পারি না। আপনার আশীর্ব্বাদই আমার ভরসা। বাবা! কথাটা ঠিক বলিলে না। সংসারের সকল কর্ম্মই ত বাধ্য হইয়া করিতেছ; সেইরূপ বাধ্য হইয়াও নিত্যকর্ম্ম করিতে হইবে। শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ ত আছেই।

তাঁহার আশীর্ব্বাদ ত বুঝিতে পারি না; তাই আপনার আশীর্ব্বাদ চাই।

আশীর্ব্বাদ বুঝিতে যদি চাও, তবে একটু উপযুক্ত হও। বুঝিবে।

কি বলিতেছেন?

বলিতেছি তাঁহার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদাই জীবের উপর বর্ষিত হইতেছে। যে তাঁহার আজ্ঞাপালনে প্রাণপণ করে, সেই তাঁহার আশীর্ব্বাদ বুঝিতে পারে। যে প্রাণপণ করে না, সে আশীর্ব্বাদ থাকিলেও পায় না।

আশীর্ব্বাদ করুন বলিলেই ত গুরুজনেরা আশীর্ব্বাদ করেন?

বলনা কত আশীর্ব্বাদ ত পাইয়াছ? কোন্‌টি ফলিয়াছে?

কেন ফলে না?

যেমন আচরণ করিলে, আশীর্ব্বাদ করিলে আশীর্ব্বাদ ফলে, তেমনটি কর কৈ? তুমি যেমন বচনে মাত্র আশীর্ব্বাদ চাও, আশীর্ব্বাদও সেইরূপ বচন মাত্র সার হইয়া যায়। কর্ম্মটি কর, আশীর্ব্বাদ ফলিবেই।

কর্ম্মই যদি করিতে পারিতাম তবে আর আশীর্ব্বাদ চাহিব কেন?

কথাটা ঠিক বুঝিতে পার নাই। কর্ম্মের জন্য প্রাণপণ করা চাই। যতদূর তোমার অবস্থায় সম্ভব ততদূর চেষ্টা থাকা চাই। তোমার চেষ্টা পূর্ণমাত্রায় থাকিলেই যে ঠিক ঠিক হইবে তাহাও নহে। যতক্ষণ না তাঁর কৃপাদৃষ্টি পাও, ততক্ষণ হইবার মত হইবে না। তাই বলি, প্রাণপণও করা চাই আবার কৃপাদৃষ্টিও পাওয়া চাই। আবার তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস রাখিয়া প্রাণপণে চেষ্টা কর, তুমি সিদ্ধ হইতে পারিবে। নতুবা শুধু প্রাণপণ করিলেও কার্য্য একরূপ হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে তোমার বন্ধন দূর হইবে না। ব্যবহারিক কার্য্য কিছু দিন একটু সুবিধা দেখাইয়া চলিবে বটে কিন্তু আসল কার্য্যে তুমি যেখানে ছিলে সেইখানেই থাকিবে।

কি করিতে হইবে বলুন। আমি প্রাণপণ করিব।

হাঁ। এই ত চাই। প্রাণপণ কর আশীর্ব্বাদ পাইবেই। আমি মূলসূত্র বলিয়া দিতেছি। তুমি যদি নিতান্ত কুৎসিত কর্ম্ম করিয়াও কলুষিত হইয়া গিয়া থাক, তথাপি যাহা বলিতেছি তাহা করিতে পারিবে। কিন্তু তোমার পক্ষে বিশেষ দৃঢ়তা চাই।

বলুন কি করিব?

তোমাকে যে কার্য্য করিতে বলিতেছি তাহা তোমার সর্ব্বদার কার্য্য। সহজ কার্য্য। তুমি এই দৃঢ়সঙ্কল্প কর যে, মরণ ত আছেই। কত লোক ত মরিতেছে। মরিব কিন্তু এ কর্ম্ম করিবই। মরণ হয় হউক। এ কর্ম্ম আমি ছাড়িব না। এই দৃঢ় অধ্যবসায় কর,—করিয়া এই মুহূর্ত্ত হইতেই লাগিয়া পড়। ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। 'ফল যা হয় হউক, যত দিনে হয় হউক; আমি বরং মরিব, তথাপি একর্ম্ম কখন ভুলিয়া থাকিব না। পূর্ব্বাভ্যাস-বশে ভুল হইলেও আবার করিব।

ইহা নিশ্চয় জানিও, কিছুদিন দৃঢ়তার সহিত করিয়া চল—নিশ্চয় বলিতেছি ভুল হইবে না।

বলুন।

প্রণব, বীজ ও নাম, কোথাও বা বীজ ও নাম, কোথাও বা শুধু বীজ. কোথাও শুধু প্রণব—এইগুলি মন্ত্রের প্রকার ভেদ। তুমি মন্ত্র গ্রহণ কর। তোমার বংশের ইষ্ট দেবতার মন্ত্রই তোমার মন্ত্র। শ্রীগুরুর নিকট হইতে অথবা তদভাবে গুরুবংশ হইতে শাস্ত্রমত মন্ত্র গ্রহণ কর। ইহা মনে রাখিও যে মন্ত্র ইষ্টদেবতা ও গুরু এই তিনটির যোগেই তোমার সাধনা। গুরুবিচার প্রথম অবস্থায় করিতে যাইও না। কুলমন্ত্র ও কুলগুরু বা গুরুবংশ ত্যাগ করা উচিত নহে। তবে যদি সিদ্ধপুরুষ কোথাও পাও, সেও জানিও তোমার পূর্ব্বকৃত তপস্যার ফলেই তাহা লাভ হয়। যাহাকে তাহাকে সিদ্ধপুরুষ ভাবিয়া ভ্রমে পতিত হইও না। সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ স্বতন্ত্র। তাঁহারা এক বৎসর নিকটে রাখিয়া তোমায় বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া তবে কিছু দিয়া থাকেন। তাহাও প্রথমে তোমাকে প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্য দিয়া থাকেন। আর শিষ্যসংগ্রহের জন্য যে গুরু তাহা ফুসলান ব্যবসা মাত্র। আজকাল যখন ব্যবসার প্রসার অত্যন্ত অধিক দেখা যায়, তখন কুলমন্ত্র ও কুলগুরুই ভাল। তোমার ভক্তি থাকিলে, তোমার দৃঢ়তা থাকিলে তোমার মন্ত্র ও তোমার ইষ্টদেবতা তোমার উপর কৃপা করিবেন। তখন তুমি যাহা চাও তাহাই পাইবে।

আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা বুঝিলাম। এখন কাজের কথা বলুন।

বলিতেছি কুলদেবতার নামটি অগ্রে গ্রহণ কর। ঈশ্বর এক। কিন্তু মূর্ত্তি অনেক। যিনি ইষ্টদেবতা তিনিই নির্গুণ, সগুণ ও অবতার। কাজেই সকল দেবতাই সেই এক পুরুষ। ইহাতে ভেদজ্ঞান করিও না। কালী বলিয়া ডাকিলেও যাঁহাকে ডাকা হয়, কৃষ্ণ বলিলেও তাঁহাকেই ডাকা হয়, দুর্গা বলিলেও তিনি, জগদ্ধাত্রীও তিনি, সীতাও তিনি, রামও তিনি, শিবও তিনি, সূর্য্যও তিনি।

এই জানিয়া তুমি তিন বেলা—প্রাতে, মধ্যাহ্নে বা স্নানের পর এবং সন্ধ্যায় তাঁহাকে ডাকিতে বসিবে। এই তিন বেলা বসা চাইই। ব্রাহ্মণ, সন্ধ্যা আহ্নিক করিবেন এবং মন্ত্র জপ করিবেন। অন্যে জপ করিবেন। যাঁহারা পূজা জানেন

তাঁহারা পূজা করিবেন। ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা আহ্নিক সারিয়া জপ করিবেন। যাঁহাদের এখনও মন্ত্র হয় নাই, তাঁহারাও তিন বেলায় সংখ্যা রাখিয়া জপ করিবেন।

এই যে তিন বেলা বিশেষ ভাবে বলা—ইহা কেবল সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণে রাখিবার জন্য। তবেই সর্ব্বদাই সর্ব্ব ভাবনায়, সর্ব্ব বাক্যে ও সর্ব্ব কার্য্যে তাঁহার স্মরণ চাই। এইটিই সর্ব্বদার কার্য্য। এই জন্য বলি—স্মরণের সুবিধা জন্য সর্ব্বদাই তোমাকে তাঁহার নাম লইয়া থাকিতে হইবে। এমন কর্ম্ম অনেক আছে যখন কর্ম্ম করা ও নাম করা সমকালে হয় না। সে ক্ষেত্রে কর্ম্মের আদিতে স্মরণ করিয়া লও। করিয়া কর্ম্ম করিতে থাক। কিন্তু কোন কর্ম্মই এক লাগাও হয় না। কর্ম্মের বিরাম আছে। প্রতি বিরামে তাঁহাকে ডাকা অভ্যাস কর। যখনই অন্য কর্ম্ম থাকিবে না, তখন মনে হওয়া চাই এখন ত আর অন্য কর্ম্ম নাই। আর কি করিব? সর্ব্বদার কর্ম্ম করি। নাম জপিয়া জপিয়া স্মরণ করি—ডাকি। নামই যে সে। ইহা হইলে বাজে কথা, বাজে গল্প, বাজে সমালোচনার অবসর তোমার থাকিবে না। তুমি সর্ব্বদাই যেন নামের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িবে। এই করিতে করিতে নামের উপর প্রেম জন্মিবে। নাম ছাড়িয়া থাকিতে কষ্টবোধ হইবে। মরিতে হয় মরিব, কিন্তু নাম ছাড়িব না—এইরূপ দৃঢ়তা কর সর্ব্বদাই নাম লইয়া থাকিতে পারিবে। উঠিতে, বসিতে, চলিতে, ফিরিতে, গৃহস্থালী করিতে করিতে—সর্ব্বদা নাম লইয়া থাকিতে পারিবে। ইহাই হইল প্রথম।

দ্বিতীয় কথা—এই নাম কর আর সহ্য কর। কিছুতেই দৈন্যতা করিও না। কিছুতেই বিরক্তি প্রকাশ করিও না। তুমি তাঁহার দাস বা দাসী হইয়া কাহার কাছে দুঃখ প্রকাশ করিবে? হৃদয়ের রাজাকে ছাড়িয়া, কাহার সঙ্গে পরামর্শ করিতে চলিবে? আগে তাঁহার সঙ্গে কথা কও, পরে ইচ্ছা হয় সেই বোধে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে চাও করিও। যত অসুবিধা হউক না কেন, যত কষ্টেই পড় না কেন, নাম ছাড়িও না। মনে রাখিও, এই নামই নামী—এই সেই। দুঃখ যে আসিতেছে ইনিই তাহা প্রেরণ করিতেছেন। তোমার অপরাধের বিস্ফোটক হইতে বিষ বাহির করিয়া তোমাকে নির্ম্মল করিয়া দিবার জন্যই তিনি অস্ত্র করিয়া দিতেছেন। নাম কর আর সহ্য কর। ইহাই দ্বিতীয় কথা।

তৃতীয় কথা—নাম কর, সহ্য কর, আর সেবা কর। পিতা, মাতা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলের মধ্যেই তোমার নামরূপী শ্রীভগবান্ বিরাজ করিতেছেন। নাম করিতে করিতে মনে মনে প্রণাম করিতে করিতে সেবা করিয়া যাও। যথাপ্রাপ্ত দরিদ্রসেবায় নিযুক্ত হও—যেখানে যতটুকু পার নাম করিতে করিতে পীড়িতের শুশ্রূষা করিয়া যাও। ইহাই তোমার নিষ্কাম ভাবে সংসারধর্ম্ম করা। নিষ্কাম কর্ম্ম যাঁহারা অভ্যাস করেন তাঁহারা কোন কার্য্যে পশ্চাৎপদ নহেন, কোথাও ভীরু নহেন, কোথাও পারিব না একথা বলেন না। ইহাতেই তুমি সংসারধর্ম্ম করিয়া নিঃশ্রেয়সের পথে চলিতে পারিবে।

এই কর, বড় সংযমী হইবে; সদা সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে। এখন প্রভুর আশ্রয়ে আসিয়াছ, আর তোমার অভাব কি? আর তোমার অসন্তোষ কি?

তাই বলি, তিন বেলা বসিতে অভ্যাস কর; সর্ব্বদা নাম কর, সব সহ্য কর; যথাপ্রাপ্ত সেবা কর, ক্রমে অন্য সমস্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

সকলের মধ্যেই যখন শ্রীভগবান্ আছেন, তখন গুরু, আচার্য্য, পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া প্রভৃতি গুরুজনকে ঈশ্বর বোধ করিয়া ভক্তি করা,—তাঁহারা যেরূপ ব্যবহারই কেননা করুন, সব সহ্য করিয়া সংযম অভ্যাস করিতে করিতে সেবা করা—ইহা কঠিন হইবে না। আর যাহারা তোমার বয়ঃকনিষ্ঠ তাহাদিগকেও ভিতরে ঈশ্বরভাব রাখিয়া, বাহিরে কর্ত্তা সাজিয়া কখন আদর করা কখন শাসনচ্ছলে উপদেশ করা—ইহাও অভ্যাসীর পক্ষে কঠিন কথা নহে। সবই পারা যায়, যদি দৃঢ়ভাবে করিবই বলিয়া প্রবল ইচ্ছা করা যায়। মরিতে হয় মরিব তথাপি জপ করা, সহ্য করা, সেবা করা এসব কিছুতেই ছাড়িব না। কর না এই সব। করাও না এই সব। দেখদেখি বিষণ্ণ সংসার আবার হাসিয়া উঠে কি না? ইহাই আর্য্যশিক্ষা। ইহাতে স্বার্থপরতা দূর হয়, নীচত্ব যায়, শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ পাওয়া যায়, নিজের নিঃশ্রেয়স্ লাভ হয়, দশের উপকার হয়—এক কথায়, এই নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমকালে নিজের নিঃশ্রেয়স লাভ ও জগচ্চক্র পরিচালনরূপ গীতোক্ত কর্ম্মের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। এই কর্ম্ম আপনি আচরণ করিয়া, অন্যকে আচরণ করাইবার জন্য উপদেশ কর। অবশ্যই শুভ হইবে। অবশ্যই শ্রীভগবানের কৃপাদৃষ্টি পাইবে। ইহাই যথার্থ আশীর্ব্বাদ।

সাধনার ধন।

ওগো!

নিমিষের তরে ধরা দিতে এসে,

(কেন) ফিরে গেলে পুনঃ চকিতে?

আমি জানি না কেমনে হারানু চেতনে

নারিনু তোমায় লখিতে।

কেন আঁখির পিয়াসা মিটালে না সখা?

জনম জনম ধরিয়া;

মোর কত কথা যে গো বলিবার আছে—

সকল পরাণ ভরিয়া।

আমি কাহারে কহিব মরমের দুখ

কে বুঝিবে মোর বেদনা?

ওগো! দুয়ার হইতে ফিরে গেল বঁধু

সকল সাধের সাধনা।

এবে এছার জীবনে কোন সুখ নাহি,

মরণে অধিক যাতনা;

তবু বিস্মরণ হ'তে শতগুণে শ্রেয়—

তোমার স্মৃতির বেদনা।

ওগো! যদিও তরুণ পরাণে সকল

ভরসা গিয়াছে টুটিয়া;

এবে নিরাশার—মেঘে হৃদয় ছাইল

হাহুতাশ দিল ঢালিয়া।

তবু হিয়ার বেদনে আকুল রোদনে

মরমে মূরতি গড়িব;

এই জীবন মুকুল বৃন্তচ্যুত হ'লে—

তোমারি চরণে ঝরিব॥

(ভবানীপুর)

মহাত্মা কবিরের সাধনা।

আর্য্যমিশনের কবির, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত ভগবান দাস প্রভৃতির দোঁহা সংগ্রহ এবং কবিরপন্থীয় "কবিরের জীবন" ইত্যাদি হইতে কবিরের সাধনাটি আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি।

মহাত্মা কবির আপনাকে আপনি বলিতেছেন,—

কবির সো দিন কাঁয়সা হোয়েগা
রাম গহহি গে বাঁহি।
আপনা করি বৈঠাওসি
চরণকমল কি ছাহি॥

কবির সে দিন কেমন হইবে যে দিন রাম আমার হাত ধরিয়া, আপনার করিয়া নিজ চরণকমলের ছায়াতে আমাকে বসাইবেন?

এইটি প্রেমের উক্তি। শুনা যায় কবির জীবন্মুক্ত। তিনি শ্বাসে শ্বাসে নাম করিয়া যোগমার্গ ও ভক্তিমার্গের অপর সাধনাগুলি করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারাই তাঁহার প্রেম জন্মিয়াছিল এবং পরে জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে ভূমিকা করা হইয়াছে। এখানে শাস্ত্রবিশ্বাসী কাহারও কাহারও একটু সংশয়ের কথা উত্থাপন করা আবশ্যক।

তমেব বিদিত্বাহতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়॥

তোমাকে জানাই মৃত্যু অতিক্রম করা—জীবন্মুক্ত হওয়া। মুক্তির আর অন্য পথ নাই।

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। শ্রুতি ইহা বলেন। কবির যদি জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন তবে অবশ্যই তাঁহাকে সন্ন্যাস লইয়া গুরুমুখে শ্রবণ, মননাদি সাধনার মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে। ইহা যখন কবিরের গ্রন্থে পাওয়া যায় না, তখন তিনি জীবন্মুক্ত হইলেন কিরূপে? কেহ কেহ এই সংশয় তুলেন।

আমরা কবিরের সমস্ত গ্রন্থ দেখি নাই। কাজেই বলিতে পারি না তিনি বিধিপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন পরিপাকান্তে তত্ত্বমসি শ্রবণে জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন কি না? কিন্তু তিনি যে জীবন্মুক্ত ছিলেন এ সম্বন্ধে

অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখা যায় না। শ্রুতি বলিতেছেন তাঁহাকে জানিলেই জীবন্মুক্তি হইবে। কবির তাঁহাকে জানিয়াছিলেন। যে উপায়ে জানিয়াছিলেন সে পথ বিবিদিষা ও বিদ্বৎ সন্ন্যাস পথেরই অন্য প্রকার হইতে পারে। শ্রুতি যে বলিতেছেন তাঁহাকে জানা ভিন্ন অন্য কিছুতেই মুক্তি হয় না, সেইরূপ যদি বলিতেন কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সাধনা ভিন্ন তাঁহাকে জানা যায় না, তবে আমরা সন্দেহ তুলিতে পারিতাম। সাধনা অনন্ত প্রকার। শাস্ত্র ইহা বলিতেছেন। সেই সাধনার মধ্যে কোন প্রকার সাধনা কবিরের ছিল।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য প্রধানতঃ নাম সাধনা করিতেই উপদেশ করেন। নাম সঙ্কীর্ত্তন বহিরঙ্গ সঙ্গে করিতে হইবে। কিন্তু অন্তরঙ্গ সঙ্গে ভাবের আস্বাদন আবশ্যক। কবিরও নাম জপ করিতে বলেন। কিন্তু তিনি যোগপথটিকেও অগ্রাহ্য করেন নাই। শ্বাসে শ্বাসে জপ, কেবল কুম্ভক ইত্যাদি কথারও কবিরের গ্রন্থে বহু উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যোগের সাহায্যে নাম করিতে করিতে প্রেম জন্মায়। ইহা কবিরের সাধনাতে স্পষ্ট দেখা যায়। মহাপ্রভু ভক্তির অবস্থা পর্য্যন্ত দেখাইয়াছেন, কবির ভক্তির পরে জ্ঞানের কথাও বলিয়াছেন।

আমরা তাঁহার সাধনার কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করিবার সময় যথাসাধ্য যোগ ভক্তি ও জ্ঞানপথগুলি দেখাইতে চেষ্টা করিব।

আমরা প্রথমে প্রেমের অবস্থা ও প্রেমের ব্যাকুলতা কবিরের উক্তি হইতে দেখাইব। পরে যে সাধনা দ্বারা প্রেম জন্মায় তাহা বিশেষ করিয়া দেখাইব।

মহাত্মা নানক, কবির প্রভৃতি মহাজনগণ এবং শাস্ত্রও একবাক্যে বলিতেছেন আপনার ভিতরেই আপনার অনুসন্ধান কর।

মোকো কঁহা ঢূঁড়ো বন্দে!
ম্যায় তো তেরে পাস মে।

আমাকে কোথায় খোঁজ! রে সেবক। আমি তো তোর নিকটেই। মহাত্মা কবির আপনার ভিতরেই আপনাকে পাইয়া প্রেম করিয়াছিলেন। কবিরের উক্তি অতি সুন্দর।

তেরে গওনেকা দিন নগিচানা।
সোহাগিন্ চেত করোরি।

রে সোহাগিনি! প্রিয়তমের ঘরে যাইবার দিন নিকট। চিত্তকে জাগাও!

জাগরী মেরি সুরত সোহাগিন্ জাগরী
ক্যা তুম্ শোও ত মোহ নীদ মে।
উঠ্ কে ভজনীয়া মে লাগরী॥

জাগ আমার প্রেম সোহাগিণি! জাগ। কেন মোহনিদ্রায় শুইয়া আছ। উঠ—ভজন কর। আবার বলিতেছেন উঠ—ভজন কর। তোমার সর্ব্ব অঙ্গে মধুর ধ্বনির রাগিণী উঠিয়াছে। মন দিয়া শোন। মনকে ছন্দমত স্পন্দন করাইতে পারিলে ভিতরে গগনগুফায় স্বরলহরীর স্থান খোলা হইয়া যায়। ভক্তিমার্গের সাধনায় স্বর, রাগ রাগিণী ইত্যাদি সঙ্গীতের অঙ্গগুলি নিতান্ত আবশ্যক মানসেও এই ভাবনা নিতান্ত প্রয়োজন।

যে সোহাগিনীর কথা কবির বলিতেছেন তিনি সাধকের কে তাহা যিনি নিজের মধ্যে মিলাইয়া না লইতে পারেন তিনি অন্ধকারে ঘুরিবেন। কুপথেও যাইতে পারেন। কিন্তু এই সোহাগিন্ সম্বোধন অতি মধুর। কবির অন্য স্থানে বলিতেছেন—হে সখি! হে সোহাগিন্! রাত্রি নাই। প্রভাত হইয়াছে। চিত্ত মিলাইয়া মঙ্গলগীতি গান কর।

আকাশে আশ্চর্য্য শোভা দেখা যাইতেছে। অসীম রাগিণী বাজিতেছে। কোন্ সুরে না জানি কে গাহিতেছে। কবির বলিতেছেন—

সাঁই সব কুচ্ দিন্হ দেত কুছ না রহো।
হম্ হি অভাগিন্ নার! সুকম্ ত্যাঁজ দুখ লহয়ি।
গয়ি পিয়াকে মহল! পিয়া সঙ্গ না রচি।

স্বামী সবই দিয়াছিলেন—দিতে আর কিছুই বাকী রাখেন নাই। আমি অভাগিনী নারী—সুখ ছাড়িয়া দুঃখ গ্রহণ করিলাম। প্রিয়ের মহলে গেলাম, কিন্তু সঙ্গ করিলাম না। [ধন দৌলত দেখিয়াই ফিরিয়া আসিলাম]

আমরা আরও এই মহাত্মার প্রেমোক্তি কিছু কিছু বলিয়া তাঁহার সাধনাটি ধরিতে চেষ্টা করিব। শুধু লোকের প্রেমের কথা পড়িয়া কি হইবে যদি সেই প্রেমের সাধনা করিয়া সেইরূপ জীবন গঠন না করা যায়?

কবির আপনাকে আপনি সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—আর ত সখি! বাপের বাড়ী ভাল লাগে না। এখানে শুধুই খাওয়া দাওয়া। আমার স্বামীর ধাম কিন্তু পরম সুন্দর। সেখানে যে যায়, সে আর ফিরিয়া আসিতে চায় না।

সেখানে চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ প্রবেশ করিতে পারেন না। সেখানে আমার বার্ত্তা কে লইয়া যাইবে? আমার ব্যথা স্বামীকে কে বুঝাইবে?

প্রাণ বলিতেছে আগে চল! নয়ন কিন্তু পথ দেখিতে পায় না—অথচ পথে দাঁড়াইয়া থাকিবারও যো নাই। হে সখি! কেমন করিয়া পতি-গৃহে যাইব? সেই প্রিয়তম বিনা এমন কেহই নাই যে এই পথ বলিতে পারে!

কহত কবির! শুন ভাই প্যারে!
কৈসে প্রীতম্ পাবে?
তপন স্বহ কি বুঝাবে।

কবির কহেন শুন ভাই প্রিয়! কেমন করিয়া প্রিয়তমের দেখা পাইব? কেমন করিয়া প্রাণের জ্বালা জুড়াইব?

হে প্রিয়! অতি উচ্চ তোমার অট্টালিকা আমি দেখিয়া চলিতেছি। সেথায় চন্দ্রসূর্য্যের কোটি দীপ কেবলি জ্বলিতেছে। তবুও পথ ভুলিতেছি। যোগিগণ এক গগনগুফার কথা বলেন। মহারাজজীর "সত্যনামকা ধ্যান তুম্হারা পূরণ হো আশা" রূপ বারমাসায় এই গগনগুফার কথা বলা আছে।

ভাদো ভরম মিটাবো গুরু কি সেবা কছু করনা।
গগনগুফাকে মারগ্‌মে তুম্ ধীরজসে চলনা।
খম্ভা এক কেঁওয়াড়ী দ্বাদশ জিস্‌মে হয় লাগি।
বৈকুণ্ঠপুরী বো দশম্ দ্বারা জঁহা জ্যোতি জাগি।
ন লাগে ওঁহা কাল ফাঁসা। সত্যনামকা ইত্যাদি।

ভাদ্রমাস। শ্রীগুরুর কিছু সেবা করিয়া ভ্রম সমূহ দূর কর। ধৈর্য্য সহকারে গগনগুফার ভিতর দিয়া চল। ইহাতে একটি থাম আর দ্বাদশটি দ্বার আছে। ইহার ভিতরে বৈকুণ্ঠপুরী ও তাহার উপরে দশমদ্বার। যেখানে সর্ব্বদা চৈতন্যময় জ্যোতি বিরাজমান। এই স্থানে আসিলে যমের ফাঁসি লাগে না। দেহে নয় দ্বার। দশম দ্বারটি যোগিরা ধরেন।

কবির বলিতেছেন, গগন মধ্যে কি ঝঙ্কারে বাজনা বাজিতেছে। সেথায় চন্দ্র বিনা কুমুদিনী হাসিতেছে। যেখানে সেখানে রাগ রাগিণী। অমৃত পুরুষের প্রীতি জন্য তালে তালে কত গীত উঠিতেছে। কত মুরলী সপ্তস্বরে বাজিতেছে। কত প্রেমের ঝঙ্কার উঠিতেছে। কি রমণীয় সুগন্ধ সেথায়,

উঠিতেছে। রাগ রাগিণীর রূপ সেথা কোটি ভানুর মত উজ্জ্বল। আনন্দের কি অনুপম বীণা সেখানে বাজিতেছে। হে সখি! এসব যেন কাণে আসিতেছে। আর আমি বল্লভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি।

সাঁই বিন্ দরদ করে জে হোয়।
দিন নহি চৈন রাত নহি নিঁদিয়া
কা সে কহুঁ দুখ রোয়।
আঁখি রতিয়া পিছলে পহর বা
সাঁই বিন তরস তরস রহি সোয়।
কহত কবির শুনো ভাই প্যারে
সাঁই মিলে সুখ হোয়॥

পিয়া বিনা আমার অন্তরে বড়ই ব্যথা। দিনে সোয়াস্তি নাই; রাতে নিদ্রা নাই। এ দুঃখের কথা কাঁদিয়া কাহাকে বলি? অন্ধকার রাত্রি—প্রহর পিছলিয়া চলিতেছে। স্বামী বিনা বার বার চমকিয়া উঠিতেছি। কবির বলেন শুন ভাই প্রিয়! স্বামী যদি মিলে তবেই সুখ। আর এক স্থানে কবির বলিতেছেন—আগে সখীদের সঙ্গে কেবল খেলা করিয়াছি; এখন স্বামীর ঘরে যাইতে প্রাণ কাঁপে। আনন্দ চাই, কিন্তু লজ্জা ছাড়ে না। প্রিয়তমের সঙ্গে হৃদয় মিলাইয়া লাগিতে হয়। অবগুণ্ঠন খুলিয়া অঙ্গ ভরিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ করিতে হয়। নয়নে প্রেমের আরতি সাজাইতে হয়।

কবির বলেন, হে সখি! শোন! যার প্রেম হয়, সেইই এ কথা বোঝে। নিজের প্রিয়তমের জন্য ব্যাকুলতা যদি না থাকে, তবে বৃথা তোমার কাজল পাড়া আর বৃথা তোমার সাজসজ্জা।

আমরা বলিতেছিলাম, কবির আপনার ভিতরে আপনার প্রেমের কথাই বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও বলিয়াছিলেন যখন নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ আছেন আর তাঁর নাম আছে, তখন চণ্ডিদাস বা বিদ্যাপতির মত আরোপে যাইবার কোন আবশ্যক নাই। চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতির সাধনার সহিত মহাপ্রভুর সাধনার পৃথকত্বই ইহা।

কবির কোন্ সাধনায় এই প্রেমে পৌঁছিয়াছিলেন তাহাই এখন আলোচ্য।

কবির যো জন বিরহী নামকে ঝিনে পঞ্জর তাসু।
নয়ন ন আওয়ে নিদরি, অঙ্গন্ জামে মাসু ॥

যিনি নামের বিরহী তাঁহার পাঁজরার হাড় বাহির হইয়া গিয়াছে। কখন্ তাঁহাকে পাইব ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে ঘুম নাই, আর গায়েও মাংস জমে না।

কবির রামানুজের শিষ্য রামানন্দের নিকট রামনাম পাইয়াছিলেন। ভক্তি দিলাওল্ উপজি, ল্যায়ে রামানন্দ। রামানন্দ ভক্তিবীজ আনিয়া দিলেন। এই নামতত্ত্ব কি—তিনি বুঝিয়াছিলেন, বুঝিয়া কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন।

কহে কবির শুন ভাই সাধো
সব শ্বাঁসোকি শ্বাঁস মে।

কবির বলেন শুন ভাই সাধু—তিনি তোমার সঙ্গেই আছেন, আর তিনি সকল শ্বাসের শ্বাসে আছেন।

কবির কাঁহা ভরোসা দেহকো বিনশী যায়ে সিন্ মাহি।
শ্বাস শ্বাস সুমিরণ করে আওর্ উপায় কিছু নাহি ॥

কবির বলেন দেহের আবার ভরসা কি? এককণেই ইহার নাশ হয়। প্রতিশ্বাসে স্মরণ করা—অন্য উপায় আর নাই।

কবির শ্বাস সুফল সোই জানিয়ে হরিকা সুমিরণ লায়ে।
আওর্ শ্বাস এহুঁ গয়া করি করি বহুৎ উপায়ে।

কবির সেই শ্বাসই সুফল দেয়, যে শ্বাস হরি-স্মরণে লাগে। অনেক উপায় করিলেও অপর শ্বাস বৃথা যায়।

কবির যাকি পুঁজি শ্বাস হায়, ছিন আওয়ে ছিন যায়ে।
তাকো য্যায়সা চাহিয়ে রহে রাম লোলায়ে।

কবির যাঁর শ্বাসমাত্র পুঁজি—আবার সেই শ্বাস একবার যায়, একবার আসে। এস্থলে এমনটি করা চাই যে, ঐ শ্বাস যেন রামকে লইয়া মজিয়া থাকে। কবির শ্বাসে শ্বাসে রাম রাম করিতে বলিতেছেন। "মালা ফের শ্বাস কি" অজপা সুমিরণ ঘট্ বীচে—ইত্যাদিতে কবির শ্বাসে শ্বাসে জপ করিতেই বলেন।

আবার বলেন—

কবির রামনাম ছাঁড়ো নহি, সদ্গুরু শিখ্ দেয়ি।
অবিনাশি সো পরশ্ করি, আত্মা অমর ভেঁয়ি।

কবির রামনাম ছাড়িও না। নাম সদ্‌গুরু শিখাইয়া দিয়াছেন। অবিনাশীকে স্পর্শ করিলে, তোমার বদ্ধ আত্মা অমর হইয়া যাইবে।

কবির জাগৎ শোয়ৎ রাম কহু, পরে উতানে রাম
উঠৎ বৈঠৎ রাম কহু, পাওয়ৎ অঁচোয়ৎ রাম॥

নিদ্রা হইতে জাগিয়া, শুইয়া রাম বল; উঠার সময়, বসার সময়, ভোজনের সময়, আঁচাইবার সময় রাম রাম বলিতে থাক।

কবির যোগী ছিলেন। যোগী হইয়াও নাম সাধনা তাঁহার ছিল। নাম সাধনা করিয়া তিনি প্রেমমার্গে পৌঁছিয়াছিলেন, পরে জীবন্মুক্ত হন। শ্রীগীতাও বলেন—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

যোগীদিগের মধ্যে যিনি মদ্গতচিত্ত হইয়া কেবলমাত্র আমাকেই আরাধনা করেন, তিনি সকল অপেক্ষা পরম শ্রেষ্ঠ। কবির যোগসাধনার পরে ভজনা করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন।

আজকাল নাম সাধনা অনেকেই করেন। আমরা পরবারে গুরু, নাম সাধনার স্মরণ, বিরহ, প্রেম ইত্যাদি কবিরের সাধনা আলোচনা করিব। যতটুকু বলা হইল ইহাতেই যিনি কর্ম্মী তিনি শ্বাসে শ্বাসে জপ লইয়া থাকিবেন। কারণ সময় আর কৈ?

বংশীরব।

চক্রধরপুর চাঁইবাসার রেলওয়ে ষ্টেশন। ইহা সিংহভূম জেলায়। বেশ স্থান।

পর্ব্বতের কোলে কতকগুলি সাঁওতালের বাস। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। গ্রীষ্মকাল। বুঝি কোন সাঁওতাল যুবক এই সন্ধ্যার প্রাকালে বাঁশী বাজাইতেছে।

কি আছে এই দূরশ্রুত বংশীধ্বনিতে? কি জানি বাঁশী যেন কত কি কথা কয়।

শ্রীবৃন্দাবনে একদিন বাঁশরী বাজিত। গগনগুফায় প্রতিদিন বাঁশী বাজে। চিত্তকে স্থির করিলে এই বাঁশী শুনা যায়।

আচ্ছা সন্ধ্যাকালে যখন চারিদিক নিস্তব্ধ হয় তখন যদি কেহ বাঁশী বাজায়—সে যদি তোমার পরিচিত হয়, সে যদি এমন হয় যার কাছে তুমি সর্ব্বদা ছুটিয়া যাইতে চাও—কিন্তু লোকবন্ধনে বাঁধা আছ বলিয়া যাইতে পার না, যাইতে তোমায় দেয় না—এরূপ অবস্থায় বাঁশী শুনিতে শুনিতে তোমার কি হয়?

আর তোমায় পরিচিত—তোমার প্রিয়—যদি সেই বংশীধ্বনিতে তোমাকেই ডাকে, যদি বড় মধুর করিয়া তোমার নাম করে, বড় ব্যাকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ বংশীধ্বনি তোমাকেই ডাকিতে থাকে, আর তুমি তাহাই স্পষ্ট শুনিতে পাও, স্পষ্টই তাহা বুঝিতে পার—তবে তোমার কি হয়? দৌড়িয়া গিয়া তাহার চরণে লুটাইয়া পড়িতে কি তোমার সাধ যায় না? ইহার নাম ব্যাকুলতা। তাঁহাকে ত ডাক। কিন্তু তোমার ডাকার পরে তাঁহার ডাকটা একবার শুনিবার জন্য স্থির হও। আর ডাক শুনিয়া ভাবনায় ব্যাকুল হও।

প্রাণপ্রয়াণোৎসব।

তুমি ত কতবার বলিয়াছ, তথাপি আবার ভাল করিয়া বলনা, প্রাণ-প্রয়াণ কি উৎসব? তুমি যাহা বল, সবই আমার উল্‌টা বোধ হয়। জগতের লোক যাহার নামে অমঙ্গল মনে করে—ভয়ে জড়সড় হয়, তুমি তাহাকেই উৎসব বলিতেছ! তুমি আশ্চর্য্য বক্তা!

তুমিও বেশ কুশলতার সহিত বুঝিতে চেষ্টা কর, তুমিও আশ্চর্য্য জ্ঞাতা হইবে। শ্রুতি বলেন—'আশ্চর্য্যোবক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাশ্চর্য্যো জ্ঞাতা' (কঠোপনিষৎ)। আর আসিবার সময় লোক যেমুখ হইয়া আসে, ফিরিবার

সময় তাহার বিপরীত হইয়া ত ফিরিতে হয়। সুতরাং আমার কথা তোমার বিপরীত মনে হইবে—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

আচ্ছা এখন বল—সত্যসত্যই কি প্রাণ-প্রয়াণ-উৎসব ? বল কি ভাবে আমি বুঝিব ?

দেখ, দুর্গোৎসবের সময় যখন তোমরা প্রবাসী ভ্রাতৃগণ গৃহে প্রত্যাগমন কর, তখন তোমাদের গৃহ কেমন উৎসবে পূর্ণ হয় না ? দশভুজার স্থূল মূর্ত্তির মত তোমার গর্ভধারিণী দশ হাতে দিন ঠেলিয়া যে সুখের দিন নিকটবর্ত্তী করেন, আর প্রোষিত তোমরা দেহলীদত্ত পুষ্পরাশি দ্বারা যে সুখের দিন গণনা করিতে থাক, আহা সে দিন কত উৎসবময়। তার পর দেখিতে দেখিতে যখন সে সাধের দিন উপস্থিত হয়, তোমার সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সিন্দূর বিন্দুর মত যখন সে দিনের সূর্য্য তোমার কল্পনার উপহৃত নূতন বেশে বিভূষিত হইয়া উদিত হন, তরু, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, নদী, লহরী, আকাশ, গ্রহনক্ষত্র যখন বৎসরের পার্ব্বণ শোভায় সুশোভিত হইয়া শত সাধ মাখা মূর্ত্তিতে চারিদিক্ রঞ্জিত করিয়া তুলে একবার ভাবিয়া দেখনা, সে দিন কত উৎসবময়।

তাই ত আমি বলি, আহা এত উৎসবময় জগৎ, তাহাও যে সময়ে ছাড়িতে হইবে—তুমি তাহাকেও উৎসব বলিতেছ।

হাঁ তাহাকেই উৎসব বলিতেছি—কেন বলিতেছি তাহা পরে বলিব। এখন একবার ভাবনা সেদিন কত উৎসবময়। উৎকণ্ঠাস্ফুটিত মাতৃ হৃদয়ে মিলিত হইয়া যে দিন তোমরা ভ্রাতৃগণ অত্রত্য মোহনচিত্রের এক একটী করিয়া দেখিতে থাক, সে দিন প্রকৃতই মধুময়। যে দিন "মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ", যে দিনের বায়ুহিল্লোল প্রিয় স্পর্শে মধুময় হইয়া খেলিতে থাকে, যে দিনের সিন্ধু আপন মধুময় লহরী লইয়া খেলিতে খেলিতে মধুক্ষরণ করিতে থাকে,—একবার ভাব দেখি সে দিন কত আনন্দময় যে দিন "মাধ্বীর্ণ সন্ত্বোষধী মধুনক্ত মুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ", যে দিনের তরুলতা যে দিনের শস্যমালা বায়ু দোলায় হেলিয়া দুলিয়া মধুময় দৃশ্য প্রদর্শন করে, যে দিনের নক্ষত্রমালিনী চন্দ্রকিরীটিনী রজনী, যে দিনের অরুণকিরণালঙ্কৃত উষা মধুময় বেশ ধারণ করে, এমন কি, যে দিনের প্রতি ধূলিকণা পর্য্যন্ত ভাবনোপহৃত মধুময় মাধুরীতে সুশোভিত হইয়া গৃহ-পথিকের নিকট নবানুরাগরঞ্জিত প্রতীয়মান হয় আহা সে দিন কত মধুময়। এই মধুময় অবস্থারই বর্ণনায়, মধুমতী ঋক্

আরও কত বলিয়াছেন - বলিয়াছেন সে দিনের নভোমণ্ডল, সে দিনের বৃক্ষ বনস্পতি,সে দিনের সূর্য্য, সে দিনের গোকুল সকলই মধুময়, সকলই নয়নাভিরাম বেশভূষায় সুসজ্জিত। আহা সে দিন কত আনন্দময় একবার ভাব দেখি !

তুমি একি কাব্য কল্পনা আরম্ভ করিলে ? শারদোৎসবের এই সব কাল্পনিক ছবি দেখাইয়া বুঝি আমার প্রশ্নের তুমি চাপা দিবে ? গৃহাভিমুখী পথিক, শারদোৎসবে আনন্দ-পুলকিত হয় সত্য, কিন্তু বাহ্যাভ্যন্তর সমস্ত জগৎ তাহার নিকট মধুময় বোধ হইবে—এতবড় দৃষ্টি সাধারণের কোথায় ? ইহা তোমার কাব্য কল্পনা নয় কি ?

তুমি কি আমার কথায় কেবল সাধারণের শারদোৎসব বুঝিতেছিলে ? আমি সাধারণের কথা বলিয়াই তোমাকে অসাধারণ উৎসবের কথা বুঝাইতেছিলাম। বিদেশ-প্রস্থিত ভ্রাতৃগণের মাতৃক্রোড়ে একত্র সম্মিলনের ছবি লইয়া শারদোৎসব যেমন আনন্দময় বোধ হয়, সেইরূপ তাহাকে মিথ্যা কল্পনার উৎসব বুঝাইয়া যে মিলনানন্দ, তৈজস রাজ্যে উপনীত হইয়া জীব প্রাপ্ত হয়, উহাই প্রাণ-প্রয়াণোৎসব।

তবে কি তুমি বলিতেছ এই শারদোৎসব কাল্পনিক ? আর ইহাতে যে আনন্দ উপলব্ধি করা যায়—উহা মিথ্যা ?

কেবল তাহা বলিতেছি না, তবে হঁা আমি তাহাও বলিতেছি। যাহারা অজ্ঞান তাহারাই এ উৎসবের অধিকারী। যাহাদের একটু জ্ঞান আছে তাহাদের এ আনন্দ উপেক্ষণীয়।

তুমি নাস্তিকের মত মাতৃপূজার বিরোধী হইতেছ কেন ? অথবা আমি তোমার ভাব বুঝিতে পারিতেছি না ?

তুমি আমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পার নাই তাই তোমার নাস্তিকতা আমাতে আরোপ করিতেছ ! আমি বলিতেছি—এই মর-রাজ্যে উৎসব হইতে পারে না ; তবে যে উৎসব হয় উহা যাহারা মায়ার কুহকে ইহাকেই অমররাজ্য মনে করিয়াছে তাহাদেরই উৎসব। নতুবা তুমি বড় সাজ সজ্জা করিয়া দেশে চলিয়াছ —এমন সময় যদি সংবাদ পাও, তোমার দেশের বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নী যুগপৎ লোকান্তরিত হইয়াছে—তবে কি তোমার এই শারদোৎসবের আর উৎসব থাকে ?

হাঁ, এমন আকস্মিক মহামারী অতি অল্প লোকেরই হয়। এমন হতভাগ্য সংসারে অতি অল্পই আছে যাহাদের যুগৎপৎ এইরূপ বহু বন্ধু বিনাশ পাইয়াছে ?

তুমি অজ্ঞানে হতভাগ্য বলিতেছ—আমি তোমায় সংবাদ দিতেছি তুমিই এই অবস্থাপন্ন !

তুমি উৎসব বলিতে যাইয়া এসব কি বলিতেছ ? এ সংবাদ যদিও মিছা কিন্তু তথাপি তোমার এসব কথা আমি শুনিতে চাই না।

তুমি শুনিতে না চাহিলেই সত্য মিথ্যা হইতে পারে না। পাছে অবিদ্যার কুহক ভাঙ্গিয়া অনুভূয়মান সুখের ব্যাঘাত হয়, এই জন্য, তোমার মত অনেকেই এই সত্য কথা শুনিতে চায় না এবং এই নিরাবরণ সত্যের নিকট অজ্ঞানের আবরণে আপনাকে ঢাকিয়া উৎসব করে—তাই ত এ উৎসব মিথ্যা। মহা-শ্মশানেও অশন বসন লইয়া উৎসব তাহারই হয়—যে ঘোর অজ্ঞান অথবা যে জ্ঞানময়। তুমি কি পূর্ণ জ্ঞানময় ? অবশ্যই নয়, সুতরাং তুমি অজ্ঞান। তাই তোমার এই অজ্ঞানাবরণ উন্মোচন করিয়া আমি বলিতেছি এবং দেখাইয়া দিতেছি—দেখ তুমি কোথায় বসিয়া উৎসব করিতেছিলে ? ইহা ঘোর শ্মশান। জাতশ্চৈব মৃতশ্চৈব জন্মচৈব পুনঃ পুনঃ তুমি কতবার এখানে জন্মিয়াছ, কতবার মরিয়াছ, এই সংসারে তোমার কত জন্মের পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র তোমার বিরহবেদনায় চীৎকার করিতেছে—তুমি এমন অজ্ঞান. তাহাদের চীৎকারধ্বনিতে কর্ণপাত না করিয়া আপন কাল্পনিক উৎসবে মত্ত রহিয়াছ।

তুমি একি দেখাইতেছ, আমার জন্মান্ধদৃষ্টি একি দেখিতেছে তুমি ঠিক বলিয়াছ, এই ত আমার প্রথম জন্ম নহে ; কতবার জন্মিয়াছি, কতবার সাধের সংসার, সাধের পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ছাড়িয়া নিতান্ত নির্দ্দয়ের মত চলিয়া আসিয়াছি, এবারও যে আমি এখানে আসিয়াছি ইহার পূর্ব্বে এই রূপেই বন্ধুবান্ধবগণকে কাঁদাইয়া আসিয়াছি—হয় ত এখনও তাহারা আমার শোকে কাঁদিতেছে, হয় ত তাহারা আমার আশে পাশে রহিয়াছে ; কিন্তু এখন আমি তাহাদের চিনিতেও পারি না। অহো ! সংসার কি কৃতঘ্নতার স্থান, কি নিষ্ঠুরতার লীলাভূমি, মৃত্যুর রঙ্গমঞ্চ ! অহো সংসার কি মহাশ্মশান।

কিন্তু এই কি তোমার উৎসব বর্ণনা ?

শুধু ইহাই নহে, এরূপ উৎসব-বর্ণনা তোমাকে আরও শুনিতে হইবে।

ইহার আর এক দৃশ্য তোমাকে আরও দেখাইবার বাকী আছে। তুমি দেখিতেছ—তুমি অন্যকে মৃত্যুকালে কাঁদাইয়া আসিয়াছ, কিন্তু তুমি যে কি কাঁদাণ কাঁদিয়াছ তাহা তোমার মনে নাই। এই বিস্মৃতির আবরণ তুলিয়া তোমাকে একবার সেই দৃশ্য দেখাইব—তুমি কি বল?

কি বলিব? যাহা সত্যসত্য হইয়াছে হইবে, তাহা আগে দেখিতে আপত্তি কি? বরং আগে দেখা ভাল, কারণ প্রস্তুত হওয়া যায়, না দেখা, না জানাই যদি ভাল হইত, তবে অজ্ঞানান্ধের এই মৃত্যুযন্ত্রণা হইত না, কিন্তু তাহা ত নহে, তাহারই ত আরও এ যন্ত্রণা বেশী হয়। সুতরাং আমি তৃণমুষ্টি নিক্ষেপে আগুন নিভাইতে চাই না। তুমি তোমার জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় আমার জন্মান্ধদৃষ্টি উন্মীলিত কর।

দেখ জীব পূর্ব্বে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তাহা দ্বারা দেবতা প্রীত বা অপ্রীত হইয়া জীবের অপবর্গ ভোগ বা সাধনের সুবিধার জন্য আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তাহাকে অনুগ্রহ করেন। তুমি যে আজ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখা শুনা করিতেছ—ইহা ঐ দেবতার অনুগ্রহে। ঐ মহাদেবের চক্ষু সূর্য্য—তাঁহার আলোকে তোমার চক্ষু অনুগৃহীত হইয়া আপন অপবর্গ বা ভোগসিদ্ধির জন্য স্বকার্য্য দর্শনীয় বা অদর্শনীয়রূপ দর্শন করিয়া থাকে। এইরূপ কর্ণ তাহার শ্রুতিস্বরূপ দিকের অনুগ্রহে—মন তাঁহার মনস্বরূপ চন্দ্রের অনুগ্রহে, প্রাণ তাঁহার প্রাণস্বরূপ বায়ুর অনুগ্রহে স্ব স্ব কার্য্য বা অকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপে জীব প্রতিপদবিক্ষেপে অনুগ্রাহক দেব হিরণ্য গর্ভের নিকট অনুগৃহীত হইয়া কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্ম ফুরাইয়া ফেলে। কর্ম্মক্ষয়ে জীব, দেবতার নিকটে অনুগ্রহ লাভের অযোগ্য হয়। দেবতা আপন অঙ্গ শক্তি প্রত্যাহার করেন,—জীব তখন দেখিতে শুনিতে, চলিতে, বলিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। তখন জীবের ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি দেবতার অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইয়া নিরাশ মনে আপন গৃহে ফিরিতে বাধ্য হয়। চিন্তা কর দেখি—সে দিন কি ভীষণ! জীবের অফুরন্ত বিষয়বাসনা হৃদয় ভরিয়া রহিয়াছে, তথাপি জীব যখন একটিও বাসনা পূর্ণ করিতে পারে না—একবার ভাব দেখি সে কি দুঃসময়! অতৃপ্তরূপ তৃষ্ণায় দৃষ্টি আকুল, কিন্তু লীলাকমলনিভ আপন নয়নযুগল স্পন্দনে শক্তি নাই; শ্রবণশক্তি প্রতিহত হইয়া দ্বিগুণ বুভুক্ষিত—আহার সম্মুখে, আহরণের সামর্থ্য নাই। এইরূপ আশেপাশে সব থাকিতেও

জীবের যখন কিছুই থাকে না,—থাকে কেবল বাসনার লোল রসনা আর বিষয়-স্মৃতির মুর্ম্মুর দহন। একবার ভাবিয়া দেখনা সে কি বিকট দৃশ্য! তুমি এই অবস্থার আগুণে পুড়িয়া কেবল অন্যকে কাঁদাইয়া নহে,—আপনি মর্ম্মে মর্ম্মে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়া দেহত্যাগ কর। অহো! কি ভীষণ সেই মৃত্যুযন্ত্রণা!

অগো এ যে আরও ভীষণ! এরূপ কত ভীষণ চিত্র তুমি দেখাইবে? কেন আর দেখাইবে, আমি আর ইহা লইয়া থাকিতে চাইনা—বল আমি কোথায় গেলে জুড়াইব? অনন্ত জন্মমরণস্মৃতির তুষানলে উত্তপ্ত এই হৃদয়ে জুড়াইবার স্থান কি নাই?।

আছে। তাহা তোমাকে আপাততঃ বলিতেছি—দেখ জীব শেষের দিনে নিরাশ হইয়া কর্ম্মচ্যুত কর্ম্মচারীর গৃহগমনের মত যেস্থানে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়, তুমি এখন হইতে সেই স্থানে যাইতে অভ্যাস কর দেখি। জীবন, থাকিতে থাকিতেই মরিয়া মরিয়া মৃত্যুমারণে অভ্যস্ত হও দেখি তুমি অমর হইয়া যাইবে। মৃত্যুর সময় জীবের কি অবস্থা হয়? শ্রুতি বলেন 'হৃদয়মেবাম্বব-ক্রামতি' বিভিন্ন দেশ প্রস্থিত প্রাণ তখন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে লোভনীয় ক্রীড়া কন্দুক দূরে ফেলিয়া হৃদয়দেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। তুমি এখন হইতে সুদূর প্রস্থিত আপন চিত্তকে প্রবুদ্ধ করিয়া আপন অঙ্গদেবতাস্বরূপ প্রাণসমূহ হৃদয়ে আনয়ন করিতে অভ্যাস কর, মৃত্যুর জাজ্জ্বল্যমান ভীষণ ছবি দেখাইয়া তুমি আকুল হওয়া মাত্র তোমার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবর্গ বিদেশ-বিতৃষ্ণ হইয়া মাতৃ-ক্রোড়ে ফিরিবে। মনে করিও না মাতৃক্রোড় কথার কথা, কাব্য কল্পনা, সত্য সত্যই মা তোমার জন্য কোল পাতিয়া বসিয়া আছেন; সন্তান স্মরণে প্রস্নতস্তনী সর্ব্বদা তোমার আশাপথ চাহিয়া আছেন; সত্যবটে তিনি সহজানন্দ-গৃহিণী রাজ-রাজেশ্বরী কিন্তু সন্তান-বিরহিণী। রাজরাজেশ্বরী হইলেও পথের কাঙ্গালিনী। একবার তাঁহারদিকে উন্মুখ হইয়া চলিতে থাক। ঐ দেখ তোমার সুশোভন হৃদয়কমলাসন, ঐ দেখ তন্মধ্যে ষট্‌কোণ মধ্যবর্ত্তি ত্রিকোণাসনে দ্বিজাতিজনপ্রসূত সাবিত্রী,—তাঁহার পূর্ব্বদ্বারে প্রাণ-চক্ষু ও সূর্য্য, দক্ষিণ দ্বারে ব্যান শ্রুতি দিক্; পশ্চিমদ্বারে অপান, পৃথিবী ও অগ্নি; উত্তর দ্বারে সমান, বিদ্যুৎ ও পর্জ্জন্য; উর্দ্ধদ্বারে উদান, আকাশ ও বায়ু। ভাবিও না, ইনি নিজেই সীমাবদ্ধ শান্তমূর্ত্তি—আমাকে অন্তশূন্য অসীম অবস্থায় লইয়া

মৃত্যুমুখ হইতে ইনি কি উদ্ধার করিতে পারিবেন? তোমার গ্রহণের জন্যই ইনি সীমাশূন্য হইলেও আজ সসীম, অনন্ত হইলেও শান্ত। তুমি ইহার জ্যোতি-সাগরে আপন মনজ্যোতি আহুতি দেও,—দেখিবে অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত ঘৃতধারা যেমন অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ইনিও আহুত তোমার চিত্তকে আপন প্রভায় একীভূত করিয়া বিরাট্ মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছেন। তুমি ভাবনারূপ শিল্পযন্ত্রের ক্ষুদ্রতায় ক্ষুদ্র মনোময় ঘট নির্ম্মাণ করিয়া যাঁহার জ্যোতিসাগরে ডুবাইয়া অত্যল্প মাত্র মানস জ্যোতির অধিকারী হইয়াছিলে, আজ সে ঘট চূর্ণ হইয়া এক অখণ্ড জ্যোতির সাগররূপে তুমি পূর্ণ হইয়া গিয়াছ; আর ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র ব্যষ্টি-সুষমা তোমাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে; সত্য সত্যই তুমি রাজরাজেশ্বরীর সন্তান হইয়া গিয়াছ—এই অবস্থা লাভ ঘটে প্রাণ-প্রয়াণে; এইজন্যই প্রবাসী সন্তানের গৃহে প্রত্যাগমনোৎসবের উপমা লইয়া প্রাণ-প্রয়াণোৎসব শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। তুমি মৃত্যুভীত মার্কণ্ডেয়ের মত মৃত্যুঞ্জয়কে জড়াইয়া ধরিতে প্রাণ-প্রয়াণ অভ্যাস কর,—দেখিবে সাধারণের নিকট প্রাণ-প্রয়াণ মৃত্যু হইলেও তোমার নিকট উহা উৎসব কেন—মহোৎসবরূপে প্রতিভাত হইবে। তখন বুঝিবে শ্রুতি 'মধুমতী নামে পরিচিত হইয়া কোন্ অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রুতি বলিয়াছেন—মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধী র্মধুনক্ত মুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধুদ্যৌ রস্তনঃ পিতা, মধুমান্নোবনস্পতি র্মধুমাঁস্তু সূর্য্যো মাধ্বী র্গাবো ভবন্তুনঃ"।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সহঃ সম্পাদক (৺কাশীধাম)।

ঋষিগণের পদানুসরণ প্রয়াস।

(চতুর্থ প্রবন্ধ)

পূর্ব্ব তিন প্রবন্ধে যাহা বলা হইল; তাহা প্রথমে সংক্ষেপে আলোচনা করিলে ভাল হয়।

আচ্ছা। প্রথমে সংসারের সমস্তই যে অনিত্য, সমস্তই ক্ষণস্থায়ী—এই ভাবনা কর। এখানকার সমস্তই এই আছে, এই নাই। এমন কি, মানুষের

দেহ, মানুষের সঙ্কল্প বিকল্পযুক্ত মন,—ইহারা পর্য্যন্ত স্থায়ীভাবে থাকে না। আর অস্থায়ীকে স্থায়ী করিবার চেষ্টাটাই দুঃখের কারণ। সংসারটা দুঃখপূর্ণ। এই চিন্তা দ্বারা আগে মনটাকে কম্মে বসাও। বসাইয়া মনকে স্থায়ী যাহা তাহার কথা শ্রবণ করাও। তাহাকে পাওয়া যায় কিরূপে—সেই উপায়গুলি চিন্তা কর, করিয়া তাহাই মনের সম্মুখে ধর।

আচ্ছা এখন বল যাহা বলিবে—

পাইবার বস্তু কি ?

পরম পদ। অনায়াস পদ।

কিরূপে পাওয়া যায় ?

উপাসনা করিলে।

কাহার উপাসনা ?

বরণীয় ভর্গের।

অনেকগুলি প্রশ্ন আছে।

বল।

বরণীয় ভর্গ কে ? তিনি কোথায় থাকেন ? কিরূপেই বা তিনি মিলাইয়া দেন ? তাঁহার উপাসনাই বা কিরূপ ?

একটি একটি করিয়া প্রশ্ন কর ও তাহার উত্তর শ্রবণ কর।

আচ্ছা। বরণীয় ভর্গ কোথায় থাকেন ?

ব্রহ্মাণ্ডে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাহা বা অনুভবগ্রাহ্য যাহা তাহার মধ্যেই বরণীয় ভর্গ থাকেন।

কিরূপে থাকেন তাহা পরে শুনিব—আগে বল তিনি কি ?

তিনি ভূলোক, তিনি অন্তরীক্ষ লোক, তিনি স্বর্লোক, তিনি মহলোক, তিনি জনলোক, তিনি তপলোক, তিনি সত্যলোক, তিনি ক্রীড়াশীল, দীপ্তিশীল, সর্ব্ব-প্রসবিতার বরণীয় ভর্গ। তাঁহাকে ধ্যান করিলে, তিনি আমাদের সারভূত অতিসূক্ষ্ম নির্ম্মলবুদ্ধি বা বিচারশক্তিকে রমণীয়দর্শনের পরমপদে পৌঁছাইয়া দেন। তিনি আপোজ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরোঁ।

প্রথমে বলিলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা অনুভবগ্রাহ্য যাহা কিছু তাহার মধ্যে তিনি আছেন। আবার বলিতেছ সবই তিনি। ইহা কিরূপ ? তিনি ভূরাদিলোক প্রকাশ করেন আর তিনিই সব। ইহার মধ্যে অনেক কথা আছে।

তিনি কি আগে বুঝ। পরে সমস্ত বুঝিবে।

আচ্ছা।

জীবের মধ্যে তিনি অমৃত। জীবের মধ্যে তিনি চেতনা।

অন্য সব ছাড়িয়া চেতনা হইতে আরম্ভ কর কেন?

ইহা সহজে অনুভবে আসিবে তাই। জীবের মধ্যে তিনি যে চেতনা তাহা কোথায় পাও?

শ্রুতি-বাক্যে। আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরোঁ। এখানে যে অমৃত কথাটি আছে—সেই অমৃত অর্থে চেতনা।

কেন?

যাহা মরে না তাহাই অমৃত। জীবের মধ্যে চৈতন্য যেটি তাহাই মরে না। তাই অমৃতই চেতনা। জীবের মধ্যে চেতনাটিই ভর্গ। ভর্গই গায়ত্রী। ভর্গই শ্রীভগবান্।

ভর্গই শ্রীভগবান্ কিরূপে?

ভর্গকে চেতনা বলা হইল। স্মৃতিতে ভগবান্ বলিতেছেন "ভূতানামস্মি চেতনা"। কাজেই চেতনা বা ভর্গই ভগবান্।

ভর্গ ও বরণীয় ভর্গ কি এক?

গায়ত্রী ধর্ম্ম কি অগ্রে তাহাই দেখ।

যো নঃ প্রচোদয়াদিতি কামঃ! কাম ইমান্ লোকান্ প্রচ্যাবয়তে।

যো নৃশংসো যোঽনৃশংসোঽস্যাঃ স পরো ধর্ম্ম ইত্যেষা বৈ গায়ত্রী ॥

যিনি আমাদিগকে চালিত করেন ইহা কাম। কামই এই সকল লোককে চালিত করে। যিনি নৃশংস, অনৃশংস গায়ত্রীর তাহাই পরম ধর্ম্ম।

যে কাম অসৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়া নৃশংস, যে কাম সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়া অনৃশংস—এই দুইরূপে পরিচালনা করাই গায়ত্রীর অসাধারণ ধর্ম্ম। অসৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তনারূপ ধর্ম্ম যাঁহার—তিনি ভর্গ হইলেও উপাসনীয় ভর্গ নহেন। সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তনা রূপ ধর্ম্ম যাঁহার—তিনিই বরণীয় ভর্গ।

জীবের মধ্যে যে চেতনা তাহাকেত ভর্গ বলিতেছ। এখানে নৃশংস ও অনৃশংস ধর্ম্ম কোথায়—তাহা দেখাইয়া দিলে ভাল হয়।

আচ্ছা মনোযোগ কর।

গাঢ় নিদ্রাভঙ্গ হইবার পরই কিছু কি অনুভব হয়?

হয়! মনে হয় তখনই চেতনা পাইলাম! কিন্তু এই উঠি—এই উঠি—করিয়া বিছানায় পড়িয়া থাকি। যখন উঠি, তখন দেখি কত কি যেন স্বপ্নের মত মনের মধ্যে বহিয়া যাইতেছিল।

"সুষুপ্তং স্বপ্নবৎ ভাতি"। সুষপ্ত অবস্থাই স্বপ্নবৎ প্রকাশ হয়। স্বপ্নবৎ—ঠিক স্বপ্ন নহে, স্বপ্নের মতন। সুষুপ্তিতে যে চেতনা থাকে তাহাতে অহংবোধটি পর্য্যন্ত থাকে না। এখানে অহংবোধক যে খণ্ড-চৈতন্য তাহা অহংশূন্য অখণ্ড-চৈতন্যের সহিত মিলিত হইবার পরেই মিশ্রিত হইয়া এক হইয়া যায়—সগুণ যাহা তাহা নির্গুণে মিশ্রিত হয় বলিয়া দুই আর থাকে না, একই থাকেন। যেমন মহাপ্রলয়ে সমস্ত দিক্‌দেশাগত জলধারা এক মহার্ণবে মিশিয়া যায়, সেইরূপ পরমশান্ত পরমপদ মাত্রই তখন থাকেন আর কিছুই থাকে না।

সুষুপ্ত অবস্থা আরও স্থূল হইয়া যখন স্বপ্নমত হয়—তাহার পরে ইহা আরও স্থূল হইয়া যখন জাগ্রৎ অবস্থা আইসে, তখন চেতনাকে একবার লক্ষ্য কর।

জাগিয়া উঠিয়াই শয্যার উপরে পদ্মাসনে উপবেশন কর। দেখিবে তোমার চেতনা তখন স্বপ্নের মত কত কি দেখাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরেই তুমি নানা জাগতিক চিন্তার উদয় স্পষ্ট ভাবে মনে করিতে পারিলে। এই সময়ে তুমি একটু বিচার কর।

বিচার কর—এই ত সুষুপ্ত অবস্থায় যেন অচেতন মত ছিলাম। অন্য কিছুই ছিল না। শুধু আপনি আপনিই ছিলাম। এখন তন্দ্রভঙ্গে আমি বহুভাবে যেন ভাবিত হইতেছি। কত কি ব্যবহারিক বিষয় দেখিতেছি। যাঁহার স্পর্শে আমি চেতনাপ্রাপ্ত হইলাম, তাঁহার সাহায্যেই আমি আপনার আপনি আপনি ভাবটি একবার স্মরণ করি। আহা! কি সুন্দর অবস্থা ইহা। কি অনায়াস পদে আমি স্থিতিলাভ করিয়াছিলাম। আহা! এই পরম পদ, এই অনায়াস পদই আমি। এখানে কোন ক্লেশ নাই। ইহাই আনন্দে স্থিতি। ইহাই সচ্চিৎসুখং পরমহংসগতিং তুরীয়ম্। সৎচিৎ সুখস্বরূপ পরমহংসগতি তুরীয় পদই ইহা। এই তুরীয় পদই আপনা হইতে স্বভাবতঃ উত্থিত মায়া বা সঙ্কল্প সাহায্যে জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রাপ্ত হন। যৎ স্বপ্ন জাগর সুষুপ্তিমবৈতি নিত্যং তৎব্রহ্ম নিষ্কলমহং ন চ ভূত সঙ্ঘ।

ইনিই স্বপ্ন জাগ্রৎ সুষুপ্তি অবস্থা নিত্য লাভ করেন। আমি এই ব্রহ্ম। আমি ভূতসঙ্ঘ নই।

এখন দেখ যে চেতনা তোমাকে জগৎ দেখায়, সে চেতনা উপাসনীয় নহে, কিন্তু যে চেতনা তোমাকে সেই পরমপদে স্থিতির অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন তিনিই বরণীয় ভর্গ।

এখন দেখ বরণীয় ভর্গ আমাদের ধী কে, আমাদের উত্তম বুদ্ধিকে, ব্রহ্ম পথে প্রেরণ করেন। আমরা তাঁহাকে ধ্যান করিলেই, তিনি সেই রমণীয়-দর্শনকে দেখাইয়া দিয়া থাকেন। দেখিতেছ না—বিচার করিলে তবে না আমরা সেই অনায়াস পদকে স্মরণ করিতে পারি? সেই তদ্বিষ্ণুর পরমপদকে নিত্য স্মরণ করিতে পারিলে আমরাও দেবতাদিগের মত সেই পরমপদ দর্শনে সমর্থ হইব।

সুষুপ্তিকালে আমরা যে পরমপদে মিশ্রিত হইয়া যাই—হইয়া যখন আমরা সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দে স্থিতিলাভ করি—বিচার দ্বারা আমাদের অনাদি-সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কারের বাধ হয় না বলিয়াই আমাদিগকে পুনর্ব্বার জাগ্রৎকালে সংসারতরঙ্গে ভাসমান হইতে হয়; কিন্তু সাধনা দ্বারা মনোনিবৃত্তি ও বাসনাক্ষয় হইলে, তখন জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি আয়ত্বাধীন হয়—তখন সেই অনায়াস পদে থাকিয়াই আপনা হইতে স্বভাবতঃ উত্থিত মায়াকে অধীন করিয়া, মায়াধীশ হইয়া, মহামৎস্যের মত আমরা এই জীবননদীর উভয়কূল যে জাগ্রৎ স্বপ্ন তাহাতে বিচরণ করিতে পারি; আবার ইচ্ছা হইলেই মধ্যনদীর অগাধ সুষুপ্তি-জলে ডুবিয়া গিয়া তুরীয় পদে আপনি আপনি স্থিতিলাভ করি। অবস্থাত্রয় আয়ত্তাধীন করিলে যে সুখ হয়, তদপেক্ষা সুখের অবস্থা মানুষ কল্পনা করিতে পারে না।

তাই বলা হইতেছে, যতদিন না সাধনা পরিপক্ক হইতেছে, ততদিন সাধনা কর; কিন্তু সাধনা অন্তে এবং অন্য অন্য কর্ম্ম অন্তেও বাসনানন্দে যতক্ষণ পার ততক্ষণ স্থিতিলাভ করিতে যত্ন কর।

পরমপদ, তুরীয়পদ, অনায়াসপদই ব্রহ্মানন্দ। আর পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া সেই সুষুপ্তিকালের আনন্দ অবস্থা স্মরণ করাই বাসনানন্দ।

বরণীয় ভর্গস্বরূপ প্রণব উপাসনা দ্বারা এই পদ লাভ হয় বলিয়াই, ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যা উপাসনা করেন; সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে প্রণবের প্রয়োগ এই জন্য। প্রণব এই রমণীয়-দর্শনের সহিত আমাদিগকে মিলিত করিয়া দেন। প্রণবই পূর্ব্বোক্ত দুই ধর্ম্ম বিশিষ্ট গায়ত্রী।

প্রণব মধ্যে অ উ ম এই তিন শক্তি মিলিত। এই জগৎ শক্তিরই ব্যক্তাবস্থা। সমস্ত শক্তি গঠিত এই ব্রহ্মাণ্ডই প্রণবের মূর্ত্তি। অনায়াসপদের ত্রিপাদ, পরম শান্ত পরমপদ। আর উহার চতুর্থ পাদের কোন এক স্থানে মায়া দ্বারা এই সৃষ্টিতরঙ্গ উঠিতেছে—সেই স্থানটুকুকে পরমপদের সহিত তুলনায় বিন্দু বলা হয়। ইহাই পরমপদে প্রবেশ করিবার দ্বারস্বরূপ। মহাপ্রলয়ে সমস্ত শক্তি যখন ঊর্দ্ধ দিকে স্পন্দন করিতে আরম্ভ করে, তখন অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড শক্তিতে লয় হয়। শক্তি আবার শব্দে লয় হয়। এই শব্দই নাদ। নাদ আবার বিন্দুতে লয়। বিন্দুতে প্রবেশ করিলে আর কোন চলন থাকে না, কোন স্পন্দন হয় না। পরমশান্ত পরমশিবকে স্পর্শ করিলে মহাকালীর নৃত্য বন্ধ হইয়া যায়। শক্তি শক্তিমানে মিশিলে যাহা হয় তাহাই পরমপদ, অনায়াসপদ।

যে ক্রম অবলম্বন করিয়া গায়ত্রী উপাসনা করিলে স্থিতিলাভ হয়, তাহাই ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা।

এই সমস্ত অতিসূক্ষ্ম বিষয় চিন্তা করিতে যদি তোমার রুচি না থাকে, তবে তুমি ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়াছ। ব্রাহ্মণের ইহাতে রুচি না থাকিলে, সে যখন ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়াছে বলা হয়—তখন অন্য জাতির লোকের গলায় একগাছি সূত্র বাঁধিয়া দিয়া কি দ্বিজ করা যায়?

যাহা আলোচনা করা হইল—তাহা দ্বারা এখন সন্ধ্যার মন্ত্রগুলির অর্থ ধারণা করিয়া সন্ধ্যা করা কথঞ্চিৎ রুচিকর হইতে পারে।

সর্ব্বশেষে শ্রীভগবানের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে, তিনি যদি তাঁহার কোন জ্ঞানী ভক্ত ও কর্ম্মী সাধককে ব্রাহ্মণের সন্ধ্যামন্ত্রগুলির পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ ও অর্থ সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিবার প্রেরণা করেন, তবে আমাদের মত পতিত বংশব্রাহ্মণের বিশেষ উপকার হয়।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী।

এ জনম তিথি বিফল না যায়, এস এস নন্দলাল।
সতৃষ্ণ অন্তরে চাহি আশাপথ, রহিব কি চিরকাল?
ঘন ঘন মন তড়িৎ চমকে, যমুনা ভরিল জলে।
গভীর রজনী শুধু মাঝে মাঝে, ডাকে ওই শিবাদলে।
জুড়াতে মায়ের এ তাপিত প্রাণ, এস এস বাপধন।
তেমনি ঝাঁপিয়া দুবাহু পশারি, দাও স্নেহ আলিঙ্গন।
শ্রীমুখ চুম্বনে নূতন জীবন, আবার হইল বাপ।
নব বরিষণে ভুলিল পাদপ, প্রখর রবির তাপ।
মুখে দিয়া ননী, সাজাব আদরে, আয়রে মাখম চোরা।
চাঁচর কুন্তলে বিনাইয়া বেণী, বাঁধিব মোহন চূড়া।
নীলাব্জ নয়নে কজ্জলের রেখা, কনক নূপুর পায়।
মন্থর গতিতে চরণ ফেলিতে, কমল ফুটিল তায়।
কিবা সে সুন্দর রক্ত কোকনদ, চারিটি পাপড়ি তার।
নবারুণ বর্ণে সুসজ্জিত শিশু, বল বল তুমি কার?
নীল বরণ দশ দল পদ্মে বয়সে কিশোর তনু।
প্রতি অঙ্গে খেলে লাবণ্য লহরী, যেন কোটি শশী ভানু।
রাধা নামাঙ্কিত উজ্জ্বল মুকুট, নূপুরে চন্দন বিন্দু।
নাসাগ্রে মুকুতা শ্যাম জলধরে, শোভিছে শরৎ ইন্দু।
কমল নয়নে করুণার ধারা, ঝরিছে নির্ঝর প্রায়।
ভৃগু পদাঙ্কিত শ্রীলক্ষ্মী বিলাস, কৌস্তুভ শোভিত তায়।
সুভঙ্গ ভঙ্গিতে মৃদু মন্দ হাসি, বাঁশিটি ফেলিয়া আজি।
বল মনোচোরা! মণিপুরে এলে, একি অপরূপ সাজি।
কোথা সে নয়নে তরল চাহনি, সে নব যৌবন ছটা।
কোথা বা শৈশব এবে কোন বেশ, মৌলে বদ্ধ দীর্ঘ জটা
প্রলয়াগ্নি সম জ্বলে ত্রিনয়ন, যেন কোটি রবি মাঝে।
উথারি অমৃত কত সুশীতল, চন্দ্রদল কিবা রাজে।
জ্ঞান ভক্তি প্রেম ত্রিনয়ন ধারা মৌলি বদ্ধ গঙ্গাজল।
সোহাগে তরল তরঙ্গে চুমিছে, আপন জনম স্থল।
তুষার মণ্ডিত হিমাদ্রি শিখরে, যেমন ছুটিল ধারা।
স্নেহে স্বয়ম্ভু বিভক্ত করিল, তাহার তিনটি ধারা।

নিরমল জ্যোৎস্না উঠিল ভাসিয়া, হৃদাম্বর আলো করি।
বৈদিক বাক্যের প্রথম ঝঙ্কারে, হৃদয় যাইল ভরি।
আবার ও কি ও ষট্‌কোণে কেন, একি এ ভীষণ দৃষ্টি।
যা দেখাও তুমি ঈশান ঈশ্বর, সকলি তোমারি সৃষ্টি।
এস কণ্ঠদেশে প্রসন্নাত্মা শিব, শিব শিবা একাকার।
সর্ব্বস্ব সুহৃদ মানস অতীত, এসেছ যেওনা আর।
দ্বিদল কমলে মনোময় অলি, লুবধ ভ্রমর মত।
পদ্মে পদ্মে ভ্রমি এমনি করিয়া, গোঁয়াবে জনম কত?
ওকি দিব্য জ্যোতি দিগন্ত ব্যাপিয়া, সহসা ভাসিল প্রাণে।
ওকি বেদধ্বনি সুর তাল ভরা, এখনও বাজিছে কানে।
ওকি সৌম্যমূর্ত্তি দেবর্ষি নারদ, করি শত নমস্কার।
এসেছ বাল্মীকি কবি কুল গুরু, বল বল আর বার।
হৃদয় কাননে সুকণ্ঠ গায়ক, হরে রাম হরে রাম।
হউক জীবন্ত চতুর্বর্গ ফল ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম।
ওকি দিব্য মূর্ত্তি স্বতঃই উজ্বল, এস বাঞ্ছা কল্পতরু।
মন্ত্র দাতা গুরো মায়ার মুরতি, সকল শাস্ত্রের গুরু।
বল বাগীশ্বর! কেন নাহি যায়, এ মহা আমিত্ব জ্ঞান।
সর্প নাহি যদি তবে কেন ওঠে, রজ্জুতে সর্পের ভান।
দাও কর্ণমূলে তারকব্রহ্ম নাম, এ শুভ মুহূর্ত্তে হরি।
কি কাজ বিচারে বসি স্থিরাসনে, শ্রীগুরু স্মরণ করি।
ধারণা অভ্যাসে হক্ প্রাণপণ, তন্ময়ত্ব দাও আসি।
নিত্য আশীর্ব্বাদে ধৌত কর গুরো! এ মহা পাতকরাশি।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী।

(১)

ভণিতা।

৺দাশুরথী রায়ের পাঁচালী—

এই সভ্যতার দিনে আবার পাঁচালী?

শোন ঐ বালক কি বলিতেছে? বলিতেছে কাল হইতে ত অবকাশ শেষ হইতেছে। আজকার দিনটা সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিলে হয় না? কাল হইতে আবার ত যুথিয়া দিবেন।

কি করিতে চাও।

চলুন একটু বেড়াইয়া আসি। আজই সন্ধ্যার সময় ফেরা যাইবে।

কোথায় যাইবে?

এই রেলে রেলে ভ্রমণ। কোন ষ্টেশনে গিয়া তিন ঘণ্টা থাকিয়া পরে ফেরা যাইবে।

কতদূর পর্য্যন্ত যাইবে তাহা কি ঠিক করিয়াছ?

করিয়াছি। রাণীগঞ্জ। সঙ্গে থাকিবে এক চা আর চ—পম—ফে আপনি আর আমি।

আচ্ছা।

হাওড়া ষ্টেশনে ১০টা কি ১০॥০ টার গাড়ী। রবিবার জন্য সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সারিয়া ইহারা চলিল। দুইজন সেকেণ্ডক্লাসে আর সকলে ইন্‌টারে।

সেকেণ্ড ক্লাসে অনেকগুলি বাবু। এই দুই ব্যক্তি গাড়ীতে উঠিবামাত্র বাবুরা মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া লইলেন। এক বালকের মাথায় শিখা ছিল অর্থাৎ টিকি ছিল। এক সভ্য নব্য যুবক ঠাট্টা করিলেন বলিলেন শূকরের ল্যাজটা মাথায় কেন? বালক বলিল যদি বাবাকে কেহ বলে ধাঙ্গড় তবে কি বাবাকে ত্যাগ করিতে হইবে?

পিগটেলও কি ঐ প্রকার?

কমত কিছুতেই নয়। এখন সঙ্গের বৃদ্ধটি কথা কহিলেন। বলিলেন মহাশয়! টিকি রাখায় বালকের কি অপরাধ হইল?

আপনারও মাথায় আছে নাকি?

আছে বৈ কি। ইহা যে হিন্দুজাতির চিহ্ন। শিখা সূত্র না থাকিলে ব্রাহ্মণই হইতে পারে না। ইহা বেদের আজ্ঞা। আপনি হিন্দু। অথচ বেদ অমান্য করিয়া লোকে পিগটেল বলে বলিয়া লজ্জায় রাখিতে পারেন না। শিখা নাই বলিয়া আপনারই লজ্জিত হওয়া উচিত। আপনি বালককে কি লজ্জা দিতেছেন? হিন্দু হইয়াও আপনি চিত্তের দুর্ব্বলতা জন্য হিন্দুজাতির জাতীয়ত্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। এ কি রকম আপনাদের স্বদেশানুরাগ বোঝা যায় না। যুবকটি কিছু অপ্রস্তুত হইল। বলিল মহাশয়! শিখা না রাখিলে কি দোষ হয়? বৃদ্ধ বলিলেন ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা আহ্নিক করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শিখা না রাখিলে তিন বেলা মিথ্যা ব্যবহার করিতে হয়। শিখাই রাখেন না

অথচ শিখায়ে বষট্ ইহা বলা হয় কিরূপে? বিশেষতঃ বেদমতে শিখা না রাখিলে, কোন ধর্ম্ম-কর্ম্মের অধিকারী হওয়া যায় না। যদি বলেন সন্ধ্যা আহ্নিক না করিলেই বা কি হয়? তবে আর হিন্দু বলিয়া গৌরব করেন কেন? যাহা ইচ্ছা করিবেন, যাহা ইচ্ছা খাইবেন—অথচ বলিবেন হিন্দু; ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দশা আর কি হইতে পারে?

কথাবার্ত্তা চুপ হইয়া গেল। বালক একখানি ইংরাজী পুস্তক পড়িতে লাগিল। বৃদ্ধ সঙ্গে দুই তিন খানি মাসিক পত্র আনিয়াছিল। প্রথমে ভারতী দেখিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে ভারতবর্ষ দেখিতে লাগিল। পরে এই সব ত্যাগ করিয়া, একখানি পাঁচালী বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। এখানি দাশুরায়ের পাঁচালীর ষষ্ঠখণ্ড। প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী।

বৃদ্ধ সেই যুবককে বলিতে লাগিল—দেখুন, এই যে আজকালকার সংবাদ পত্র ইহাতে শুধু ক্ষণিক চিত্তবিনোদনের কথাই থাকে। কাজের কথা বড় বেশী একটা থাকে না। ক্ষণিক চিত্তবিনোদনই এত প্রয়োজন? এই রেলে যাইতেছি। বাহিরের প্রকৃতির কতই নূতন দৃশ্য দেখা যাইতেছে। ইহাতেও ত চিত্তবিনোদন হয়। শুধু এদেশের ওদেশের কতকগুলি সংবাদ জানিয়া চিত্তবিনোদন করাই কি জীবনের উদ্দেশ্য? এই জীবনে আমাদিগকে কত গুরুতর কার্য্য করিতে হইবে। ডিটেক্‌টিভের গল্প, না হয় উপন্যাস, না হয় খবরের কাগজের সংবাদ পড়িয়া পড়িয়া চিত্ত এত তরল হইয়া যায় যে, জীবন গঠনের জন্য যে কঠোর স্বাধ্যায় ও সাধনা করা আবশ্যক, তাহাতে আদৌ রুচি থাকে না। কঠোর সাধনা লইয়া যাঁহারা থাকেন, তাঁহারা না হয় একটু আধটু চিত্তবিনোদনের সাহায্যে চিত্তকে আবার আপনার সাধনায় নিয়োগ করিবার জন্য ইহা উহা দেখিতে পারেন, কিন্তু ঐ সব বিষয়ে নেশা করা কি উচিত?

উপন্যাস পড়িয়া পড়িয়া আমাদের স্ত্রীলোকদিগের কি হইতেছে তাহা ত দেখিতেছেন। স্বামীর সহিত কিছুদিন সংসার করা হইয়াছে—সন্তান সন্ততিও হইয়াছে—তাহার পরে এমন স্ত্রীও অন্যাসক্ত হইতেছে। আর বলিতেছে আমার পিতামাতা যে বিবাহ দিয়াছিলেন সেটা বিবাহই নয়, এজন্য আমি গান্ধর্ব্ব মতে এই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়াছি। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত আজকাল প্রায়ই দেখা যায়। ইহা উপন্যাস পড়ার ফল। দেখিতেছেন না—স্ত্রীলোকের

মধ্যে যেমন সতীত্বের ধারণা নাই, পুরুষের মধ্যেও সেইরূপ পবিত্রতার ধারণা নাই। তার পরে শাস্ত্রে বিশ্বাস ত প্রায়ই দেখা যায় না। দেব-দ্বিজে ভক্তি নাই, ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস নাই, পিতাকে কখন পরমপিতা বোধে জীবনের সার্থকতা করা হয় নাই, মাতাকে কখন জগজ্জননী ভাবিয়া পূজা করা নাই—বলুন সমাজ কোন্ পথে চলিতেছে? এই সব ছাড়িয়া, প্রাচীন আর্য্যদিগের সুন্দর সুন্দর আদর্শ ত্যাগ করিয়া আমরা সমাজে কি ঢুকাইতেছি? আর ইহাতেও কি কোথাও শান্তি আছে? কি একটা অশান্তি যেন হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। বহুদিন হইতে হিন্দুসমাজে এই রোগ ঢুকিয়াছে। এই পাঁচালীতেও সমাজের ব্যাধির কথা অনেক প্রকারে দেখান হইয়াছে।

দাশরথি কি বিখ্যাত লোক ছিলেন? ছিলেন কি না ছিলেন তাহা তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়া দেখিলেই বুঝিবেন। কিন্তু আমি দেখি, তাঁহার অনেক কথা সমাজে চলন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার লেখার মাধুর্য্য না থাকিলে, সমাজ সে সমস্ত কথা ব্যবহার করিত না।

দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইবেন কি?

আচ্ছা দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

"বলে মা কি কল্লি কালী একবারে পয়মাল"; "যে জন কৃষ্ণগুণ গায় কংস শুনিলে কৃষ্ণ পাওয়ায়"; "বেঁধে পূরিত হরিণ বাড়ীতে"; পৃথ্বীর বুঝি ঘৃণাপিত্তি লোপাপত্তি হয়েছে একবারে"; "যদি কখন মরণ হয়, সাধিব ওঁকে সেই সময়, কাজ নাই কোন কথায়, মাথায় থাকুন উনি; "তোমার হাঁড়িতে বসেছে কথা, বাহির হয়েছে যমের খাতা, পাকা ফল আর কদিন রয় গাছে"; "কই লঙ্কা জয় হ'ল, লঙ্কা যদি ফিরে এল, নাগাদ সন্ধ্যা রাবণ আসতে পারে"; "যেমন কান্না তেমনি হাঁসি"; "হেদে "ভ্যাড়াকান্ত ন্যাড়া গুল"; "গোরায় জাত খেয়েছে"; "খোল বাজালেই শুচি"; "তোমাকে ভজিতে দয়াময়, ঘরকন্না সমুদয়, দয়েতে দিয়েছি দয়াশীল"; "মন্দ কথার গন্ধ পেলে অতি শীঘ্র ছোটে"; "মানটা গেলে প্রাণটা যেন ফটা নাড়ার মত"; "ভক্ত-প্রিয় মাধব"; "ও ননদি পাতাল কত দূরে"; "দয় মজায়ে দায়েম কাননে'; "পরিচয় দেন আমি ফুলে, কিন্তু হাত কভু দেন না ফুলে, ফুল ত আর কিছু দেখিনে কেবল লেজটা আছে ফুলে"; "যত বেটারা ধুমড়ি ধরা"; "অতএব

সতী লোপাপতা" ; "এখন পদে পদে প্রায় পদাঘাত, পদে পদে দেকদারী" ; "যত বুড়টে গেছো পেত্নী" ; "কাকে লাগে ফিঙ্গে, যেমন বাঘে লাগে ফেউ" "মন কলা খাও মনে মনে" ; "দৈবে কলঙ্কিনী হওনা, স্থান পাওনা ক্ষণ পাওনা , ফিকির পেলে ফকির করে দাও" ; "ঘোম্‌টা খুলে কবির লড়াই হয়" "নারীদের যেমন নারিকেল কাড়াকাড়ি" ; "খই ফুটে যায় মুখে" ; "ছিছি কি বদনামি" "আকাঁড়া চাল, দিলে ভিক্ষা লন না" ; "তালপত্র ছায়ার তুলনা" ; গর্জ্জিয়ে উঠিল যেন কালভুজঙ্গিনী" ; 'আলো নিভালে সম্বন্ধ থাকে না" ; "পুরুষের কপালে ঝাঁটা" ; "ল্যাজ তুলে দেখে না" ; "সিদ্ধান্ত পুঁতে পাঁকে,' ; "না পড়ে হয় পণ্ডিত" ; "পেটটা ফুলে হ'তো ঢাক, উড়িত ছিল পড়িত কাক" ; "গোদা পায়ের লাথী খেতো" ; "দশে ধর্ম্মে দেখ্‌তো পেতো সবে" ; "গায়ে যেন কেউ ছড়িয়ে দিচ্চে বিষ" "প্রায় লক্ষণ চটাচটি, দুইজনে বাণ কাটাকাটি, কেউ উনিশ কেউ বিশ" ; "তোমরা ঢাকা খুলে, ঢাক বাজায়ে, ঢাকা যেতে পার" ; "তোমরা গাছের পাড়, তলার কুড়াও" ; "তিলটি হ'লে তালটি কর তাকে" ; "ঘরে এসে মর্দ্দানী" ; "এক হাতে কি তালি বাজে" ; "তোমার ও মুণ্ডমালার দাঁতখামুটি আমাকে আর সয় না" ; "চিংয়ে দিলে ঘুমান বাঘ" ; "বেল পাকিলে কাকের কি" ; খোঁড়া মেয়ের কানা বর" ; "বয়স প্রায় ঘনাল আশি" ; ইত্যাদি ইত্যাদি।

সত্যই মহাশয়, অনেক কথা যাহা আমরা ব্যবহার করি, তাহা দেখিতেছি দাশুরায়ের।

তাই ত বলিতেছি দাশরথি রায় ক্ষমতাশালী লেখক ছিলেন। তিনি সমাজের তখনকার অনেক দোষ অতি তীব্রভাবে, চমৎকার ভাষায় সমালোচনা করিয়াছেন। এরূপ খাঁটী বাঙ্গালা অথচ মনোহর ভাষা আজকালকার লেখায় দেখিতে পাই না। তাই ভারতী, ভারতবর্ষ ফেলিয়া পাঁচালী দেখিতেছিলাম। বলিতে কি, পাঁচালীতে যেমন সমাজের তীব্র সমালোচনা আছে, তেমনি সমাজের রোগ দূর করিবার জন্য ভক্তিভাবও জাগাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ফলে আজকালকার লেখকগণ দাশরথির নিকট রোগের প্রতীকারটি শিখিতে পারেন।

দাশরথি সমাজের দোষ কিরূপ উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি ভক্তিভাবই বা কিরূপ দেখাইয়াছেন ?

(২)

জন্মাষ্টমী।

যার হরিকথাতে জন্মে মতি, জন্ম হ'তে অব্যাহতি,
ভবে জন্ম না হইবে পুনঃ।
জন্ম-মৃত্যু-হর হরি, ল'বেন তোমার জন্ম হরি,
আজ হরির জন্মকথা শুন"।

রাজা পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণকে অবমাননা করিয়াছেন। ইহার জন্ম তাঁহার গুরুতর দণ্ড হইল। রাজা ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে পড়িলেন। সাতদিনের মধ্যেই তক্ষক-দংশনে তাঁহার মৃত্যু হইবে। রাজার পুণ্যবলও ছিল। তাই এই দুঃসময়ে শুকদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

হরিতে রাজার অসুখ, সুধামাখা বাক্যে শুক
কহিছে, কি চিন্তা মহারাজ!
জন্ম যদি হয় ভবে, তবেই ভয় সম্ভবে,
জন্ম ঘুচিলে সেভয়ে কি কাজ॥

ব্রাহ্মণ যেরূপই হউক না কেন—ব্রাহ্মণের অবমাননা করিলে অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে।

সে কালে যে সকল ব্রাহ্মণই ভাল ছিল তাহা নহে। মহাভারতে, স্কন্দ পুরাণে পতিত ব্রাহ্মণের কথাও পাওয়া যায়। ইহাদের অবমাননাতেও দারুণ অনিষ্ট হয়! আজ কাল এ কথা কেহ মানে না। ত্রেতাযুগে রাবণ রাজাও ইহা মানে নাই।

দাশরথি, ব্রাহ্মণের সুখ্যাতি করিয়া শাস্ত্র সমর্থন করিতেছেন। বলিতেছেন—

শিব-মুখে সর্ব্বদা বাণী, সদা শুনেন সর্ব্বাণী,
সর্ব্ব-তীর্থ ব্রাহ্মণ-চরণে।
এই কর্ম্ম-ভূমি পৃথিবীতে, দ্বিজ হয়েছেন বীজ ইহাতে,
সর্ব্ব-কর্ম্ম বিফল দ্বিজ বিনে॥
যেমন কর্ম্ম বিফল বিনা সত্য, ঔষধি বিফল বিনা পথ্য,
গৃহ বিফল অতিথি নাই যার।

নয়ন বিফল দৃষ্টি বিনে, দৃষ্টি বিফল ইষ্ট পানে—
দৃষ্টি না ভবে যে জনার ॥
হরি বলেছেন নিজ মুখে, ভোজন আমার দ্বিজমুখে,
চতুর্ম্মুখের মুখে ঐ কথাই।
এখন অনেক পাষণ্ডগণে, এরা এখন মনে গণে
কলির ব্রাহ্মণের বস্তু নাই।

"কলির ব্রাহ্মণের বস্তু নাই" এ কথা দাশরথির সময়ে যতদূর গড়াইয়াছিল, এখন তাহা কোটিগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আরও পাইবে। দাশরথি নিজের যুক্তি দিয়া শাস্ত্র সমর্থন করিতেছেন—বলিতেছেন—

ক'রে দ্বিজের অপমান, পায়না ফল বর্ত্তমান,
বিষ নাই ব'লে অনায়াসে বিধবারে ধরে।
কিন্তু অলঙ্ঘ্য দ্বিজের বাক্য, নরের নরক মোক্ষ,
কালে ফলে সেটা মনে না করে ॥

পাপ করে যেই দণ্ডে, তখনি কি যমে দণ্ডে,
পুণ্য কল্লে বাঞ্ছাপূর্ণ তখনি কি হয়।
বৃক্ষ রোপণ যেই দিবে, সেই দিনেই কি ফল দিবে,
কিন্তু ফল ফলিবে নিশ্চয় ॥
যে দিনে কুপথ্য যোগ, সেই দিনে কি হয় রোগ,
কুপথ্য রোগের মূল বটে।
যে দিন ধাত্রী কাটে নাড়ী, সেই দিনে কি উঠে দাড়ী,
কাল পেলে যৌবনে দাড়ী উঠে ॥
যে দিন দেয় খড়ি হাতে, সেই দিনে কি হাতে হাতে,
বালকের পাঠ হয় চণ্ডী।
যে দিন সন্তান পড়ে ভুমে, সেই দিন কি গয়াধামে
গিয়ে, পিতার দিয়ে আসে পিণ্ডি ॥

দাশরথি বলিতেছেন, ব্রাহ্মণের অশীর্ব্বাদ অথবা ব্রহ্ম-মন্যু কালে অবশ্যই ফলিবে—এ কথা বেদে আছে। বেদ কখন মিথ্যা হয় না। "দ্বিজরূপেতে পীতাম্বর" "দ্বিজরূপে চন্দ্রসূর্য্য" চন্দ্রসূর্য্যের জ্যোতিই ব্রহ্মজ্যোতি ইত্যাদি দাশরথি বিশ্বাস করিতেন। তিনি ঐ দুঃসময়ে সমাজকে ঐ শিক্ষাই দিয়াছিলেন। দুই

এক জন হয় ত এ শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল—এখনও হয়ত দুই এক জন গ্রহণ করে। কিন্তু যেরূপ ভ্রষ্টাচারের বর্ষা তাহাতে পাপনদীর বন্যা-রোধ বুঝি আর হয় না। না হইলেও সত্য সত্যই থাকিবে। এরূপ যুগে যুগেই হইতেছে। তথাপি সনাতন ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্মই আছে। এ ধর্ম্মের বিনাশ নাই। এই জাতিরও বিনাশ নাই। শ্রীভগবান্ এই ধর্ম্ম উদ্ধার জন্যই অবতার গ্রহণ করেন।

দাশরথির গান অতি সুন্দর। আজকালকার গানে সে ভাবও নাই; আর সেই সুখও নাই। কাল-ধর্ম্মে সমস্তই পাতলা হইয়া যাইতেছে। "মন মানসে সদা ভজ" 'মুনি ঐ ভয় মম মানসে," "হরি নিদয় হর নিদয়" গিরি যায় হে লয়ে হর" "তুই ঘরে ফিরে এলিরে" "ননদিনী ব'ল নগরে" ইত্যাদি গানের তুলনানাই।

আমরাও বলি নূতন ধরিতে হয় ধর, কিন্তু পুরাতনের যাহা ভাল তাহা অবিচারে বিদায় দাও কেন?

রাজার ভয় নাশ করিতে, শুকদেব জন্মাষ্টমী হইতে আরম্ভ করিলেন। দাশরথি প্রথমে কংসের অত্যাচার বর্ণনা করিলেন। আমোদের স্থান নাই, সকল কথা আমরা তুলিতে পারিলাম না। যাঁহারা আমাদের সহিত ধর্ম্ম-কথা শুনিতে চান, তাঁহারা স্বয়ং দাশুরায়ের পাঁচালী পাঠ করিলেই তৃপ্তি পাইবেন; এ কথা আমরা বেশ বলিতে পারি। তবে বিশ্বাসী হওয়া চাই। দাশরথি কংস সম্বন্ধে বলিতেছেন—

শ্রবণ কর মহাশয়, আশ্চর্য্য এক বিষয়
তখন পুণ্যবান্ সমুদায়, এক পাপী কংস মথুরাতে ছিল।
তার ভার না পেরে ধর্ত্তে, পৃথিবী যান নালিশ কর্ত্তে
ভার সহ্য কোন রূপে না হ'ল॥
এখন বাঙ্গালাটা করিলে অংশ, দশ হাজার জুটেছে কংস
অন্য দেশ ঐক্য করিলে লক্ষ হ'তে পারে।
কিরূপে ভার ধরেন পৃথ্বী, পৃথ্বীর বুঝি ঘৃণাপিত্তি
লোপাপত্তি হয়েছে একবারে॥ ইত্যাদি

ইহার পরে দাশরথি শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, দেবকীর কৃষ্ণরূপ দর্শন, বসুদেবের যমুনা পার, যোগমায়ার রূপদর্শন, কংসের যোগমায়া বধে চেষ্টা, নন্দোৎসব

ইত্যাদি অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা জন্মাষ্টমীর ব্রত করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্রথমে দাশরথি পাঠ করিয়া, শেষে শ্রীভাগবতের দশম স্কন্দ হইতে সমস্ত ঘটনাগুলি পাঠ করিয়া, ঐ দিনে বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়া—পরে সমস্ত ঘটনাগুলি মনে মনে ভাবনা করেন। ইহাতেই শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইবেন—ইহা শাস্ত্রের উক্তি।

জন্মাষ্টমী, রামনবমী, শিবরাত্রি এবং মহাষ্টমী—এই গুলিতে উপবাস অবশ্য কর্ত্তব্য। তপস্যার মধ্যে উপবাসই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। শেষকালে ত কতই উপবাস করিতে হইবে। তবে সুস্থশরীরে দুই চারিটি উপবাস ব্রত করিয়া, শ্রীভগবানের প্রীতিভিক্ষা করিতে আপত্তি কি? সেই মহাযাত্রার সম্বল ত কিছুই নাই। এই ভাবে পাথেয়-সংগ্রহে মহৎ উপকার সাধিত হইবে।

স্বর্ণযুগ।

মাগো তোমার সে দিন কি আর হবে?
ব্রাহ্মণ বেদবিদ্যাযুত,
ক্ষত্র, বৈশ্য সভয়ে নত,
শূদ্র তাঁহাদের সেবায়ে রত,
নিত্য চরণে পুষ্পাঞ্জলী দিবে।
ধরণী শোভিতে, জননী তোমার,
সে দিন কি আর হ'বে?
আদ্য-অতীত গরব-প্রতিমা,
এসো এসো বাণী, এসো এসো রমা,
তন্বী, সুখদা, বরদা, শ্যামা—
মোদের দিন কি এমনি এমনি যাবে?
ধরণী শোভিতে, জননী তোমার
সে দিন কি আর হবে?
ঋক্, যজু সাম বেদের রাগিণী,
ভুবন ভরিয়া উঠিবে ধ্বনি।
গৃহে গৃহে আর কাননে কাননে মধুর রবে।

ধরণী শোভিতে, জননী তোমার
সে দিন কি আর হবে ?
ধরমের পথে চলিবে পথিক,
করমের স্রোতে ভাসিবে গো দিক্,
দিক্ বলয়ে সুরপুরবালা জাগিবে সবে।
ধরণী শোভিতে জননী তোমার,
সে দিন কি আর হবে ?
দেবতারা সব মরতে বিচরি,
রচিবে হেথায়ে স্বরগপুরি,
অতুল শোভায়, তাপিত হৃদয় জুড়ায়ে যাবে।
ধরণী শোভিতে, জননী তোমার
সে দিন কি আর হবে ?
প্রজা হ'বে যাঁরা ঋষির মত,
আদেশ পালন সাধনব্রত,
শোকী, তাপী, পাপী, তাপিত হৃদয় রবে না ভবে।
ধরণী শোভিতে, জননী তোমার,
সে দিন কি আর হবে ?
হিমালয় হ'তে ঝরিয়া পড়িবে মুকুতা কণা।
সাগর হইতে উঠিবে হাসিয়া ফেনিল ফণা,
হোমের অনলে বেড়িবে আকাশ,
মেঘে মেঘে ঘন বিজলী প্রকাশ,
কনক তপন ঘনবর শিরে উদিবে পূবে।
ভুবনমোহিনী জননী তোমার,
সে দিন কি আর হ'বে ?

(মালদহ।)

৺শারদীয়া পূজায় মায়ের উক্তি।

এখনও আমার পূজার দিনের দেরি আছে। কাগজে সেই একঘেয়ে এস মা, এস মা—দেশ বন্যায় ভাসিল, ম্যালেরিয়ায় মরিল—এই পর্য্যন্ত লিখিয়া দিয়াই যদি মনে ভাব তোমার ডাকা শেষ হইল, তবে আমারও আসা তোমার কাছে ঐরূপ জানিও। কিন্তু সত্য সত্যই যদি আমার আসা দেখিতে চাও, তবে এস মা, এস মা এই ভাব লইয়া নিত্য থাকিতে অভ্যাস কর। তিন বেলা আমার আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হও। ব্রাহ্মণের সন্তান যদি ভাব সন্ধ্যা আহ্নিক ত হয় না—মিথ্যা সাপের মন্ত্র আওড়াইয়া কি হইবে—তবে তুমি শূদ্র হইয়া গিয়াছ জানিও। সন্ধ্যা আহ্নিকের অর্থ না বুঝিতে পারিলেও যদি কাতর হইয়া মন্ত্র দ্বারা আমাকে ডাক, তাহা হইলেও আমার আজ্ঞাপালন

হয়। দুর্ভিক্ষপীড়িত, বন্যাপীড়িত, ম্যালেরিয়াপীড়িত লোকের জন্য কাতর হইয়া সেবা করিতেছ ইহাতেও আমার সেবা হইতেছে, আমার আজ্ঞাপালন হইতেছে সত্য—কিন্তু নিত্যকর্ম্ম যদি বাদ দিয়া এই সব কর, তবে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন জন্য তোমার পাপও হইবেই। নিত্যকর্ম্ম ও সেবাকর্ম্ম সমকালে করিতে অভ্যাস কর। নিত্যকর্ম্মই প্রধান। নিত্যকর্ম্ম দ্বারা সেবাকর্ম্ম ঠিক ঠিক হইবে। দুঃখীর সেবা করিয়া যদি মনে না ভাবিতে পার শ্রীভগবানের আজ্ঞাপালন করিতেছি—সেবাকর্ম্মে যদি না ভাবিতে পার সর্ব্বজীবে নারায়ণ-রূপে যিনি লীলা করেন তাঁহারই সেবা করিতেছি—তাহা হইলে তুমি দুঃখীর দুই চারি দিনের সুবিধা জন্য চেষ্টা করিলে মাত্র। "অকরণাৎ মন্দকরণমপি শ্রেয়ঃ" কিছু না করা অপেক্ষা মন্দ ভাবে করাও ভাল—এ কথা ঠিক। কিন্তু পূর্ণভাবে আমার আজ্ঞা পালন করিয়া নিজে সুখী হও, অন্যকেও সুখী কর, এই আমার আজ্ঞা। ইহা হইলেই তোমার কর্ম্ম আর আংশিক হইল না। নতুবা কর্ম্মটা হুজুগ মত হইতে লাগিল। তোমারও বন্ধন ছুটিল না। হাতে পায়ে লোকের সাহায্য জন্য কর্ম্ম কর—ইহা ভাল। কিন্তু মন লইয়া দুঃখীর জন্য প্রার্থনা কর, তজ্জন্য সংখ্যা রাখিয়া আমার নাম জপ কর, ইহাতে কর্ম্ম-গুলি আরও ভাল হইল। আবার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল তখন হইবে যখন "তুমি প্রসন্ন হও" মাত্র ভাবিয়া নিত্যকর্ম্মও করিবে ও সর্ব্বজীবে নারায়ণের সেবাও করিবে।

তাই বলিতেছিলাম, এখনও ৺পূজার বিলম্ব আছে। এখনও কিছু সময় তুমি পাইতেছ। এখন হইতে সকালে, স্নানের পর ও সায়াহ্নে সংখ্যা রাখিয়া আমাকে ডাক। আর কিছু দিন ধরিয়া আমার পূজাটা একটু অভ্যাস কর। কতদিন ত পূজা দেখিতেছ একবার ভাবনায় আমার পূজা কর না। স্নান বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ইত্যাদি ভাবনায় সংগ্রহ করিয়া ভাবনায় পূজা কর। ৺শারদীয়া পূজা আসিবার পূর্ব্বে এখনও যে কয় দিন সময় পাইতেছ, সেই কয় দিন ধরিয়া ভাবনায় সেইরূপ পূজা নিত্য কর, নিত্য সেইরূপ আরতি কর, সেইরূপ ভোগ দাও। এই অভ্যাসটা কর না—যদি কর ৺পূজার সময় যখন পুরোহিত কর্ত্তৃক পূজা হইতে দেখিবে, তখন বুঝিতে পারিবে আমার আগমন কিরূপ। অধিক আর কি বলিব—একটা কথা আরও বলি—এখন হইতে প্রত্যহ ভাবনাতে আমার মূর্ত্তি

খাড়া করিয়া বলিদানটা দাও। ছাগল, মেষ ও মহিষ এই তিনটি বলিই প্রচলিত। ভাবনায় ছাগল আন। দূরে যাইতে হইবে না। তোমার মধ্যে তোমার কামটাই ছাগপশু, আর তোমার লোভটাই মেষ, আর ক্রোধটাই মহিষ। কাম, ক্রোধ ও লোভ—নরকের দ্বারস্বরূপ এই তিন রিপুকে পশু ভাবনা করিয়া ইহাদের সপ্তখণ্ডিত মুণ্ডের সমাংস রক্ত দিয়া মায়ের পূজা অভ্যাস কর। করিয়া দেখ—কি অপূর্ব্ব অবস্থা পাও। আর কি বলিব তোমাদের মঙ্গল হউক।

দুর্গোৎসব।

(১)
আসিছে আনন্দময়ী
একটী বরষ পরে,
তাই গো এ বঙ্গবাসী
ভাসিছে আনন্দনীরে।

(২)
তুই মা আসিবি বলি
হরষে জলদ দল,
ঢালিছে মঙ্গলঘটে
নয়নের সুধাজল।

(৩)
তোমার বন্দনা গাহি
কুলু কুলু কুলু স্বরে,
আনন্দে দু'কুল প্লাবি
তটিনী বহিছে ধীরে।

(৪)
তুই মা আসিবি বলি
বিহগ আনন্দে গায়,
নন্দন সুরভি বহি
সমীরণ মৃদু বয়।

(৫)
তুই মা আসিবি বলি'
শরতে শেফালী ফুটি,
তোমারি চরণ আশে
ধুলায় পড়িছে লুটি।

(৬)
মায়ের সরল শিশু
শুয়ে জননীর কোলে,
"কবে মা আসিবে দুর্গা ?"
জিজ্ঞাসিছে কুতূহলে।

(৭)
তুই মা আসিবি বলি,
নির্ম্মল শারদাকাশে—
ফুটিছে তারার মালা,
আনন্দে চন্দ্রমা হাসে।

(৮)
আনন্দেতে তরু কাঁপে,
আনন্দে লতিকা দোলে
পাপীতাপী শোকদুঃখ
সকল গিয়াছে ভুলে।

(৯)
কি এক আনন্দ উৎস
ছুটিছে ধরার বুকে,
উঠিছে মাতিয়া সবে
'কি এক মহান্ সুখে।

(১০)
করুণা-আশীষ-মাখা
তোমার অঞ্চলখানি—
ধরিতে সন্তান ছোটে
করিয়া আনন্দ-ধ্বনি।

(১১)
মধুময় এ জগৎ
বলে মা পবিত্র যারা
শুভে, শুভঙ্করী-মূর্ত্তি
তোমারে মা দেখে যারা

(১২)
করেছি মা অপরাধ
কিনা দেখিয়াছ তুমি
কার কাছে কপটতা ?
"তোর মেয়ে" হ'ব আমি ।

(১৩)
দীন দয়াময়ী তুই
আয় মা গো গিরিবালা ;
রাঙ্গাপদ বুকে ধরি—
জুড়াই প্রাণের জ্বালা ।

(১৪)
কি দিব তোমায় মাগো
কি আছে সম্বল আর ?
অনুতাপ দিয়া প্রাণে
লও মোর অশ্রুধার ।

(দেওঘর ।)

পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর ।

বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্রনন্দন ।

শ্রীকৃষ্ণ যখন সুবলকে শ্রীরাধিকার রূপের কথা কহিতেছিলেন, তখন অপর একটী স্ত্রীলোক নিকটেই একটী বৃক্ষান্তরাল হইতে উভয়ের এই কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীকৃষ্ণ এবং সুবল চলিয়া গেলে, ঐ রমণী ধীর পাদবিক্ষেপে সেখান হইতে গমন করিলেন ; শ্রীকৃষ্ণ বা সুবল ইহার বিন্দু-বিসর্গ জানিতে পারিলেন না।

এই রমণীর নাম বিশাখা। ইনি শ্রীরাধিকার একজন অন্তরঙ্গ সখী। এই বিশাখা সখীই, রাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট দেখাইয়াছিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার অনুরাগ দেখিয়া এবং বৃন্দাদেবীর মুখে শ্রীরাধিকার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ শুনিয়া, আজ অতর্কিত ভাবে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণের মনোভাব বুঝিতেছিলেন।

* * * * * *

ইহার পর দুই দিন অতীত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ একাকী যমুনাতীরে বসিয়া মুরলী আলাপন করিতেছিলেন। এখনও সন্ধ্যা হয় নাই, রাখালবালকেরা গাভী লইয়া গোকুলের দিকে আসিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, একটী স্ত্রীলোক তাঁহার দিকে আসিতেছে, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, একা এখানে ?

শ্রীকৃষ্ণ। কেন একা কি আমাকে দেখ নাই ?

রমণী। দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ সন্ধ্যাকালে ?

শ্রীকৃষ্ণ। সূর্য্যাস্ত দেখ্‌ছিলাম।

রমণী। সূর্য্য অস্ত তো দেখা হ'য়েছে, তবে এখনও বসিয়া কেন ? যাও বাড়ী যাও।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন তোমার এখানে কি আবশ্যক আছে ?

রমণী। আছে বৈ কি ?

আর কোন কথা না কহিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাটীরদিকে ফিরিলেন, কিন্তু কি মনে করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন সুন্দরি! তোমার নাম কি ?

"আমার নাম বিশাখা।

"বিশাখা ? তা তুমি এখানে ?

এইবার একটু হাসি মুখে বিশাখা কহিলেন তোমারই জন্য।

শ্রীকৃষ্ণ। আমারই জন্য।

বিশাখা। হাঁ তোমারই জন্য।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন ? আমি তোমার কি উপকার ক'র্ত্তে পারি ?

বিশাখা। তুমি সকলই করিতে পার, কিন্তু সে কথা এখন নয়, এখন জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, সে দিন সুবলের সঙ্গে কি কথা কহিতেছিলে ?

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি কোথায় ছিলে ?

বিশাখা। মুরলীবদন! আমি তোমার সকল কথাই শুনিয়াছি; বৃন্দাদেবীর মুখেও শুনিয়াছি, তবু আমার সন্দেহ যাইতেছে না। যাঁহাকে কালীয়দমনের দিন এবং গোবর্দ্ধনধারণের দিন দেখিয়াছিলে, তাঁহাকে সে দিন কোথায় দেখিয়াছ ?

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই, যাহার জন্য এই "হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি" হইতেছে, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা গোপন রাখিবারই বা প্রয়োজন কি ? এই ভাবিয়া বলিলেন, বিশাখা! যদি সকল কথাই শুনিয়াছ, তবে বলিবার কথাই বা আমার কি আছে ? আজও এই যমুনার জলে সেই সুন্দরীকে স্নান করিতে দেখিয়াছি। বিশাখা! সেই মনোমোহিনী কোথায় বাস করেন ? তিনি কাহার কন্যা ?

স্বজনি ! ও ধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা গোরি, নবীন কিশোরী,
নাহিতে দেখিনু ঘাটে ॥
যমুনার নীরে, বসি তার তীরে,
পায়ের উপরে পা।
অঙ্গের বসন, করিয়া আসন,
সে ধনী মাজিছে গা ॥
কিবা সে ভুগুলি, শঙ্খ ঝলমলি,
সরু সরু শশিকলা।
মাজিতে উদয়, শুধু সুধাময়,
দেখিয়ে হইনু ভোলা ॥
সিনাঞা উঠিতে, নিতম্ব তটেতে,
প'ড়েছে চিকুর রাশী।
কাঁদিয়া আঁধার, কনক চাঁদার,
শরণ লইল আসি ॥
চলে—নীল শাড়ী— নিঙাড়ি নিঙাড়ি,
পরাণ সহিতে মোর।
সেই হ'তে মোর, চিত নহে থির,
মনমথ-জ্বরে ভোর ॥
কহে চণ্ডিদাসে, বাশুলি আদেশে,
শুনহে নাগর চাঁদা।
সে যে বৃষভানু, রাজার নন্দিনী,
নাম বিনোদিনী রাধা ॥

বিশাখা শ্রীরাধিকার মানসিক অবস্থার কথা ইতঃপূর্ব্বেই ললিতার মুখে শুনিয়াছেন, আজ শ্রীকৃষ্ণের কথাও শুনিলেন। কত কথাই বিশাখার মনে আসিতে লাগিল,—মনে হইল সেই দিন,—যে দিন "কালিয়ারূপ মরমে লাগিয়া সোয়াথ না হয় মনে" বলিয়া শ্রীরাধিকা অতি মর্ম্মস্পর্শী বাক্যে ললিতাকে প্রাণের কথা বলিতেছিলেন; আর এক দিন যে দিন "কি তপস্যা করিলে সেই কালবরণকে পাওয়া যায় বলিয়া ললিতার কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে-

ছিলেন, আর সেই দিন যে দিন" চন্দনচর্চ্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালীর রূপ দেখিবার জন্য অধৈর্য্য দেখিয়া আমি এই শ্যামসুন্দরের এক আলেখ্য দেখাইয়াছিলাম,—যাহা দেখিয়া

"যে রূপ দেখিনু যমুনার তটে।
সেই রূপই বটে চিত্রপটে॥

বলিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন; তারপর চৈতন্য হইলে

"এমন মূরতি কেমন করি, লিখিলে বিশাখা ধৈরজ ধরি॥
কিবা অপরূপ আমরি আমরি, আনহ হিয়ার মাঝারে ধরি॥
দরশে পরাণ লইল হরি। পরশে কি হয় বলিতে নারি॥
দেখি দেখি পট আনহ কাছে। এমন পুরুষ কি জগতে আছে॥
দেখিতে দেখিতে পটের লেখা। হরিল পরাণ বিষম ডাকা॥
মোহন কহয়ে লিখিল যে। পরাণ নিছনি তাহারে দে॥

বিশাখা মনে ভাবিলেন, আজ কৃষ্ণের কাছে সকল কথাই খুলিয়া বলি, কিন্তু আবার কি ভাবিয়া নীরব হইলেন।

কৃষ্ণ কহিলেন, কি বলিলে? তাহার নাম রাধা? রাধ, রাধা, রাধা, বেশ নাম তো। শ্রীকৃষ্ণ অস্ফুট স্বরে আরও কয়েকবার রাধা নাম উচ্চারণ করিলেন।

এক দিন শ্রীরাধিকাও এইরূপ সখী মুখে শ্যামনাম শুনিয়া বলিয়াছিলেন—

"না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীনি—

লক্ষ্মীরাণী

লক্ষ্মীরাণী একখানি নাটক। যিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতায় আহ্নিকম্, উচ্ছ্বাসাঃ লিখিয়াছেন, যিনি লোকালোক নামক খণ্ড কবিতা গ্রন্থ লিখিয়াছেন এই পুস্তকখানি সেই জ্ঞানশরণ বাবু রচনা করিয়াছেন। আমি এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমার কোন বিশেষ সম্মানার্হ বহুদর্শী বন্ধুকে পড়িতে দিয়াছিলাম। তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৮ বৎসর। তিনি বেলা দুইটা হইতে পড়িতে আরম্ভ করেন। রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত পড়িয়া শেষে রাত্রি ৪টার সময় আলো জ্বালিয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করেন। বেলা ৮টায় তাঁহার পুস্তক পাঠ শেষ হয়। বই খানি কতকদূর পড়িয়া তিনি বলিয়াছিলেন—পুস্তকের ভাব গাম্ভীর্য্য যেরূপ, তাহাতে ভাষাটি যদি আর একটু মোলায়েম হইত—মানব-চরিত্র বিশ্লেষণটির সঙ্গে সঙ্গে যদি বাহ্যপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যরস দিয়া ভাষাকে আর একটু সরস করা হইত তবে সোনায় সোহাগা হইত। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে কবি যদি এই পুস্তকের প্রতি আর একটু সময় দেন তবে এই পুস্তকখানি চিরদিনের জন্য সমাজের যথার্থ উপকার ও যথার্থ আনন্দের আধার হইয়া থাকিবে। বইখানি পড়িয়া তিনি আর একবার দেখিতেছিলেন। আমি সেই সময়ে তাঁহার নিকটে যাই। গিয়া দেখি তখনও তাঁহার চক্ষে জল। তিনি আপনা হইতে বলিলেন কবি মুন্নার চরিত্র যাহা আঁকিয়াছেন—পুস্তকের শেষের গানটি পড়িতে পড়িতে তিনি বলিতে লাগিলেন এই পুস্তকের সৌন্দর্য্য এত অধিক, দুর্ব্বল মানব হৃদয়ে ইহা এরূপ ভাবে শক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ, যে ইহার ভাষা সম্বন্ধেও কোন কথা বলিয়া কবির হৃদয়ে কোন প্রকার আঁচ দেওয়া উচিত নহে। বঙ্কিমবাবুর আয়েসার চরিত্রের সহিত এই মুন্নার কতক সাদৃশ্য থাকিলেও ধর্ম্মপ্রেমিকের মত মুন্নার সংসারত্যাগ বহু জীবনে একটা স্থায়ী ভাব আনয়ন করে। 'আমিও বলি গ্রন্থকার ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার জন্য আর একটু সময় যদি দেন তবে পুস্তকে লোকের যতদূর উপকার হওয়া সম্ভব তাহাই হয়। আর কাহারও কিছু বলার থাকে না। সেক্সপিয়ারের পুস্তকগুলি বহুবার পুনর্লিখিত হইয়া উপস্থিত আকার ধারণ করিয়াছে।

---

* শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ এম, এ, পি, আর, এস, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যশরণ চক্রবর্ত্তী এম, বি, ২।৩ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন এবং ১৬২ নং বৌবাজার উৎসব আফিসে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

উপরে যাহা লেখা হইল তাহা সমালোচনা কি না জানি না। এক্ষণে এই পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের বলিবার যাহা আছে, আমরা তাহাই বলিয়া নিরস্ত হইব। বলা বাহুল্য, প্রকৃত সমালোচনা করিতে হইলে যতখানি সময় এই কার্য্যে দেওয়া আবশ্যক ততখানি সময় আমরা ইহাতে দিতে পারিলাম না।

বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু সাহিত্য, বহু আচার ব্যবহারের সজ্ঘর্ষণে এই বৃদ্ধ জাতির যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এই জাতির কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা বড়ই জটিল হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি আমরা বলি, আমাদের জাতির মধ্যে যাহা ভাল, যাহা আদর্শ তাহা অবিকৃত রাখিয়া যদি কালসঞ্চিত দোষ-রাশির সংস্কার করা হয়, তবেই এই জাতির কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। মানব জাতির প্রকৃত উন্নতি তখন হয়—যখন পুরুষের আদর্শ হয় পবিত্রতা এবং স্ত্রীজনের আদর্শ হয় সতীত্ব। যত প্রকার সংস্কার করিতে চাও কর কিন্তু যাহা পুরুষের পবিত্রতার [ভাবনা, বাক্য ও কর্ম্ম এই তিন বিষয়ের পবিত্রতার] প্রতিকূল, আর স্ত্রীলোকের সতীত্বের হানিকর—সেইরূপ কোন কিছু সমাজে আনিতে চেষ্টা করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। এই কথা প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকেই স্বীকার করিতে হইবে। লক্ষ্মীরাণীতে আমরা এই দুইটি আদর্শই, অক্ষুন্ন ভাবে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। সেই জন্য ইহার সমালোচনা।

এই পুস্তকের সৌন্দর্য্য দেখাইতে হইলে, আমাদিগকে পুস্তকের বহুস্থান উদ্ধৃত করিতে হয়। আমরা দুই এক স্থান মাত্র উদ্ধৃত করিব। অতি সংক্ষেপে এই পুস্তক সম্বন্ধে আমরা ইহাই বলি যে, যে সমস্ত দুর্ব্বল চিত্ত-প্রসূত, বিচার-অবিশুদ্ধ, ধর্ম্মভাবশূন্য নাটক, গল্প, উপন্যাস বা কবিতার বন্যার খরস্রোতে বঙ্গনরনারী ভাসিয়া চলিয়াছে—এই প্রকারের পুস্তক, মানুষকে সে অবস্থা হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ। পুস্তকখানি প্রথমেই ধার্ম্মিকের বিরুদ্ধে অধার্ম্মিকের প্রবল ষড়যন্ত্র লইয়া আরম্ভ। এই ষড়যন্ত্র ধ্বংস করিয়াধর্ম্মের জয় দেখাইতে যাহা যাহা আবশ্যক, গ্রন্থকার এই নাটকে বিলক্ষণ দক্ষতার সহিত তাহার সমাবেশ করিয়াছেন। বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, এই গ্রন্থে কোথাও গ্রন্থকার পাপকে মনোহর মূর্ত্তিতে চিত্রিত করেন নাই। সেক্সপীয়ারের গ্রন্থপাঠে যেমন পাপের উপরে একটা ঘৃণা আইসে, এই গ্রন্থেও তাই হয়। তারাদাস, সমরজিৎ, আফজল, লক্ষ্মীদেবী, রোজিয়া, মুন্না প্রভৃতির চরিত্রে ধর্ম্মের বল এবং প্রেমের বল যেরূপ ভাবে আঁকা হইয়াছে, তাহা

বাঙ্গলা সাহিত্যের এই দুঃসময়ে বহু গ্রন্থকারের শিক্ষার সহায়। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে মনে হয়—যে সমস্ত কবি চরিত্রের তেজ ও ধর্ম্মের তেজ সজীব ভাষায় অঙ্কিত করিতে পারেন তাঁহাদের লেখনী ধারণই সার্থক। আর যাঁহারা পাপে ঘৃণা জন্মাইতে পারেন না, পবিত্রতা ও সতীত্বের তেজ দেখাইয়া দুর্ব্বল নরনারীর চিত্তে শক্তিসঞ্চার করিতে পারেন না, যাঁহারা দুর্ব্বলতার চিত্র আঁকিয়া পাপের প্রশ্রয় প্রদান করেন—সে সমস্ত লেখকের লেখনী ধারণে সমাজের ব্যভিচার বৃদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

অল্পদিন হইল এক গ্রন্থকার এক ঐতিহাসিক সুন্দরীকে চারি বৎসর সতীত্ব রক্ষা করিতে দেখিয়া কত প্রশংসাই করিয়াছেন। আর লক্ষ্মীরাণীতে রোজিয়া বলিতেছে—

"প্রেমের আস্পদে
অনুরক্তা যে রমণী,—অপর পুরুষে
তাড়নায়, ভয়ে, তুচ্ছ ঐশ্বর্য্যের লোভে
আত্ম সম্প্রদান করে—সে যদি রে সতী,
অসতী গণিকা তবে কহে সখি কারে ?"

রামায়ণে শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র, প্রজারঞ্জনের জন্য শ্রীসীতাকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধা জানিয়াও বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। এই নাটকের নায়িকা লক্ষ্মীরাণী, আপন স্বামীকে পরম পবিত্র জানিয়াও প্রজার কল্যাণ জন্য যথার্থ দণ্ডপ্রদানেও সম্মত হইয়াছিলেন। রাণী হইবার সময় লক্ষ্মীরাণী আপন গুরুদেবের বাক্যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন :—

আজি এ বৈশাখ মাসে শুক্লা সপ্তমীতে
বুধবারে বিশ্বেশের পদস্পর্শ করি,
যাঁর রাজ্য তাঁরে হৃদে করিয়া স্মরণ
লইলাম রাজ্যভার, এ দুর্ব্বল করে।
দিও বল দেবদেব, পালিতে এ ব্রত
দিও শক্তি, অনুরাগ, সাহস, সংযম,
পালিতে কর্ত্তব্য মোর। মুহূর্ত্তের তরে
ধর্ম্মপথ হ'তে যদি হই বিচলিত,
স্বার্থ যদি জাগে হৃদে, সহস্র অশনি

চূর্ণ বিচূর্ণিত যেন করে এ হৃদয়ে
সেইক্ষণে। পাপীজনে ন্যায্য দণ্ড দিতে
কঠোরতা আবশ্যক হয় যদি দেব!
বজ্রে বেঁধে দিও বুক আমার তখন।
জলস্থল-অন্তরীক্ষ-বিহারী দেবতা
সাক্ষী মোর, সাক্ষী বহ্নি, বিশ্ব চরাচর,
দেবদেব বিশ্বনাথ, আত্মপর ভুলি
ন্যায়সত্য ধর্ম্মমতে করিব পালন
রাজধর্ম্ম; কভু যদি ন্যায়ের ছুরিকা
পড়ে আসি নিজ বুকে, বিঁধি অকাতরে
ধর্ম্মের চরণে দিব জীবন আহুতি!

লক্ষ্মীদেবী রাণী হইয়া এই ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পালন করিয়াছিলেন। পুস্তকের শেষ দুই অঙ্ক অতি সুন্দর। এত সৌন্দর্য্য কবি সেখানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন যে, পড়িতে পড়িতে অশ্রুবেগ কিছুতেই রোধ করা যায় না। কবি উর্দ্দু ও পারসী ভাষায় যে সমস্ত গীত ও কথাবার্ত্তা দিয়াছেন—আমাদের ঐ ঐ ভাষায় অধিকার না থাকিলেও, আমরা বলিতে পারি যেন তিনি ঐ ভাষাও বিলক্ষণ আয়ত্ত করিয়াছেন।

তু ফুল্লা গোলাব   পূরা রুআব
জওয়ানী দেমাক্ আঁখ ধরণা মুসকিল্,
ফুল্লা তু বেলা   অকেলা অকেলা
খুসবু ভরা তন্ খুসবু ভর দিল্!

আবার   যো জানে ন দুনিয়া   সো বোলে খরাব
(যাঁহা) পহলী তো আওরৎ   ও দুসরী শরাব। ইত্যাদি।

মুন্না-চরিত্রে কবি যে প্রেমের চিত্র আঁকিয়াছেন, পুস্তক শেষ করিলেও বহুক্ষণ তাহার ঝঙ্কার ভুল যায় না। আমরা সব সৌন্দর্য্য দেখাইতে পারিতেছি না বলিয়া দুঃখিত। যাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিবেন, আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি তাঁহারা বিশেষ আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন। মুন্না, সমরসিংহকে ভাল বাসিয়াছিল। সমরসিংহ লক্ষ্মীরাণীর স্বামী। মুন্না ও সমর উভয়েই পবিত্র। তথাপি উদাসী ফকির সমরসিংহ, মুন্নার হৃদয় জানিয়াও যে আত্মবিচার

দেখাইয়াছেন—আজকালকার বাঙ্গলা সাহিত্যে এতখানি চরিত্রের তেজ আমরা অল্পই দেখিয়াছি। সমরসিংহ মুন্নার সরলতা, মুন্নার পবিত্রভাব, মুন্নার রূপমাধুরী দেখিয়া, মুন্নার হৃদয় তাঁহাতেই মিশিতে চায় জানিয়াও আত্মবিচার করিতেছেন :—

আর আমি? গৃহত্যাগী ফকির উদাসী,
ধর্ম্মিষ্ঠ সমরসিংহ—বল্ সত্য ক'রে,
কি ভাব হৃদয়ে তোর অস্ফুট আঁধারে!
কোষাধ্যক্ষ ঢালি মুদ্রা যথা থলি হ'তে
উলটিয়া দেখে তারে, নাড়ে বারম্বার;
ভূমিতে আছাড় মারে, খুলিয়া তেমনি
সমস্ত হৃদয় তোর সত্যের আলোকে
দেখ দেখি একবার! ছি ছি শত ধিক্,
কিসের অঙ্কুর ইহা? কৃতঘ্ন পামর
সাধুবেশে প্রবঞ্চক তস্কর, নারকী,—
সাবধান, সাবধান, মরিবি এখনি!
এখনি তুলিয়া ফেল পাপের অঙ্কুর
সমূলে হৃদয় হ'তে, এখনি, এখন!
নতুবা উত্তপ্ত করি লৌহের ফলকে
অগ্নিসম ভীমবলে ভরিব এ হৃদে—
সর্পসম গরজিয়া বিন্দু বিন্দু করি
শোণিত করিতে পান! বল্ মুন্না বিবি
দেবীসমা, মাতৃসমা, জননীরূপিণী!

ইহার শেষ অংশ আরও সুন্দর। পাঠক নিজে ইহা পাঠ করুন, করিয়া ধর্ম্মবলে যিনি বলীয়ান্ তাঁহার চরিত্রের বল কি তাহা বুঝুন এবং যদি কাহারও চরিত্রবান্ হইতে ইচ্ছা হয়, এইরূপ গ্রন্থ পড়িয়া তিনি চরিত্রবান্ কিরূপে হইতে হয় তাহাও জানুন।

উপসংহারে আমরা রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট সবিনয়ে ইহা নিবেদন করিতে ভরসা করি যে তাঁহারা যখন সমাজকে শিক্ষা দিবার জন্যও বহু গ্রন্থ অভিনয় করিয়া থাকেন, তখন এই গ্রন্থখানি অভিনয় করিলে যে সমাজের বহু উপকার হইবে তাহা তাঁহারা গ্রন্থপাঠেই একবারেই বুঝিতে পারিবেন। এই

পুস্তকখানি ঘটনাবহুলে ও উচ্চভাবে সর্ব্বতোভাবে অভিনয়ের উপযোগী। শেষ অঙ্কগুলির অভিনয় যে কত সুন্দর হইবে, তাহা সকলেই ধারণা করিতে পারেন। নাট্যগুরু ৺গিরীশবাবুর সহিত আমাদের অন্যসূত্রে পরিচয় ছিল। এখন তিনি নাই। থাকিলে আমরা নিজে তাঁহার নিকট গিয়া অনুরোধ জানাইতাম। আমরা শ্রীযুক্ত অমৃতবাবুর সম্বন্ধে যতটুকু জানি, তাহাতে তাঁহাকেও এ বিষয়ে অনুরোধ করিতেও পারি।

সমালোচনা।

১। আর্য্য রামায়ণে বাল্মীকি। শ্রীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ। পুস্তকখানি প্রথম ভাগ, ৭৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ॥০ আনা। হেডমাষ্টার রাথুরাবান্ধব হাইস্কুল, ঢাকা। পোঃ আঃ বালিয়াজুরী—এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলাম।

রাম নাম মধুর। নামের অক্ষর মধুর। আর যিনি আদিকাব্যবনস্পতির কবিতাশাখায় নিজ দেহ লুকাইয়া রাম রাম ধ্বনিতে দিগন্ত পরিপ্লাবিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সেই বাল্মীকি-কোকিলও বন্দনীয়। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে গ্রন্থকার রামায়ণের ঘটনার, রামায়ণের বর্ণনার, রামায়ণের শিক্ষার, রামায়ণের ভাষার, রামায়ণের চরিত্রের সৌন্দর্য্য অল্পকথায় সুন্দররূপে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই দিকে তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে। আমরা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে গ্রন্থকার যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতে পাঠক মাত্রেই রামায়ণের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইবেন। কিন্তু গ্রন্থকারের অধিক কৃতিত্ব সেইখানে—যেখানে তিনি রামায়ণে ভগবান্ বাল্মীকির কৌশল দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যদিও আমরা একথা বলিতে প্রস্তুত নহি যে আদিকবি আজকালকার কবি বা উপন্যাস লেখকের মত চরিত্রগঠনের জন্য গ্রন্থের ঘটনা সন্নিবেশ করিয়াছেন অর্থাৎ রামায়ণের ঘটনাগুলি কাল্পনিক—সরল ভাবে ভগবান্ বাল্মীকি এই কাল্পনিক ঘটনাগুলি একত্র সংযোজিত করিয়া রাবণবধ নাটক খানি প্রণয়ন করিয়াছেন—

তথাপি ইহা সত্য যে, যথার্থ ঘটনা যাহা ঘটিয়াছিল আর আদিকবি ধ্যানস্থ হইয়া যাহা দেখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ঘটনা সন্নিবেশের মাধুর্য্যে কোন যুগের কোন গ্রন্থের ঘটনা রামায়ণকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। গ্রন্থকার অতি সুন্দরভাবে আদিকবির অভিপ্রায় খুলিয়া দেখাইয়াছেন। গ্রন্থকার, রামায়ণ-পাঠে দুঃখী জীবের শোকশান্তি কিরূপে হয়, তাহাও দেখাইতে ভুলেন নাই। গ্রন্থকারের রামায়ণ পাঠ সার্থক হইয়াছে। আমরা সকলকে পুস্তকখানি পড়িতে অনুরোধ করি এবং এই পুস্তকের দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ দেখিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি। সর্ব্বশেষে আমরা ইহাও বলি যে অল্প কথায় অধিক ভাব প্রকাশ করিতে হইয়াছে বলিয়া এই পুস্তকের ভাষা সকলের অনায়াসবোধ হইবে না। ইহাই হওয়া উচিত। পরিশ্রম করিয়া যাহা লাভ করা যায় তাহাই উত্তম।

বঞ্চনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সকলের প্রেমে বাঁধা থাকিয়াও কোন স্থানে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের ব্যাঘাত ঘটে নাই; যেহেতু তিনি (স্বরাট্) এমন কি, আদি কবি বিরিঞ্চিরও বিস্ময় উৎপাদনার্থ, নিজ সঙ্কল্পমাত্রেই ব্রহ্মাত্মক বৎস ও বালকগণ প্রকাশ করিয়া বৎসরাবধি ক্রীড়া করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই (যত্র) অলৌকিক লীলাতে স্বয়ং ভব নারদাদি ভক্তগণও প্রেমের উচ্ছ্বাসে মুগ্ধ ও বিবশ হইয়া পড়িতেন। (তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ) প্রাণীর কথা দূরে থাকুক, যাঁহার মুখচন্দ্রের জ্যোতিতে চন্দ্র ম্লান হইয়াছিলেন, মধুর বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া পাষাণ দ্রবীভূত হইত, স্রোতস্বতী যমুনা কখন উজান বহিত, কখন বা স্তম্ভিত হইয়া কঠিনতা লাভ করিত,—সেই পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ধ্যান করি।

আধুনিক বৈষ্ণবেরা বলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীরামানন্দ প্রভুকে এই শ্লোকের ২০ প্রকার ব্যাখ্যা শুনাইয়াছিলেন।

আমরা এইখানে বিরত হইলাম। শ্রীভাগবতের ২য় ও ৩য় শ্লোকের ভাবার্থ দিয়া আমরা আমাদের মতন করিয়া শ্রীভাগবত লিখিয়া লিখিয়া পড়িব—ইহাই আমাদের সঙ্কল্প। ভগবান্‌কে জানাইয়াই আমরা এই কার্য্য করিতে চেষ্টা করিতেছি। তুমি প্রসন্ন হও—এভিন্ন আমাদের অন্য প্রার্থনা নাই। কতদূর কি হইবে সে বিষয়ে আমাদের চিন্তা করিবার কিছুই নাই।

২

এই সুন্দর ভাগবতে কোন্ ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে?

এই শাস্ত্রে প্রোজ্ঝিত কৈতব—ফলাভিসন্ধান রহিত পরম ধর্ম্ম যে ঈশ্বরের আরাধনা তাহাই নিরূপিত। ফলাভিসন্ধান করিয়া কর্ম্ম করাই কৈতব—কপটতা। ধর্ম্ম প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র পরমঃ।

কাহার জন্য এই ধর্ম্ম?

নির্ম্মৎসরাণাং সতাং যাহারা পরের গুণ, পরের উৎকর্ষ সহ্য করিতে পারে না তাহারা মৎসর। যে সমস্ত সাধু পরগুণ শ্রবণে আহ্লাদিত হয়েন এবং যাঁহারা জীবে দয়া করেন তাঁহাদের জন্যই এই পুস্তক।

যিনি শ্রীভাগবত পড়িতে যাইতেছেন, তাঁহাকে দুইটী বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে।

১। কাহারও নিন্দা করা হইবে না। অন্যের গুণ শ্রবণে প্রফুল্লিত হইতে অভ্যাস করিতে হইবে।

২। সর্ব্ব জীবে দয়া করা অভ্যাস করিতে হইবে।

শ্রীভাগবতের জ্ঞাতব্য বিষয় কি?

যিনি পরম সুখদ, যাঁহাকে পাইলে ত্রিতাপজ্বালা জুড়াইয়া যায়, সেই সত্য বস্তুই এখানে জ্ঞাতব্য। বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।

অন্য শাস্ত্রের সহিত ইহার প্রভেদ কি?

অন্যশাস্ত্রে কিছু বিলম্বে ঈশ্বর হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েন, কিন্তু এই শাস্ত্র শ্রবণের ইচ্ছা হইলেই, ঈশ্বরকে হৃদয়মধ্যে নিশ্চয় করিতে পারা যাইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরৈঃ।
সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যতেঽত্রকৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

৩

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রব সংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

শ্রীভাগবত বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল। শুকমুখ হইতে বিগলিত হইয়া ইহা পৃথিবীতে পড়িয়াছে। অমৃতং পরমানন্দঃ। অমৃতরূপেণ পরমানন্দরূপেণ দ্রবেণ রসেন সংযুতম। এই ফল পরমানন্দরস যুক্ত। শুকমুখস্পৃষ্ট ফল অমৃতের মত স্বাদু হয়—ইহা লোকে প্রসিদ্ধ আছে। এই ফল শুধু রস স্বরূপ। ইহাতে ত্বক্ অস্থি প্রভৃতি যেন নাই। যাঁহাদের রসানুভবে শক্তি আছে, যাঁহারা ভাবুক—রসবিশেষ ভাবনায় পারদর্শী—তাঁহারা যাবৎ মোক্ষলাভ না হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত ইহা পুনঃ পুনঃ পান করুন।

নিগমো বেদঃ স এব কল্পতরুঃ। যে বৃক্ষের নিকটে যাহা চাও তাহাই পাইতে পার—সেই বৃক্ষকে কল্পতরু বলে। বেদই সেই কল্পতরু। এই শ্রীভাগবত সেই বেদবৃক্ষেরই ফল। বৈকুণ্ঠেই এই ফল ছিল। শ্রীনারদ বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীভাগবত প্রাপ্ত হইয়া, ব্যাসদেবকে ইহা প্রদান করেন। ভগবান্ ব্যাস আপন পুত্র শুকদেবকে ইহা অধ্যয়ন করান। শুকদেবের মুখ হইতে এই আনন্দরসপূর্ণ শ্রীভাগবত, শ্রীপরীক্ষিৎ শ্রবণ করেন। এই অমূল্য গ্রন্থ শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে চারিদিকে প্রচারিত হইলেও, কখন বিকৃত হইবে না। হে রসিক! হে ভাবুক! যতক্ষণ মোক্ষলাভ না হইতেছে, ততক্ষণ তোমরা এই অমৃতময় ফল মুহুর্মুহুঃ সেবন কর।

প্রার্থনা।

শ্রীভাগবত অধ্যয়নে অথবা শ্রবণে শ্রীভগবান্ হৃদয়ে উদয় হয়েন। কলিযুগে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিবার ইহাও একটী উপায় এই জানিয়া পুস্তক পাঠে লোভ জন্মিয়াছে। কিন্তু মূর্খের আশা কি পূর্ণ হইবে? তোমার কৃপায় মূক হয় বাচাল, পঙ্গুতে গিরি লঙ্ঘন করে। হে প্রভু! এই কার্য্য যে করিতে যাইতেছি তাহা তোমাকে জানাইতেছি। যদি উপযুক্ত মনে কর, তবে একার্য্য যেন সম্পন্ন হয়। হে দীনবন্ধু! শুনি যে তুমিই সকলকে সকল কার্য্য করাইয়া থাক। আমার আর প্রার্থনা কিছুই নাই, কেবল তুমিই এই কার্য্য করাইতেছ সেইটী নিশ্চয়রূপে নিঃসন্দেহে আমার অনুভূতিতে আনিয়া দিও। আমি তোমাকে শত শত প্রণাম করিতেছি। তুমি প্রসন্ন হও। আমি এই শুভকার্য্য করি। হে প্রভু! তোমার দুঃখী জীবকে যে তুমি কৃপা কর তাহা বুঝাইয়া দিও।

ম
সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তেঃ স্বভূতা স্বাধীনত্বেন জগৎসৃষ্ট্যাদিনির্ব্বাহিকা
ম
মায়া তত্ত্বপ্রতিভাসপ্রতিবন্ধেনাতত্ত্বপ্রতিভাসহেতুরাবরণবিক্ষেপশক্তিদ্বয়-
ম
বত্যবিদ্যা সর্ব্বমপ্রপঞ্চপ্রকৃতিঃ"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্"
বা শ শ শ
ইতিশ্রুতেঃ। হি যস্মাৎ দৈবী দেবস্য মমেশ্বরস্য বিষ্ণোঃ স্বভাবভূতা
রা রা নী
দেবেন ক্রীড়াপ্রবৃত্তেন ময়ৈব নির্ম্মিতা বা অথবা দেবস্য জীবরূপেণ
নী শ্রী শ্রী
লীলয়া ক্রীড়তো মম সম্বন্ধিনীয়ং দৈবী অলৌকিকী অত্যদ্ভুতেত্যর্থঃ
রা বা শ শ রা
তস্মাৎ সর্ব্বৈঃ দুরত্যয়া দুঃখেনাত্যয়োঽতিক্রমণং যস্যাঃ সা দুরতিক্রমা।
রা
অস্যাঃ কার্য্যং ভগবৎস্বরূপ-তিরোধানং স্বস্বরূপভোগ্যত্ববুদ্ধিশ্চ।
রা
অতো ভগবন্মায়য়া মোহিতং সর্ব্বং জগৎভগবন্তমনবধিকাতিশয়ানন্দ-
ম নী
স্বরূপং নাভিজানাতি। অত্রেবং প্রক্রিয়া জীবেশ্বরবিভাগশূন্যে
নী
শুদ্ধচিন্মাত্রে কল্পিতো মায়াদর্পণঃ চিৎপ্রতিবিম্বরূপং জীবং বশীকৃত্য
নী
বিম্বচৈতন্যমনুরুধ্য প্রচলতি অয়স্কান্তমনুরুধ্যেব লোহশলাকা ইদমেব
নী
ঈশ্বরাধীনত্বং মায়ায়াঃ, ঈশ্বরস্য চ মায়াদ্বারা সর্ব্বস্রষ্টৃত্বমপি। তথা
নী
চ শ্রুতিঃ "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া

ম
সনিরুদ্ধঃ” ইতি। ততশ্চ বিম্বস্থানীয়ঃ পরমেশ্বর উপাধিদোষানাস্কন্দিতঃ
ম
প্রতিবিম্বস্থানীয়শ্চ জীব উপাধিদোষস্কন্দিতঃ, ঈশ্বরাচ্চ জীব-
ম
ভোগায়াকাশাদিক্রমেণ শরীরেন্দ্রিয়সংঘাতস্তদ্ভোগ্যশ্চ কৃৎস্নঃ
ম
প্রপঞ্চো জায়ত ইতি কল্পনা ভবতি, বিম্বপ্রতিবিম্বমুখানুগতমুখবচ্চ
ম
ঈশজীবানুগতং মায়োপাধিচৈতন্যং সাক্ষীতি কল্প্যতে।

ম
যদ্যপি অবিদ্যাপ্রতিবিম্ব এক এব জীবস্তথাপ্যবিদ্যাগতানামন্তঃ-
ম
করণসংস্কারাণাং ভিন্নত্বাৎ তদ্ভেদেনান্তঃকরণোপাধেস্তস্যাত্র ভেদ-
ম
ব্যপদেশঃ; শ্রুতৌ চ “ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেব বেদাহং
ম
ব্রহ্মাস্মীতি, তস্মাৎ তৎসর্ব্বমভবৎ, একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ, অনেন
ম
জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য, বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো
জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্প্যতে। ইত্যাদিঃ।

ম
যদ্যপি দর্পণগতশ্চৈত্রপ্রতিবিম্ব স্বং পরঞ্চ ন জানাত্যচেতনাংশ-
ম
স্যৈব তত্র প্রতিবিম্বিতত্বাৎ, তথাপি চিৎপ্রতিবিম্বশ্চিত্ত্বাদেব স্বং
ম
পরঞ্চ জানাতি; প্রতিবিম্ব পক্ষে বিম্বচৈতন্য এবোপাধিস্থত্বমাত্রস্য

ম
কল্পিতত্বাৎ, ভাসপক্ষে তস্যানির্ব্বচনীয়ত্বেঽপি জড়বিলক্ষণত্বাৎ স চ
ম
যাবৎ স্ববিম্বৈক্যমাত্মনো ন জানাতি তাবজ্জলসূর্য্য ইব জলগত-
ম
কম্পনাদিকমুপাধিগতং বিকারসহস্রমনুভবতি । বিম্বভূতেশ্বরৈক্য
ম
সাক্ষাৎকারমন্তরেণ অত্যেতুং তরিতুমশকোতি দুরত্যয়া, অতএব
ম
জীবোঽন্তঃকরণাবচ্ছিন্নত্বাৎ তৎসম্বন্ধমেবাক্ষ্যাদিদ্বারা ভাসয়ন্
ম
কিঞ্চিজ্‌জ্ঞো ভবতি । ততশ্চ জানামি করোমি ভুঞ্জে চেত্যনর্থশতভাজনং
ম
ভবতি, স চেদ্বিম্বভূতং ভগবন্তমনন্তশক্তিং মায়ানিয়ন্তারং সর্ব্বমিদং সর্ব্ব-
ম
ফলদাতারমনিশমানন্দঘনমূর্ত্তিমনেকানবতারান্ ভক্তানুগ্রহায় বিদধন্ত-
ম
মারাধয়তি পরমগুরুমশেষকর্ম্মসমর্পণেন তদা বিম্বসমর্পিতস্য প্রতিবিম্বে
ম
প্রতিফলাৎ সর্ব্বানপি পুরুষার্থানাসাদয়তি । এতদেবাভিপ্রেত্য

প্রহ্লাদেনোক্তম্ —

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে ।
যদ্‌যজ্জনো ভগবতে বিদধীতমানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ ॥ ইতি—

ম
যথা দর্পণ প্রতিবিম্বিতস্য মুখস্য তিলকাদি শ্রীরপেক্ষিতা চেদ্বিম্বভূতে

ম
মুখে সমর্পণীয়া সা স্বয়মেব তত্র প্রতিফলতি ন্যান্যঃ কশ্চিৎ তৎ-
ম
প্রাপ্তাবুপায়োঽস্তি, তথা বিশ্বভূতেশ্বরে সমর্পিতমেব তৎপ্রতিবিম্ব-
ম
ভূতো জীবো লভতে নান্য কশ্চিৎ তস্য পুরুষার্থলাভেঽস্ত্যুপায় ইতি
ম
দৃষ্টান্তার্থঃ। তস্য যদা ভগবন্তমনন্তমনবরতমারাধয়তোঽন্তঃকরণং
ম
জ্ঞানপ্রতিবন্ধকপাপেনরহিতং জ্ঞানানুকূলপুণ্যেন চোপচিতং ভবতি,
ম
তদাতিনির্ম্মলে মুকুরমণ্ডল ইব মুখমতিস্বচ্ছেঽন্তঃকরণে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ-
ম
শমদমাদিপূর্ব্বকগুরূপসদনবেদান্তবাক্যশ্রবণমননিদিধ্যাসনৈঃ সংস্কৃতে

তত্ত্বমসীতি গুরূপদিষ্টবেদান্তবাক্যকরণিকাহংব্রহ্মাস্মীত্যনাত্মা-
ম
কারশূন্যা নিরুপাধিচৈতন্যাকারা সাক্ষাৎকারাত্মিকা বৃত্তিরুদেতি
ম
তস্যাঞ্চ প্রতিফলিতং চৈতন্যং সদ্য এব স্ববিষয়াশ্রয়ামবিদ্যামুন্মূলয়তি

দীপ ইব তমঃ। ততস্তস্যা নাশাৎ তয়াবৃত্ত্যা সহাখিলস্য কার্য্য-
ম
প্রপঞ্চস্য নাশঃ, উপাদাননাশাদুপাদেয়নাশস্য সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তসিদ্ধত্বাৎ।
ম
তদেতদাহ ভগবান্ "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"
শ রা রা শ
ইতি। তত্রৈবং সতি মায়াবিমোচনোপায়মাহ মামেতি। সর্ব্বধর্ম্মান্

শ শ শ ম
পরিত্যজ্য মামেব মায়াবিনঃ স্বাত্মভূতং সর্ব্বাত্মনা যে কেচিৎ প্রপদ্যন্তে
রা শ্রী শ
শরণং প্রপদ্যন্তে ভজন্তি তে এতাং সর্ব্বভূতচিত্তমোহিনীং দুরতি-
ম ব ম ম
ক্রমণীয়াং অর্ণবমিবাপারাং মায়াং অখিলানর্থজন্মভূবমনায়াসেনৈব
শ শ রা
তরন্তি অতিক্রামন্তি সংসারবন্ধনাৎ মুচ্যন্তে ইত্যর্থঃ। মায়ামুৎসৃজ্য
ব ব
আনন্দৈকরসং প্রসাদাভিমুখং স্বস্বামিনং মাং প্রাপ্নুবন্তীতি ইতি বা।
ম
যে মদেকশরণাঃ সন্তো মামেব ভগবন্তং বাসুদেবমীদৃশমনন্ত
ম
সৌন্দর্য্যসারসর্ব্বস্বমখিলকলাকলাপনিলয়মভিনবপঙ্কজশোভাধিক চরণ-
ম
কমলযুগলপ্রভমনবরতবেণুবাদননিরতবৃন্দাবনক্রীড়াসক্তমানস হেলোদ্ধৃত
ম ম
গোবর্দ্ধনাখ্যমহীধরং গোপালং নিষূদিত শিশুপালকংসাদিদুষ্ট-
সঙ্ঘমভিনবজলদশোভাসর্ব্বস্বহরণচরণপরমানন্দঘনময়মূর্ত্তিমতিবৈরিঞ্চ-
ম
প্রপঞ্চমনবরতমনুচিন্তয়ন্তো দিবসানতিবাহয়ন্তি তে মৎ প্রেম-
ম
মহানন্দসমুদ্রমগ্নমনস্তয়া সমস্ত মায়াগুণবিকারৈর্নাভিভূয়ন্তে, কিন্তু
ম
মদ্বিলাসবিনোদকুশলা এতে মদুন্মূলনসমর্থা ইতি শঙ্কমানেব মায়া

ম
তেভ্যোঽপসরতি বারবিলাসিনীর ক্রোধনেভ্যস্তপোধনেভ্যঃ। তস্মান্মায়া-
ম
তরণার্থী মামীদৃশমেব সন্ততমনুচিন্তয়েদিত্যপ্যভিপ্রেতং ভগবতঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চ অত্রার্থে প্রমাণাকর্ত্তব্যাঃ ॥ ১৪ ॥

আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া যেহেতু দৈবী (সেই হেতু ইহা সকলের পক্ষে) দুরতিক্রমণীয়া। (যদি এইরূপ হইল, তবে মায়া-বিমোচনের উপায় কি? না) যাঁহারা আমাকেই আশ্রয় করেন, তাঁহারা এই মায়া অতিক্রম করিতে পারেন ॥ ১৪ ॥

অর্জ্জুন—মায়াকে গুণময়ী বলিয়াছ; এখন ইহাকে দৈবী বলিতেছ এবং ইহাকে অতিক্রম করা সহজ নহে ইহাও বলিতেছ। তোমার মায়াতে সমস্ত প্রাণী মোহিত, ইহা লোকে বলে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জগৎটাই তোমার মায়ার রূপ। সত্ত্ব, রজ, তম গুণে সবাই মোহিত। দৈবী কথার অর্থ কি? মায়াকে দৈবী বলিতেছেন কেন?

ভগবান্—দৈবীর দুই প্রকার অর্থ করা যায়—প্রথম অর্থ ভক্তের, দ্বিতীয় অর্থ জ্ঞানীর।

(১) দেবেন ক্রীড়াপ্রবৃত্তেন ময়ৈব নির্ম্মিতা।

(২) দেবস্য মমেশ্বরস্য বিষ্ণোঃ স্বভাবভূতা।

(১) দীব্যতে ক্রীড়তে যস্মাদ্রুচ্যতে শোভতে দিবি। তস্মাদ্দেব ইতি প্রোক্তঃ স্তুয়তে সর্ব্বদৈবতৈঃ ইতি যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ। শ্রীভগবান্ ক্রীড়ার জন্য মায়া প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া, মায়াকে দৈবী বলা হইতেছে। এই অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া দ্বারা শ্রীভগবান্ ক্রীড়া করেন, এই জন্য এই অলৌকিকী অত্যন্ত অদ্ভুত মায়াকে দৈবী বলে। মহাপ্রলয়ে যখন তিনি একাই থাকেন, তখন ত খেলা হয় না। একা খেলা হইতে পারে না। তাই তিনি এই মায়া সৃজন করিয়া এক হইয়াও বহু হয়েন,—হইয়া খেলা করেন। তিনি স্বয়ংই আছেন,—তিনি একা, তথাপি আপনাকে অন্যমত দেখানই তাঁহার উল্লাস। "স্বয়মন্যইবোল্লসন্" ইহা তাঁহার মায়া দ্বারা ঘটে। তিনি অজ, তথাপি যে তাঁহার জন্ম হয়, তাহা মায়া দ্বারাই হয়। "সম্ভবাম্যাত্ম মায়য়া" পূর্ব্বে ইহা বলিয়াছি। পরমাত্মার কোন রূপ নাই, কোন আকার নাই, কোন গুণ নাই—তিনি অরূপ, তিনি নিরাকার, তিনি গুণাতীত নির্গুণ—কিন্তু তিনি এমন এক মায়া প্রকাশ করেন—যাহাতে তিনি গুণবান্মত হইয়া আকার ধারণ করেন। 'শ্রুতি' বহুস্থানে এই মায়ার কথা বলিয়াছেন। "যস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ 'মায়ী ঈশ্বর' এই বিশ্ব সৃজন করেন এবং অন্য অর্থাৎ জীব এই মায়াদ্বারা

বদ্ধ। মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" ইত্যাদি। শ্রীভগবান্ মায়াকে আশ্রয় করিয়া আকার গ্রহণ করেন, ক্রীড়া করেন, আত্মপ্রকাশ করেন—ইহা সত্য। এইরূপ ভক্ত মায়া সম্বন্ধে যাহা বলেন, জ্ঞানী তাহাতে জিজ্ঞাসা করেন—যিনি আপ্তকাম তাঁহার জগদাড়ম্বর করিবার ইচ্ছা কেন হয়—ইহার উত্তরে ভক্তগণ বলেন—তিনি স্বাধীন, তাঁহার ইচ্ছার কারণ কেহ নির্দেশ করিতে পারে না। যিনি ঐরূপ চেষ্টা করেন, তিনি শ্রীভগবান্‌কে স্বাধীন না বলিয়া পরাধীন করিয়া ফেলেন। এই প্রকারে ভক্তগণ প্রতিবাদীকে নিরস্ত করেন সত্য, কিন্তু তথাপি যেন প্রাণ তৃপ্ত হয় না। যিনি অবাঙ্‌মনস্ গোচর, যিনি সর্ব্বপ্রকার চলনবর্জ্জিত, মহাপ্রলয়ে 'যিনি মাত্র' অবশিষ্ট থাকেন, অন্য কিছুই থাকে না; যিনি সম্পূর্ণ আপ্তকাম, তাঁহার সৃষ্টিব্যাপার কেন? যদি বলা যায় ঈশ্বর সর্ব্বদাই সাকার, জীবও নিত্য, প্রকৃতিও নিত্য—এইরূপ বাক্যে বহু শ্রুতিবিরোধ হয়। মায়াকে যে সনাতনী বলা যায় তাহা মায়ার বিদ্যা অংশকে বলা হয়। ইহা মায়া-উপহত চৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয়। মহাপ্রলয়ে কিছুই থাকে না, 'তিনি মাত্রই থাকেন। জীব বা প্রকৃতি বা মায়া তবে ত্রিকালে থাকে না; কাজেই ইনি নিত্য নহেন, সনাতনীও নহেন। মহাপ্রলয় সম্বন্ধে—ঋগ্বেদ ৮।৭।১৭।১,২,৪—বলিতেছেন

নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমাহপরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদগহনং গভীরম্॥

যে কালে পূর্ব্ব সৃষ্টি প্রলীন ছিল, উত্তর সৃষ্টিও উৎপন্ন হয় নাই—তৎকালীন বর্ণনার পর বলা হইতেছে:—সেই সময় সৎ ও অসৎ দুইই ছিল না। নামরূপ বিশিষ্ট জগৎকে এখানে সৎ বলা হইতেছে এবং শশবিষাণাদিকে অসৎ বলা হইতেছে। এই সময়ে কোন অব্যক্তাবস্থা ছিল। নাসীদ্রজঃ। রজঃ ছিল না অর্থাৎ গুণত্রয়ই ছিল না। ব্যোম অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতও ছিল না। এই গুণত্রয় ও পঞ্চমহাভূত ভিন্ন গিরি, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি যা কিছু দৃশ্য তাহা কিছুই ছিল না। মহাতত্ত্বাদি আবরণ ছিল না—কোন্ দেশে কোন্ ভোক্তার সুখ নিমিত্ত কাহাকে আবরণ করিবে? ভোক্তা জীবও ছিল না। প্রবেশাশক্য অগাধ সলিলই বা কি ছিল? তাহাও ছিল না।

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি না রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রচেতঃ।
আসীদবাতং স্বধয়াতদেকং তস্মাদ্ধান্যং ন্নপরঃ কিঞ্চনাস॥ ঐ ২

মহাপ্রলয়কালে প্রাণিগণের মৃত্যু ছিল না। জীবনও ছিল না। রাত্রির চিহ্ন নক্ষত্রাদি ছিল না। দিবসের চিহ্ন সূর্য্য ছিলেন না। সেই সর্ব্বোপনিষদ্ সিদ্ধ এক ব্রহ্মবস্তু স্বাশ্রিত সর্ব্বজগতের আকৃতিরূপ মায়ার সহিত চেষ্টাযুক্ত ছিলেন। চেষ্টা এখানে সম্ভাব মাত্র। বায়ু রহিত ছিল (নিশ্চল ছিল)। সেই ব্রহ্ম হইতে কিছু উৎকৃষ্টও ছিল না অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট কিছুই ছিল না।

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতিষ্যা কবয়ো মনীষা॥ ঐ—৪

পরব্রহ্ম সম্বন্ধি মনের প্রথম রেত অর্থাৎ প্রথম কার্য্য যা ছিল, সেই কার্য্য সৃষ্টির অগ্রে কামরূপে অধিকতর আবির্ভূত হইয়াছিল। এক অদ্বিতীয় সত্যজ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম, সৃষ্টির পূর্ব্বে তমোগুণ দ্বারা আবৃত ছিলেন। সেই তমবিশিষ্ট ব্রহ্মের সিসৃক্ষারূপ যে মন আদিতে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই মনের প্রথম কার্য্যভূত পদার্থ কাম। সোঽকাময়ত ইত্যাদি। সেই কাম ইদানীং সৎরূপে প্রতীয়মান ভূতভৌতিক জগতের অসৎশব্দ-প্রতিপাদ্য তমরূপ অব্যক্তে বন্ধন হেতু; অর্থাৎ কামই অজ্ঞানে সমুদায় ব্যবহার বন্ধন করিয়া থাকে। বেদান্তপারগ পণ্ডিতগণ হৃদয়ে স্বকীয় বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া এই কামকে নিশ্চয় করেন, ইত্যাদি। ভক্তগণ মায়াকে যেরূপ সাজাইয়া থাকেন, তাহা শুনিলে—এখন জ্ঞানী, মায়া সম্বন্ধে যাহা বলেন শ্রবণ কর।

(২) আপ্তকাম ব্রহ্ম, ক্রীড়ার জন্য মায়া নির্ম্মাণ করেন—জ্ঞানিগণ এ কথা বলেন না। মণির ঝলক যেমন স্বভাবতঃ হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে স্বভাবতঃ মায়া উৎপন্ন হয়। যিনি সর্ব্বপ্রকার চলন রহিত, স্বভাবতঃ তাঁহাতে চলন হয়। স্বভাবতঃ নিঃসঙ্কল্প পুরুষে সঙ্কল্প উঠে। মায়ার উদয় হইলে, পরে সেই মায়াবী, মায়া লইয়া ক্রীড়া করেন। সূচীর শতপত্রভেদের ন্যায় ক্রম অনুসারে সৃষ্টিকার্য্য বহুদূর অগ্রসর হইলে, তবে সৃষ্টির কথা প্রকাশিত হয়। যেমন বালক বহু কর্ম্ম করিয়া ফেলিবার পরে তবে জ্ঞান-উদয়ে বুঝিতে পারে, তাহা দ্বারা কোন্ কর্ম্ম হইয়াছে—সেইরূপ অদ্বৈত হইতে দ্বৈতভাব আসিবার পরে তবে কিরূপে সৃষ্টি হইল তাহা প্রকাশের লোক হয়। মায়াকে দৈবী বলা হয়, কেননা ইহা শ্রীবিষ্ণু ঈশ্বরের স্বভাব। এই যে তোমাকে মায়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে জ্ঞানী ও ভক্তের একটু বিরোধ দেখান হইল—ইহা শ্রুতিতেও নাই—বশিষ্ঠ, নারদ, ব্যাস, বাল্মীকি, ইঁহাদের মধ্যেও এ বিরোধ নাই। ইঁহারা অদ্বৈত ভাব ঠিক রাখিয়া দ্বৈতভাবে জগতের যে খেলা তাহা দেখাইয়াছেন। আধুনিক ভক্তগণ দ্বৈতভাবই আছে, অদ্বৈত ভাব মিথ্যা— এইরূপ ভেদ বজায় রাখিবার জন্য বিচারের দোষে গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন মাত্র।

অর্জ্জুন—মায়া সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানীর ও প্রকৃত ভক্তের কোন বিরোধ নাই বুঝিতেছি। এখন অন্য কথা জিজ্ঞাসা করি।

ভগবান্—বল।

অর্জ্জুন—মহামায়া জগৎকে মোহিত করেন। জ্ঞানিগণের চিত্তকেও "বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি"—বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া এই মহামায়া মোহপ্রাপ্ত করান। মোহিত করানটি ত আর ভাল কার্য্য নহে? মায়া এই অসৎ কার্য্য করেন কেন? আবার তুমি বলিতেছ, ইঁনি দুরত্যয়া—ইঁহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া বড়ই কঠিন। মায়া কিরূপে দুরত্যয়া, কেনই বা দুরত্যয়া—আমাকে ইহা বুঝাইয়া দাও।

উৎসব।



স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৮ম বর্ষ।] ১৩২০ সাল, কার্ত্তিক। [৭ম সংখ্যা।

বিজয়া।

পোহাইল শারদীয় নবমীর নিশি,
ঘরে ঘরে ফুকারিল বিসর্জ্জন বাঁশী।
রক্তিম বরণ ভানু কেনরে মলিন?
একি ভাব তাহে যেন আবরিছে মসি!
কেঁদনা মা, ভুলনা মা, বঙ্গভূমি তব,
নিতান্ত অভাগা মোরা দারিদ্র্য পীড়িত।
তাই শত শত আঁখি পূর্ণ অশ্রু আজি—
সবিস্ময়ে চেয়ে আছে ও রাজীব পদে।
অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, জীর্ণ শীর্ণ দেহ,
ভগ্ন তরি ডুবু ডুবু সংসার অর্ণবে।
কি দিয়ে তুষিবে তাঁরা হতভাগ্য, হেয়,
কোথা পাবে রত্নধন, ভূষণ, কাঞ্চন?

চেয়ে দেখ, মাগো তোর নয়ন ফিরায়ে,
বঙ্গবাসী অঙ্গ জরা, অস্থিচর্ম্মসার ;
মুষ্টিমেয় অন্নতরে ফিরে দ্বারে দ্বারে,
হাহাকার উঠিতেছে প্রতি ঘরে ঘরে।
পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ গলিত বসন,
ছল ছল আঁখি তার, চলেনা চরণ ;
তার পানে বল মাগো, কেবা চাহে ফিরে ?
আশায় নিরাশ প্রাণে ফিরে যায় ঘরে।
ছোট্ট ছোট রাঙা ঠোঁট ছেলে মেয়ে গুলি,
মানস সরসে হায় কমল কলিকা ;
ম্লান চোখে ধেয়ে এসে চেয়ে রবে যবে,
কি দিবে তাদের মুখে ভাবিয়া আকুল !
আরও দেখ, রাজপথে স্রোতসম মাগো,
শত শত শুষ্ক ফুল ভেসে যায় যেন—
তুই কি কঠিন, মাগো ! তুই কি কঠিন !
সোনার এ বঙ্গভূমি করিলি শ্মশান !
ফুটেছিল কত শত সোনার কমল,
তোর কোলে একদিন গন্ধে আমোদিয়া—
কোথা হায় ! এবে তাঁরা কালের হিল্লোলে ?
বিস্মৃত গৌরব সব গিয়াছে মুছিয়া,
বুঝেছি, জননি ! তুমি কাঙালের নহ ;
যে তোরে তুষিতে পারে পুর তার সাধ।
পুষ্পিত, সংস্কৃত দেব বিত্রাস জীবন,
কোথা কবি জয়দেব অমূল্য রতন ?
ললিত তরঙ্গ যাঁর হৃদয়ে না ধরি'—
উছলিয়া পড়েছিল একদিন হেথা ;
বনে বনে, কুঞ্জে কুঞ্জে, শ্যামল প্রান্তরে,
যমুনার কূলে কূলে লহরে লহরে।
কোথা কবি বিদ্যাপতি, কোথা চণ্ডিদাস ?

সাহিত্য আকাশে যেন সান্ধ্যতারা দু'টী।
ফুটবে না আর কভু হেথা নীলাম্বরে,
ছড়াবে না প্রেম-দীপ্ত কিরণের ছটা—
দেখাবে না আঁখি খুলি "পিরীতি কি রীতি",
যাহে অন্ধ মানবের দৃষ্টি নাহি চলে।
সার্ব্বভৌম, শাক্যসিংহ, চৈতন্য, শঙ্কর,
আরও কত সুধীজন সন্তান মাতার,
শোভেছিল অঙ্কদেশ, এবে কোথা তাঁরা?
চ'লে গে'ছে অনাদির আনন্দ ভবনে।
জননী তাঁদের হায় মলিনা বিধুরা,
যাপিতেছে অসহন দুঃখের শর্ব্বরী।
আর কি হ'বে না মাগো সেই নিশা ভোর?
নবরাগে ডগমগ উদিবে তপন?
উৎসবের হাসিখেলা প্রতি ঘরে ঘরে,
বেদ-বিদ্যাপরায়ণ শান্তিসুখরত;
বাজিতেছে কত বাঁশী, কত হাসিরাশি,
ভাসিতেছে দিশি দিশি আনন্দ-প্লাবনে।
কেনরে পরাণ আজি করিল উদাসী?
তোর এই আনন্দের বিসর্জ্জন দিনে।
জানি আমি, জানি তুমি জগৎজননী,
ইচ্ছাময়ী, পলকেতে প্রলয় তোমার;
ভ্রমান্ধ মানব মোরা চক্রাকারে ঘুরি,
তত্ত্বজ্ঞান রাখিয়াছ বাঁধি মায়াপাশে।
আর না, আর না, মাগো করিব ক্রন্দন,
যা'হবার হ'বে কেবা করে অবরোধ?
কে বা পারে ফিরাইতে স্রোতস্বিনী-ধারা?
ধায় যবে মিলনের আশে সিন্ধুপানে।
একে একে একে হায়, জলবিম্বপ্রায়,
উঠিবে ডুবিবে সব অনন্ত-সাগরে।

হরি, হর, পুরন্দর, মরালবাহন,
কেহ নহে চিরতরে, কারণ-সলিলে—
কালের করাল-গর্ভে হইবে বিলীন ;
সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার সে কালের নিয়ম।
আজ রাজা—কাল সেই পথের ভিখারী,
সুখদুঃখ ফিরিতেছে চক্রের মতন।
চিরদিন কা'রও দুঃখে নাহি অধিকার,
আশাপাশে বাঁধা নর ধূলির সংসার।

(মালদহ)।

সুপ্তি-ভঙ্গে আত্ম-নিবেদন।

আঁখিজ্যোতি হ'য়েছিল ম্লান
ভেবেছিনু দিবা অবসান,
জীর্ণ বীণা রেখেছিনু তুলি
তাই আর গাই নাই গান ;

তাই তু'ল নাই ফুল, গাঁথি নাহি মালা,
মানসে চম্পক তুলি ভরি নাহি ডালা।

দেখি নাথ! তোমার জগতে—
আমারে যে নিত্য দরকার ;
আমাতে কি সাধ্যে প্রয়োজন?
বল প্রিয়! সর্ব্বস্ব আমার!

আবার উঠিনু জাগি তোমার পরশে,
ভাব-পুষ্প পরিমল বিলাতে সরসে—

লহ প্রভু, সব লহ তুমি,
যাহা আছে আমার আপন;
অশ্রু-শিশিরে হিয়ার গোলাপে
ভরাপ্রাণে হ'ক আত্মনিবেদন।

(ভবানীপুর)।

অবস্থা—"মম মায়া দুরত্যয়া"।

আমরা অবস্থা অবস্থা করিয়া অনেক সময়ে অনেক কথা বলিয়া থাকি। অবস্থা যদি ভাল হয় তবে বিশেষ সুখী হই, আর যদি মন্দ হয় তবে জীবনেও ধিক্কার হয়—মনে হয় মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। সাধারণতঃ সকলেই এই অবস্থার দাস। ইহাকে অতিক্রম করা কি, তাহা যে চেষ্টা করে সেই জানে। বরং পর্ব্বত লঙ্ঘন করা সহজ, কিন্তু অবস্থা অতিক্রম করা সহজ নহে। এই অবস্থা বস্তুটি কি তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা যাউক।

অবস্থা বলিলে সচরাচর কি বুঝায়? ব্যক্তিবিশেষের অবস্থা ভাল কি মন্দ বলিলে বুঝি এই যে, তাহার সাংসারিক অবস্থা ভাল বা মন্দ, অর্থাৎ হয় ধন জনাদি থাকার কারণ সুখী কিম্বা তাহাদিগের অভাববশতঃ দুঃখী। মনুষ্য ব্যতীত সৃষ্টির যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধেও অবস্থার অর্থ ঠিক এইরূপ। অর্থাৎ ভাল অবস্থা বলিলে বৃদ্ধি কিম্বা পরিবর্দ্ধিত অবস্থায় স্থিতি এবং মন্দ অবস্থা বলিলে ক্ষয় বা নাশশীলতা বুঝায়। কেবল এই ভাবে দেখিলেও এই অবস্থার বৈচিত্র, সৃষ্টিবৈচিত্র সদৃশ অনন্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু স্থূল-শরীরের সুখ দুঃখ লইয়াই কেবল অবস্থার নির্ণয় হয় না। মনের সহিত অবস্থার বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ধনজনাদি সম্বন্ধে ঠিক এক অবস্থার দুইটি লোকের মানসিক অবস্থায় হয় ত আকাশ পাতাল প্রভেদ থাকিতে পারে। একজন হয় ত ক্ষিপ্ত হইতে পারে এবং অপরটি পণ্ডিত হইতে পারে। এক-জন ক্রূর হইতে পারে এবং অপরটি পরম দয়ালু হইতে পারে। একজন ঘোর বিষয়ী হইতে পারে এবং অপরটি পরম বিবেকী হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত

দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বিদ্যা, বুদ্ধি ইত্যাদি কত বিষয়ে অবস্থার পার্থক্য হয়। অতএব কেবল মাত্র ইহার বৈচিত্রতার দিকে লক্ষ্য করিলেই ইহাকে অনন্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। একবার বিবেচনা করিয়া দেখ, একটি লোকের অবস্থা কিসে কিসে গঠিত হয়। ইহার প্রথম ও প্রধান উপাদান হইতেছে শরীর এবং মন। তাহার পর সংসার, সমাজ, জাতি ধর্ম্ম, দেশ, কাল, বিদ্যা, বুদ্ধি, লোকসঙ্গ, অর্থ, ভূমি, আহার, পরিচ্ছদ ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, নদী, জল, সমুদ্র, পর্ব্বত, আকাশ, মেঘ, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা, গ্রহমণ্ডল ইত্যাদি সৃষ্টির যাবতীয় পদার্থ হইতে এই অবস্থার উপাদান আহৃত হইয়া থাকে। মনে হয় যেন সৃষ্টিদেবী অবস্থা-রূপে জীবকে আপনার ক্রোড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। এই অবস্থাকেভগবানের মূর্ত্তিমতী প্রহরীস্বরূপিণী বলিয়া মনে হয়। তুমি চলিবে, ফিরিবে, হাসিবে, কাঁদিবে, যাহা কিছু করিবে,—এই সৃষ্টিরূপ কারাগারের মধ্যে এই অবস্থা-রূপিণী প্রহরীর আদেশক্রমে। ইহার আজ্ঞাব্যতীত তোমার এক পা চলিবার ক্ষমতা নাই, একটি নিশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলিবার অধিকার নাই। কে এই দেবী, কোথায় ইহঁার নিবাস কি প্রকার ইহঁার রূপ ও শক্তি? এই দেবী সাক্ষাৎ ভগবৎমায়া, ইহঁার নিবাস মনোমধ্যে, অন্তরের অন্তস্থলে। ইনি মনোরূপিণী, ইহঁার রূপের সীমা নাই, ভক্তচিন্তানুসারে ইঁহার রূপ অনন্ত। আর ইহঁার শক্তিও ইহঁার রূপের ন্যায় অনন্ত, অপরিসীম। ইনি কৃপা করিলে হয় না এমন কার্য্য নাই। সম্পদ্‌সিদ্ধি ত তুচ্ছ কথা, ইহঁার আনুকূল্যে সাক্ষাৎ ভগবৎদর্শন পর্য্যন্ত হইতে পারে। অপর পক্ষে, ইনি যদি প্রতিকূল হন তবে দুর্গতির সীমা থাকে না। জীব বাতাহত তৃণকাষ্ঠতুল্য ইতস্ততঃ বিতাড়িত হইতে থাকে। ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত, ভগবানের কৃপা ব্যতীত তাহার উদ্ধারের উপায় থাকে না। ইহঁার শক্তির বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় কর্ম্ম করিবার সময়ে। তুমি দরিদ্র আছ, অর্থ চাও। তোমাকে এই অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধ করিয়া যদি ইহঁাকে সন্তুষ্ট করিতে পার, ইনি শিবরূপী হইয়া তোমাকে বর প্রদান করিবেন, তুমিও সিদ্ধমনোরথ হইবে। কিন্তু সে যুদ্ধ সহজ যুদ্ধ নহে। তোমার সমস্ত উৎসাহ, বল, বুদ্ধি, পরাক্রম কেন্দ্রীভূত করিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে এবং তাহাতেও তোমার জয়ের আশা নাই যদি ধৈর্য্যের অভাব হয়। এই যুদ্ধ জয়ে

শেষ হয় না। তোমাকে পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইতে হইবে। যদি একবার বিতাড়িত হইয়া তুমি পশ্চাৎপদ হও, তোমার হইল না,—অবস্থা তোমাকে কাপুরুষ মনে করিয়া উপহাস করিবে। হয় ত দয়া করিয়া তোমাকে অল্প কিছু দিতে পারে, কারণ যুদ্ধেই ইহার পরম সন্তোষ; কিন্তু তোমার অভীষ্টসিদ্ধি সুদূরপরাহত। তুমি আবার উৎসাহ-সহকারে অগ্রসর হও; সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত কাষ্ঠখণ্ড যেমন সমুদ্র সবেগে তীরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়, অবস্থাও সেইরূপ তোমাকে বহুদূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবে। ইহাতেও যদি তুমি দমিত না হও, যদি আবার প্রবল উদ্যমের সহিত বীরের মত ছুটিয়া গিয়া ইহাকে আক্রমণ কর, দেখিবে, যাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছ সে আর নাই, তুমি যাহা খুঁজিতেছ তাহাই আছে। অবস্থা তখন বিকট কিরাতকিরাতীমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া সুন্দর শিবমূর্ত্তিতে তোমাকে আলিঙ্গন করিতেছে। কিন্তু এতটা উদ্যম, এতটা ধৈর্য্য, এতটা পুরুষকার কয়টা লোকের থাকে? অর্জ্জুনের ছিল, তাই অর্জ্জুন ভগবানের এত প্রিয়। তোমার আমার ইহা কি করিয়া হইবে? তুমি হয় ত বলিবে, অর্থোপার্জ্জনাদি পার্থিব বিষয়ে কত লোকে অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া বিজয়ী ও সিদ্ধ-কাম হয়। সত্য, ইহার দ্বারা তাহার সিদ্ধির যথার্থ পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয় মাত্র। তাহারা যে উদ্যম লইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, অর্থোপার্জ্জনের পর তাহা শিথিল হইয়া যাওয়ায় অর্থোপার্জ্জন পর্য্যন্তই হইয়া থাকে। অর্থ-ভোগের সময়ে জরা ও মৃত্যু আসিয়া বাধা দেয়, কারণ সে দিকে ত কিছু করা হয় নাই। যুদ্ধ করার জন্য কিছু লাভ হইল, কিন্তু সম্পূর্ণ লাভ ত হইল না। অর্জ্জুন যুদ্ধ করিয়া অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন এবং পরে সেই অস্ত্রের সম্যক্ ব্যবহার করিয়া নষ্টরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। তোমার আমার যদি হয়, তবে অস্ত্রলাভ পর্য্যন্তই হয়; তাহার ব্যবহার করিবার পূর্ব্বেই অবস্থা মৃত্যুরূপী হইয়া আমাদিগকে গ্রাস করে। সুতরাং অর্জ্জুনের সহিত আমোদের পার্থক্য অনেক। অর্জ্জুন যুদ্ধের কৌশল জানিতেন, আমরা তাহা জানি না!

ভগবৎমায়ারূপিণী, সর্ব্বসিদ্ধিদা, সর্ব্বগুণসম্পন্না এই "অবস্থানাম্নী" দেবীই আদি প্রকৃতি। ইঁহার কৃপাতেই নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হন, ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন, শিব লয় করেন। ইঁহারই আজ্ঞায় জীব জাগ্রৎ হইয়া

কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, স্বপ্নাবস্থায় নানাপ্রকার প্রলাপ দেখে ও সুষুপ্তিতে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে। ইনি ক্ষুদ্রের নিকট ক্ষুদ্র ও বৃহতের নিকট বৃহৎ। জীব শিব সকলেই ইহঁার অঙ্গীভূত। ইনিই সাক্ষাৎ জগজ্জননী। ইহঁার কৃপা না হইলে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। ইনি রুষ্ট হইলে কোন বিপদই অসম্ভব নয়। এই যে মহামায়া,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যাঁহার সেবায় নিরত, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা, এ কথার অর্থ কি? এ যুদ্ধ সাধারণ যুদ্ধের মত নহে। এই রণরঙ্গিণীর সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে, অসিচর্ম্মাদি অস্ত্রের আবশ্যক হয় না। অস্ত্রাদি লইয়া ইহঁার সহিত যুদ্ধ করিয়া আজ পর্য্যন্ত কেহ জয়ী হইতে পারে নাই। যে ইহঁাকে জয় করিয়াছে, সে ইহঁার চরণ আশ্রয়ে ইহঁাকে জয় করিয়াছে। এদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই। প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের মত ইনি চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া তোমার উপর দিয়া চলিয়া যাইবেন। অটল ধৈর্য্যসহকারে শবের ন্যায় নিশ্চলভাবে ইহঁার চরণতলে পড়িয়া স্থিরনেত্রে ইহঁার দিকে চাহিয়া থাক। তুমি অন্তরে প্রবল পুরুষার্থ অবলম্বন করিয়া অবিচলিতচিত্তে ইহঁার গতি পর্য্যবেক্ষণ কর। তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না। তুমি অনায়াসে মৃত্যুঞ্জয়পদ লাভ করিবে। তুমি তখন হাসিতে হাসিতে বলিতে পারিবে—

"শমন দমন মায়ের চরণ, সর্ব্বদাই হৃদে ধরি।
আমার কিসের শঙ্কা, মেরে ডঙ্কা,
চ'লে য'াব কৈলাসপুরী॥
যারে শমন যারে ফিরি।
ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি॥

শ্রীআ—

আমার গতি।

আমি একটী ক্ষুদ্র নদী। পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়াছি। আশা আছে কালে সাগরের সহিত মিলিত হইব। আমি কেবলই ছুটিতেছি, কত দিনে সাগরের সহিত মিলিত হইয়া শান্তি লাভ করতে পারিব? সাগরাভিমুখে চলিতেছি—সাগরের সহিত মিলিত হইব বলিয়া আনন্দও হইতেছে কিন্তু আমাকে বড়ই কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। কত দুর্গম স্থান দিয়া যে আমাকে ছুটিতে হইতেছে, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু এখনও আমি সঙ্কীর্ণই আছি, তাই আমাকে কেহই তেমন বাধা দিতে পারে নাই।

যখন আমি উৎপত্তি-স্থান হইতে ১৫।১৬ মাইল এই প্রকার সঙ্কুচিত ভাবেই আসিয়াছি, তখন সহসা দেখিতে পাইলাম আমার কলেবর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে—বুঝিলাম বর্ষাকাল উপস্থিত। মনে ভয় ও ভাবনার উদয় হইল। বুঝিলাম ইহা আমার একটী ভীষণ সময় উপস্থিত। এতদিন আমার জল বিশুদ্ধ ছিল, লোকে সাগ্রহে পান করিত। কিন্তু এখন ক্রমে নানা প্রকার আবর্জ্জনা ভাসিয়া আসিয়া আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিবে। লোকে আর ঘৃণায় আমার জল পান করিবে না। তবে বর্ষা আসিয়া আমার কি উপকার করিল? আমি যেমন ছিলাম তেমনই রহিলাম না কেন? বর্ষা দুকূল প্লাবিত করিয়া আমার সৌন্দর্য্য বাড়াইল বটে, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য আমার কত দিন থাকিবে? কেহ যদি আমাকে স্নেহের চক্ষেই না দেখিল, সকলেই যদি ঘৃণায় আমার জল পান করা ত্যাগ করিল—তবে আমার এ ক্ষণিক সৌন্দর্য্যে কি প্রয়োজন? ভাবিতে ভাবিতে চলিতে লাগিলাম।

সহসা দেখিতে পাইলাম—যে পথে আমি যাইব, সে পথ একটী বিশাল পর্ব্বত দ্বারা আবদ্ধ। কোন ক্রমেই আর আমার সে পথে যাইবার সাধ্য নাই। আমি কি করিব চিন্তা করিতেছি, এমন সময় বুঝিতে পারিলাম আমি যেন কোথা হইতে আকর্ষিত হইতেছি। ভাবিলাম এ আবার কি? এতদূর চলিয়া আসিলাম, কোথাও ত আমি আকর্ষিত হই নাই! এ আবার কে আমাকে আকর্ষণ করিতেছে? আমি ফিরিলাম। কিছুদূর আসিবার পর দেখি, কয়েকটী সুন্দর সরল নালা আমাকে আকর্ষণ করিতেছে। কি আশ্চর্য্য! আমি এতদূর আসিলাম, কিন্তু ইহাদিগকে ত কখনও দেখি নাই। ইহারা কোথা হইতে

আসিল ? আমি ইহাদের আকর্ষণ সহ্য করিতে পারিলাম না। তাহাদের সহিত মিশিবার জন্য ব্যগ্র হইলাম। আমি মিশিতে যাইতেছি, এমন সময় কে যেন আমার গভীরতম প্রদেশ হইতে বলি। উঠিল,— 'ওপথে যাইও না, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে, সাগরে মিশা হইবে না।"

কিছুক্ষণ চিন্তা করিলাম। অবশেষে আকর্ষণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া, তাহাদের সহিত মিশিতে গেলাম। আদেশবাণী ভুলিয়া গেলাম। তখন দেখি, পূর্ব্বে লোকে আমাকে দেখিলে যেরূপ আনন্দে আমার জল পান করিত, এখন আমাকে দেখিলে সেইরূপ ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়। যেন আমাকে দেখিলেও পাপ। আমি বুঝিতে পারিলাম না—কেন তাহারা আমাকে দেখিলে এরূপ ব্যবহার করে।

আমি এক মনে চলিতেই লাগিলাম। যখন আমি এক এক বার আমার দিকে লক্ষ্য করিতাম, তখনই দেখিতে পাইতাম আবার উপরে প্রচুর আবর্জ্জনা ভাসিতেছে। তখন দুই এক বার মনে হইত—তাই বুঝি লোকে আমায় এত ঘৃণা করে। আমার দুঃখ হইত। কিন্তু অধিকক্ষণ স্থায়ী হইত না। আবার চলিতে আরম্ভ করিতাম।

ক্রমে এক, দুই, তিন করিয়া কয়েকটী মাস চলিয়া গেল। সহসা অনুভব করিলাম—পশ্চাৎ হইতে কে যেন আমাকে আকর্ষণ করিতেছে। সে আকর্ষণ যেন প্রভূত শক্তিশালীর বলিয়া বোধ হইল। আমি সে আকর্ষণ আর সহ্য করিতে পারিলাম না। দেখিলাম সেই আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে নালা-গুলির আকর্ষণ আর নাই। আমি ভাবিতে লাগিলাম—যাহারা এতদিন আমাকে আকর্ষণ করিল, তাহারা আজ নীরব কেন ? একবার তাহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম—বুঝিলাম, তাহারা আমাকে ছাড়িয়াছে, আর আমাকে তাহাদের প্রয়োজন নাই। সেই কারণে তাহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। তখন আমার পূর্ব্বের কথা মনে পড়িল। অনুতাপে জর্জ্জরিত হইতে লাগিলাম। বুঝিলাম, আদেশবাণী শ্রবণ না করিবার ফলই এই। দুঃখের সীমা রহিল না। সাগ্রহে একবার আমার দেহের প্রতি চাহিলাম। দেখিয়াই অবাক্ হইলাম। একি! আমার সে বর্ষাকালীন সৌন্দর্য্য কোথায় ? আমি পূর্ব্ব হইতে অনেক সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছি। আমার চারিপার্শ্বে কর্দ্দমাক্ত ভূমি। তাহাতে নামিতে

কেহ সাহস করে না ; বুঝি বা মনে করে, তাহারা নামিবা মাত্রই কর্দ্দমে প্রোথিত হইয়া যাইবে আর আমি ভীষণ আকারে তাহাদিগকে গ্রাস করিব।

নিজের কথা ভাবিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইল। দেখিলাম, বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল আবর্জ্জনা ভাসিয়া আসিয়াছিল, তাহারা আমার উপরে সমভাবেই আছে। আমি তাহাদের নিম্নে—যেন কত পরাধীন। আমি ভয়ে পশ্চাতে ফিরিয়া যাইতে লাগিলাম। বহু কষ্টে বিপদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আমার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু পূর্ব্বের অবস্থা ও বর্ত্তমান অবস্থাতে কত পার্থক্য ? পূর্ব্বে আমি নির্ম্মল ছিলাম, আমাতে কলঙ্কের লেশ মাত্রও ছিল না,—কিন্তু এখন যেন কোথা হইতে মাঝে মাঝে আবর্জ্জনা ভাসিয়া আসিয়া আমাকে অস্থির করিয়া ফেলে। আমি দিশে হারা হইয়া যাই। পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া বড়ই আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া আর কার্য্য করিব না। আবার চলিতে লাগিলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর দেখি, আমার জল অনেকটা নির্ম্মল হইয়াছে। বহু সাধু সন্ন্যাসী কৃপা করিয়া আমার জল পান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ও তাহাতে স্নানাদি করিতেছেন। দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল। আমি অতি সঙ্গোপনে ও ভক্তিভাবে তাঁহাদের চরণ ধৌত করিয়া চলিতে লাগিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর দেখিতে পাইলাম—আমার শরীরে আর বিশেষ ময়লা নাই। মাঝে মাঝে যাহা দুই একটী আইসে তাহা আমার তরঙ্গাঘাতে কোথায় চলিয়া যায় আর দেখিতে পাই না। কিছুদূর আরও অগ্রসর হইবার পরে দেখিতে পাইলাম—আমার কলেবর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু বর্ষাকালীন অস্থায়ী বৃদ্ধির ন্যায় নহে। সে এক নূতন ভাবে। তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারা যায় না। তাহাতে কোন প্রকার আবর্জ্জনা নাই। তখন কে যেন আমাকে বলিয়া দিল "অগ্রে একটী বড় নদীর সহিত মিলিত হও, তুমি অতি ক্ষুদ্র নদী, বড় নদীর সাহায্য ব্যতীত সাগরে মিশিতে পারিবে না।" তখন আবার আমার চিন্তা হইল—বড় নদী কোথায় পাইব ? চিন্তা করিতে করিতেই ছুটিতে লাগিলাম।

সহসা একদিন কি এক আনন্দে যেন আমার কলেবর উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ; আমি বুঝিতে পারিলাম না কেন। আমি সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। আমার "আমিত্ব" হারাইলাম। কেবল "তুমি কোথায়, কত দূরে আছ" এই প্রকার

চিন্তা আমার মনে আসিতে লাগিল। আমি আশায় বুক বাঁধিয়া চলিতেই থাকিলাম। অকস্মাৎ একদিন রাত্রে, কে যেন আমার দেহে তাঁহার কোমল কর-পল্লব দান করিলেন। আমি শান্ত হইলাম। আমার মনে হইল—আমি যাহা চাই তাহা বুঝি পাইয়াছি। আমার সমস্ত তাঁহাকে দিয়া আমি তাঁহাতে মিশিয়া যাইতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন,—"তুমি সমস্ত আমাকে দান করিতে পার, কিন্তু আমার সহিত তোমাকে সাগরে মিশিতে হইবে। নতুবা পূর্ণ শান্তি পাইবে না। ভয় নাই, তোমার জন্য যাহা করিতে হয় আমিই করিব। তুমি শীঘ্রই সাগরে মিশিতে পারিবে। আমি তাঁহার প্রতি সমস্ত ভার প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

আমার ভাবনা দূর হইল। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে আমি বুঝিতে পারি নাই আমি কোথায় আসিয়া মিশিয়াছি। প্রভাত হইবা মাত্র শত শত লোকে তথায় স্নান করিতে আসিল। তথায় স্নান করিয়া কৃতার্থ হইয়া সকলেই সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতে লাগিল। কেহ বা স্তব পাঠ করিল—

মাতঃ সুরেশ্বরি! ভগবতি! গঙ্গে,
ত্রিভুবন তারিণি! তরল তরঙ্গে ইত্যাদি।

আমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, আমি গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছি। নতুবা এত লোক কোথায়ও স্নান করিয়া কৃতার্থ হইতে আইসে না। আমার আনন্দ আর ধরে না। নিজকেও বড়ই কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলাম। আমার সাগরে মিশিবার কোনই সন্দেহ রহিল না। আমি নিশ্চিন্ত মনে, তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলাম।

(গৌহাটী—আসাম)

করিয়া চল।

নাই নাই করিলে সাপের বিষ থাকে না। তোমার তাই হইয়াছে। শক্তি নাই, শক্তি নাই করিয়া তুমি নির্জীব হইয়া পড়িয়াছ। কিছু বলিলেই বলিবে আমার কি সে শক্তি আছে? আমি যে পারি না?

সর্ব্বৈব মিথ্যা। সব শক্তি তোমার আছে? তোমাকে করিতেই হইবে।

আজ মনটা ঠিক নাই পারিব না। মনটা ঠিক নাই ইহা ত তোমারই সৃষ্টি। তুমিই ত ইহা করিয়াছ। আর মনকে ঠিক করিতে তুমিই পার! পার না? বেঠিক করিয়াছে কে? সে ত তুমি। এক দণ্ডে যে ত্রিভুবন ঘুরিয়া আসিতে পারে—সে না পারে কি? এ সব কথা ছাড়।

চেষ্টা কর। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর। যেরূপ করিলে পার, তাহাই ধীরে ধীরে করিতে থাক। বসিয়া পার না—পায়চারী করিতে করিতে চেষ্টা কর। স্থির হইয়া পার না—এক পায়ে দাঁড়াইয়া কর। বসিয়া পার না—হস্তপদাদিকে নৃত্যভঙ্গিতে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে কর। কেন পারিবে না—যাহাতে পার গান গাহিয়া পার—উচ্চকণ্ঠে স্তবপাঠে পার—যাহাতে পার তাহাতে কর।

করিয়া যাও। না করিলে বড়ই দুঃখসাগরে পড়িবে। সবই তুমি পার।

বলিতেছ মরিতে বল কি?

মরণ কি তোমার আছে? তোমার মরণ নাই। মরিবে না সে ভয় নাই। রে চিত্ত! করিয়া চল। সব শক্তি তোমার আছে। একবার চাহিয়া দেখ-দেখি আমি কে?

আমি বলিতেছি তোমাকে করিতেই হইবে। কর,—না করিলে তোমার নিষ্কৃতি নাই। জান ত আমি সব পারি। তোমার মত অসুর আমি অনেক বধ করিয়াছি। দেখিতেছ না আমার হস্তে শাণিত অসি, গলায় রক্তাক্ত মুণ্ড-মালা, হস্তে সদ্যখণ্ডিত অসুর মুণ্ড। এ দেখিয়া তোমার ভয় হইতেছে না? আবার অন্যদিকে দেখ—যাহারা শান্ত—যে সব সন্তান আমার কথা শোনে তাহাদের জন্য বর ও অভয়। আমার মূর্ত্তি ভীষণ ইহা—অসুরেরা দেখে; আমার অবাধ্য সন্তানেরা দেখে। কিন্তু সিংহ-শিশু কি সিংহিনীকে ভয় করে? শিশুর কাছে যে সর্ব্বদা আমার হাসি মুখ।

এই আমি তোমার মা। ভয় নাই। আমার আজ্ঞা পালন করিয়া যাও—করিয়া চল। নানা উপায় আছে। যাহাতে পার—যত প্রকারে পার করিয়া চল। তুমি তোমার মতন করিয়া চেষ্টা কর—আমি আর সব করিয়া দিব। কথা না শোন—বড় যাতনা পাইয়া করিবে। "সেই সোজাই ত হইবে" তবে সময়ে না হও ত দুঃখ পাইয়া, ঠেঙ্গানি খাইয়া সোজা হইবে। তাই বলি সুবোধ হইয়া করিয়া চল। তোমায় আমি করাইবই নিশ্চয়।

করিলে কত সুখ পাইবে। সে সুখও ত তুমি জান। গ্লানি শূন্য আনন্দ। আগে বিষের মত লাগে। সে তোমার মন্দ অভ্যাস বদলাইতে হয় বলিয়া কিন্তু শেষে অমৃতোপম।

ধমক খাইয়া চিত্ত বসিল। বেশ করিতে পারিল। আহা! এই চিত্ত এখন কত সুন্দর হইয়াছে! কেমন শরণাপন্ন হইয়াছে! দেখদেখি হতভাগ্য! বৃথা এতদিন এই সুখে বঞ্চিত ছিলে!

তাই বলি করিয়া চল। ইহাই সঙ্গে যাইবে। আর কিছুই সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে না। আমি সকলেরই আছি। করিয়া চল। সুখী হও।

কাবেরী দর্শনে।

১

কাবেরী কালের বেশ ধরেছে আপনি,
এক দিকে ছুটিতেছে যেন উন্মাদিনী;
উছলি উছলি কায় বলিতেছে আয় আয়,
ভীষণ তরঙ্গ তার হেরিলে নয়নে,
বৈরাগ্য আসিয়া যায় সংসারীর প্রাণে।

২

এক মনে এক ধ্যানে ছুটিয়াছ ত্বরা,
কত প্রেম সে হৃদয়ে কি বুঝিব মোরা;
কার সাধ্য বাঁধে তায় শোক দুঃখ মমতায়,
বাধিতেও নারে তারে রবি শশী তারা,
ধাইতে অনন্ত পানে যেন আত্মহারা।

৩

কত দিকে কত রূপ সেজেছ কাবেরি !
মাতাইয়া মানবেরে দিবস শর্ব্বরী ;
কিন্তু এক দিকে টান ভকতি পুরিত তান,
ভুলে যাই সব জ্বালা যখন নেহারি
ধরা-মাঝে শান্তিময়ী কাবেরী-সুন্দরি,

৪

কখন জননী-বেশে মরি কি কোমলা,
স্নেহেতে মাখান হৃদি তনয় বৎসলা
লইয়ে হৃদয়ে ধরি ক্ষুদ্র জনে দয়াকরি
শান্তি তরঙ্গেতে মাগো কত কর খেলা
তোমারে পাইয়ে তারা জুড়াইছে জ্বালা।

৫

কখন পিছনে থাকি তাদের ডুবাও,
ভয়েতে ব্যাকুল ক'রে অকুলে কাঁদাও ;
না দেখে তোমারে তারা ডুবে ডুবে হয় সারা
আবার সম্মুখে আসি হাসিয়ে দাড়াও
কারে বা সাদরে ধ'রে চুম দিয়ে যাও।

৬

যেন গো স্নেহের টানে টেনেছ তাদের
আদরে দিতেছ ধুয়ে ধুলি মা ভবের
শান্তিবারি দিয়ে বালা ধুইছ পাপের ধুলা
শিখাবে অমিয় গীতি তুমি স্বরগের
জুড়াইতে হৃদি জ্বালা নিজ তনয়ের।

৭

নীরবে বিরল কি গো পেতেছ সংসার
নগরের কোলাহল করি পরিহার
কিম্বা প্রকৃতির সনে খেল মা বিজন বনে
মিশাও প্রেমের গীতি সাথে পাপিয়ার
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি পদে দাও দেবতার ?

৮

না না না বুঝেছি মাগো দেখিনু এবার,
কি কারণে এ অরণ্যে বসতি তোমার ;
অনন্তকালের তরে, সহস্র বাসুকি পরে,
অনন্ত শয়নে শুয়ে প্রাণেশ তোমার,
ছেড়ে পতি কোথা সতী থাকে বল আর ?

৯

পূজিতে সে দেবপদ তুমি আত্মহারা,
সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই ধ্রুব তারা ;
শত গিরি কাঁটাবন কিছুতে না টলে মন
অনন্ত ভকতি ভরে যেন মাতোয়ারা
সে ভকতি সেই স্তুতি কি বুঝিব মোরা।

১০

এই কি মা ভক্তিধারা দেবতার পায়,
অসীম ভকতি প্রীতি নীরবে পূজিছ পতি,
কে বুঝিবে কি গরিমা এ মহাপূজায়
কাবেরী চরণে ধরি শিখাও আমায়।

১১

তোমার ভকতি ধারে সুরবালাগণ,
স্বরগ ত্যজিয়া হেথা করি আগমন
আনন্দে বিভোর মাতি নন্দনের পারিজাত
এনে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে হতেছে মগন,
মরি মরি কি মাধুরী জুড়াল নয়ন !

১২

বুঝিয়াছি শৈলসুতা জানিয়াছি সার
যোগেশের কাছে যোগশিক্ষা মা তোমার ;
ভক্তিতে হৃদয়পরি লয়ে যজ্ঞেশ্বর হরি,
যোগানন্দে নাচিতেছ কাবেরী আমার,
কোন্ দুঃখ রবে কাছে কি সাধ্য তাহার ?

১৩

তোমার আশ্রিত যারা না পায় দুর্গতি,
নমি পদে তব পূজা দেখে দিবারাতি ;
তা দিকে মা দয়া করি বিতরিছ শান্তি-বারি,
সুজলা সুফলা সাজে করিছ বসতি,
কেমনে বলিব মাগো তোমার শকতি।

১৪

ওকি ও হেথায় কার কাতরতা ধ্বনি,
কাতরে ব্যাকুল কণ্ঠে আকুল পরাণি ;
দে ফটিক জল বলি শুকায় কণ্ঠের ধূলি,
তুমি দেখি মোর মত চির কাঙালিনী
চিনেছি চিনেছি আমি তোরে চাতকিনী।

১৫

তুমি দেখি ভাগ্য-হীন আমার মতন,
বিজনে ভবের বনে করিছ রোদন ;
লইতে গণ্ডূষবারি, হেথা হ'তে যাও ফিরি,
শুষ্ক কণ্ঠে প্রাণ ভরা লইয়ে বেদন,
এসে দেখ ভক্তি ধারা সুন্দর কেমন !

১৬

এবার এসেছ ভাই রবে না পিপাসা,
মিটাবে জননী তোরে পিপাসার আশা ;
ভক্তি-বারি পরশনে, খেলরে আনন্দ মনে
খাও মাখ প্রাণ ভরে ঘুচাইয়ে তৃষা,
পবিত্র কাবেরী তীরে কেনরে পিয়াসা ?

১৭

কবে রে চাতক মোর হবে তোর মত,
ভকতি-তৃষায় প্রাণ কাঁদিবে নিয়ত ;
তোর মত প্রেম-নীরে, বেড়াব কখন ফিরে,
প্রেম পিয়ে তৃষাহীন হ'য়ে তোর মত,
মায়ার সংসার বন করিয়ে নিহত।

১৮

কাবেরী জননী মাগো প্রণমি চরণে,
বিদায় বলিতে যেন শেল বিঁধে প্রাণে ;
আর কি তোমার দেখা, আছে মা কপালে লেখা ?
সে আশা ত এক তিল নাহি লয় মনে,
প্রণমি কাবেরী সতী নমি নারায়ণে।

(গিরিডি)।

বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্র-নন্দন।

বিশাখা! আজ এই কালিন্দীকূলে, সেই বৃষভানুকুমারী আমার মন-প্রাণ লইয়া চলিয়া গিয়াছে। এখন যতক্ষণ অবধি সেই নীলবসনাসুন্দরীকে না পাইতেছি, ততক্ষণ আমাব অধৈর্য্য প্রাণকে কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারিতেছি না।

শুন শুন এ সখি কর অবধান।
সে যে রমণী নিল হামারি পরাণ॥
যদবধি না দেখিয়ে সো চাঁদ-মুখ।
তদবধি মদন দ্বিগুণ দেই দুঃখ॥
ঝর ঝর অনুখণ এ দুহুঁ নয়ান।
জর জর অন্তর না যায় পরাণ॥
তা সঞে রভস রস যদি নাহি হোয়।
নিচয় না জীয়ব কহলম তোয়॥
দুই এক দিবসে মিলবে বরনারী।
এ যদুনন্দন যাঙ বলিহারি॥

বিশাখা দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণের চক্ষে জল আসিয়াছে, আর তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, শ্রীকৃষ্ণের অশ্রুজলে তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। বিশাখা মনে করিয়াছিলেন, রাধিকার সম্বন্ধে কোন কথাই আজ আর বলিব

না, কিন্তু বারংবার কৃষ্ণের কাতরোক্তি শুনিয়া আর নীরবে চলিয়া যাইতে পারিলেন না, বলিলেন,—

শুন শুন সুন্দর নাগর-রাজ।
সো ধনি বৈঠত গুরুজন মাঝ॥
মুগধা গোঙারি কবহুঁ নাহি সঙ্গ।
শুনইতে রোখব ঐছন রঙ্গ॥
বিপরীত বাণী কহলি তুহুঁ মোয়।
কৈছনে ঐছন সাহস হোয়॥
অব এক অনুভব আছয়ে তায়।
বিহি যদি তাহে কিছু করয়ে সহায়॥
মাধবিকা কুঞ্জ কুসুম অনুপাম।
তাঁহা তুহুঁ যাই করিবে বিশ্রাম॥
অব হাম যাইয়ে রাইক ঠাম।
গোবিন্দ দাস করত পরনাম॥

"তোমার জন্য আমি এই অতি অসম্ভব কার্য্যও স্বীকার করিলাম" তুমি কাল এই সন্ধ্যার সময় মাধবীকুঞ্জে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিও।

বিশাখার কথায় শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাস করিলেন। কহিলেন, দেখ বিশাখা! বুঝিলাম তুমি আমার জন্য এই কার্য্যে সম্মত হইলে; কিন্তু বল দেখি, তোমাদের ন্যায় কুলকামিনীগণ আমার সহিত এইরূপ নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিলে, যদি গোকুলের কোন লোক এ কথা জানিতে পারে, তবে সে কি মনে করিবে? এই আজ আমার সহিত রাত্রিকালে এখানে কথা কহিতেছ, যদি ইহা ঘুণাক্ষরেও কেহ শুনিতে পায়, তবে এই কথা লইয়াই হয়তো মহা অনর্থ ঘটাইবে। শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া বিশাখার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল, কণ্ঠস্বরও যেন গম্ভীর; অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন—গোবিন্দ! লোকে দেখ্‌লে কি মনে ক'র্‌বে, সে লজ্জা বা সে ভয় থাকিলে কি আর তোমার সঙ্গে কেহ দেখা করিতে আসিতে পারে? সে লজ্জা ভয় ত্যাগ ক'রেছিলাম বলিয়াই তোমার সহিত দেখা করিতে পারিয়াছি। এখন মাধবীকুঞ্জে কাল দেখা পাইব তো?

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ পাইবে। শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন। বিশাখাও অন্য দিক্ দিয়া গোকুলের দিকে চলিয়া গেলেন।

সেই দিন রাত্রেই বিশাখা বৃন্দাদেবীর সহিত দেখা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত কালিন্দীকূলে যাহা কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, যথাযথ বিবৃত করিল, শুনিয়া আনন্দ-ময়ী বৃন্দার বড়ই আনন্দ হইল।

কৃষ্ণানুগতা ব্রজরমণীদিগের মধ্যে এই বৃন্দাদেবীই সর্ব্বাপেক্ষা বয়োধিকা, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যুগল-মিলন দর্শনই ইঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত। সে মিলন কিন্তু এখনও হয় নাই। বৃন্দা জানিতেন বৃষভানুকুমারী রাধিকাই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গলাভে আকুল হইয়াছেন, রাধিকাই একদিন এই বৃন্দাদেবীর নিকট "চিকণ কালিয়া রূপ, মরমে বিঁধিয়াছে, ধরণে না যায় মোর হিয়া" বলিতে বলিতে আকুল হইয়াছিলেন, কিন্তু আজ বিশাখার মুখে রাধিকার প্রতি কৃষ্ণের এই অনুরাগের কথা শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিতা হইলেন। তাই সাগ্রহে বিশাখাকে কহিলেন তুমি কি কৃষ্ণকে রাধিকার অনুরাগের কথাও বলিয়া আসিয়াছ?

বিশাখা। না তাহা বলি নাই, মনে হোলো, তোমাকে একবার না বলিয়া এ কথা কৃষ্ণকে বলা উচিত নয়, তাই বলিয়া আসি নাই, তবে কাল সন্ধ্যাকালে মাধবীকুঞ্জে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আসিয়াছি।

বৃন্দা। তা বেশ করিয়াছ, কিন্তু কাল আর তোমাকে যাইতে হইবে না। আমি কাল প্রাতঃকালে যাবটে রাধিকার সহিত সাক্ষাৎ ক'রে সন্ধ্যার পর সেই মাধবীকুঞ্জে কৃষ্ণের সহিত দেখা ক'রব।

বিশাখা। কেন, এ কার্য্য কি আমি পারিব না? আমি শ্রীকৃষ্ণের কাছে মিথ্যাবাদিনী হইতে পারিব না, আমাকে যাইতেই হইবে।

বিশাখার আগ্রহাতিশয্যে বৃন্দা আর কোন কথা না বলিয়া কেবল এইমাত্র বলিয়া দিলেন, আচ্ছা তুমিই যাইও, কিন্তু সাবধান, রাধামাধবের এই প্রথম মিলনই যেন বৃন্দাবনের চিরমিলনে পরিণত হয়। ইহাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

বিশাখা বৃন্দার অনুমতি লইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

পরদিন বেলা তিন প্রহর অতীত হইলে, বিশাখা অতি সঙ্গোপনে শ্রীরাধিকার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন—

অলখিতে সহচরী মিলল যাই।
কো নাহি জানল চলল লুকাই॥
প্রিয় সহচরী হেরি রাই হাসি বোল।
করে ধরি আসনে আনি বৈঠল॥
এ সখি! কাহে আয়লি তুহুঁ গোই।
নিকপটে কহবি না রাখবি সোই॥
চতুর সুনাগর আদর জানি।
মরম নিবেদয়ে লহু লহু বাণী॥
যব তুহুঁ যমুনা করত সিনান।
তব তোহে দেখল নাগর কান॥
মোহে পুছল চতুর মুরারি।
হাম কহনু বৃষভানু কুমারী॥
শুনইতে নাম মুরছি ভেল সোয়।
গোবিন্দ দাস নিবেদয়ে তোয়॥

শ্রীনি—

অতৃপ্ত সংসার।

রাজঅট্টালিকায়, ধনীর মর্ম্মর প্রাসাদে, বণিকের পণ্য বিথিকায়, দরিদ্রের জীর্ণ কুটীরে অশান্তির রোল সমভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। পথের ভিখারী তুমি, তুমি হয়ত দূর হইতে ধনীর বেগবান্ অশ্বযুক্ত শকট দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাকে সুখশান্তির অধিকারী বলিয়া মনে করিতে পার। কিন্তু একবার যদি তাহার হৃদয়মন্দির উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখ,—দেখিতে পাইবে তাহার হৃদয়ে অশান্তির বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে; সুখের পরিবর্ত্তে তীব্র মনকষ্টে ম্রিয়মান হইয়া গিয়াছে। বাহ্যিক আবরণ দ্বারা মানব মন অবগত হওয়া যায় পর নাই দুঃসাধ্য। কৃষকের মলিন বসন, কঠিন শয্যা, অর্দ্ধ উলঙ্গ শরীর ও নিয়ত কর্ম্মপ্রাণতা দেখিয়া তোমার মনে তাহার দারিদ্র্যের তীব্র যাতনা অনুভব হইতে পারে। কিন্তু তুমি

তাহাকে যদি সেই কথা বলিতে যাও, সে হয় ত তোমাকে পাগল বলিয়া বিবেচনা করিবে। প্রাতে যখন যে জয় দুর্গা বলিয়া লাঙ্গল কাঁধে লইয়া, গাভী ও বলদ সহ নিজ নিজ ক্ষেত্রাভিমুখে গমন করে তখন তাহার যে কি আনন্দ হয় তাহা তুমি কি বুঝিবে ?

তুমি লক্ষপতি, দুগ্ধফেননিভ শয্যা তোমার নিদ্রার সহায়তা করে, সুরভি কুসুম গন্ধ তাহার মধুর কমনীয় দেহলতা তোমার চক্ষে ঢালিয়া দিয়' তোমার আনন্দ বর্দ্ধন করে, সুবাসিত মনোহর দ্রব্যাদি তোমার শোভা বর্দ্ধন করে, আনন্দদায়িনী, করুণাপ্রসবিণি, জননীরূপিনী রমনী তোমার গৃহ শোভা বর্দ্ধন করিতেছে ;—তত্রাচ কেন তুমি তাহাতে অসন্তুষ্ট ? নিজ অর্দ্ধাঙ্গরূপিনী, পবিত্রতাময়ী রমণীর প্রেমে, ভালবাসায় তুমি পরিতৃপ্ত নহ কেন ? কেন তুমি তোমার অতুল ঐশ্বর্য্যে পরিতৃপ্ত নহ ? কেন সতত মনে অভিলাষ ও অতুল ধনের অধিকারী হইব ? এমন কি তুমি ঈশ্বরদত্ত নিজ শরীরেও সন্তুষ্ট নহ, তাহাকে ঘসিয়া মাজিয়া আরও উজ্জ্বল করিতে সতত যত্নবান্। তুমি তোমার ধনলিপ্সার ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার সহিত ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ভাগিরথীর স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া শুধু সংসারের ক্ষণিক সুখের পশ্চাদ্ধাবন করিনেছ, তোমার উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় বাধা পড়িলে তুমি বাতাহত কদলী পত্রের ন্যায় ক্রোধে কম্পমান হয়। হায় ভ্রমান্ধ জীব, কতদিনে তোমার এ আকাঙ্ক্ষার লয় হইবে।

দারিদ্র্যনিপীড়িত, বুভুক্ষিত, ক্ষীণকলেবর, মলিন বাসস্থানে প্রতিপালিত, অর্দ্ধোলঙ্গ ব্যক্তিগণ দারিদ্র্যের তীব্র কষাঘাতে সদা হাহাকার করিতেছে ; পরণে বসন নাই, মস্তকে তৈল নাই, ক্ষতবিক্ষত পদ যুগল, সন্তানের শুষ্ক মুখ তাহাদের আনন গভীর নৈরাশ্যের ছায়ায় আবৃত করিয়াছে। তাহাদের জীবন ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের তরে তুমি কি এক বিন্দু অশ্রুপাত কর ? যে কোন উপায়ে তোমার উচ্চাশা পূরণ করিতে তুমি প্রস্তুত। যে তোমার অভিলাষ পূরণের পথে বাধা দিতে যায় তাহাকে পদদলিত পর্য্যুদস্ত করিতে চাও। তুমি চাও জগতের যত ধন সব একত্রিত করিয়া তাহার অধিকারী হইতে। তুমি চাও জগতের যত সৌন্দর্য্য সব সম্মিলিত করিয়া উপভোগ করিতে। তুমি চাও দরিদ্র দুর্ব্বলকে পদদলিত করিয়া তাহার উপর প্রভুত্ব করিতে, তুমি চাও ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, জ্ঞান, গৌরব, সৌন্দর্য্য, প্রভুত্ব সব তোমার অতুল ঐশ্বর্য্যের দ্বারা ক্রয় করিতে।

হায় মুগ্ধ মানব! বারেকের তরেও তুমি তোমার জ্ঞান আঁখি উন্মিলিত করিবে না কি? স্মরণ কর তোমার শিশুকাল, সদানন্দময় শৈশব! জীবনের সব দুঃখ কষ্ট মাতৃ অঙ্কে যাইয়া বিস্মৃত হইতে, হায় শৈশবের সে লাবণ্য হৃদয়ের সে সরলতা, সে নির্ভীকতা সে মহৎ উদ্দেশ্য কোথায় ভাসিয়া গেল! জলবিম্বের ন্যায় একবার মস্তক উত্তোলন করিয়া আবার অনন্ত স্রোতে মিশাইয়া গেল, বলিতে পার কি ভাই এতদিন তরী বাহিয়া কুল পাইলে কি? এতদিন সংসারের ক্রোড়ে ক্রীড়া করিয়া শান্তির মুখ দেখিতে পাইলে কি? সদা কামিনী কাঞ্চনের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া হৃদয় পরিতৃপ্ত হইল কি?

এই নশ্বর জগতের সর্ব্বত্রই শুধু ক্রন্দনের রোল, নিরাশার মর্ম্মভেদী যাতনা, ভোগেচ্ছার প্রবল আকাঙ্খা, হিংসা, দ্বেষ, কলহ, অশান্তির তীব্র বেদনা ও ভীষণ স্বেচ্ছাচারিতার কল্লোল, বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় আমরা সদসৎ বুদ্ধি বিরোহিত যাহা ধ্বংসের পথ তাহাই উত্থানের পথ বলিয়া সাদরে বরণ করিয়া লইতেছি। যাহা ক্ষণিক, আপাতঃ রমণীয় তাহাকেই চিরস্থায়ী ও চির মঙ্গলময় বলিয়া বিবেচনা করিয়া তাহাকে লাভ করিবার জন্য উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছি। হে অমৃত পথের পথিক! একবার তোমার চতুঃপার্শ্বস্থ মায়াবরণ অপসারিত করিয়া আত্মস্বরূপ দর্শন কর। তুমি সিংহ শাবক হইয়া আর কতদিন মেষপালে থাকিবে? একবার তোমার পূর্ব্বস্বর স্মরণ করিয়া গভীর গর্জ্জন করিয়া উঠ। সেই গর্জ্জনের সহিত তোমার মিথ্যার আচরণ ও মায়ার বন্ধন অপসারিত হইয়া যাক, একবার তোমার হৃদয়ের সুপ্ত গুণ-রাজীকে জাগ্রত কর, হৃদয়ের নিভৃত কক্ষের দ্বারা উদ্‌ঘাটন করিয়া তোমার হৃদয়েশ্বরকে মনোবেদনা অবগত করাও তোমার হৃদয়ের সব যাতনা, সব মনোব্যথা, সব অতৃপ্ততা মুহূর্ত্তেই কোথায় ভাসিয়া যাইবে।

(কলিকাতা)।

বিবিধ।

(১)

রমণীর অভিনব অবস্থা।—আমেরিকায় অস্ত্র চিকিৎসকগণের এক সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, বিজ্ঞানের শক্তি দ্বারা এক অভিনব রমণী শরীর গঠিত করিতে পারা যায় কিনা তৎসম্বন্ধে চেষ্টা হইবে। এই রমণী আমরণকাল স্ত্রীজন সুলভ কোন পীড়ায় আক্রান্ত হইবে না। বিজ্ঞান।

(২)

যে ব্যক্তি প্রতিদিন দেহের হিতসাধনোপযোগী তিক্ত কষায় বা মধুর আস্বাদনসম্পন্ন বস্তু আহার করে সেই সমস্ত বস্তু অমৃত রূপে পরিণত হয়।

মহাভারত শান্তি পর্ব্ব ১৩৮।

(৩)

নির্ভর

ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও উপর আশা স্থাপন না করার নাম নির্ভর। সুখ দুঃখ, মান অপমান, রোগ-শোক যাহা কিছু হয় তাহাতে যে ব্যক্তি ঈশ্বরে দোষারোপ করে না; তাঁহার দিকে চাহিয়া সমস্ত সহ্য করে তাহার নির্ভরই ঠিক। উপার্জ্জন হউক বা না হউক, ঈশ্বর যে জীবিকা দানে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহাতে অন্তরের স্থিরতা হওয়া নির্ভর।

(৪)

যবদ্বীপে এক শ্রেণীর কলাগাছ আছে। অন্যান্য কলার ন্যায় এই কলা কাণ্ডের বাহিরে জন্মায় না। ইহা গাছের ভিতরে হয় এবং সেই স্থানে পুষ্ট হইতে থাকে। যখন কলাটি বেশ পাকিয়া উঠে, তখন গাছ ফাটিয়া যায়। এই কলা এত বড় হয় যে, একটিতে তিন চারি জন লোকের ক্ষুধা দূর হইতে পারে।

বসুমতী।

যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিদ্ দৃশ্যজাতং পুরোগতম্।
পরব্রহ্মৈব তৎসর্ব্বমজরামরমব্যয়ম্॥

যাহা কিছু দেখা যাইতেছে তাহা পরব্রহ্মই। সমস্তই অজর অমর অব্যয় আত্মা। এই কথায় মনে করিওনা যে কাক কোকিল আকাশ, তরু, লতা গাধা, কুকুর সমস্তই ব্রহ্ম। ইহারা রজ্জুর উপরে সর্প ভাসার মত ব্রহ্মের উপরে ভাসিতেছে মাত্র। ইহারা নাই। তথাপি ইন্দ্রজালের মত দেখা যাইতেছে।

পূর্ণং পূর্ণে প্রসরতি শান্তে শান্তং ব্যবস্থিতম্।
ব্যোমণ্যে বোদিতং ব্যোম ব্রহ্মণি ব্রহ্ম তিষ্ঠতি॥

ব্রহ্মই পূর্ণ। পূর্ণব্রহ্মে পূর্ণব্রহ্মই আছেন। জগৎ নাই। এক শান্ত ব্রহ্মই আছেন। জগৎ নাই বলিয়াই শান্ত। তাই বলা হইল শান্তে শান্তেই আছেন। আকাশে আকাশেরই উদয়। ঘটের উপাধি নষ্ঠ হইলে আকাশ আকাশেই মিলাইতেছে। উপাধিটা ভ্রমে। তাই বলা হইতেছে ব্রহ্মে ব্রহ্মেরই অবস্থান।

রাম—বন্ধ্যাপুত্রের শেল পেষণ, উপল পুত্রিকার পুস্তক পাঠ অথবা গর্জ্জন্তি চিত্র জলদা—অর্থাৎ চিত্রে আঁকা মেঘ গর্জ্জন করিতেছে—এই সকলের মত আপনার বাক্য লাগিতেছে। এই জরা মরণ দুঃখ কিছুই নাই? এই শৈলাকাশ ময় জগতও নাই? তবে এই সব দেখা যায় কি? আপনিই বা কে আমিই বা কে? আপনি আমাকে বলেন বা কি?

বশিষ্ঠ—এই বিশ্ব নাই। অলীক তথাপি যে দেখাইতেছি তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহা মনের মায়িক আবির্ভাব মাত্র।

মন ত নশ্বর। এই নশ্বর মন, নশ্বর দোষাকর বিশ্ব বিস্তার করিতেছে। স্বপ্নের ভিতরে আবার স্বপ্ন যেমন হয় সেইরূপ স্বরূপ শূন্য মন স্বরূপ শূন্য জগৎ বিস্তার করিতেছে।

তৎ স্বয়ং স্বৈর মেবাশু সঙ্কল্পয়তি দেহকম্।
তেনেয়মিন্দ্র জালশ্রীর্ব্বিত নেন বিতন্যতে।

মন আপন ইচ্ছায় আগে আপনার দেহ কল্পনা করে। পরে তাহার দ্বারায় বিপুল ভাবনা বলে ইন্দ্রজাল শোভার ন্যায় এই জগৎ শোভা বিস্তার করে।

স্ফুরতি বল্গতি গচ্ছতি যাচতে
ভ্রমতি মজ্জতি সংহরতি স্বয়ম্।

অপরতামুপয়াত্যপি কেবলং
চলতি চঞ্চল শক্তি তয়া মনঃ॥

চঞ্চল শক্তিটি মনের আছে। সেই চঞ্চল শক্তিদ্বারা মন যেখানে চলে সেইখানেই ইহার স্ফুরণ হয়। এইটি ভ্রম ভাবনা মাত্র। একমাত্র মনই চঞ্চল শক্তিদ্বারা স্ফুরিত হইতেছে, লাফাইতেছে গমন করিতেছে, যাচঞ্চা করিতেছে, ভ্রমণ করিতেছে, মগ্ন হইতেছে, সংহার করিতেছে। এই মনই সাংসারিক দশা প্রযুক্ত নীচগামী হইতেছে এই মনই আবার কৈবল্য ভাব বা মোক্ষ লাভ করিতেছে।

রাম—মন আপন ইচ্ছায় আপনার দেহ আগে কল্পনা করে। ইহার ভিতরেই তবে সব আছে। আকাশ যেন একটি নাম মাত্র, মনটাও সেইরূপ নাম মাত্র। মিথ্যা মন। মিথ্যা মনের চেষ্টাও মিথ্যা। মিথ্যা মন বিজৃম্ভিত এই বিশ্বও মিথ্যা। হে ভগবান্—এই মিথ্যা মন কবে আমার নিকট মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হইবে? কবে আমি ভ্রম মনকে পরিত্যাগ করিতে পারিব? বলুন এই ভ্রম কল্পিত মনের মূল কি? মনও মায়া যে এক বস্তু বলুন ইহাদের স্বরূপ কিরূপে বুঝিব?

৫ম সর্গ।

পরমাত্ম স্বরূপ নির্ণয়।

বশিষ্ঠ—মনটা মিথ্যা। এই মিথ্যা মন হইতে জাত জগৎটাও নাই। সমস্ত জগত কোথা হইতে উঠিল খুঁজিবার দরকার নাই। একমাত্র মনের মূল খুঁজিলেই মিথ্যা ধরা পড়িবে।

রাম—বলুন কোথা হইতে মায়াময় মন জন্মিল, স্থিতিলাভ করিল কিরূপেই বা ইহার নাশ হয়।

যাঁহা হইতে মায়াময় মন জন্মিল প্রথমে তাঁহার কথাই শ্রবণ কর।

বশিষ্ঠ—যেমন সুষুপ্তিতে সমস্ত সেই এক বস্তুতে লয় হয় সেইরূপ মহাপ্রলয়ে একমাত্র শান্তব্রহ্মই থাকেন আর কিছুই থাকে না। সমস্তই লয় হইয়া

যায়। অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের পর এবং ভাবি সৃষ্টির পূর্ব্বে "শান্তমেবাবশিষ্যতে" একমাত্র পরম শান্তই অবশিষ্ট থাকেন। ইঁহার উদয় অস্ত নাই ইনি সর্ব্বদা প্রকাশ স্বরূপ। ইহাঁর জন্মনাই, ইনি ক্রীড়াশীল দীপ্তিশীল, ইনি কালিমাশূন্য। ইনিই সর্ব্ব, ইনিই সর্ব্বকৃৎ সর্ব্ব ক্রিয়াশক্তি সম্পন্ন। ইনিই পরমাত্মা, ইনিই মহেশ্বর।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে যো মুক্তৈরবগম্যতে।

যস্য চাত্মাদিকাঃ সংজ্ঞাঃ কল্পিতা ন স্বভাবজাঃ ॥৫॥

বাক্যদ্বারা ইঁহাকে প্রকাশ করা যায় না। জীবন্মুক্ত পুরুষগণ ইঁহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করেন। বাহ্যাত্ম, অন্তরাত্মা, ইত্যাদি পরমাত্মা ইঁহারই নাম। এই নাম গুলি কল্পিত স্বভাবজ নহে। ইনি, স্বভাবে অনারোপিত কিন্তু মায়া গ্রহণে আরোপিত ধর্ম্ম বিশিষ্ট।

যঃ পুমান্ সাংখ্যদৃষ্টীনাং ব্রহ্ম বেদান্তবাদীনাম্।

বিজ্ঞান মাত্রং বিজ্ঞান-বিদামেকান্ত নির্ম্মলম্ ॥ ৬ ॥

যঃ শূন্য বাদিনাং শূন্যো ভাসকো যোর্ক তেজসাম্।

বক্তা মন্তা ঋতং ভোক্তা দ্রষ্টা কর্ত্তা স দৈবসঃ ॥ ৭ ॥

ইনি সাংখ্যের পুরুষ, বেদান্তবাদীর ব্রহ্ম, বিজ্ঞান বাদীর নিতান্ত নির্ম্মল ক্ষণিক বিজ্ঞান। ইনি শূন্যবাদীর শূন্য। চন্দ্র সূর্য্যাদি তেজঃ পদার্থেরও ইনি প্রকাশক। ইঁহাদ্বারা প্রেরিত হইয়াই লৌকিক বাক্য উচ্চারিত হয় এজন্য ইনি বক্তা। ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেও ইনি তাহাদের সাক্ষী কথন কাহাকেও নিবারণ করেন না। এইরূপ ভাবে কর্ম্মে অনুমোদন আছে বলিয়া ইনি অনুমন্তা। ইনি সত্যস্বরূপ ইনিই সর্ব্বদা দ্রষ্টা, কর্ত্তা।

সন্নপ্যসদ্ যো জগতি যো দেহস্থোপি দূরগঃ।

চিৎ প্রকাশোহ্যয়ং যস্মাদা লোক ইব ভাস্বতঃ ॥ ৮ ॥

জগতে ইনি থাকিয়াও অবিদ্যাবৃত বলিয়া পামর দৃষ্টিতে অসৎ। ইনি দেহে থাকিয়াও দূরে গমন করেন। ইনি চিৎ প্রকাশ যে হেতু ইান আলোকের মত দীপ্তিমান্।

যস্মাদ্বিষ্ণাদয়ো দেবাঃ সূর্য্যাদিব মরীয়েঃ।

যস্মাজ্জগন্ত্যনন্তানি বুদ্বুদা জগধেরিব ॥ ৯ ॥

যং যান্তিদৃশ্যবৃন্দানি পয়াংসীব মহার্ণবম্।

য আত্মানং পদার্থাঞ্চ প্রকাশয়তি দীপবৎ ॥ ১০ ॥

য আকাশে শরীরেচ দৃষৎস্বপ্সু লতাসুচ।
পাংসুষদ্রিষু বাতেষু পাতালেষু চ সংস্থিতঃ ॥ ১১ ॥
য প্লাবয়তি সংরব্ধং পুর্য্যষ্টক মিতস্ততঃ।
যেন মূকীকৃতা মূঢ়াঃ শিলাধ্যান মিবা স্থিতাঃ ॥ ১২ ॥
ব্যোম যেন কৃতং শূন্যং শৈলা যেন ঘনীকৃতাঃ।
আপোদ্রুতাঃ কৃতা যেন দীপো যস্য বশোরবিঃ ॥ ১৩ ॥

ইঁহা হইতেই বিষ্ণু ব্রহ্মাদি দেবতা সূর্য্য হইতে রশ্মির ন্যায় জন্মিতেছে। অনন্ত জগৎ ইঁহা হইতে সমুদ্র হইতে বুদ্বুদের ন্যায় জন্মিতেছে। ইঁহাতেই দৃশ্যবস্তু সমূহ প্রলয়কালে মহার্ণবে জলরাশি প্রবেশের ন্যায় প্রবিষ্ট হইতেছে। প্রদীপ যেমন আপনাকে ও অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে সেইরূপ ইনিও আপনাকে ও পদার্থসমূহকে প্রকাশ করিতেছেন। ইনিই আকাশে, শরীরে, পাষাণে, জলে, লতায়, ভস্মে, পর্ব্বতে, বায়ুতে, এবং পাতালে অবস্থিত।

ইনি স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত পুর্য্যষ্টক—কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় সূক্ষ্মভূত প্রাণ অবিদ্যা কাম কর্ম্ম অন্তঃকরণ প্রভৃতি সংঘাতকে ইতস্ততঃ—অন্তরে বাহিরে আপন চিৎ-দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া প্লাবিত করিতেছেন। ইনি মূঢ়কে মূক এবং পাষাণকে ধ্যানভাবে রাখিয়াছেন। চেতনের চেতনতাও অচেতনের বৈচিত্র্য ইনিই দিতেছেন। ইনিই আকাশকে শূন্য করিয়াছেন, পর্ব্বতকে ঘন করিয়াছেন, জলকে দ্রব করিয়াছেন। ইঁহার বশীভূত হইয়াই রবি দীপ্তিস্বভাব—প্রকাশক হইয়াছেন।

রাম। বুঝিতেছ মায়াময় মন যাঁহা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া চিত্তস্পন্দন কল্পনা এই জগদিন্দ্র জাল তুলিতেছে—তিনি কিরূপ? এই তত্ত্ব অবগত হইয়া অভ্যাস করিলে তোমার মনোলয় হইয়া যাইবে। আরও শ্রবণ কর। সমকালে নির্গুণ সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বাভ্যাস মুমুক্ষুর নিত্য আবশ্যক বলিয়া ইহা বিশেষরূপে বলিতেছি শ্রবণ কর।

রাম—বলুন। আপনার অমৃতায়মান বাক্যে আমি পরিতৃপ্ত হইয়া যাইতেছি।

বশিষ্ঠ—শ্রবণ কর।

প্রসরন্তি যতশ্চিত্রাঃ সংসারাসার বৃষ্টয়ঃ।
অক্ষয়ামৃত সম্পূর্ণাদম্ভোদাদিব বৃষ্টয় ॥ ১৪ ॥

আবির্ভাব তিরোভাবময়াস্ত্রিভুবনোর্ম্ময়ঃ।
স্ফুরন্ত্যতিততে যস্মিন্ মরাবিব মরীচয়ঃ॥ ১৫॥
নাশোরূপো বিনাশাত্মা যোন্তস্থঃ সর্ব্বজন্তুষু।
গুপ্তো যোপাতিরিক্তোপি সর্ব্বভাবেষু সংস্থিতঃ॥ ১৬॥

অক্ষয় সুখ পূর্ণ এই চিদাকাশ হইতেই বিচিত্র চিত্রিত সংসাররূপ এই ধারাবৃষ্টি নিয়ত হইতেছে যেমন অক্ষয় সলিল পূর্ণ মেঘ হইতে নিয়ত বর্ষণ হয় সেইরূপ। আবির্ভাব তিরোভাব প্রচুর এই ত্রিভুবন উর্ম্মিমালা, অতিতত—অতিবিস্তীর্ণ ইঁহাতেই, মরুভূমিতে মরীচিকারমত স্ফুরিত হইতেছে। মায়াযুক্ত হইয়া নাশরূপ কিন্তু স্বরূপে অবিনাশাত্মা ইনিই সর্ব্ব জন্তুর অন্তরে সূক্ষ্মভাবে আছেন বলিয়া গুপ্ত আবার মহত্তম বলিয়া সমস্ত হইতে অতিরিক্ত—ইনি নিষ্প্রপঞ্চ বলিয়াই অতিরিক্ত অসঙ্গ। শ্রুতিত বলেন পাদোস্য সর্ব্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দীবিতি। তথাপি ইনি সর্ব্বভাবেই অবস্থিত।

আরও দেখ

প্রকৃতি ব্রততির্ব্বোম্নি জাতা ব্রহ্মাণ্ড সৎফলা।
চিত্ত মূলেন্দ্রিয়দলা যেন নৃত্যন্তি বায়ুনা॥ ১৭॥

ইনিই আকাশে প্রকৃতিরূপা লতা সৃজন করিয়াছেন। ঈশ্বররূপ বায়ু কর্ত্তৃক এই লতা নৃত্য করিতেছে। এই লতার ফল এই ব্রহ্মাণ্ড; চিত্তই এই লতার মূল, ইন্দ্রিয় সমূহই ইহার পত্র পুষ্প। প্রত্যেক দেহরূপ সম্পুটকে—পেঁটরায় এই চিন্মনির ঝলক উঠিতেছে। এই চন্দ্রকান্ত মণিতে জগজ্জাল মরীচিকা নিরন্তর স্ফুরিত হইতেছে।

প্রশান্তে চিদ্ঘনে যস্মিন্ স্ফুরন্ত্যমৃত বর্ষিণি।
ধারা জালানি ভূতানি সৃষ্টয়স্তড়িতঃ স্ফুটাঃ॥ ১৯॥

এই প্রশান্ত অমৃতবর্ষী চৈতন্য মেঘ হইতেই জড়ভূতরাশি ধারা জলের ন্যায় পতিত হইতেছে এবং স্ফুট অর্থাৎ চিৎপ্রকাশ প্রধান সৃষ্টিরাশি বিদ্যুতের মত স্ফুরিত হইতেছে। অধিক আর কি বলা যাইবে

কুর্ব্বন্নপীহ জগতাং মহতা মনন্ত—
বৃন্দং ন কিঞ্চন ন কাঞ্চনাপি।
স্বাত্মন্যনন্তময়সম্বিদি নির্ব্বিকারে
ত্যক্তোদয় স্থিতিমতি স্থিত একএব॥ ২৪॥

মহাপ্রলয়ে কেবলমাত্র এই একই থাকেন। ইনি নির্ব্বিকার উদয়াস্তস্থিতি গতি ইঁহাতে কিছুই নাই, ইনি জ্ঞান স্বরূপ। ইনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে বিচিত্র লীলা করিয়াও কোন কার্য্যও করেন না কোন ক্রিয়াও করেন না—মহতাং জগতাং ব্রহ্মাণ্ডানাং বৃন্দং তত্র বিচিত্রলীলাশ্চ কুর্ব্বন্নপি ন কিঞ্চন কার্য্যং ন কাশ্চন ক্রিয়াঃ করোতীতি নির্ব্বিকারেপোদানকত্বমেব কার্য্য মিথ্যাত্বে হেতুরিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

৬ষ্ঠ সর্গ।

রাম—মন ও মায়া। যাঁহা হইতে কিছু না জন্মিলেও মায়ার বিচিত্র কৌশলে মনে হয় যেন জন্মিতেছে, মনও তাঁহা হইতেই জন্মে। কিন্তু যে দেবতার কথা পূর্ব্ব সর্গে বলিলেন তাঁহাকে জানিলেই মনোমায়া নিবৃত্তি হইবে। ভাল করিয়া বলুন কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে মনোমায়া হইতে মুক্তিলাভ করা যাইবে।

বশিষ্ঠ— অস্য দেবাদি দেবস্য পরস্য পরমাত্মনঃ।
জ্ঞানাদেব পরা সিদ্ধির্ণত্বনুষ্ঠান দুঃখতঃ ॥ ১ ॥

এই দেবাদিদেব এই পরাৎপর পরমাত্মার জ্ঞানই তাঁহার প্রাপ্তির উপায়। জ্ঞান হইতেই পরম সিদ্ধি লাভ হয়। কোন প্রকার অনুষ্ঠান দুঃখে তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

জ্ঞানের অনুষ্ঠানেই তাঁহাকে পাওয়া যায় অন্য কোন অনুষ্ঠান এখানে উপযোগী নহে।

মায়া রচিত অজ্ঞানই তাঁহাকে—জ্ঞান স্বরূপ দেবদেবকে কে ঢাকিয়া রাখে। যেমন মৃগতৃষ্ণা জল ভ্রান্তির শান্তি জন্য মৃগতৃষ্ণিকাকে জানা চাই তাহা হইলেই ভ্রম নিবারণ হয় সেইরূপ।

রাম—কোন্ সাধনায় তাঁহাকে পাওয়া যাইবে বলুন।

ন হ্যেষ দূরে নাভ্যাশে নালভ্যো বিষমেন চ।
স্বানন্দাভাসরূপোসৌ স্বদেহাদেব লভ্যতে ॥ ৩ ॥

কিঞ্চিন্নোপ করোত্যত্র তপোদান ব্রতাদিকম্।
স্বভাবমাত্রে বিশ্রান্তিমৃতে নাত্রাস্তি সাধনম্॥ ৪॥

অতিদূরে অতি সন্নিকটে, কোন প্রকার ক্রিয়া দ্বারা ইঁহাকে লাভ করা যায় না। নিজ আনন্দের আভাসরূপ ইনি ইঁহাকে স্বদেহ হইতেই লাভ যায়। তিনি কোন ক্রিয়া লভ্য নহেন, বিস্মৃত কণ্ঠহার মত তাঁহার জ্ঞান লভ্যতাই সুলভ। তপস্যা দান ব্রত ইত্যাদি পরমপুরুষ লাভের পক্ষে কোন উপকার করে না। আপনি আপনি ভাবে বিশ্রান্তি ভিন্ন এবিষয়ে অন্য কোন সাধনা নাই।

রাম—স্বভাব মাত্রে বিশ্রান্তির জন্য কি করিতে হইবে?

বশিষ্ঠ—সাধু সঙ্গম সচ্ছাস্ত্র-পরতৈবাত্র কারণম্।
সাধনং বাধনং মোহ জালস্য যদকৃত্রিমম্॥ ৫॥
অয়ং স দেব ইত্যেব সম্পরিজ্ঞান মাত্রতঃ।
জন্তোর্ন-জায়তে দুঃখং জীবন্মুক্তত্ব মেতি চ॥ ৬॥

ইঁহার প্রাপ্তিসাধন জ্ঞানে অন্য কোন কর্ম্ম আবশ্যক করে না কেবল সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র পরতাই কারণ। কারণ মায়ামোহের বাধানিবারণ জন্য নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারই একমাত্র উপায়।

"ইনিই সেই" এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান মাত্রই জীব সর্ব্বদুঃখ শূন্য হইয়া জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। সৎসঙ্গপরতা ও সৎ শাস্ত্রানুষ্ঠানই তাঁহাকে পাইবার উপায়—ইহা তুমি বিশেষরূপে জানিও।

রাম—"ইনিই সেই দেব দেব" এইটি জানিলেই আর মরণাদি দুঃখ পুনরায় আইসে না আপনি ইহা বলিতেছেন। সেই দেব দেবকে কিরূপে অদূরাৎ শীঘ্রমবাপ্যতে। কিরূপে শীঘ্র পাওয়া যায়? আপনি বলিতেছেন জ্ঞান দ্বারা। শীঘ্র সেই জ্ঞান কিরূপে সিদ্ধ হয়?

বশিষ্ঠ—(১) তাঁহাকে পাইবার তীব্র ইচ্ছা হওয়া চাই। এইটি প্রথম। জীবের জরা মরণের দিকে দৃষ্টি পড়িলে জীব কি স্থির থাকিতে পারে? হায়! সংসারে কি লইয়া থাকিব? কোন্ কার্য্য করিবার জন্য সংসারে থাকিব? লোকে যদি মরিয়াই যায় তবে জীবের উপকারটা আর কি হইল? যদি মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার এখানে কিছু না থাকে তবে ক্ষণিক সুবিধার বিধান করিয়া তুমি কাহার কি উপকার করিলে বল?

মৃত্যু হইতে বাঁচিবার উপায় আছে। জগৎপতিকে জানাই সেই উপায়। মৃত্যুচিন্তা দ্বারা ব্যাকুল হইলেই তাঁহাকে পাইবার তীব্র ইচ্ছা হইবে। তখন—

স্ব পৌরুষ প্রযত্নেন বিবেকেন বিকাশিনা।
স দেবো। জ্ঞায়তে রাম! ন তপঃ স্নান কর্ম্মভিঃ ॥ ৯ ॥
রাগ দ্বেষতমঃ ক্রোধ মদ মাৎসর্য্য বর্জ্জনম্।
বিনা রাম তপো দানং ক্লেশ এব ন বাস্তবম্ ॥ ১০ ॥

যখন পাইবার তীব্র ইচ্ছা জন্মিল তখন পাইবার বিঘ্ন যে রাগ দ্বেষ তম ক্রোধ মদ মাৎসর্য্য এইগুলি প্রাণপণে বর্জ্জন কর। এইরূপ উৎকট প্রযত্ন করিতে করিতে বিবেক জাগিল। তাহাতেই তাঁহাকে জানা যাইবে। তপস্যা দান স্নান ইত্যাদি কর্ম্মদ্বারা বা নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। যদি তপ দান ইত্যাদি দ্বারা রাগ দ্বেষ না যায় তবে উহারা ক্লেশ মাত্র। রাগ দ্বেষের বশীভূত হইয়া পর বঞ্চনা করিয়া যে ধন অর্জ্জন করা যায় সেই ধন দান করিলে দাতার কোন ফল হয় না। ইহাতে যাহার ধন অপহরণ করিলে তাহারই উপকার হয়। রাগ দ্বেষের বশীভূত হইয়া যে ব্রতাদি কর তাহারও কোন ফল নাই। তাহাতে দম্ভই প্রকাশ হয় অন্য কিছুই হয় না।

তস্মাৎ পুরুষ যত্নেন মুখ্য মৌষধ মাহরেৎ।
সচ্ছাস্ত্র সজ্জনাসঙ্গৌ সংসৃতি ব্যাধি নাশিনৌ ॥ ১৩ ॥

এই জন্য প্রবল পুরুষকার অবলম্বন করিয়া ভবরোগের মুখ্য ঔষধ সংগ্রহ কর। সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রই সংসার ব্যাধি নাশের মহৌষধ। ইহা ভিন্ন অন্য উপায় আর নাই।

রাম—এখন বলুন আত্মজ্ঞান জন্য কিরূপ পৌরুষ আবশ্যক!

বশিষ্ঠ—শৃণু তৎ পৌরুষং কীদৃগাত্ম জ্ঞানস্য লব্ধয়ে।
যেন শাম্যত্যশেষেণ রাগদ্বেষ বিসূচিকা ॥ ১৫ ॥

যে পৌরুষ দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয়, যদ্দ্বারা রাগদ্বেষরূপ বিসূচিকা নিবারণ হয় তাহা শ্রবণ কর।

যথা সম্ভবয়া বৃত্ত্যা লোকশাস্ত্রাবিরুদ্ধয়া।
সন্তোষ সন্তুষ্ট মনা ভোগগন্ধং পরিত্যজেৎ ॥ ১৬ ॥
যথা সম্ভব মুদ্যোগাদনুদ্বিগ্নতয়া স্বয়া।
সাধু সঙ্গম সচ্ছাস্ত্র পরতাং প্রথমং শ্রয়েৎ ॥ ১৭ ।

ভগবান্—মায়া কি প্রকার দুরত্যয়া অগ্রে তাহা শ্রবণ কর :—

পদার্থরথমারূঢ়া ভাবনৈষা বলান্বিতা।
আক্রমতি মনঃ ক্ষিপ্রং বিহঙ্গং বাগুরা যথা ॥ ১১৩। ৪৭ যোঃ উৎ।

এই মহাপরাক্রমশালিনী বাসনারূপিণী মায়া, বিষয়রথে আরোহণ করতঃ বাগুরা দ্বারা বিহগ আক্রমণের ন্যায় চিত্তকে আক্রমণ করিয়া থাকে। গাধী-ব্রাহ্মণ জলে ডুবিয়া অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিতেছেন, সহসা মায়া তাঁহার চিত্তকে আক্রমণ করিল। তিনি মন্ত্র ভুলিয়া গিয়া জলমধ্যে থাকিয়াই দেখিতেছেন—তিনি মরিলেন, মরিয়া চণ্ডাল হইলেন, চণ্ডালিনী বিবাহ করিলেন, পুত্র কন্যাদি হইল, সেই চণ্ডালপল্লীতে দুর্ভিক্ষ হইল। পরে গ্রামত্যাগ, কীর দেশের রাজা হওয়া, ১২ বৎসর রাজ্য করা, চণ্ডাল বলিয়া রাজ্যে প্রচার হইলে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ চেষ্টায় গাধী জল হইতে উঠিলেন। ক্ষণকালের মধ্যে গাধীর চিত্তে চণ্ডালসংক্রান্ত এতগুলি ঘটনা প্রবাহিত হইল। সূক্ষ্মশরীরে এই সমস্তই ভোগ হইল—যদিও সেই সময়ে স্থূল শরীরটা জলমধ্যে নিমজ্জিত ছিল। গাধি আবার স্থূল শরীরে—সূক্ষ্মশরীরের ভোগস্থান ও কার্য্য সমস্ত সত্য সত্য দেখিলেন। যতই মনে মনে ভাবেন ও সমস্ত মিথ্যা, ততই পুনঃ পুনঃ আলোচনা জন্য ভ্রম দৃঢ় হইয়া যাইতে লাগিল। ভুলকে ভুলিতে চেষ্টা করিলেই পুনঃ পুনঃ চিন্তা জন্য তাহা চিত্তের উপর বিশেষরূপে অঙ্কিত হইয়া যায়। এই জন্যই বলা হয়—মায়া দুরত্যয়া।

মায়ার কার্য্য অতি অদ্ভুত। মায়ার স্বরূপ নিশ্চয় হয় না, অথচ মায়ার অস্তিত্ব সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। মায়া এইজন্য ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার।

স্পষ্টং ভাতি জগচ্চেদং অশক্যং তন্নিরূপণম্।
মায়াময়ং জগৎ তস্মাদীক্ষ স্বাপক্ষপাততঃ ॥ চি ১৪২

সম্মুখে জগৎ দেখিতেছ, কিন্তু পক্ষপাতশূন্য হইয়া কোন একটি বস্তুর তত্ত্ব জানিতে চেষ্টা কর,—দেখিবে, তত্ত্ব পাইবে না,—সেই জন্য জগৎকে মায়াময় বলে। এই শক্তিরূপিণী অবিদ্যা বা মায়ার বাস্তবিক কোন কর্তৃত্ব নাই অথচ মায়া-সান্নিধ্য হেতু ব্রহ্মে জগৎ সৃষ্ট হয়। চিত্রাঙ্কিতা স্ত্রী যেমন গৃহ-কার্য্য করে না, সেইরূপ এই অবিদ্যাও কোন কিছু সৃষ্টি করে না। উহাতে তৃণমাত্র সত্ত্বাও নাই। রজ্জুর উপর যে সর্প ভাসে তাহাতে কি বিন্দুমাত্র সর্পসত্ত্বা থাকে? সুতরাং মায়া অলীক। ইহার কার্য্যও নিতান্ত আশ্চর্য্য বলিয়া ইহা অঘটনঘটনপটীয়সী।

যথেন্দ্রজালিকঃ কশ্চিৎ পাঞ্চালীং দারবীং করে।
কৃত্বা নর্ত্তয়তে কাম্যং স্বেচ্ছয়া বশবর্ত্তিনীম্ ॥
তথা নর্ত্তয়তে মায়া জগৎস্থাবরজঙ্গমম্।
ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তং সদেবাসুর মানুষম্ ॥

ঐন্দ্রজালিক যেমন দারুময়ী পুত্তলিকা হস্তে লইয়া তাহাকে নানাপ্রকার নাচায়, মায়াও

সেইরূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড নাচাইতেছে। অথবা মায়া পরম পুরুষকে আচ্ছন্ন করিয়া বহুরূপে নৃত্য করিতেছে।

যথা কৃত্রিমনর্ত্তক্যো নৃত্যতি কুহকেচ্ছয়া।
ত্বদধীনা তথা মায়া নর্ত্তকী বহুরূপিণী॥

বিচার করিয়া দেখ, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে যে, স্ত্রীগর্ভে এক বিন্দু রেতঃপাত হইলে, উহা চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া হস্ত, পদ, মস্তক প্রভৃতি অঙ্গবিশিষ্ট হয়; ক্রমে মনুষ্যাকারে মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় এবং বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য দশা প্রাপ্ত হইয়া—দেখে, খায়, শুনে, শুঁকে, যায়, আসে—এইরূপে নানাপ্রকারে নৃত্য করে, শেষে আবার কোথায় চলিয়া যায়।

এতস্মাৎ কিম্বিবেন্দ্র জালমপরং যদ্ গর্ভবাসস্থিতম্
রেতশ্চেতত্তি হস্তমস্তকপদং প্রোদ্ভূত নানাঙ্কুরম্।
পর্য্যায়েণ শিশুত্ব যৌবন জরা রোগৈরনেকৈর্বৃতং
পশ্যত্যত্তি শৃণোতি জিঘ্রতি তথা গচ্ছত্তথাগচ্ছতি॥ চি ১৪৭

আরও দেখ—জীব যে বলে জন্ম হইল, মৃত্যু হইল, ক্ষুধা হইতেছে, পিপাসা হইতেছে, শোক হইতেছে, মোহ হইতেছে, বদ্ধ হইতেছে, মুক্ত হইতেছে—বল দেখি—এই জন্ম মৃত্যু, ক্ষুধা পিপাসা শোক মোহ, বদ্ধ মোক্ষ—কাহার হয়? চেতন জন্মিতেছেন,—আর চেতন মরিতেছেন—একবার স্থির হইয়া ইহা ভাব দেখি? ভাব দেখি, চেতনের ক্ষুধা পিপাসা লাগিয়াছে—ক্ষুধা পিপাসা কার লাগে, না প্রাণের? ভাব দেখি, শোক হইল, মোহ হইল—শোক মোহ, কার লাগে না চিত্তের? ভাব দেখি চেতন বদ্ধ হইল, চেতন মুক্ত হইল—বন্ধন আর মুক্তি কার? না যিনি কর্ত্তা সাজেন তাঁর? শাস্ত্র এই মায়িক ইন্দ্রজাল ভাঙ্গিবার জন্য সর্ব্বদা বুঝিয়া স্মরণ করিতে বলেন—

নাহং জাতো জন্মমৃত্যু কুতো মে
নাহং প্রাণঃ ক্ষুৎপিপাসে কুতো মে
নাহং চিত্তং শোক মোহৌ কুতো মে
নাহং কর্ত্তা বন্ধমোক্ষৌ কুতো মে।

এখন দেখ, মায়া বাস্তবিক অঘটন ঘটনা ঘটাইতেছেন কি না?

অর্জ্জুন—মায়ার এরূপ অঘটন ঘটনা ঘটান কেন? তোমার মায়া জীবকে কেন মোহিত করেন? মায়াটি কি তোমার একটি কলঙ্ক নহে?

ভগবান্—লোকে কলঙ্ক ভাবে বটে, কিন্তু সত্যই কি ইহা কলঙ্ক? আমি ত আপন স্বরূপে সর্ব্বদাই আছি,—থাকিয়া আপনার মধ্যে যে মনোময়ী স্পন্দশক্তিকে খেলা করিতে দেখি, (আমার সিসৃক্ষাই মনোময়ী) সেই সঙ্কল্প-শক্তি যেন বহুধা বিভক্ত হয়।, এই বিভাগসমূহ আমার উপরেই হয় বলিয়া—আমিও যেন বহুমত দৃশ্য হই। নীল আকাশে মেঘ উঠিয়া যখন ইহা বহুখণ্ডে বিভক্ত হয়, তখন সেই নীল আকাশ যেন বহু খণ্ডমত হয়—কিন্তু আকাশ কি বহু হয়? সেইরূপ আমাতে আমার মায়া—আপনি বহু হইয়া আমাকে বহু হওয়া মত দেখায়, কিন্তু সঙ্কল্পের বহু হওয়ায় কি আমি কখন বহু হই? তা হই না। আমি সর্ব্বদা একই আছি, স্বস্বরূপে অবস্থান

করিতেছি। সকল্প আমার উপর ভাসুক না কেন—মহামনের বহু তরঙ্গ আমাতে উঠুক না কেন—তাহাতে অহঙ্কারটি না করিলেই, আমি যাহা আছি তাহাই আছি। এই অহঙ্কার করা, এই আমি আমার করা—ইহা আমার মহামন করিতেও পারে, না করিতেও পারে—এ স্বাধীনতা সকলেরই আছে।

ইহা হইতেই ইন্দ্রজাল উঠিয়েছে। প্রকৃত কথা ত এই। এই কথাই ভক্তগণ যখন বলেন, তখন একটা আরোপের মধ্যে দিয়া বলা হয় বলিয়া, সাধারণের সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।

অর্জ্জুন—মায়া জগৎকে মোহিত করেন কেন? এ সম্বন্ধে ভক্তগণ কি বলেন?

ভগবান্—ভক্তগণ বলেন আমার মায়ারাণী সর্ব্বদাই আমাকে লইয়া ব্যস্ত। সন্ধিনী সম্বিদ্—হ্লাদিনী শক্তি তিনিই। স্ত্রীগণের স্বভাবই এই যে, তাহারা আপন স্বামীকে অন্যের হাতে দিতে চায় না। যে কেহ আমার উপর অনুরাগী বা অনুরাগিণী হইতে চায়, যে কেহ গোপনে আমাকে সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করে—তাহাকেই আমার মায়ারাণী মোহিত করিয়া বিষয়ে লিপ্ত করাইতে চেষ্টা করে। আমার মায়ার সাজ সজ্জা কেবল আমাকে লইয়া রঙ্গ করিবার জন্য। দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে প্রকৃতি যে সাজে, নানা ঋতুতে নানাবিধ বেশভূষা, প্রতিদিন প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, রাত্রিকালে ইহার বিবিধ বেশ—পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র লইয়া ইহার নানা রূপ—এ কেবল আমার সন্তোষের জন্য। আমি যে অন্যের হই, তাহা মায়ারাণী সহ্য করিতে পারে না। তাহারই সন্তান সন্তুতি এই অনন্ত জীব। পাছে জীব আমাকে ভালবাসিয়া ফেলে, তাই সে, কৌশলে জীবকে আমার কাছে আসিতে দেয় না—তাই সে জগৎ মোহিত করিয়া রাখে। ইহা তাঁহার স্ত্রী-স্বভাবজনিত অজ্ঞান। তবে যাহারা তাঁহার সঙ্গে তাঁহার সখী হইয়া আমার কাছে আসিতে চায়—অথবা সখী হইয়া তাঁহাকে আমার সহিত মিলনের জন্য ব্যস্ত হয়, আমার মায়ারাণী তাঁহাদিগকে নিজ জন বলিয়াই বোধ করেন। তাঁহাদিগকে আর মোহিত করেন না। ভক্তগণ এইরূপ বলেন।

অর্জ্জুন—আহা! এও ত অতি সুন্দর কথা। এখন বল, "মামেব যে প্রপদ্যন্তে" এতৎসম্বন্ধে কি বলিবে?

ভগবান্—ভক্তগণ কি বলিবেন, তাহা ত এখন সহজেই বুঝিতে পারিতেছ। আমার মায়ারাণীকে আমার নিকটে আনিতে যিনি সহায়তা করেন,—খণ্ড প্রকৃতি, অখণ্ড প্রকৃতিকে আশ্রয় যখন করেন—তখন সেই অখণ্ড প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া আমার নিকটে আসা হয়। আমার অবতার গ্রহণ করা ও ভক্তসঙ্গে লীলা করা আমার মায়াতেই হয়—মানুষের শূন্য-কল্পনা নহে। কিন্তু প্রকৃত কথা যাহা, তাহা জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন। কারণ একটু পরেই বলিব—তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক ভক্তির্বিশিষ্যতে। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।

অর্জ্জুন—জ্ঞানী কি বলেন?

ভগবান্—জীবেশ্বর বিভাগশূন্য শুদ্ধ সৎ চিৎ আনন্দ ব্রহ্মে স্বভাবতঃ মায়ার উদয় হয় অথবা মায়াদর্পণ আমারই কল্পনা। ঐ দর্পণে চিৎএর যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহাই জীব। কল্পনা হইলেই অখণ্ড যাহা, তাহা খণ্ডিত-মত হয়। "অহং" বোধ জাগিলেই খণ্ড জীব-সত্ত্বা মায়া-দর্পণে ভাসে। মায়া এই জীবকে বশীভূত করেন। যিনি ঈশ্বর তিনি বিশ্বস্বরূপ। মায়া ঈশ্বরের অধীন থাকেন। মায়া

একটা উপাধি মাত্র। ঈশ্বরে উপাধি-দোষ থাকে না, জীবে থাকে। বিশ্বস্থানীয় ঈশ্বর, মায়াধীন জীবের ভোগ জন্য দেহ ও বিষয় কল্পনা করেন। মায়া যখন জীব সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহাকে অবিদ্যা বলে। এই অবিদ্যাগত সংস্কার বহু প্রকারের। বাসনার ভিন্নতা হেতু, ভিন্ন ভিন্ন বাসনা-অবচ্ছিন্ন চিৎপ্রতিবিম্বকে ভিন্ন ভিন্ন জীব নামে অভিহিত করা যায়।

অর্জ্জুন—জীব যদি প্রতিবিম্বই হয়, তবে প্রতিবিম্বে চৈতন্য আইসে কিরূপে?

ভগবান্—দর্পণে যে, মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা জড়মাত্র। কিন্তু চিৎএর প্রতিবিম্ব চিৎ-স্বভাব বিশিষ্ট হয়। যেমন জলে যে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহারও উষ্ণতা অনুভূত হয়। প্রকৃত সূর্য্যের ন্যায় এই প্রতিবিম্বের দিকেও চাওয়া যায় না। এখানে আবার একবার লক্ষ্য কর—মায়া কিরূপ দুষ্পরিহার্য্যা। জলে যে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা জলগত কম্পন জন্য সর্ব্বদা কম্পিত দেখায়। বাসনাময় বলিয়া অবিদ্যা সর্ব্বদা আকুল। ঐ অবিদ্যা-জলে প্রতিবিম্বিত জীবরূপ সূর্য্যচ্ছায়া—আপন উপাধিগত সহস্র সহস্র বিকার সর্ব্বদা অনুভব করে। প্রতিবিম্ব চৈতন্য জীব—বিম্ব-চৈতন্য ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়া বুঝিতে পারিলেও, উপাধিগত বিকার-সহস্র কাটাইতে পারে না। সেই জন্য জীবের পক্ষে মায়া বা অবিদ্যা দুরত্যয়া।

অর্জ্জুন—সাধারণের পক্ষে মায়া কি বুঝিতে যাওয়াও মায়ার কার্য্য। শুভ্র বস্ত্রে তৈলের দাগ লাগিয়াছে। কি তৈল, কাহার তৈল কে লাগাইল, কেন লাগাইল ইত্যাদি প্রশ্ন না করিয়া যাহাতে তৈল উঠান যায়, তাহা করাই ভাল। মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত যাহাতে হওয়া যায় তাহা-রই চেষ্টা করা উচিত। তোমাকে পাইলে তবে মায়া অতিক্রম করা যায়—তোমার আশ্রয়ে জীব যাহাতে আসিতে পারে—যাহাতে তোমাকে ভক্তি করিতে পারে, তাহাই করা উচিত। তুমিই জীবের চেতন। জ্ঞানিগণ বলেন 'স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে'—তোমার অনুসন্ধান করাই ভক্তি। এইরূপে জ্ঞান বা ভক্তি যাহাতেই হউক না,—তোমার আশ্রয় লইলে, তোমার মায়া আর জীবকে আক্রমণ করিতে পারে না। তুমি এখন পরের কথা বল ॥ ১৪ ॥

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

শ ম ম
দুষ্কৃতিনঃ পাপকারিণঃ দুষ্কৃতেন পাপেন সহ নিত্যযোগিনঃ মূঢ়াঃ

নী নী রা
যতো দুষ্কৃতিনঃ অতশ্চিত্তশুদ্ধ্যভাবাৎ আত্মানাত্মবিবেকহীনাঃ পূর্ব্বোক্ত

রা ম
প্রকারেণ মৎস্বরূপাপরিজ্ঞানাৎ প্রাকৃতেষ্বেব বিষয়েষু সক্তাঃ অত এব

শ শ ম
নরাধমাঃ নরাণাং মধ্যে অধমা নিকৃষ্টাঃ যতঃ মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ
ম স
শরীরেন্দ্রিয়সঙ্ঘাততাদাত্ম্যভ্রান্তিরূপেণ পরিণতয়া মায়য়া পূর্ব্বোক্তয়া
ম
অপহৃতং প্রতিবদ্ধং জ্ঞানং বিবেকসামর্থ্যং যেষাং তে তথা আসুরং
নী ম
ভাবমাশ্রিতাঃ অসুরাণাং ভাবং চিত্তাভিপ্রায়ং "দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ
ম
ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ" ইত্যাদিনা অগ্রে বক্ষ্যমাণমাসুরং ভাবং হিংসা-
শ্রী ম
নৃতাদিস্বভাবমাশ্রিতা প্রাপ্তাঃ সন্তো ন মাং সর্ব্বেশ্বরং প্রপদ্যন্তে
হ হ নী
মাং ন শরণং গচ্ছন্তি। তদেবং মায়য়া স্বরূপানন্দং আবৃত্য দেহাত্ম-
নী
ভ্রমে জনিতে সতি তদভিমানাদ্দেহাদিপুষ্ট্যর্থং দুষ্কৃতং কুর্ব্বন্তি, তেন
নী ম
চ মূঢ়াঃ সন্তো নরাধমা মাং ন প্রপদ্যন্তে। অহো দৌর্ভাগ্যং তেষা-
ম
মিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৫ ॥

• পাপের সহিত নিত্যযুক্ত (অতএব) বিবেকহীন মূঢ় (অতএব) নরাধম-গণ আমার নিকটে আইসে না। (কারণ) মায়া কর্তৃক তাহাদের জ্ঞান অপহৃত এবং তাহারা দম্ভদর্পাদি আসুরিক ভাবযুক্ত ॥ ১৫ ॥

ভগবান্—চিরসঞ্চিত পাপ-সঞ্চয় হেতু ইহাদের চিত্ত অশুদ্ধ। ইহারা আত্মা কি, অনাত্মা কি, হিত কিসে হয়, অহিত কিসে হয়, ইহার বিচার আদৌ করিতে পারে না। যদিও সময়ে সময়ে ইহারা অনুতপ্ত হয়, তথাপি দুষ্কর্ম্ম করিয়া করিয়া ইহাদের অভ্যাস এরূপ দৃঢ় হইয়া যায় যে, অনুতাপ ইত্যাদিতেও ইহাদের কিছুই হয় না।

অর্জ্জুন—চিরদিন পাপাচরণে ইহারা কিরূপে নিযুক্ত থাকে ?

ভগবান্—মায়া দ্বারা ইহাদের জ্ঞান অপহৃত হয়। মায়ার যে আবরণ শক্তি আছে, তদ্দ্বারা এইরূপ হয়। আবার মায়ার যে বিক্ষেপ শক্তি আছে তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইলে মানুষ অসুরের মত দম্ভ অহঙ্কার করে। হিরণ্যকশিপু যেমন প্রহ্লাদকে বলিয়াছিল, 'আমিই ঈশ্বর'—বিষ্ণু আবার ঈশ্বর কি ? "আমা অপেক্ষা ঈশ্বর আবার কে আছে" মায়া দ্বারা যাহাদের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে, তাহারাও ঐরূপ আসুরভাব যুক্ত হয়।

অর্জ্জুন—মূঢ়, নরাধম, মায়াপহৃতজ্ঞান এবং অসুরভাবাশ্রিত—ইহাদের অজ্ঞানের কি ইতর বিশেষ আছে ?

ভগবান্—আমার সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই, কেবল বিষয়েই আসক্ত এরূপ লোক মূঢ়। আমার সামান্য জ্ঞান আছে, কিন্তু হৃদয় আমার কাছে আসে না—তাহারা নরাধম। আমার ঐশ্বর্য্যাদি জ্ঞান আছে, কিন্তু অসম্ভাবনা দ্বারা ঐ জ্ঞান যাহাদের অপহৃত, তাহারা মায়াপহৃত জ্ঞান। আমার ঐশ্বর্য্যাদির সুদৃঢ় জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু তদ্দ্বারা যাহারা আমার উপর দ্বেষই করে তাহারা অসুর ভাবাশ্রিত। প্রথম পশুর মত ; দ্বিতীয় মানুষ হইয়াছে, কিন্তু অধম ; তৃতীয় ও চতুর্থ, জ্ঞানকে বিকৃত করে।

অর্জ্জুন—অনিষ্ট ত মায়াই করে—তাহাদের দোষ কি ? তবে ইহাদিগকে নরাধম বল কেন ?

ভগবান্—নরাধম বলিবার কারণ আছে। মায়া দুরত্যয়া সত্য—মায়া জীবকে মোহিত করে সত্য—কিন্তু মায়া যেমন জীবকে আক্রমণ করে, আমিও ত সর্ব্বদা জীবের সঙ্গে আছি। আমার কাছে জীব ত থাকিতে পারে ; তাহা হইলে ত আর কেহ তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। জীব যতই অধঃপতিত হউক না কেন, আমি কখনও জীবকে ত্যাগ করি না। গুরু-সাহায্যেই হউক, বা সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র সাহায্যেই হউক,—অতি দুরাচারও অল্পে অল্পে পুরুষার্থ অবলম্বন করিতে পারে। জীবের পুরুষার্থই যে আমি। পৌরুষ প্রকাশ করিবার শক্তি, জীবের সর্ব্বদাই আছে। আমি পৌরুষরূপে সর্ব্বজীবের সঙ্গেই আছি। আমার কথা শুনিবার জন্য প্রাণপণ করে না বলিয়া, জীব দুঃখ পায়।

মায়া নিরন্তর জীবের সঙ্কল্প-স্রোত ছুটাইতেছে। সঙ্কল্প হইতে কামনা—কামনা হইতে কর্ম্ম। এই সঙ্কল্পের বিরাম নাই, আর উন্মত্ত চেষ্টারও উপশম নাই। মায়ার আজ্ঞামত কার্য্য করিবার সময়, জীব বিনা আপত্তিতে করিবে ; কিন্তু আমিও সঙ্গে আছি—আমার আজ্ঞামত কার্য্য করিতে যত আলস্য ও যত ভয়। যে কার্য্যে মরিবে, যে কার্য্যে সর্ব্বদা ভয়, যে কার্য্যে সর্ব্বদা দুঃখ—উপস্থিত একটু সুখের আবরণে ঢাকা আছে বলিয়া, তাহাই করিতে ছুটিবে ; কিন্তু যে কার্য্যে অনন্তজীবন লাভ করিতে পারা যায়, যে কার্য্যে অনন্তকাল ধরিয়া পরমানন্দে অবস্থান

করিতে পারিবে, যে কার্য্যে আমার মত হইবে—তাহা প্রথমে একটু ক্লেশকর বলিয়া তাহা করিবে না। আমার আজ্ঞামত কার্য্য করিবার সময় মানুষের আলস্য, অনিচ্ছা, হাইতোলা, গা-ভাঙ্গা—যত কিছু বিপত্তি ঐ সময়েই। পারি না, মরিলাম প্রভৃতি সমস্ত কাতরোক্তি ঐ সময়েই। মরিতে ছুটিবে সুখে, কিন্তু যাহাতে বাঁচিবে, তাহার বেলায় বলিবে মরিলাম। মায়ার এই বিচিত্র কার্য্য অবলোকন কর। কিন্তু যদি সেই সময়ে বিচার করে, প্রার্থনা করে, আমার নির্দ্ধারিত কৌশল অবলম্বন করে—যদি আলস্য আসিলেই মনকে শাসন করে, শরীরকে এক পায়ে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া কার্য্য করে—পরে যদি জোর করিয়া আমার উপদেশমত চলে—যদি বলে সকলেই ত মায়া ফাঁসে মরিতেছে—আমি শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালন জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিলাম; যদি ধৈর্য্য ধরিয়া এইরূপ চেষ্টা করে, তবে সে স্পষ্ট বুঝিতে পারে যে, তাহার কর্ম্মে আমি সহায় হই—হইয়া ধীরে ধীরে তাহাকে মায়ার ফাঁস হইতে মুক্ত করিয়া দি।

তাই বলিতেছি—যে মায়ার হাবভাবে মুগ্ধ হয়, আর আমার কথা শুনিতে প্রাণপণ করেনা, তাহাকে নরাধম বলায় ত কোন দোষ নাই। আমি দেখাইয়া দিতেছি, তথাপি দেখিবে না; আমি বলিয়া দিতেছি, তবু করিবে না;—ইহাদিগকে নরাধম বলিব না ত কি বলিব? তুমি নরাধম হইও না—তুমি আমার শরণাপন্ন হইয়া আমাকে ভজনা কর।

এই শ্লোকে বলিলাম, চারি প্রকার লোকে আমার ভজনা করে না—মূঢ়, নরাধম, মায়াপহৃত জ্ঞান, অসুরভাবাশ্রিত। যে চারি প্রকার সাধক আমার ভজনা করেন, তাহাদের কথা পরে বলিতেছি ॥১৫

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোর্জ্জুন!
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ! ॥ ১৬ ॥

হে ভরতর্ষভ! হে অর্জ্জুন! আর্ত্তঃ (শ) আর্ত্তিপরিগৃহীতস্তস্করব্যাঘ্ররোগাদিনাঽভিভূতঃ (শ) যদ্বা আর্ত্ত্যা (ম) শত্রুব্যাধ্যাদ্যাপদা গ্রস্তস্তন্নিবৃত্তিমিচ্ছন্ (ম) যথা মখভঙ্গেন কুপিত ইন্দ্রে বর্ষতি ব্রজবাসীজনঃ, যথা বা জরাসন্ধকারাগারবর্ত্তী রাজনিচয়ঃ, দ্যূতসভায়াং বস্ত্রাপকর্ষণে দ্রৌপদী চ, গ্রাহগ্রস্তো (ম) গজেন্দ্রশ্চ। (ম) জিজ্ঞাসুঃ ভগবত্তত্ত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছতি যঃ (শ) আত্মজ্ঞানার্থী মুমুক্ষুঃ (ম)

যথা মুচুকুন্দঃ,যথা বা মৈথিলোজনকঃ শ্রুতদেবশ্চ। নিবৃত্তে মৌসলে যথা চোদ্ধবঃ অর্থার্থী ধনকামঃ ইহ বা পরত্র বা যন্তোগোপকরণং তল্লিপ্সুঃ, ক্ষিতিগজ-তুরগ কামিনী কনকাদ্যৈহিকপারত্রিকভোগার্থীতি। তত্রেহ যথা সুগ্রীবোবিভীষণশ্চ, যথা চোপমন্যুঃ, পরত্র যথা ধ্রুবঃ, এতে ত্রয়োঽপি ভগবদ্ভজনেন মায়াং তরন্তি। তত্র জিজ্ঞাসুর্জ্ঞানোৎপত্ত্যা সাক্ষাদেব মায়াং তরতি, আর্ত্তোঽর্থার্থী চ জিজ্ঞাসুত্বং প্রাপ্যেতি বিশেষঃ। আর্ত্তস্যার্থার্থিনশ্চ জিজ্ঞাসুত্বসম্ভবাজ্জিজ্ঞাসোশ্চার্ত্তত্বজ্ঞানোপকরণার্থার্থিত্ব সম্ভবাদুভয়োর্ম্মধ্যে জিজ্ঞাসুরুদ্দিষ্টঃ, তদেতে ত্রয়ঃ সকামা ব্যাখ্যাতাঃ, নিষ্কামশ্চতুর্থঃ, ইদানীমুচ্যতে জ্ঞানী চ বিষ্ণোস্তত্ত্ববিচ্চ যদ্বা জ্ঞানং ভগবত্তত্ত্বসাক্ষাৎকারস্তেন নিত্যযুক্তো জ্ঞানী তীর্ণমায়ো নিবৃত্তসর্ব্বকামঃ। তত্র নিষ্কামভক্তো জ্ঞানী যথা সনকাদির্যথা নারদো যথা প্রহ্লাদো যথা পৃথুর্যথা বা শুকঃ, নিষ্কামঃ শুদ্ধপ্রেমভক্তো যথা গোপিকাদির্যথা বাক্রূরযুধিষ্ঠিরাদিঃ, কংসশিশুপালাদয়স্তু ভয়াদ্দ্বেষাচ্চ সততভগবচ্চিন্তাপরা অপি ন ভক্তাঃ ভগবদনুরক্তেরভাবাৎ। চতুর্ব্বিধাঃ চতুষ্প্রকারাঃ সুকৃতিনঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ জনাঃ সফলজন্মানস্ত এব নান্যে মাং ভজন্তে সেবন্তে॥ ১৬॥

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৮ম বর্ষ।] ১৩২০ সাল, অগ্রহায়ণ। [৮ম সংখ্যা

বেদবাক্য।

বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি।
সত্যং বদ।
ধর্ম্মঞ্চর।
স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ।
আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ।
সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্।
ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্।
স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্॥ ১॥
দেবাপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।
মাতৃদেবো ভব।
পিতৃদেবো ভব।

আচার্য্য দেবোভব।
অতিথিদেবো ভব।
যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি।
নো ইতরাণি।
যান্যাস্মাকম্ সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি।
নো ইতরাণি ॥ ২ ॥

বেদ গ্রন্থ পড়াইয়া আচার্য্য শিষ্যকে পশ্চাৎ তাহার অর্থ গ্রহণ করাইতেছেন ঃ—

১। "সত্য বল"। প্রমাণ অনুসারে যে অর্থ জানিয়াছ তাহাই বল।

২। ধর্ম্ম আচরণ কর। এখানে যে ধর্ম্ম শব্দ আছে তাহা অনুষ্ঠান করিবার যে সাধনা তাহাই। অভিপ্রায় এই—বাক্য যাহা বলিবে তাহা সত্য হওয়া চাই;—তাহা প্রমাণবিশুদ্ধ বা বিচারবিশুদ্ধ হওয়া চাই। কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন সত্যবাদী হওয়া যায় না, সেই জন্য ধর্ম্ম সাধনা কর।

৩। আপন আপন শাখার বেদ অধ্যয়ন হইতে বিরত হইও না।

৪। আচার্য্য যে ধন ইচ্ছা করেন, তাহা নিজের নিকট না থাকিলে অন্যের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়াও আচার্য্যকে দাও। দিয়া আচার্য্যের অনুমতি লইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য হইতে সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক আপন জাতিকুলের সমান স্ত্রী বিবাহ কর। প্রজা উৎপাদনের উচ্ছেদ করিও না। পুত্র উৎপন্ন কর এবং পুত্রের বিবাহ দিয়া পৌত্র উৎপন্ন হইতে দেখ। যদি পুত্র না হয়, তবে রাজা দশরথাদির মত পুত্রেষ্টি যজ্ঞ দ্বারা প্রজা উৎপন্ন কর।

৫। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সত্য বল—এখানে বলা হইতেছে সত্য হইতে প্রমাদ করিও না অর্থাৎ অনৃত প্রসঙ্গ করিও না; মিথ্যা বলিও না। বিস্মৃত্যাপ্যনৃতং ন কর্ত্তব্যম্। ভুলেও কখন মিথ্যা বলিও না। শ্রুতি অন্যত্র বলেন "সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতি" যে মিথ্যা বলে, সে সমূলে শুষ্ক হয়।

পূর্ব্বে বলা হইল ধর্ম্ম অনুষ্ঠান কর—এখানে বলিতেছেন অনুষ্ঠানযোগ্য সাধনা হইতে প্রমত্ত হইও না;—সাধনার অনুষ্ঠান না করাই প্রমাদ। সাধনার অনুষ্ঠান ত্যাগ করিও না।

কুশল হইতে—আত্মরক্ষার জন্য যে সমস্ত কর্ম্ম তাহা হইতে বিরত হইও না। ভূতি অর্থ বিভূতি। উন্নতির জন্য মঙ্গলকর কর্ম্ম হইতে বিরত হইও না। অধ্যয়ন ও অধ্যাপন কর্ম্ম হইতে বিরত হইও না।

দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।
মাতৃদেবো ভব।
পিতৃ দেবোভব।
আচার্য্য দেবোভব।
অতিথিদেবো ভব।
যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি।
নো ইতরাণি।
যান্যাস্মাকম্ সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি।
নো ইতরাণি।

জপ, পূজা, যজ্ঞাদি দেবকার্য্য, শ্রাদ্ধতর্পণাদি পিতৃকার্য্য হইতে বিরত হইও না। মাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা ভাবনা করিও। পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা ভাবনা করিও। আচার্য্যকে প্রত্যক্ষ দেবতা ভাবনা করিও। অতিথিকে প্রত্যক্ষ দেবতা ভাবনা করিও শুধু ভাবনা নহে, দেবতার ন্যায় উপাসনা করিও।

যে সমস্ত কর্ম্ম অনিন্দিত তাহারই অনুষ্ঠান করিবে। নিন্দিত কর্ম্ম করিও না। আমাদের মধ্যে যাহা বেদ-অবিরুদ্ধ শ্রেষ্ঠ আচরণ তাহাই তোমার উপাসনার যোগ্য। আচার্য্য যদি অশ্রেষ্ঠ কিছু করেন, তাহা সেবন করার যোগ্য নহে।

একে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণঃ।
তেষাং ত্বয়াসনে ন প্রশ্বসিতব্যম্।
শ্রদ্ধয়া দেয়ম্।
অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্।
শ্রিয়া দেয়ম্।
হ্রিয়া দেয়ম্।

ভিয়া দেয়ম্।

সংবিদা দেয়ম্।

অথ যদিতে কর্ম্ম-বিচিকিৎসা বা বৃত্তি-বিচিকিৎসা বা স্যাৎ; যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সর্ম্মর্শিনঃ; যুক্তা আমুক্তাঃ; অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্ তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ ॥ ৩ ॥

যে কেহ আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ [ক্ষত্রিয়াদি নহে] আসনাদি দিয়া তুমি তাঁহাদের শ্রম নিবারণ করিবে। যদি কিছু দান করিতে হয়, শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক দান করিও না। লজ্জার সহির দান করিবে—যে দান করে, দান বিষয়ক অভিমান হইতে তাহার লজ্জা থাকে। ভয়ে দান করিবে অর্থাৎ দান না করিলে লোকে কৃপণ বলে এই অপকীর্ত্তি এবং দান না করিলে জন্মান্তরে দরিদ্র হইতে হয় এই ভয়ে দান করিবে। মিত্রাদির কার্য্যে দান করা উচিত অর্থাৎ মিত্রাদি-কুটুম্ব-স্বজনাদি—যাঁহাদের সহিত কোন না কোন সম্বন্ধ আছে তাঁহারা যদি নির্ধন হন, তবে তাঁহাদিগের নিকট হইতে পুনর্ব্বার গ্রহণ আশা না রাখিয়া দান করিবে।

আবার শ্রৌত বা স্মার্ত্ত কর্ম্মবিষয়ে বা আচরণবিষয়ে যদি তোমার সংশয় হয়, তবে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ঐ বিষয়ে মীমাংস করিতে সমর্থ, আর যাঁহারা ঐ কর্ম্মবিষয়ে বা ঐ আচরণবিষয়ে যুক্ত কিন্তু অন্য বিষয়ে স্বতন্ত্র, যাঁহারা ক্রূরবুদ্ধি নহেন, ধর্ম্ম বা পুণ্যই যে সমস্ত ব্রাহ্মণের একমাত্র কামনা—যাঁহারা ভোগকামনা রহিত—ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণ যেরূপ কর্ম্ম বা আচরণ করিবে, তুমিও সেইরূপ হইও।

উপরে বেদ (তৈত্তিরীয়) হইতে যাহা দেখান হইল, তদ্দ্বারা শিষ্যকে বা পুত্রকে শিক্ষিত করিবে। ঐ সমস্ত ঈশ্বরের অনুশাসন বাক্য [গ্রন্থপাঠের পর অনুষ্ঠান করিবার বাক্য]।

অবস্থা ত্রয় বা চতুষ্টয়।

কর্ম্ম নাই, শুভকর্ম্ম করান আছে ; যা মনে আসে তাই করা আছে। এই তিন অবস্থা। চতুর্থ অবস্থা সর্ব্বশেষে উল্লেখ মাত্র হইবে। মুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী বা বদ্ধ এই তিন অবস্থা। ইহার পরের যে অবস্থা তাহা পশুর অবস্থা। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন চেষ্টার অবস্থা। এই অবস্থায় লোককে বলে পামর।

যিনি মুক্ত তাঁর কোন কর্ম্ম নাই। কর্ম্ম না করিয়া কর্ম্মশূন্য অবস্থা কোন মানুষে লাভ করিতে পারে না। তুমি ভাব দেখি তোমার কোন কর্ম্ম নাই। কর্ম্ম করেন প্রকৃতি। প্রকৃতির কর্ম্ম তোমাতে আরোপ হয় মাত্র। তুমি পরম শান্ত—চলনরহিত, আপনি আপনি, নিঃসঙ্গ পুরুষ। তুমি জ্ঞান-স্বরূপ, তুমি আনন্দ-স্বরূপ ; তুমি ব্রহ্মানন্দ।

কোন বিষয় নাই অথচ যে আনন্দে স্থিতি তাহাই ব্রহ্মানন্দ। যেমন সুষুপ্তিতে কোন কিছু থাকে না—কোন কিছু নাই—সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছে সে অবস্থায় আনন্দের স্বরূপে স্থিতি। তাই বলা হইতেছিল—যে আনন্দ মানুষ ভোগ করে, আনন্দের ভোক্তা যেখানে কেহ আছে সে আনন্দ জড় মাত্র। কিন্তু যে আনন্দের বিষয় কিছুই নাই, যে আনন্দ কোন কিছু না থাকিলে প্রকাশ হয়—সেই আনন্দই ব্রহ্মানন্দ। কর্ম্ম বা প্রকৃতি যতক্ষণ থাকে তৎক্ষয়ে এই আনন্দ স্বরূপে স্থিতি—তাই বলা হইল, যিনি জ্ঞানী তিনি জানেন তাঁহার কোন কর্ম্ম নাই। তিনি প্রকৃতির পর। তিনি নিঃসঙ্গ পুরুষ। প্রকৃতিই জন্মে, প্রকৃতিই মরে ; প্রকৃতিরই জরা, আধি, ব্যাধি, রোগ, শোক। প্রকৃতিই সংসার করে। কাজেই প্রকৃতি পর্য্যন্তই কর্ম্মের গতি। আমি নিঃসঙ্গ, আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। তাই আমার জনম মরণ নাই, আহার নিদ্রা নাই, শীত উষ্ণ নাই, সুখ দুঃখ নাই, ভয় মৈথুন নাই, আমি আপনিই আপনি। আমি আনন্দ-স্বরূপ। যতক্ষণ পার এই ভাবনা করিয়া কর্ম্মশূন্য অবস্থায় ব্রহ্মানন্দে থাক। যদি রুচি ইহাতে থাকে, তবে তুমি উচ্চসাধক হইতে পারিবে।

(২)

যদি ঐ উচ্চভাব না থাকে, তবে দেখিবে আমার কোন কর্ম্ম নাই বলিয়া চুপ করিয়া থাকা তোমার কষ্টকর হইবে।

তুমি বলিবে আমি কর্ম্ম না করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারি না।

কিন্তু কোন্ কর্ম্ম তোমার আছে? তুমি প্রকৃতি বা কর্ম্মের বশে। এই কর্ম্ম দুই প্রকার—নিবৃত্তি কর্ম্ম ও প্রবৃত্তি কর্ম্ম। প্রবৃত্তি কর্ম্মকে নিবৃত্তি করাই মুমুক্ষুর কর্ম্ম।

এই জন্য মুমুক্ষুর কর্ম্ম যাহা তাহা শুভ-কর্ম্ম। মুক্তের কোন কর্ম্ম নাই। এই কর্ম্মগুলি (১) নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ। মিথ্যা কথা কহিব না, চুরি করিব না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিব না, পরদার করিব না, কাম ক্রোধ লোভ ইহাদের প্রশ্রয় দিব না; আলস্য অনিচ্ছার প্রশ্রয় দিব না; কাহারও মনে ব্যথা দিব না—এই গুলি নিষিদ্ধ কর্ম্ম।

কিন্তু নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করিব বলিলেই ত তাহা ত্যাগ হয় না। কোন কিছু গ্রহণ করিলে তবে কোন কিছু ত্যাগ হয়। বালিকা স্বামী গ্রহণ করিতে পারিলে, তবে পুতুলখেলা ত্যাগ করে। সেইজন্য (২) বিহিত কর্ম্ম গ্রহণ। ইহাতে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া প্রাতকৃত্য যথা ত্রিসন্ধ্যা করা, শাস্ত্রবিধিমত স্নান-যজ্ঞ, আহার-যজ্ঞ, নিদ্রা-যজ্ঞ করিতে হইবে। পিতৃঋণ, দেবঋণ, ঋষিঋণ পরিশোধ জন্য নিত্যকর্ম্ম করিতে হইবে। আর সর্ব্বদা ভগবানের জপ লইয়া থাকিতে হইবে।

ইহা তুমি চেষ্টা করিয়া দেখ—দেখিবে কত বাধা তুমি পাও। বাধা কে দেয় জান? তোমার পূর্ব্বকৃত পাপ। তুমি অর্থাৎ তোমার নিবৃত্ত মন তোমার প্রবৃত্ত মনকে জপ করাইতে বসিল—উহা কিন্তু খাজনা আদায় করিতে গেল বা কয়খানি কোম্পানীর কাগজ হইয়াছে তাহা নাড়িতে চাড়িতে গেল বা কোন্ গহনাখানি কিনিতে হইবে তাহা ভাবিতে লাগিল অথবা স্বাধীন প্রণয়ের চিন্তায় ডুবিল, অথবা কারবারের হিসাব তুলিল বা মক্কেলকে জিতাইবার জন্য শওয়াল জবাব করিতে লাগিল। বলিতেছিলাম বিঘ্ন যাহা তাহা পাপ। এই পাপের নিবৃত্তি জন্য (৩) প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক।

কিছুদিন তীর্থে ঘুরিয়া আইস।

তীর্থে সাধুসেবা করিয়া আইস, সৎসঙ্গ করিয়া আইস, দীনদুঃখীর মধ্যে ভগবান্ আছেন—দৃঢ়ভাবে ইহা স্মরণ করিয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে, তুমি প্রসন্ন হও বলিতে বলিতে—জীবসেবা করিয়া আইস। পুণ্যতীর্থে স্নান কর, শাস্ত্রমত দান কর, তীর্থে তীর্থে থাকিয়া নিত্য কর্ম্ম কর, সৎসঙ্গ কর, সৎশাস্ত্র

শ্রবণ মনন কর, প্রতিদিন প্রার্থনা উপাসনাতে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অনুতাপ কর—প্রায়শ্চিত্ত হইল। ইহার পর কর্ম্ম শুভকর্ম্ম (৪) উপাসনা—এই উপাসনা দ্বারা চিত্ত কোন অবলম্বন ধরিয়া ঈশ্বরে একাগ্র হইবে। উপাসনাতে বাহিরের ও ভিতরের পূজা আছে। প্রাণায়াম আছে, জপ আছে, স্তবস্তুতি আছে, প্রার্থনা আছে, আর কথা কওয়া আছে। ইহাতে ব্রত উপাসনা আছে, স্বাধ্যায় আছে, ঈশ্বর প্রণিধান আছে। যতগুলি শুভকর্ম্ম বলা হইল তাহা চিত্তশুদ্ধির জন্য। বিহিত নিষিদ্ধ কর্ম্মত্যাগ, গ্রহণ, প্রায়শ্চিত্ত, উপাসনা ইত্যাদিদ্বারা যখন মনে হইবে যাহার উপাসনা কর—তিনি যেমন তোমার ভিতর আছেন, তেমন সর্ব্বজীবের ভিতরে আছেন সর্ব্ববস্তুর ভিতরে বাহিরে আকাশের মত আছেন, কাজেই রাগদ্বেষ কাহার উপর করিব? সর্ব্বদা সর্ব্ব বস্তুতে তাঁহার সত্তা ভাবনা করিতে করিতে যখন সেই সত্তাই সর্ব্বদা চক্ষে ভাসিবে তখন শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব ভাবের ও বোধ থাকিবে না এইরূপ অবস্থাই চিত্তশুদ্ধির চরম।

এই অবস্থায় চিত্ত; ঈশ্বরভাবে ভাবিত হইয়া যাইবে। কিন্তু চিত্ত যতদিন না ব্রহ্মভাবে ভাবিত হয়, ততদিন ব্রাহ্মীস্থিতি হইবে না; সেইজন্য যে শুভকর্ম্ম গুলি করিতে হইবে। এইগুলি মুমুক্ষুর সাক্ষাৎ সাধনা। এইগুলি—

(১) নিত্য কি অনিত্য কি বিচার।

(২) ইহলোকের ও পরলোকের ভোগ ত্যাগ।

(৩) আত্মাতে শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান—এই গুণ গুলির উদয়।

(৪) মুক্তির তীব্র ইচ্ছা। ইহার পরেই গুরুমুখে তত্ত্বমসির শ্রবণ—শেষে মনন নিদিধ্যাসন অন্তে মুক্তি।

তৃতীয় অবস্থাটা বড়ই শোচনীয়। এখানে কখন ধর্ম্ম করা কখন অধর্ম্ম করা—যখন যেটা ভাল লাগে। এখানে কর্ম্ম হয় খেয়ালে। সময়ে সময়ে শোক তাপ পাইলে একটু ভগবান্‌কে ডাকিতে ইচ্ছা—আবার একটু সারিয়া উঠিলে থিঙ্গী। একটু সামর্থ্য হইলে বেশী করিয়া গুছাইয়া সংসার করা। মোটের উপর ইহারা প্রকৃতির দাস; তিন রজ্জুতে বন্ধ। সাধারণ দড়ীতে যাহারা বাঁধা, তাহারা এক জায়গায় বাঁধা হইয়া পড়িয়া থাকে। কিন্তু এই অপূর্ব্ব রজ্জুতে যাহারা বদ্ধ—তাহারা ধাবতি ধাবতি। কেবল ছুটিতেছে। মানসভ্রমে

ছুটে, যশের আকাঙ্ক্ষায় ছুটে, কাঁকড়ার বাচ্ছা সমুদ্র-তরঙ্গ থামাইতে দল বাঁধে সর্ব্বদাই ছুটাছুটি করে। বদ্ধের ছুটাছুটি বড় ভীষণ।

আর একটা অবস্থা আছে সেটা অধমাধম অবস্থা। সেখানে আহার নিদ্রা ভয় আর মৈথুন চেষ্টা ভিন্ন অন্য চেষ্টা থাকে না। এই সব লোক পশুধর্ম্মী। পামর।

অবস্থা ত্রয় বা অবস্থা চতুষ্টয় এইরূপ। চিত্ত বুঝিয়া দেখ তুমি কোন্ অবস্থায়। বুঝিয়া এখন উপরের অবস্থাতে উঠিবার জন্য প্রাণপণ কর। এই আর কি?

পদানুসরণ প্রয়াস।

৫ম প্রবন্ধ।

(১)

ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন—যতপ্রকার উন্নতির চেষ্টা করিতে হয় কর; দেশের ধনবৃদ্ধি, দেশের শারীরিক বলবৃদ্ধি দেশের লোকবৃদ্ধি, দেশের শিক্ষাবৃদ্ধি সমস্তই চেষ্টা কর—কিন্তু যতদিন না নিজে ঈশ্বর ভাবনা করিয়া অন্যকে ঈশ্বর ভাবনা শিখাইতে পারিবে ততদিন তোমরা শোকের হাত হইতে এড়াইতে পারিবে না। সমস্তই কর কিন্তু সমস্তের মূলে ঈশ্বর ভাবনাটি রাখ। এইটি বাদ দিয়া অন্য যাহা করিবে তাহাতে যথার্থ মঙ্গল সাধিত হইবে না।

ঈশ্বর ভাবনাতে কোন ইষ্ট সাধিত হইবে?

জগতের শোকশান্তি ঈশ্বর ভাবনা ভিন্ন অন্য কিছুতেই হইতে পারে না। যদি তোমার বা তোমার দেশের লোকের শোকশান্তির প্রয়োজন আছে মনে কর, তবে ঈশ্বর ভাবনা করিতে শিক্ষা কর।

ঈশ্বর ভাবনার ফল কি উপলব্ধি করা যায়?

যায় বৈ কি। যে যেমন ভাবে তাঁহাকে ভাবিতে পারে সে সেইরূপ ভাবে ফল লাভ করে। ঈশ্বর ভাবনা সদ্য ফলপ্রদ।

শুধু মুখে বলিলেই ত হইবে না। এটা কি দেখাইয়া দিতে পার?

পারি। ক্রম অনুসারে ঈশ্বর-ভাবনায় কিরূপে মন শান্ত হয় দেখাইতেছি। সর্ব্বোচ্চ ভাবনা হইতে আরম্ভ করিতেছি। সর্ব্বোচ্চ ভাবনাটি যদি ভাবিতে পার, তবে সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিবে ইহাতে সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হয় কিনা।

বল—আমি নানাপ্রকার শোকে জর্জ্জরিত। আমি চেষ্টা করিব।

ঋষিরা বলেন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-ভাবনাটি গায়ত্রী-মন্ত্র। মোটামুটি ইহার অর্থ পূর্ব্বের চারি প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করা গিয়াছে। এখানে আরও পরিষ্কার করিয়া ধারণা করার প্রয়াস পাওয়া যাইবে।

"ধীমহি" ধ্যান করি। এখানে ধ্যান অর্থ চিন্তা, ভাবনা। ভাবনা করিলেই চিত্ত পরমপদে পৌঁছিবে। পরমপদে কোন প্রকার শোকতাপ নাই, কোন প্রকার জ্বালাযন্ত্রণা নাই। সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তিই এই পরমপদ। গায়ত্রীকে চিন্তা কর। করিয়া দেখ, তোমার বুদ্ধিকে তিনি সেই নিত্যানন্দে প্রেরণ করেন কিনা?

দৃষ্টান্ত দিয়া না দেখাইলে আমার হইবে না। তাহাই হউক। গায়ত্রী-চিন্তা কি, অগ্রে তাহাই দেখ।

সবিতার বরণীয় ভর্গকে চিন্তা করিতে হইবে। যাঁহা হইতে কোন কিছু প্রসূত হয়, তিনিই তাহার সবিতা। যাঁহা হইতে বিশ্ব প্রসূত, তিনিই বিশ্বের সবিতা। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে—যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত জন্মিতেছে, তিনিই সবিতা।

কোথা হইতে এই ভূত সমস্ত জন্মিতেছে?

ব্রহ্ম যখন আপনস্বরূপে থাকেন, তখন সৃষ্টি নাই। যখন তিনি আপনি আপনি ভাবে অবস্থান করেন, তখন আর কিছুই নাই। কেবল তিনি। দ্বিতীয় কিছুই নাই।

মহাপ্রলয়ে যখন জল নাই, স্থল নাই, অম্বরতল নাই, চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, জ্যোতিষ্কমণ্ডল কিছুই নাই, জীব নাই, জন্তু নাই, নদী নাই, সমুদ্র নাই, কিছুই নাই—কেবল তিনিই তিনি।

কিছুই নাই—এই বিপুল বিশ্ব নাই—ইহা কি ধারণা করা যায়?

যায় বৈকি। যখন তোমার সুষুপ্তি হয়, তখন কি থাকে বলিতে পার? তখন বিশ্বের অভাব কি হয় না?

দেহ নাই, মন নাই, এই বিপুল বিশ্বের কিছুই নাই—সকলের অভাব

হইয়া গিয়াছে ; কোন কিছুই নাই—সকলের অভাব অনুভব হইতেছে বলিলে কি বুঝা যায় ? সকলের অভাব ইহারই অন্য নাম স্বরূপে স্থিতি—আপনি আপনি ভাবে স্থিতি। বেশ করিয়া এই অভাবটি ধারণা কর—করিয়া দেখ, কি পাও ? ইহাই পূর্ণের অনুভব, ইহাই পরিপূর্ণে স্থিতি।

ভাবনা কর, মহাপ্রলয়ে সব শান্ত হইয়া গিয়াছে—কিছুই নাই—কেবলটি মাত্র আছেন—আপনি আপনি আছেন। এইটি ব্রহ্মের স্বরূপ। এখানে সৃষ্টি নাই। তবে স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে "ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" হইতেছে না ?

না—তাহা হইতেছে না।

তবে কোথা হইতে ভূত সমস্ত জন্মিতেছে ? ব্রহ্মের শক্তি হইতে ? বলিতে পার, একমাত্র ব্রহ্মই যেখানে আছেন আর কিছুই নাই—সেখানে শক্তি আসিল কোথা হইতে ? তবে কি শক্তি ও ব্রহ্ম এক ? না তাহা নহে। যেমন মন ও সঙ্কল্প, সূর্য্য ও দীধিতি, অগ্নি ও উত্তাপ, বায়ু ও স্পন্দন, সেইরূপ ব্রহ্ম ও শক্তি। এ বিচার অতি সূক্ষ্ম। মন হইতে যেমন সঙ্কল্প উঠে সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে শক্তি বা সঙ্কল্প উঠে। ব্রহ্মে শক্তি আছে বা নাই এই দুয়ের কিছুই বলা যায় না। যদি বল আছে তবে বলিব ধরিয়া দাও। তাহা পার না। কারণ যাঁহাতে স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় কোন প্রকার ভেদ নাই সেখানে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অপর কিছু থাকিবে কিরূপে ? আবার যদি বল শক্তি ও ব্রহ্ম একই বস্তু ? তবে শক্তিই আছে বলিলেই হয়, ব্রহ্ম স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। তাহা বলাও ত ঠিক হয় না। কারণ শক্তি ত আকাশে ঝুলে না ? শক্তিমান্ ভিন্ন শক্তি থাকিবে কোথায় ? তবে শক্তি ও শক্তিমান অভেদ এই যে বলা হয় তাহা কোনখানে, ইহার বিচার যদি আবশ্যক হয় পরে করা যাইবে।

ব্রহ্মই আছেন। শক্তি নাই এ বলিলেও ত হয় ? তাহা হয় না। যদি শক্তিই না থাকে তবে শক্তির কার্য্য এই বিশ্ব কোথা হইতে আসিল ?

এও ত বড় অদ্ভুত কথা। শক্তি আছে ইহাও বলা যায় না, শক্তি নাই ইহাও বলা যায় না। তবে কি বলা যাইবে ?

এই জন্যই এই শক্তিকে মায়া বলা হইয়াছে। কি যে এই মায়া—তৎসম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না অথচ ইহার কার্য্য আছে সকলকেই ইহা স্বীকার করিতে হয়।

ব্রহ্মে মায়া আছে বা নাই কিছুই বলা যায় না। ইহা না হয় বলা হইল কিন্তু মায়ার কার্য্য এই বিশ্ব কোথা হইতে আসিল ?

মায়া যেরূপ বস্তু তাহার কার্য্যও সেইরূপ হওয়া উচিত। মরুমরীচিকায় যেমন জল নাই কিন্তু জলভ্রম হয়, রজ্জুতে যেরূপ সর্প নাই কিন্তু সর্প ভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেও জগৎ নাই কিন্তু জগৎ ভ্রম হয়। কাজেই বলা হয় ব্রহ্মই আছেন জগৎ নাই। যদি জগৎ থাকে তাহা ভ্রমে। অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াই এই ভ্রমের মূল।

আচ্ছা বিশ্বটা ভ্রমই হউক বা যাহাই হউক এটা উঠে কোথা হইতে?

পূর্ব্বে বলিলাম স্বরূপ বা আপনি আপনি ব্রহ্ম হইতে এই মায়ার কার্য্য বা বিশ্ব উঠে না, আবার মায়া বা শক্তিকে যখন আছে বলা যায় তখন ইহা জড় মাত্র—ইহা দ্বারাও সৃষ্টি হয় না কাজেই বলিতে হয় ব্রহ্ম যখন মায়াকে স্বীকার করেন তখন তিনি সগুণ হয়েন। সেই সগুণ ব্রহ্ম হইতে "ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"।

আশ্চর্য্য কথা বটে—যাহা আছে বা নাই কিছুই বলা যায় না তাহার কার্য্য কিন্তু ব্রহ্মে আরোপ হয়। আচ্ছা ব্রহ্মে মায়ার খেলা হয় ইহা কি ব্রহ্মের ইচ্ছায় হয়?

কেহ কেহ বলেন বটে ব্রহ্মের ইচ্ছায় বিশ্ব সৃষ্টি হয় কিন্তু এতৎসম্বন্ধে কেহ কেহ এই বলিয়া আপত্তি করেন যে ব্রহ্ম যিনি তিনি ত আপ্তকাম। তিনি পূর্ণ। অভাব না থাকিলে ইচ্ছা হয় না। পূর্ণের আবার ইচ্ছা কেন জাগিবে? এই জন্য বলা হয় ব্রহ্মে মায়ার কার্য্য স্বভাবতঃ জাগে ইহাতে ব্রহ্মের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই থাকে না। মণির ঝলক যেমন স্বাভাবিক, ব্রহ্মে মায়ার কার্য্যোৎপত্তিও সেইরূপ স্বাভাবিক।

এই যে তুমি সবিতার ব্যাখ্যাতে এত কথা বলিলে ইহাও স্থূল দৃষ্টান্ত দিয়াই বলিতেছ। ব্রহ্ম ত মণির মত একটা জড় পদার্থ নহেন। ইনি জ্ঞানস্বরূপ, ইনি আনন্দস্বরূপ। এই জ্ঞানানন্দে মায়ার কার্য্য—ইহা ত বুঝাইতে হইবে?

স্বরূপ জ্ঞান ও স্বরূপ আনন্দ ধারণা করা কঠিন। তিনি জ্ঞানময়, আনন্দময় যদি বল তবে জ্ঞান ও আনন্দ হইতে তিনি ভিন্ন। তিনি জ্ঞানের দ্রষ্টা ও আনন্দের ভোক্তা যখন তখন জ্ঞান ও আনন্দ জড় মাত্র। কিন্তু জ্ঞান স্বরূপ বা আনন্দ স্বরূপ যিনি তিনি দ্রষ্টা, ভোক্তা নহেন।

জ্ঞান স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ ইহা তবে কি? বিশ্বই দৃশ্য বস্তু। বিশ্বের অভাব অনুভব করিতে পারাও যা জ্ঞানস্বরূপে বা আপনি আপনি ভাবে স্থিতিও তাই।

সুষুপ্তিতে বিশ্বের অভাব যেন কেহ অনুভব করাইয়া দেয়। তাই জাগিয়া বলিতে পারা যায় কিছুই ছিল না। আর কিছুই নাই অর্থই একটি কেবলটি আছে। এই একটিই—কেবলটিই অখণ্ড সীমা শূন্য আপনি আপনি।

তবেই হইল কোন বস্তু নাই অথচ আনন্দ, কোন দৃশ্য নাই অথচ জ্ঞান—ইহাই জ্ঞানানন্দের স্বরূপ।

এই স্বরূপজ্ঞানের উপরে অজ্ঞান বা মায়ার কার্য্য ভাসিবে—ইহা কিরূপ?

দৃশ্যজগৎ নাই, আপনি আপনি আছি, ইহাই স্বরূপ স্থিতি। ইহা হইতে স্বভাবতঃ মণির ঝলকের মত যে অজ্ঞান উঠে বা কল্পিত হয় [কল্প সামর্থ্যে] এই অবস্থাটি মায়াশবলিত ব্রহ্ম বা সগুণ ব্রহ্ম। সগুণ ব্রহ্ম হইতে ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। এই জন্য বলা হয় ব্রহ্ম অজ্ঞান কল্পনা করেন।

এই সগুণ ব্রহ্মের বরেণ্যং ভর্গই চিন্তা করিতে হইবে। বরণীয় ভর্গ বলিলেই, অবরণীয় ভর্গ বলিয়া কিছু আছে ইহা ত বলিতে হয়? সগুণ ব্রহ্মের বরণীয় ভর্গই বা কি, আবার অবরণীয় ভর্গই বা কি?

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইহা বলা হইয়াছে। এখানে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে—যে শক্তি তোমার বুদ্ধিকে মায়া বা জগৎ ছাড়াইয়া ব্রহ্মে লইয়া যায়, তাহাই তোমার বরণীয় ভর্গ। আর যে শক্তি তোমার বুদ্ধিকে বিষয়পথে চালিত করে, তাহাই তোমার অবরণীয় ভর্গ।

বরণীয় ভর্গের স্বাভাবিকী গতিই ব্রহ্মপথে। কেবল অবরণীয় ভর্গের সহিত জড়িত হইয়া যখন অবরণীয় ভর্গ ইহাকে টানিয়া রাখে তখনই ইনি ব্রহ্মপথে চলিতে পারেন না। সহজ বাঙ্গলায় ইহাকেই বলে—যখন রজস্তম শুদ্ধ সত্ত্বকে অভিভূত করে, তখন শুদ্ধ সত্ত্ব ব্রহ্মপথে ধাবিত হইতে পারে না। রজস্তম বা লয়বিক্ষেপ কাটাইতে না পারিলে, বরণীয় ভর্গের গতির সহিত আমাদের ধীকে বা উত্তম বুদ্ধিকে মিশান যায় না।

রজস্তম কাটান যোগমার্গেও হয়, ভক্তিমার্গেও হয়, আবার যোগভক্তিমিশ্রিত জ্ঞানমার্গেও হয়। এই মিশ্র মার্গের উপাসনাই সন্ধ্যা। সন্ধ্যার প্রথম কার্য্য প্রাণায়াম, মধ্যম কার্য্য ভক্তি, শেষ কার্য্য জ্ঞান। প্রার্থনাগুলিও ভক্তির কার্য্য।

"ধীমহি" ত চিন্তা করাকেই বলিতেছ?

হাঁ। অগ্রে প্রাণায়াম ও ভক্তির কার্য্য করিয়া তবে চিন্তা করিতে হইবে।

পঞ্চম বর্ষেও যজ্ঞোপবীত হয়। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, শক্তির স্বরূপ, শক্তিমানের স্বরূপ—এই সমস্ত চিন্তা কি বালকে পারিবে ?

সেই জন্যই জপ বিধি। ইহাতে মাকে যেমন বালকে ডাকে, সেই ভাবে ডাকা হইলেই হইবে। বালকের কোন প্রয়োজন নাই, ক্ষুধা পাইতেছে না, অন্য কিছুই পায় নাই—কিন্তু মা'কে না দেখিতে পাইলে, সে যেমন ব্যাকুল হইয়া যা'কে পায় তাহাকেই জিজ্ঞাসা করে "মা কোথায় গেল"- কাহারও কাছে উত্তর না পাইয়া যেমন কাতর হইয়া কাঁদে, আর মা মা বলিয়া চিৎকার করে—সেইরূপ গায়ত্রী-মন্ত্রে ডাকিতে পারিলেই মা আসেন, কোলে করেন ; তখন বলাধান করিয়া মা'কে বুঝিবার জন্য যে চিন্তা সেই চিন্তার সামর্থ্য দিয়া দেন। এই কারণেই শাস্ত্রে দেখা যায় ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান হয় না।

এখন বল ,চিন্তা করিতে করিতে বুদ্ধি সেই চিন্তনীয় বস্তুতে প্রবেশ করে কিরূপে ? কেননা ধীমহি করিলে তবে ত ধীয়োয়োন প্রচোদয়াৎ হইবে ?

ব্যাসদেব প্রণম্য ধ্যানসংযুক্তং রামায়ণমুদীরয়েৎ বলিয়াছেন। ভক্তিভাবে প্রণাম করিলে এবং ধ্যান বা চিন্তা করিলে—চিত্ত, ধ্যানের বস্তুর ভাবে ভাবিত হইবেই। শুধু কল্পনা ইহা নহে ; মন বা চিত্ত দেহ ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ এমন স্থানে যাইবে - যেখানে শরীর ও মন উভয়ই যেন নাই, অথচ পূর্ণমাত্রায় আনন্দের অনুভূতি আছে। পরেই আনন্দে স্থিতি। এই স্থিতি স্থায়ী হইলেই মুক্তি।

যত প্রকার চিন্তা আছে, গায়ত্রী-চিন্তাই প্রধান সৎসঙ্গ। ইহাতে ব্রহ্মচিন্তা আছে ; জগৎ নাই, এই অভাব চিন্তাও আছে। ঠিক ঠিক, এই চিন্তা করিতে পারিলেই, চিত্ত ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া স্থির হইয়া যাইবে।

বুঝিতেছি জ্ঞানমার্গে গায়ত্রী চিন্তা করিলে সদাই ফল পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাত পারি না। তবে ভক্তিমার্গে গায়ত্রী চিন্তাটি ভাল করিয়া বল।

পূর্ব্বে ত বলিলাম "মা কোথায় গেল"—ইহা মনুষ্য, পশু, পক্ষী, আকাশ, সমুদ্র, তারা, চন্দ্র, দিবা, নিশি, সূর্য্য, বায়ু সকলকে জিজ্ঞাসা কর—কেহ না বলিলে বালকের মত কাঁদিতে কাঁদিতে ডাক—ডাকা হইবে। ইহাকেই ডাকার মত ডাকা বলে। বুড় ছেলে "ছাড় অন্য অভিলাষ" না হইয়া ডাকিলে যে—ডাকা সেটা ডাকার মতন ডাকা নহে।

এই এক রকম ডাকা। ইহাতে রূপের দরকার হয় না। কিন্তু আর এক রকম ডাকা আছে। তা'তে রূপ আছে। জগৎ জুড়ে চৈতন্য আছেন।

চৈতন্ত শুভ্র। মায়ার কার্য্য কালীর ফোঁটা। শুভ্র চৈতন্তকে শিব বলা হয়। কালীর ফোঁটার রূপ কালী। ফোঁটা বলা হয় প্রণবের উপর বিন্দুকে। অতি সূক্ষ্ম বলিয়াও তিনি বিন্দু. আবার সীমাশূন্ত ব্রহ্মের একদেশে অতি সূক্ষ্ম স্থানে যে মায়ার খেলা, চতুষ্পাদ ব্রহ্মের তুলনায়, পরমশান্ত মায়াতরঙ্গশূন্ত ত্রিপাদ ব্রহ্মরূপ পরমপদের প্রবেশদ্বারও এই বিন্দু বটে। যাই হোক, শিবের উপরে কালী। জীব, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া যে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েন, সেই শিবের রূপই এই কালীর পদতলের শিব। সংসারকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া না গায়ে মাখিলে, শিব হওয়া যায় না। আবার গলায় বিষ ও কপালে অমৃত-রূপী শিবকলা না ধরিলে শিবত্ব মিলে না। সাপে বাঘে নাহি খায়—বরং সাপ বাঘের আশ্রয়স্থান না হইলে শিব হয় না। হস্তে সর্ব্বদাই প্রলয় ডিণ্ডিম না থাকিলে, সর্ব্বদা প্রলয়চিন্তায়, এক মাত্র শক্তিস্পন্দন তাঁহাতে মিশিয়া এক হইয়া পরমশান্তভাবে স্থিতিলাভ করিতেছে, এই চিন্তা সর্ব্বদা না করিলে শিব হওয়া যায় না, শবরূপে শক্তিপদতলে পড়িয়া ঐ চিন্তাদ্বারা শক্তিকেই একাগ্র-ভাবে দেখিতে না পারিলে, শিব হওয়া যায় না। শিবের ভাবে শক্তিকে দেখ—আগে শিবের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শিবভাবে ভাবিত হও (ইহাতে তৃতীয় চক্ষুর কার্য্য আছে); পরে শিবচক্ষু লইয়া কালীর দিকে চাও। দেখিবে মা আমার কত সুন্দরী—দেখিবে মা আমার রজস্তমের খেলা সাঙ্গ করিয়া অথচ অসি-মুণ্ড রক্তাক্ত ছিন্ন হস্ত না ফেলিয়া দিয়াও, শুদ্ধ সত্বস্বরূপিণী, বরণীয় ভর্গরূপিণী। তিনি তোমাকে—তোমার উত্তম ধীকে আপনার সঙ্গে মিশাইয়া লইয়া, তোমাকে আপন স্বরূপ দিয়া, পরমশিবের বামে বসিতেছেন অথবা বলিতে পার উভয়ে মিলিয়া রাধা হইয়া কৃষ্ণসঙ্গে মিশিতেছেন। মিশিবার কালে "অত্যন্ত সুখ মশ্নুতে"—কিন্তু মিলিয়া গিয়া পরমশান্ত পরমপদে স্থিতি। আবার এই স্থিতি আয়ত্ত করিয়া যৎস্বপ্ন জাগর সুষুপ্তমবৈতি নিত্যং তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমহং নচ ভূতসঙ্ঘঃ॥ এও হয়, আবার তাও হয়—যখন নবমী পূজার বলিদান সময়ে গান করে—

শুনহে মহারাজ, এরণে নাহি কাজ,
এ বামা কভু নহে সামান্তে।
চরণে দিতে ভর, ধরা যায় রসাতল,
সসৈন্তে পড় বামার চরণে।

যাহোক একটা কর আর কি।

যা হোক একটা ত করব; কিন্তু পালালে ত হবে না, আরও জিজ্ঞাসা আছে।

আর একটি কথা। হাঁ রে "মা কোথায় গেল"? এই যে জিজ্ঞাসা করে—এ কা'কে করে?

মা'কেই করে; কিন্তু ভিন্নরূপে মা'কে দেখিয়াও দেখেনা তাই করে। তুমিও করিও—সকলকে মা ভাবিয়া ই জিজ্ঞাসা করিও। হাঁ ভাই মা কোথায় গেল। মা হইয়া মা ভজা—হরি হইয়া হরি ভজা বুঝিলে। আর না।

(২)

বরণীয় ভর্গ ও প্রেম।

কাম ও প্রেম কত প্রভেদ! প্রেম আলোক, কাম অন্ধকার। প্রেম স্বর্গ, কাম নরক। প্রেম ঈশ্বর, কাম শয়তান। প্রেম সাধু, কাম চোর। প্রেম প্রেমিক, কাম লম্পট। প্রেম অমরাবতীর পারিজাত, কাম পৃথিবীর পূতিগন্ধভরা আঁইস।

তথাপি ইহাদের সম্পর্ক আছে। ইহাই আশ্চর্য্য। কামের ভিতরে প্রেম, আবার প্রেমের মধ্যে কাম থাকে। প্রেমে কাম থাকে বলিয়া অসংযমী, অসাবধান প্রেমিক কামে পড়িয়া গড়াগড়ি যান; সাপের মাথার মণি তুলিবার কৌশল না জানিয়া মণি আহরণ করিতে গিয়া সর্পদংশনে জর্জ্জরিত হইয়া প্রাণ হারান; আবার কামুকও বিশেষ ঘটনায় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া প্রেমিক হইয়া যান!

বরণীয় ভর্গ ও অবরণীয় ভর্গ—প্রেম ও কাম। বরণীয় ভর্গকে প্রেম বল। ইহা প্রেমের মত ত্রিলোকব্যাপী বটে। আর সেই দীপ্তিশীল, ক্রীড়াশীল পরমপুরুষের শ্রেষ্ঠ তেজও বটে। ইহাকে আশ্রয় করিতে পারিলে, আমাদের মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভও হয় বটে।

ধার্ম্মিকের যাহা হয়, প্রেমিকের কি তাহাই হয়? ধার্ম্মিকের প্রধান বস্তু বৈরাগ্য, প্রেমিকেরও তাই।

স্ত্রীলোক হও, বা পুরুষ হও, যদি কাহাকেও ভাল বাসিয়া থাক—এই ভালবাসাকে কামগন্ধে যদি বিকৃত না করিয়া থাক—এই ভালবাসাকে যদি আত্মসুখের বস্তু বলিয়া গ্রহণ না করিয়া, ইহাতে নিজের দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া, প্রিয়তমের সুখের জন্য ব্যাকুল হও—যদি নিজের কত ক্লেশ হইতেছে না ভাবিয়া সে

আমায় পাইলে কত সুখী হইবে—আমায় পাইয়া সদাই সে কি এক ভাবতরঙ্গে থাকিবে—আমি ভাবনায় পবিত্র, বাক্যে পবিত্র, কার্য্যে পবিত্র হইয়া যখন তাহার কাছে যাইব তখন সে আমায় পাইয়া সমাধিবিরামে সাধকের মত কি যেন কি ভাবে আমায় দেখিবে—লোকসঙ্গে থাকিয়াও কত ভাবে আমায় জানাইবে সে আমার কে—যদি এই ভাবে কামগন্ধশূন্য প্রেম ধরিতে পার তবে তুমিও প্রধান সাধকের মত প্রথমেই বৈরাগ্যবান্ হইতে পারিবে।

যাহাকে ভাল বাসিয়াছ প্রথমে সমস্ত বিশ্বটা যেন সেই হইয়া যাইবে। বিশ্ব নাই, সেই আছে। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে—কত সুন্দর ইহা! সকলেই সে। আমি তারেই দেখি আর কিছুই ত দেখিনা। এই বিপুল বিশ্ব আমার চক্ষে আর ভাসেনা। যদি এই বিশ্বের কথা কেহ কয়—কহিয়া আমারে স্মরণ করাইয়া দেয় তখন দেখি যেন তাহাতেই এই বিশ্ব ভাসিয়াছে। শ্রীভগবান্ বিশিষ্ট ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া বলেন "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি"। প্রেমিকের এই অবস্থা হয়।

মানুষকে সর্ব্বশক্তিমান্ কি ভাবা যায়? প্রকৃত প্রেমিক যে, সে ত মানুষকে মানুষ দেখে না; সে ত শরীরকে বা মনকে ভালবাসে না; সে ত শরীরের রূপ বা মনের গুণকে ঈশ্বর বলে না - সে ভালবাসে শরীর ও মনের যিনি আধার তাঁহাকে; রূপ ও গুণের যিনি আধার তাঁহাকে; যিনি আত্মা, তাঁহাকেই। কাজেই প্রেমিক যদি আত্মাকে ভালবাসিয়া থাকে তবে সে আপন প্রিয়কে—সর্ব্বশক্তিমান্ কেন না বলিবে? যথার্থ প্রেমিক যে, তাহার চক্ষে তাহার প্রিয়—ক্ষুদ্র বস্তু নহে। তাহার প্রিয়ই ঈশ্বর। ইহার কমে তাহার হয় না। ক্ষুদ্র কে—রূপকে বা গুণকে ভালবাসা, প্রেমের ধর্ম্ম নহে—প্রেমের ধর্ম্ম ভূমা। অনন্ত লইয়া থাকা।

প্রেমই যে বরণীয় ভর্গ একবার ভাবিয়া দেখ না। ভারতের বাহিরেও বরণীয় ভর্গ প্রেমরূপে উপনীত হইতেছেন। জগৎ গণিয়া প্রিয় পর্য্যন্ত হইতেছে, কিন্তু তাহার পরই প্রেম কামে পরিণত হইয়া যাইতেছে; প্রিয় এখন পর্য্যন্ত ঈশ্বর হইতে পারিতেছেন না। সাধনা ঠিক মত হইলেই ইহা হইবে।

ঈশ্বর-ভাবনায় প্রধান প্রধান ক্রমগুলি এখানে দিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

(১) সুষুপ্তিতে জগতের অভাব-চিন্তাটি বেশ করিয়া ধারণা করিয়া, সর্ব্বত্রই উহা ভাবনা কর। যেমন রজ্জুতে সর্প নাই, মরুমরীচিকাতে জল নাই—

সেইরূপ ব্রহ্মে জগৎ নাই। তথাপি যখন জগৎ দেখা যায়—তখন যেমন স্বপ্নকালে এটা স্বপ্ন, এটা মিথ্যা, এই ভাবনা করিতে পা'রলে স্বপ্নটা ভাঙ্গিয়া যায় এবং স্বপ্নদৃষ্ট-বস্তু স্মৃতিতে থাকিলেও তাহা দ্বারা প্রকৃত কার্য্য হয় না দেখা যায় সেইরূপ দেহটা মিথ্যা ভাবনা করিয়া জগৎটা মিথ্যা ভাবনা করিয়া ব্যবহারিক কার্য্য করিয়া যাও।

(২) দেহটা নাই, জগৎ নাই ; যত যত আমিতে থাকিবে, তত তত অখণ্ড সীমাশূন্য আপনি আপনির ছায়া নিজের মধ্যে দেখ। জগতের মধ্যে আমি নই, দেহের মধ্যে আমি নই ভাবিয়া—আমির মধ্যে এই ভ্রম দেহ, এই ভ্রম জগৎ ভাবনা দ্বারা আপনি আপনি ভাবে স্থিতিলাভ কর।

(৩) আমার মধ্যে দেহ, আমার মধ্যে জগৎ আমিই বিরাট্ পুরুষ। আমি ব্যাপনশীল বিষ্ণু। বিষ্ণু হইয়া বরণীয় ভর্গকে আলিঙ্গন করিতে করিতে শান্ত হইয়া যাওয়া অথবা বিষ্ণু হইয়া বরণীয় ভর্গ চিন্তা করিয়া, পরমপদের প্রবেশদ্বারে প্রবেশ করিয়া পরমপদে বিশ্রাম করা।

(৪) উগ্রভাবে প্রিয়কে সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া তাহার চিন্তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করা। নিজের মনের ভাব দেখিয়া স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিবে সে আমায় স্মরণ করিতেছে।

যোগপথে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা। সহজ কথায় দাঁড়ায় এই যে প্রাণায়াম দ্বারা চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ করা যোগীর সাধনা। চিত্তকে বিরাট্ ভাবে ভাবিত করা, অবতার ভাবে ভাবিত করা, বা প্রিয়ের ভাবে ভাবিত করা ভক্তের সাধনা। কিন্তু জগৎ মিথ্যা ইহার বিচার দ্বারা চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিয়া—আপনি আপনি ভাবে স্থিতিলাভ করা জ্ঞানীর সাধনা। শেষটিতে সদ্যোমুক্তি অন্যগুলিতে ক্রমমুক্তি।

ব্রজগীতি।

আমি যাব কি স্বজনি, তাহারি দুয়ারে,
সেকিগো ডেকেছে আমারে "আমার" ব'লে ;
ওই নিলাজ বাঁশরী কি যেন কি ভাষে,
অথবা কি জানি সখি, মন বুঝি ছলে।

সেরূপ কালিয়া নিরখিব ব'লে,
দিনে কতবার যাই কত ছলে ;—
গাগরী ভরিতে যমুনার জলে ;
সেতগো সকলি জানে।

এ মোর বাসরসজ্জা প্রীতি-অনুরাগ,
শ্যাম-সাধে কুসুমিত এ মোর কবরী—
সে যদি না হেরে হায়! বৃথা সে সকলি,
যতনে সরমে যাহা রেখেছি আবরি।

ঐ ইঙ্গিতালোক জাগে কি আবার,
বিবশা রমণী করে অভিসার ;
আহ্বান-বাঁশরী জাগে কি তাহার—
মুখরি মধুর তানে?

সখি? যমুনা পুলিনে নীপ তরুতলে
কোথা সে মাধব, কুঞ্জ-কানন বিহারী ;
রাধিকা-হৃদি-রমণ পরশরতন,
চিত্ত গগন-ইন্দু সুন্দর বলিহারি।

(ভবানীপুর)

সেবাধর্ম্ম।

সব আমির আগে সব তুমি—আবার সব তুমির আগে সব তোমার। সব তোমারের ভিতরে সেবাধর্ম্ম। সব তোমার না দেখিলে বুঝি সেবা হয় না। যদি বল হয়, তা বলিব হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিব "রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন"। তেমন প্রাণভরা সেবা হয় না—তেমন অনুরাগে সেবা হয় না। সেবা হয়, কিন্তু সে সেবা কখন হয়—কর্ত্তব্য বোধে—শাস্ত্রে আছে বলিয়া—ধার্ম্মিকেরা বলেন বলিয়া—শুধু বলেন না সাধুরা করেন বলিয়া তাই হয়।

কখন হয়—আশায় ; সেবা করিলে আমার ভাল হইবে এই জন্য হয় ; কখন হয় ভয়ে—সেবা না করিলে তাড়াইয়া দিবে তাই হয়। কিন্তু যে সেবা যথার্থ সেবা সে সেবা কোন কিছুর জন্য নহে ; সে সেবা না করিয়া থাকা যায় না তাই সেবা হয়। সে সেবার কিছুর জন্য নাই সে সেবা অহৈতুকী সেবা। করিবে একটু এই সেবা ?

আগে তাকে একটু ভাল বাস তবেই তার বস্তুও ভাল লাগিবে, তার লোক জন ভাল লাগিবে, তার পশুপক্ষী ভাল লাগিবে, তার বৃক্ষলতা ভাল লাগিবে, তার ছাগল মাছ ভাল লাগিবে—আর কোন কিছুকে মন্দ বলা যাইবে না ; আর কোন কিছুকে অবহেলা করা যাইবে না সব যে তার ! কারে অবহেলা করিব ? কার প্রাণ সংহার করিব। নিজের দেহ রক্ষা জন্য তার কোন কিছু নষ্ট করা—সেত তার প্রাণে ব্যথা দেওয়া মাত্র। ইহাত প্রাণ থাকিতে পারিব না। সবই যে তার—তার বস্তু ! আমার কত আদরের !

এই গৃহ ! এযে তার। তাই ইহা পরিষ্কার রাখিতে ইচ্ছা হয়। সে যে এই ঘরে আসে—ইহা কি যেমন তেমন করিয়া রাখা চলে ? না না তা কি হয় ? সে কি মনে করিবে ! এই যে সব দেহ,—মানুষের দেহ—এমন কি পশুর দেহ, কীটপতঙ্গের দেহ, পক্ষীর দেহ, বৃক্ষলতার দেহ—আহা ! ইহাদের কাহাকেও যে অযত্ন করিতে পারি না। কেন পারি না ? এই সবের মধ্যে যে সে আছে—এই সব যে তার ব্যবহার করা। কিন্তু সে যখন এই সবে অভিমান রাখে না, তখন ত এসব কিছুই ভাল লাগে না। এই সেবাধর্ম্ম। এর ভিতরে সব। বেশী বলা আড়ম্বর।

মা ও মধুর ভাব।

তুমি বল পরিবর্ত্তন—মা হ'তে প্রাণেশ্বর বড় ভারী পরিবর্ত্তন। আমি বলি বড় বেশী নয়। এক কালের পূর্ণ স্বভাব হইতে আর এক কালের পূর্ণ স্বভাবে আগমন।

বালিকাকালে মা'তে প্রাণ ভরিয়া যায়, আবার যুবতীকালে প্রাণেশ্বরে হৃদয় পূর্ণ থাকে ; আর বৃদ্ধাকালে ? বৃদ্ধকালে যা হয় তাতে বলার কেহ থাকে না ; কাজেই তার আলোচনায় কাজ নাই।

রামপ্রসাদ চিরদিন মা মা করিতেন। মনে করা হউক, একদিন কৃষ্ণলীলা হইতেছে। মিলনের পরে বিরহ। এ বিরহ জনে জনের ভিন্ন।

কেহ কাঙ্গালিনী, কেহ উন্মাদিনী। পথে পথে, লতায় পাতায়, ফুলে ফুলে যেন তার চিহ্ন—তাই দেখে আর কাঁদে আর জিজ্ঞাসা করে—কোথায় গেল তা কি দেখেছ? মাধবী তুই যে তার বড় প্রিয়—বল্ আমার মাধব কোথায়?

"আমারে লইয়া সঙ্গে কেলি কৌতুক রঙ্গে
ফুল তুলি বিহরই বনে"।

বন দেখিয়া, ফুল দেখিয়া, সেই সব মনে পড়ে—আর মনে পড়ে "শেজ বিছায়ই—রস পারিপাটীর কারণে"। কেহবা উন্মাদিনী। উন্মাদিনী হইয়া সেই সুন্দর রূপ, সেই সুন্দর ভঙ্গী যখন বর্ণনা করে তখন কত সুন্দর সে সব উক্তি:—

হে দেব! হে দয়িত! হে জগদেক বন্ধো! হে ক্রীড়াশীল! হে দীপ্তিশীল দেবতা! হে আমার প্রিয়! হে জগতের একমাত্র বন্ধু! হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে নাথ। হে রমণ! হে নয়নাভিরাম! আমার দৃষ্টিপথে কখন আসিবে!

অংশালম্বিত বামকুণ্ডলভরং মন্দোন্নতং ভ্রূলতং—তুমি কি এক ললিত ত্রিভঙ্গে দাঁড়াইয়াছিলে! এই বামে হেলা ভঙ্গী—তুমি যে আমাকে বামে লইয়া আমার মুখকমলের অতি নিকটে অধরে মুরলী লইয়া দাঁড়াইয়া ছিলে—আমার বংশীশিক্ষার ছলে কি তত নিকটে দাঁড়ান? কিন্তু কি সুন্দর সেই ভাব। আমি দেখিতেছিলাম তোমার বামকর্ণের কুণ্ডল স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত—আর সেই সুন্দর ভ্রূলতা ঈষৎ উন্নত। কোমল অধরপুট কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত, আর সেই পদ্মপলাশলোচনে তেরছ চাউনি। বড় আনন্দে আলোল অঙ্গুলীপল্লব দ্বারা মুরলিকার রন্ধ্র ধরিয়া পূর্ণ করিতেছ—আর এই মূর্ত্তি! সেই সুধাসাগর মধ্যবর্ত্তী মণিপুর—তন্মধ্যে কল্পতরু! সেই কল্পতরু মূলে এই ত্রিভঙ্গললিত ভঙ্গী—জানি জানি এই মূর্ত্তিত জগমোহন মূর্ত্তি।

হে গোপালক! হে কৃপাসাগর! হে লক্ষ্মীপতি! হে কংসান্তক! হে গজেন্দ্রমোক্ষদাতা! হে মাধব! হে রামানুজ! হে ত্রিজগদ্গুরু! হে পদ্মপলাশলোচন! হে গোপিকাকান্ত! আমি তোমা বিনা জানি না—আমায় পালন কর।

তোমার ললাটদেশে কি সুন্দর কস্তুরি তিলক! বক্ষস্থলে কৌস্তুভমণির কি শোভা! তোমার নাসাগ্রে নূতন মুক্তা, করতলে বেণু, করে কঙ্কণ, সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দন, কণ্ঠদেশে মুক্তামালা! গোপালচূড়ামণি! গোপস্ত্রী পরিবেষ্টিত তুমি—তুমি জয় যুক্ত হও।

আর তোমার বংশীনিনাদ! এই বংশীরবে লোক উন্মত্ত হয়, কর্ণ মুখরিত হয়; বৃক্ষ হর্ষিত হয়; পর্ব্বত দ্রব হয়; পশুপক্ষী বিবশ হয়, গো সমূহ আনন্দিত হয়। তোমার বংশীরবে গোপগোপীর বিলাসবিভ্রম ঘটে, মুনিগণ উচ্ছ্বাস প্রাপ্ত হন, কোকিলগণ কাকলি করে। তোমার বংশীরব ওঁকারের অর্থ উদ্গীরণ করে। হে বালগোপাল! তোমার বংশীধ্বনি জয় যুক্ত হউক।

এই রকমের ভাব—রাসলীলায় শ্রবণ করিয়া কে না মুগ্ধ হয়? রামপ্রসাদও হইয়াছিলেন। তিনি করিতে যান কালী কালী—হয় কিন্তু কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কিন্তু চিরদিন মা মা করিয়া যাঁর ডাকা অভ্যাস, সে আজ গোপিনীদিগের মত কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে কিরূপে? অথচ প্রাণ গোপিনীদিগের ভাবে ভরিয়া গিয়াছে। গোপিনীগণ যে বড় প্রাণ ভরিয়া ডাকিত এত মিষ্ট করিয়া ডাকিতে যে আর কেহ পারে না। রামপ্রসাদ জানিয়াছিলেন রাধা হইয়া কৃষ্ণ ডাক, বড় মধুর।

কালীও ছাড়া যায় না আবার কৃষ্ণও ছাড়েন না—ফাঁফরে পড়িয়া রামপ্রসাদ গান ধরিলেন—

হৃদয় রস মন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।

সব গোল মিটিয়া গেল। কালী, কালা হইলেই সব গোল মিটিয়া যায়।

যে কালী কালা হইতে পারে না, যে মা প্রাণেশ্বর হয় না—সে কালী, সে মা, যেন ঠিক নয়। আমার ভগবান্ কালীও সাজেন, কালাও সাজেন, মা'ও সাজেন, প্রাণেশ্বরও সাজেন। বুঝি প্রেমের ধর্ম্মই এই। এখানে একই সব সাজে, আবার সবই একে উদয় হয়। শ্রীরঘুমণি বিলাপ করিতে করিতে লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন।

কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী ধর্ম্মেষু পত্নী ক্ষময়া ধরিত্রী,
স্নেহেষু মাতা শয়নেষু বেশ্যা রঙ্গে সখা লক্ষ্মণ। সা প্রিয়া মে।

অজবিলাপে পাওয়া যায় গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ। প্রিয় শিষ্যা ললিতা কলাবিধৌ।

তাই বলা হয় – মা সর্ব্বত্র, কিন্তু সর্ব্বত্রের মা একত্র হইলেই প্রাণেশ্বর। মা অনেক হইতে পারে, প্রাণেশ্বর হয় এক। বড় সুন্দর! বড় অদ্ভুত!

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী

শ্রীমতীর ভালবাসা মানুষে বুঝিলেও বুঝিতে পারে। এ প্রেমের নবানুরাগ, পূর্ব্বরাগ, বিপ্রলম্ভ, কলহ ভাব, মানের ভাব, কলহান্তরিতার ভাব, উন্মাদ ভাব—মানুষে ধারণা করিলেও করিতে পারে। ভাব স্থায়ী করিতে পারুক বা না পারুক, ভাব আয়ত্ত করিতে পারুক বা না পারুক—কিন্তু সকল ভাবই যেন কখন না কখন মানুষকে ছুঁইয়া যাইতেও পারে।

এক দিঠা করি ময়ূরা ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণ,
অথবা বসনে বসন মিশিবে বলিয়া
একই রজকে দেয়;
অথবা বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমন যোগিনী পারা,
অথবা আঁধল প্রেম পহিলে নাহি বুঝনু
সো বহু বল্লভ কান;
আদর সাধে বাদ করি তা সহ
অহর্নিশ জ্বলত পরাণ,
অথবা কত কোটি কোটি চন্দ্র চন্দ্রাবলী
ও মুখের তুলনা হয় না;
সে চাঁদ চকোর হ'য়ে, (এই) আছ পদে লুটাইয়ে
বঁধু তা দেখিয়া মনে লাজ পাওনা,
শ্যাম চরণ ছাড়িয়া কেন দাও না।

এ সব যেন মানুষ বুঝিতে পারে—

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রেম! এ প্রেম কি করিয়া মানুষ বুঝিবে? সত্য বটে—

নীল নলিনাভমপি তন্বি! তব লোচনং

ধারয়তি কোকনদ রূপম্—

এই দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কাতর হয়েন, আর শেষে "দেহি পদপল্লব মুদারম্" ইহাও বলেন—এ কিন্তু যেন শ্রীমতীর ভাব শ্রীকৃষ্ণ দেহে আসিয়া ঐরূপে বাহির হয়। শ্রীকৃষ্ণের কি আছে, কি নাই, যেন কিছুই বলা যায় না। শ্রীমতী যখন যেমন, শ্রীকৃষ্ণ যেন তখনই সেইরূপ। শ্রীমতী সর্ব্বদা ভালবাসা লইয়া আছেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শুধু ভালবাসা লইয়াই নাই—তিনি কংসশিশুপালও বধ করেন, আবার পার্থ সারথিও হয়েন, আবার যশোমতীর গোপাল, সখার সখা, রামের অনুজ, কত কি সাজেন। যে যেমন ভাবে তাঁরে চায়, শ্রীকৃষ্ণ যেন তেমনিভাবে রঞ্জিত হইয়া সকলের চিত্ত হরণ করেন।

তবে কি পুরুষ ও প্রকৃতির প্রেম বিভিন্ন প্রকারের?

না—বিভিন্ন প্রকার না হইলেও ভালবাসাই শ্রীমতীর জীবন; কিন্তু ইহা পুরুষের প্রধান অঙ্গ হইলেও—ইহাই জীবন নহে; ইহাতে আরও অনেক আছে। সাধারণ লোকে এই পর্য্যন্ত বলে। কিন্তু অসাধারণ লোকে বলেন পুরুষ যিনি—তিনি কি যেন কি—যেমন ভাবে প্রকৃতি তাঁরে সাজান, তিনি তেমনি সাজেন, আর না সাজাইলে আপনি আপনি। এ সব কথা আর বেশী লেখা গেল না।

আচ্ছা অনুরাগ তবে প্রকৃতির ধর্ম্ম। যেখানে বালিকার স্ত্রীর অনুরাগ এখনও আইসে নাই, সেখানে যুবা স্বামীর অনুরাগ আগে কেন দেখা যায়? এক মাত্র উত্তর—এ অনুরাগটি অন্য স্থান হইতে পুরুষে আসিয়া পড়ে। পুরুষ পরের অনুরাগ লইয়া বালিকার উপরে অকালে ইহা ফুটাইতে যায়, গিয়া বড়ই বিকৃতি করে।

আমরা বলিতেছিলাম পুরুষের প্রেম যদি ক্ষীণ হয়—তাহা হয় কিন্তু প্রকৃতির ব্যভিচারে। প্রকৃতি যদি সমান ভাবে আপন ভালবাসা রাখে, তবে পুরুষ সর্ব্বদা তাহা অনুভব করে। যখন উভয়ে উভয়কে সমান ভাবে রাখিতে পারে তখন বড় সহজেই প্রধান সাধনা সাধিত হইয়া যায়। এই পথ কঠিন হইলেও বড় সহজ—যদি সংযমী কেহ হয়।

২

তাই তোমারে দেখ্‌তে আসি
দেখা দিতে আসিনে।
ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে॥

বেশ করিয়া দেখিলে দেখা যায়, এই গানটিতে কাম ভাবটিই প্রবল। কিন্তু ইহাও আশ্চর্য্য—কাম ও প্রেম অতিশয় বিভিন্ন হইলেও কামের ভিতর দিয়াই প্রেমের উদয় হয়। যেখানে দেখ্‌তে আসা আসি আছে সেখানে কাম; আর যেখানে দেখা দিতে আসা আছে সেখানে যদি জানা থাকে আমায় দেখিলে তোমার আনন্দ হয়—তবে সেখানে প্রেম।

কাম খোঁজে নিজের সুখ, আর প্রেম খোঁজে কৃষ্ণসুখ। যতদিন মনে হয় আমাকে পাইলে সে প্রসন্ন হয়, আমি কাছে গেলে সে যেন ফুটিয়া উঠে ততদিন অনুরাগ ঠিক থাকে। আর যে মুহূর্ত্তে মনে হয় আমাকে না পাইলেও তার চলে, আমি না থাকিলেও তার কোন অভাব থাকে না সেই মুহূর্ত্তে অনুরাগ সরিয়া যায়। এইটি প্রেমের ভুল। প্রেম এমনি বস্তু যে, ইহা কখন পুরাতন হয় না, ইহা কখন ক্লেশ দেয় না, ইহা কখন বিরক্তি আনিতে পারে না। তবু যদি মনে হয় আমি গেলে সে সন্তুষ্ট হয় না তখন জানা যায় প্রেম নাই—ব্যভিচার হইয়া গিয়াছে। তাই ঐরূপ মনে হয়। কিন্তু যেখানে ব্যভিচার নাও হয় সেখানে একটা ভ্রম হয়; শতবার মানুষ দেখে যে, আমাকে পাইলে সে সন্তুষ্ট হয়, তার চক্ষে যেন কত কি ভাসিয়া উঠে; তথাপি যখন মনে করে আমি না হইলেও তার চলে, তখনই সংশয়ে ভ্রম আনয়ন করে। ইহাতেই অনুরাগ শুষ্ক হইয়া যায়।

অনুরাগ শুষ্ক যদি না হয়, অনুরাগ ব্যভিচার যদি না করে, তবে মানুষ কখন মরে না, মানুষ বুঝি বৃদ্ধও হয় না। অন্ততঃ দেহের জরাতে মনের জরা কখন আইসে না। প্রেমিক সদাই নবীন কিশোর, প্রেমিকা নবীনা কিশোরী।

অনুরাগ প্রবল রাখ—তবেই জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবে।

এই অনুরাগ প্রবল রাখার জন্য শ্রীমতী আয়ানের ঘরে আর জটিলা কুটিলার সঙ্গে।

৩

শ্রীমতী উন্মাদিনী। বিরহবিকারে যেন শেষ দশায় আসিয়াছেন। কখন কৃষ্ণকথা, কখন রোদন, কখন হাস্য, কখন মূর্চ্ছা। আবার জাগেন, জাগিয়া অঙ্গের আভরণ খুলিবার চেষ্টা করেন; করিতে করিতে বলেন—

শঙ্খ কর চুর বসন কর দূর,
তোড়ত গজমতি হাররে।
পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে,
যামুন সলিলে সব ডাররে।

কখন মর্ম্মসখীর হাতে ধরিয়া বলেন "আমায় আনিয়া দে"। সখী যখন বলেন "সে যে এত করিল—শেষে 'দেহি পদ পল্লব' কতই বলিল—সে যে ধূলায় লুণ্ঠিত হইল—তখন ত একবার ফিরেও চাইলি না—

হাতক লছমী চরণ পর ডারসি
কৈছে মিলায়ব আনি।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলি বল এখন কি ক'রে তারে আনি।

কথা শুনিয়া শ্রীমতীর অশ্রু শুখাইল। দীর্ঘশ্বাস ঘন ঘন বহিল—শ্রীমতী আবার মূর্চ্ছা গিয়াছেন। এ মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গে না। অনেকক্ষণ গেল। শ্রীমতীর বুঝি অন্তিম দশা।

সখীগণ ব্যাকুল হইল। সখারা বলাবলি করিতে লাগিল :—

আজ হারালাম গো রাই অমূল্য ধনে।
চল সকলে যমুনা কূলে
রাখিয়া তুলসী মূলে
সবে কৃষ্ণ নাম শুনাই রাধার শ্রবণে
রাইয়ের হয়েচে দুর্দ্দশা, দুর্দ্দশার চরম দশা
দুর্দ্দশার বাকী কি তা বল।
আইকে বল' কেবল বিচ্ছেদ বল
শ্যামের আশা পথ ফুরাল এত দিনে।

যমুনা কূলে তুলসী মূলে লওয়া হইল না। এক সখী আসিয়া সংবাদ

দিল আমি কৃষ্ণকে দেখিলাম। রথের উপরে শ্যাম রায়। বুঝি আমাদের আশা পূর্ণ হইল। ঐ শুন বাঁশী বাজে। সকলে শুনিল কৃষ্ণের বাঁশীই বটে।

তখন বড় একটা ব্যস্ততা পড়িয়া গেল। কেহ কুঞ্জের দ্বারে পূর্ণ ঘট রাখিতে গেল, কেহ আম্রশাখা ভাঙ্গিয়া আনিল, কেহ ফুল তুলিতে গেল—আর সকলে বড় উৎসাহে শ্রীমতীর কর্ণে কৃষ্ণ নাম করিতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে শ্রীমতী চক্ষু মিলিলেন। চারিদিকে মঙ্গল চিহ্ন দেখিলেন। সেই সময়ে বাঁশী আবার বাজিল। শ্রীমতী বিষন্ন হইলেন। হইয়া বলিলেন এ আয়োজন, কার তরে করিতেছ?

কেন বাঁশী কি শুনিতেছ না? শ্রীমতী উঠিয়া বসিয়াছেন। বলিতেছেন এ বাঁশীত কৃষ্ণের বাঁশরী নয়। "সে বাঁশীতে আঁখি মম পুরিত সন্ধান" সে বাঁশীতে আমার স্তন শিহরিত—এ বাঁশী সে বাঁশী নয় এ বাঁশীতে আমার পয়োধরে ক্ষীর সঞ্চার হইতেছে। শ্রীমতী বলিতেছেন—তোরা এত উতলা কেন হইলি? বুঝি কোন ভক্ত আসিতেছে।

শ্রীমতী আর কিছুই বলিলেন না এমন সময়ে উদ্ধব আসিলেন। আমরা উদ্ধব সংবাদ আর এখানে দিলাম না।

৪

শ্রীকৃষ্ণ দূতি পাঠাইয়াছেন। দূতি কিন্তু শ্রীমতীর। শ্রীমতীর দূতিই আজ কৃষ্ণ দূতি।

দূতি আসিল। শ্রীমতী দূতিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। এ আলিঙ্গন বড়ই স্বাভাবিক পরে কৃষ্ণ কথা আরম্ভ হইল। তখন দূতি বলিল শ্রীকৃষ্ণ ভাল আছেন সংবাদ দিয়াছেন—আর শ্রীমতী কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

হরি! হরি! করিয়া শ্রীমতী কপালে কঙ্কন ঠুকিলেন। কতক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন "আমার কি কপাল ভাঙ্গিল"?

শ্রীমতী বড়ই বিষন্ন। আর কিছুতেই যেন প্রবোধ মানেন না। শ্রীমতী বলিতে লাগিলেন—সখি! আমার ত এদিন ছিল না। তোরা ত সব জানিস্। আমার কি না ছিল?

লাজ ভয় হেমাগার গুরু গৌরব সংহ দ্বার
ধর্ম্মের কবাট ছিল তায়।

আমিত কুলের কুলবতী ছিলাম। আপনি আপন গরবে আপনি গরবিনী

ছিলাম। বল্ আমার কি না ছিল? এই যৌবন গর্ব্ব? আমার—"ধৈর্য্যশালে মত্ত হাতী বাঁধা ছিল দিবা রাতি" তোরা ত সব জানিস্—বল্ আমার ধৈর্য্যের কাছে কার ধৈর্য্য ছিল? আর আমার লজ্জা? আর গুরুজনের ভয়?

এখন আমার কি আছে? গুরুগঞ্জন? সে আমার কাছে "চন্দন অঙ্গভূষা।" আমি যে তার তরে কত আদর করে তা অঙ্গে মেখেছি।

এমন রূপের ফাঁদ ফাঁদিতে তারে কে বলিয়াছিল? সেই হাসি—সেই অঙ্গছটা। আহা!

নন্দের দুলাল চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছলে কদম্বের মূলে।
দিয়া হাস্য সুধাচার অঙ্গছটা আঠা তার
আঁখি পাখী তাহাতে পড়িল॥
আঁখিতে আঁখি মিলিল--আর
মনোমৃগী হেন কালে পড়িল রূপের জালে
শূন্য দেহ পড়িয়া রহিল।

আর যে ধৈর্য্যশালে আমার যৌবন—আমার এই মত্তহাতী—দিবারাতি বাঁধা ছিল—সেই মত্তহাতী আজ ক্ষিপ্ত হইল কটাক্ষ অঙ্কুশে॥

আজ তার দন্ত শিকল কোথায় গেল - সে যে শিকল কাটিয়া পলাইয়াছে। লজ্জা ভয়ের হেমাগারে গুরুগৌরব সিংহ দ্বার। তাতে ধর্ম্মের কবাট আঁটা। কিন্তু সেই বংশীরব—সখি! কি বলিব! বংশীরব লোকের কাছে কত মধুর! আর আমার কাছে? আমার কাছে—

বংশীরব বজ্রাঘাতে পড়ি গেল অকস্মাতে
সমভূমি করিল আমায়।

এমন কার হয়? বংশীরবে ব্রজাঘাত কার হয়? সেই বজ্রাঘাতে হেমাগার সিংহদ্বার ধর্ম্মের কবাট সব সমভূমি হইয়া গেল। কালীয় কটাক্ষ বাণে—আর কুলশীল কিছুই ত নাই। সেই! আমার ব্রজবাস ত উঠিয়াই ছিল এখন কেবল প্রাণই বাকী আছে।

অবশেষে প্রাণ বাকী—তাও বুঝি যায় সখি! সখিরা এদুঃখ বুঝিয়াও বুঝিল না। কৃষ্ণ সংবাদ দিয়াছেন—কেমন আছে জানিতে চাহিয়াছেন—সে কথায় শ্রীমতীর এদুঃখ কেন হইল? কেন শ্রীমতী কপালে কঙ্কন আঘাত

করিলেন? কেনই এ বিলাপ গাথা গাহিলেন? লোকে প্রিয়জনের সংবাদ পাইলে কত সুখী হয়—কিন্তু এখানে এমন কেন হইল? সখীরা নানা কথা পাড়িলেন? সুখের সংবাদে দুঃখ কেন আসিল?

শ্রীমতী তখন বলিতে লাগিলেন,—সই! সে দিনের কথা স্মরণ করিতেও আমি কি হইয়া যাই। সেই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম—সেই "শারত চাঁদ ফাঁদই মুখমণ্ডল"—আর সেই "নটখঞ্জন দিঠিজোর"—আর কি বলিব! আমিত একবার মাত্র চাহিয়া ছিলাম। হায় সে দিনের কথা আর কি বলিব?

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গী ভেল।

সেই নয়ন ভঙ্গীতে প্রথমেই "রাগ" উদয় হইল। সে রাগের কি বর্ণনা হয়? আমি যখন বড়ই ব্যাকুল হইলাম,যখন কেবলই যমুনায় যাইতাম—আর বলিতাম। "আমি আনা জল ঢেলে ঢেলে আর কতই বা যাব মা" যখন আমার এই দশা তখন সেওত সব জানিতে পারিত, সেওত সেইরূপ ব্যাকুল হইত। সেওত প্রখর রৌদ্রকিরণে উত্তপ্ত পর্ব্বত কোণে দুই প্রহরে আমার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিত। সে "রাগ"ত তাহারও ছিল। সেত দুঃখে সুখ বোধ করিত। আমি যখন তার জন্য অভিসার করিতাম, যখন—

বঁধুর সরস দরশ লালসে
যাইতাম যবে নিকুঞ্জ নিবাসে
তখন চরণে বেড়িত বিষধর কত
হইত নুপুর জ্ঞান গো।

বল্ সখি! আমার তখন কি কোন ভয় ছিল? কোন দুঃখ কি তখন হইত? হায় সখি! তার ভাবে দুঃখ ও যে সুখ হইয়া যাইত।

এই যে অনুরাগ সে অনুরাগ আমার—

অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।

আর সেই রাগ আমায় এমন করে যাহাতে আমার মনে হয়:—

ন সো রমণ হম্ নহ রমণী
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি।

হায় সখি! কে যেন আমাদের উভয়ের মনে প্রবেশ করিয়া দুই মনকে

এক করিয়া দিয়াছিল। দুই দেহে এক মন ছিল আমি সত্যই সত্য দেখিতাম। আমি রমণী নই সেও রমণ নহে।

এ সখি! সে সব প্রেম কাহিনী
কাণু ঠামে কহবি বিছুরল জানি॥

কাণু কি সে সব ভুলিয়াছে? তখন ত আমরা কেহই দূতি খুজী নাই—আমাদের মিলনের জন্য অন্য কিছুই আবশ্যক হইত না—পঞ্চবান আমাদের মিলনে মধ্যস্থ ছিল।

না খোঁজলু দোতী না খোঁজলু আন
দুহুঁক মিলনে মধত পাঁচবান।

কৈ তখন ত কোন দূতির আবশ্যক ছিল না। আর এখন আমি কেমন আছি এ সংবাদ কাণু সর্ব্বদা পায় না? তবে কি সেই অনুরাগ আর নাই? সেই রাগ কি বিরাগ হইয়া গিয়াছে যে তুই দূতি হইয়াছিস্। হায়! সুপুরুষের প্রেমের কি এই রীতি!

অব সোই বিরাগ তুঁহু ভেল দূতি।
সুপুরুষ প্রেমক ঐছন রীতি॥

বলিতে বলিতে কমলিনীর ভাব বিপর্য্যয় ঘটিল। না না সেত নিঠুর নয়। ঐ দেখ কুঞ্জের দ্বারে কি ভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

শ্রীমতীর মেঘ দেখিয়া কৃষ্ণ ভ্রম হইয়াছে। এমন কতবার হইত। কখন কৃষ্ণ দেখিয়া মেঘ ভ্রম হইত। কখন কৃষ্ণকে কোলে রাখিয়া তাঁহাকে সখী ভাবিয়া কৃষ্ণের কথা কহিতেন। এ বড় অপূর্ব্ব! বিরহ এত প্রবল ভাবে শ্রীমতীর অন্তরে রাজত্ব করিত যে কৃষ্ণ প্রাপ্তিতেও কৃষ্ণ ভুল হইয়া যাইত। কৃষ্ণকে সখী মনে করিয়া কতবার কৃষ্ণের কথা কহিতেন—কৃষ্ণ! কত আদর করিয়া কপোল ধরিয়া বলিতেন—"আমি যে"। শ্রীমতী চমকিয়া লজ্জা পাইতেন। আজ মেঘ দেখিয়া কৃষ্ণ ভ্রম হইয়াছে। শ্রীমতী মেঘ দেখিতে দেখিতে মেঘ দেখিতেছেন না। ভুল হইয়া গিয়াছে। মনে করিতেছেন কৃষ্ণ কুঞ্জের দ্বারে কি যেন কি মনে ভাবিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

শ্রীমতী বলিতে লাগিলেন :—

ঐই গানটি বলিবার জন্যই আমরা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতীর অবতারণা করিয়াছি। যোগী হও বা বেদান্তের পণ্ডিতই হও আর সাংখ্যজ্ঞানীই হও আর যে হও

যতদিন না একে স্থিতিলাভ হইতেছে ততদিন ভক্তি চাইই। আর যতদিন ভক্তি চাই ততদিন শ্রী কৃষ্ণকমল গোস্বামীর এই গানটিও চাই। হৃদয়-কমল পর্য্যন্ত সাধনায় দেখিতে পাইতে পার কিন্তু হৃদয়-কমলে সে যদি শ্রীপদ না দিয়া উপবেশন করে তবে কি ধ্যান করিয়া তারে আনা যায়? তাই এস এস বলিয়া তারে ডাকিতে হয়। এস আমি হৃদয়-কমল তোমার জন্য সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছি। তোমার ভয় নাই—তোমার বিরহে তাপিত আমার এই হৃদয়। তোমার চরণ-কমল যে কোটিশশি তুল্য শীতল—শীতল হইতেও শীতল। এস সখা—আমার তাপিত-হৃদয়-কমলে তোমার কোটিশশি শীতল চরণ-কমল একবার দাও—আমি তোমার পরশে শীতল হই। আবার বলি এই গানটির জন্য আমরা এই কথা পাড়িয়াছি। গানটি এই :—

শ্রীমতী মেঘকে কৃষ্ণ ভ্রম করিয়া বলিতেছেন :—

কি ভাবিয়ে মনে দাঁড়ায়ে ওখানে
একবার—একবার নিকুঞ্জ-কাননে
কর পদার্পণ।
একবার আসিয়ে সমক্ষে, দেখিলে স্বচক্ষে
জানবে—আমরা কত দুঃখে রেখেছি জীবন॥
ভাল ভাল বঁধু ভালত আছিলে
ভাল ভাল সময় এসে দেখা দিলে
আর ক্ষণেক পরে দেখা দিতে যদি সখা
হত না—দেখা হ'ত না
তোমার বিরহেতে (সবার) হ'ত যে মরণ॥
আমার মতন তোমার অনেক রমণী
তোমার মতন আমার তুমি গুণমণি।
যেমন দিনমণির কতই কমলিনী
কমলিনীগণের একই দিনমণি।
নেত্র পলকে যে নিন্দে বিধাতারে
এত ব্যাজে দেখা সাজে কিহে তারে।
বঁধু যা হোক দেখা হল, দুঃখ দূরে গেল
যা হ'ক হে—এখন গত কথার আর নাহি প্রয়োজন॥

হৃদয় কমলে রাখিয়ে শ্রীপদ তিল আধ ব'স ব'স হে শ্রীপদ
না সেবিয়ে পদ হল যে বিপদ
সে বিপদ ঘুচিবে সেবি পদ
যদ্যপি বিরহে তাপিত হৃদয়
তাহে তাপিত না হবে পদ দ্বয়
কোটি শশী শীতল হতেও সুশীতল
তব পদতল পরশেতে শীতল
হইব এখন ॥

লোকে নিন্দা না করে এবং শাস্ত্রবিরোধী না হয় এইরূপ যথা সম্ভব জীবিকাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া ভোগের গন্ধ পর্য্যন্ত ত্যাগ কর।

সমস্ত উদ্বেগ ত্যাগ করিয়া সম্ভবমত উদ্যোগ দ্বারা সাধুসঙ্গ রত ও সৎশাস্ত্র পরায়ণ হও। ইহাই প্রথম।

যে মহামতি বিচার দ্বারা আপনার আপনি আপনি ভাব পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার প্রতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, শঙ্করাদি দেবতাগণ অনুকম্পা করেন।

রাম—এখন বলুন সাধু কে এবং সৎশাস্ত্রই বা কি?

দেশে যং সুজনপ্রায়া লোকাঃ সাধুং প্রচক্ষতে।
স বিশিষ্টঃ স সাধুঃ স্যাৎ তং প্রযত্নেন সংশ্রয়েৎ ॥ ২০ ॥
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং প্রধানাং তৎ কথাশ্রয়ম্।
শাস্ত্রং সচ্ছাস্ত্রমিত্যাহুর্ম্মুচ্যতে তদ্বিচারণাৎ ॥ ২১ ॥

দেশের মধ্যে সজ্জন লোকেরা যাঁহাকে সাধু বলেন, তিনি যদি জ্ঞানবৈরাগ্যাদি গুণবিশিষ্ট হয়েন, তবেই তিনি সাধু।

আর অধ্যাত্মবিদ্যাই বিদ্যার প্রধান, সৎশাস্ত্রই শাস্ত্র। অধ্যাত্মবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ কর, সৎশাস্ত্র অবলম্বন কর। ইহাদের বিচারে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

যেমন কতক ফল ঘসিয়া জলে দিলে জল নির্ম্মল হয় এবং যোগাভ্যাসে বুদ্ধির মালিন্য দূর হয়, সেইরূপ সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র জনিত বিচার দ্বারা অবিদ্যা দূর হয়—বিদ্যাবিরোধী রাগাদির নাশ হয়। অবিদ্যানাশেই বিদ্যা প্রকাশ হয়। ইহাই সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি।

---

৭ সর্গঃ।

জগদাদি দৃশ্যাসত্তা প্রতিজ্ঞা।

রাম—

য এষ দেবঃ কথিতো যস্মিন্ জ্ঞাতে বিমুচ্যতে।
বদ কাসৌ স্থিতো ব্রহ্মন্ কথমেনমহং লভে ॥ ১ ॥

হে ব্রহ্মন্! যে দেবের কথা বলিলেন—যাঁহাকে জানিলে মুক্তি হয়—

তিনি কোথায় থাকেন বলুন? কিরূপেই বা আমি তাঁহাকে লাভ করিব?

বশিষ্ঠ—তিনি দূরে অবস্থিত নহেন। নিত্যই শরীরে বাস করেন। তিনি চিন্ময়।

এষ সর্ব্বমিদং বিশ্বং ন বিশ্বং চৈব সর্ব্বগঃ ॥ ৩ ॥

ইনি এই সমস্ত বিশ্ব। বিশ্ব কিন্তু এই সর্ব্বগ পুরুষ নহেন। কারণ,

বিদ্যতে হ্যেষ এবৈকো নতু বিশ্বাভিধাস্তি দৃক্ ॥ ৩ ॥

ইনিই একমাত্র আছেন। বিশ্বনামক পৃথক্ দৃশ্য নাই।

চিন্মাত্রমেষ শশিভৃচ্চিন্মাত্রং গরুড়েশ্বরঃ।
চিন্মাত্রমেব তপনশ্চিন্মাত্রং কমলোদ্ভবঃ ॥ ৪ ॥

এই চিন্মাত্র দেবই এই চন্দ্রশেখর মহাদেব, এই চিন্মাত্র দেবই এই গরুড়েশ্বর বিষ্ণু, এই চিন্মাত্র দেবই এই সূর্য্য, এই চিন্মাত্র দেবই এই কমলযোনি ব্রহ্মা। সেই এই সমস্ত।

রাম—বালা অপি বদন্ত্যেতৎ যদি চেতন মাত্রকম্।
জগদিত্যেব কৈবাত্র নাম স্যাদুপদেশতা ॥ ৫ ॥

জগৎ যদি চেতনমাত্রই হয়, তবে বালকেও তাহা জানিতে পারে। যাহা আপনা আপনি জানা যায় তাহার উপদেশের আবশ্যক কি?

বশিষ্ঠ—ব্রহ্মই জগৎ। জগৎটা ব্রহ্ম নহে—ইহা কিন্তু অনুভব করা চাই। জগৎকে যদি চেতন মনে করিয়া থাক, তবে সংসার-মুক্তির কোন উপায়ই পাও নাই। বিশ্বই চিন্মাত্র, কেবল চেতন ইহা যদি জানিয়া থাক, তবে দৃশ্যজ্ঞান নাশ বা অজ্ঞান নাশ বা জগৎ-মরীচিকা-ভ্রান্তি নাশের কোন উপায়ই পাও নাই। কেন তাহা শ্রবণ কর।

চেতনং রাম সংসারো জীব এষ পশুঃ স্মৃতঃ।
এতস্মাদেব নির্যান্তি জরামরণভীতয়ঃ ॥ ৬ ॥

অনিত্য মনোবৃত্তি প্রতিফলন চিৎপরিগ্রহে তদাশ্রয়ভূতমন্তঃকরণমেবাত্মতয়া গৃহ্নং স্তদাত্মা জীব উক্তঃ স্যাৎ। স চ বহির্মুখতয়া বিষয়ানেব সারতয়া পশ্যন্ পশুঃ। এতস্মাদেব দেহেন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়বাসনানুসারাৎ তত্তদ্দেহপরিগ্রহে জরামরণাদয়োঽবস্থা নির্যান্তীষাবির্ভবন্তীবেত্যর্থঃ।

অখণ্ড চিন্মণিই 'একমাত্র পরিপূর্ণ চৈতন্য। আকাশ যেমন সর্ব্বত্র

পরিপূর্ণ ভাবে অবস্থিত, সেইরূপ চৈতন্য সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ। চৈতন্যই পূর্ণ—পূর্ণে অন্য কোন কিছু থাকিবার স্থান কোথায়? তবেই এই বিশ্ব আর কোথায় থাকিবে? মরীচিকাতে যেমন জল ভ্রম হয়, সেইরূপ পূর্ণচৈতন্যে এই জগৎ ভ্রম উঠিয়াছে। পরিপূর্ণ আত্মাতে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন ভাসিয়া থাকে। মনও অনিত্য, মনোবৃত্তিও অনিত্য। অনিত্য মনোবৃত্তি দ্বারা চৈতন্য খণ্ডমত বোধ হয়। অনিত্য মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন যে চিৎ—সেই চিৎ আপনার অখণ্ডরূপ ভুলিয়া যখন আপন আশ্রয়ভূত অন্তঃকরণকেই আমি বলিয়া বোধ করেন, তখন সেই স্বরূপবিস্মৃত অনাত্মরূপ পরিধৃত আত্মাই জীবরূপে কথিত হয়েন। এই জীবাত্মা বহির্ম্মুখ বলিয়া, বিষয়কে সারবস্তু বলিয়া দেখেন। সেই জন্য ইনি পশু। দেহ ইন্দ্রিয় বিষয় বাসনা অনুসরণ হেতু—ইঁহার যে দেহ গ্রহণ হয়, তাহাতে জরামরণাদি অবস্থার আবির্ভাব হয়। আকাশ আপনার পূর্ণ ভাব ছাড়িয়া যখন আপন মিথ্যাখণ্ড স্বরূপ আধার ঘটকেই আমি বলিয়া বোধ করেন, তখন ঘটের সৃষ্টি স্থিতিলয় হওয়াকেই মনে করেন আমার জনন মরণ হইতেছে। আকাশের সহিত ঘটের কোন সম্পর্ক নাই, তথাপি ঘট ভাঙ্গিলেই আকাশ ভাঙ্গিল মনে হওয়াই অজ্ঞান; ভ্রান্তি।

বাস্তবিক যাঁহার মূর্ত্তি নাই, যাঁহার শরীর নাই—তিনি শরীরকে, মূর্ত্তিকে আমি ভাবনা করেন বলিয়া জরামরণাদি দুঃখ প্রাপ্ত হয়েন।

রাম—আশ্চর্য্য প্রহেলিকার মত সমস্ত বোধ হয়। পুনঃ পুনঃ জ্ঞানের বিচার আপনি শুনাইতেছেন। আমিও বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। তথাপি যাহার জন্য বিচার করিতেছি, তাহাই ভুলিয়া যাইতেছি। আমি কে, জগৎ কি—ইহাই না জানিবার বিষয়? কিন্তু আমি কে এসম্বন্ধে কতটুকু অনুভব হইতেছে?

বশিষ্ঠ—রাম! আমি কে ইহা বুঝাইবার জন্যই আমি দৃশ্যদর্শন যে ভ্রান্তি মাত্র ইহা তোমার ধারণায় আনিতে চেষ্টা করিতেছি। "আমি কে" এই প্রশ্ন তুমি সর্ব্বদা মনে জাগ্রৎ রাখিয়া আমার কথা শ্রবণ কর।

রাম—"আমি কে" এই প্রশ্ন সর্ব্বদা মনে না রাখিয়া, যোগবাশিষ্ঠ আলোচনা করি বলিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইতেছি। আমি কে এই সম্বন্ধে আর একবার আলোচনা করিয়া বলিব?

বশিষ্ঠ—বল।

রাম—আমি কে? ইহার স্থূল উত্তরে বলি—বাল্যকাল হইতে যে কত দেখিয়াছে, শুনিয়াছে, চলিয়াছে, ফিরিয়াছে, স্পর্শ করিয়াছে, স্বাদগ্রহণ করিয়াছে আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়াছে, এখনও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম করিতেছে, আরও করিবে—এক কথায় বাল্যকাল হইতে যে কত ভাবিয়াছে, ভাবিতেছে, কথা কহিয়াছে, কহিতেছে; কর্ম্ম করিয়াছে, কর্ম্ম করিতেছে; ভাবনা, বাক্য ও কর্ম্ম যে কতই করিয়াছে, করিতেছে;—সেই আমি।

বশিষ্ঠ—ভাবনা, বাক্য ও কর্ম্ম যিনি করিতেছেন তিনি আমি বটে, কিন্তু ইহাই আমির সম্পূর্ণরূপ নহে। ভাবনা, বাক্য ও কর্ম্ম এই আমি দ্বারা কৃত না হইলেও একটা মিথ্যা অহং অভিমানে যেন আমি করিতেছি বোধ হয়। আমি যিনি তিনি ভাবনা, বাক্য ও কর্ম্মের অভাবকেও জানেন।

রাম—আমি তাহাই বলিতে যাইতেছিলাম। যিনি ভাবনা করেন এবং করেন না—যিনি কথা কহেন এবং কহেন না—যিনি কর্ম্ম করেন এবং করেন না—তিনিই আমি।

"আমি দেখিতেছি" ইহাতে যেমন আমির অনুভব হইতেছে "আমি দেখিতেছিনা"—ইহাতেও সেইরূপ আমির অনুভব আছে। সেইরূপ সমস্ত ভাবনা, সমস্ত বাক্য এবং সমস্ত কর্ম্ম করার সময় এবং না করার সময় অথবা ভবিষ্যতে করিতে পারি এই সময়ও আমির অনুভব আছে। এই আমির অনুভবটি একটি অখণ্ড বস্তুর আভাস দিতেছে। কোন একটি বস্তু দেখিবার সময় সেই অখণ্ড আমি যেন খণ্ডিত হইয়া বস্তুটি দেখিতেছে। কারণ দেখিবার সময়ে, আমি দেখি না, আমি ভবিষ্যতে দেখিতে পারি—এইগুলি ভুল হইয়া যায় বলিয়াই, কর্ম্ম করিবার সময় আমি খণ্ডমত হয়। কিন্তু কর্ম্মে যিনি কর্ম্ম না করাও দেখেন, তিনিই জ্ঞানী। অর্থাৎ ভাবনা, বাক্য ও কর্ম্মে যিনি ভাবনাশূন্য অবস্থা, বাক্য না কওয়া অবস্থা, কর্ম্ম না করা অবস্থা বা অকর্ম্ম বা বিশ্রাম দেখেন—তিনি সকল কর্ম্ম করিয়াও কিছুই করেন না। ইনিই জ্ঞানী। আর যাহারা পূর্ণ আমির স্বরূপ বিস্মৃত হয়, তাহারাই নানা দুঃখ ভাজন হইয়া পড়ে।

বশিষ্ঠ—হাঁ, ইহা আমির অনুভব বটে। এই বিষয় আরও পরিষ্কার হইবে। হইলে বুঝিবে-দৃশ্য দর্শনে দৃশ্য অদর্শন বা বিশ্রাম আছে। এখন যাহা বলিতেছিলাম শ্রবণ কর।

পশুরজ্ঞোঽহমূর্ত্তোপি দুঃখস্যৈবৈষ ভাজনম্।

চেতনত্বাচ্চেতনীয়ং মনোঽনর্থঃ স্বয়ং স্থিতঃ ॥৭

পূর্ব্বে বলিলাম, যিনি মূর্ত্ত স্থূল শরীরাদির অতিরিক্ত, তিনি যখন আপনাকে স্থূলশরীরাদির অভিমানী মনে করেন—তখনই তাঁহার জরামরণাদি প্রত্যয় সিদ্ধ হয়। "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত" এই শ্রুতিবাক্য তখন ভুল হইয়া যায় বলিয়াই—তিনি পশু, তিনি অজ্ঞ, তিনি দুঃখের ভাজন।

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই দেহত্রয় রহিত হইয়াও, শুদ্ধ চৈতন্যরূপ হইয়াও, ইনি যখন আপন চেতনা দ্বারা দীপ্ত অতএব চেতনবৎ আপনার যে মন সেই মনোরূপী বলিয়া অভিমান করেন—আপন স্বরূপ ভুলিয়া আমি মন, আমি দেহ এইরূপ অভিমান যখন ইহাঁর হয়—তখন ইনি দুঃখশূন্য হইয়াও সকল দুঃখ ভাজন হয়েন।

জীব নিজ-চৈতন্য দীপ্ত মনে অবস্থিত থাকাতেই বৃথা অনর্থ অনুভব করে।

চেত্যনির্ম্মুক্ততা যা স্যাদচেত্যোন্মুখতাথবা।

অস্যা সা ভরিতাবস্থা তাং জ্ঞাত্বা নানুশোচতি ॥ ৮ ॥

বিষয়শূন্য অবস্থা অথবা ব্রহ্ম-মুখতা অবস্থাই হইতেছে মনের ভরিতাবস্থা। ইহা জানিলে শোক থাকে না। চিৎটি হইল আপনি আপনি ভাব। চিৎ হইতে স্বভাবতঃ যে ঝলক উঠে—যাহাকে সঙ্কল্প বলে—সেই ঝলকজড়িত চিৎ অথবা বিম্বক্রোড়ীভূত প্রতিবিম্ব অথবা সঙ্কল্পজড়িত চৈতন্য যখন আপনি আপনি ভাবে না থাকিয়া ঝলকে অভিমান করেন,—করিয়া যাহা দেখেন, তাহার নাম চেত্য। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ—এই বিষয়কে চেত্য বলে। দেহ মন এই সমস্তই চেত্য। এক কথায় প্রকৃতি বা অনাত্মা যাহা—আত্ম ভিন্ন অন্য যাহা কিছু তাহাই চেত্য। আত্মা যখন অনাত্মাতে আত্মত্ব স্থাপন করেন, তখনই হয় সংসার। আর আত্মা যখন চেত্যভাব ত্যাগ করেন—করিয়া অচেত্য অর্থাৎ আপনি আপনি ভাবের দিকে ফিরেন, তখন ইঁহার ভরিতাবস্থা হইতে থাকে। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলেন" সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এব আনন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ। যে অবস্থাতে ভগবান্ আত্মা কোন কাম বা পদার্থ বা চেত্য ইচ্ছা করেন না এবং কোন স্বপ্নও দেখেন না, তাহাই সুষুপ্তি। সুষুপ্তি সময়ে বিশ্বপ্রপঞ্চের বস্তু সমূহের পৃথক্ পৃথক্ বোধ থাকে না। কুয়াসায় আচ্ছন্ন হইলে নানা আকার বিশিষ্ট

বস্তুসমূহ যেমন একাকারে প্রতীত হয়, সেইরূপ এক—অজ্ঞান তমোগ্রস্ত হওয়ায় দ্বৈত ভান থাকে না, নানাপ্রকার বস্তুর নানাপ্রকারত্ব থাকে না ; একীভূত হইয়া যায়। এই জন্য প্রাজ্ঞ পুরুষকে একীভূত বলা হয়। ইনি প্রজ্ঞানঘন। জাগ্রৎ স্বপ্ন কালে নানা প্রকার বস্তুর নানা প্রকার জ্ঞান থাকে, আর সুষুপ্তিতে নানা বস্তুর জ্ঞান মিশ্রিত হইয়া একভাব ধারণ করে ; জাতি, গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদির পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান থাকে না। এজন্য সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে প্রজ্ঞানঘন বলে। বহু প্রকারের জ্ঞান ঘন হইয়া বা মিশ্রিত হইয়া একাকার ধারণ করে, এই জন্য ইনি প্রজ্ঞানঘন। ইনি আনন্দময়। বিষয় বা চেত্য অনুভবের কোন আয়াস—কোন ক্লেশ নাই ; সর্ব্বদুঃখের অভাব এই সময়ে, তাই আনন্দময়। নিরায়াস বলিয়া অদুঃখীমত—তাই আনন্দময়।

ইনি আনন্দভুক্। আনন্দের ভোক্তা ইনি। নিরায়াস পদ লাভ হইলে লোকে যেমন সুখ ভোগ করে, সেইরূপ বিষয় অনুভবের কোন আয়াস পর্য্যন্ত নাই বলিয়া ইনি আনন্দভুক্।

এই অবস্থায় ইনি চেতোমুখ। আত্মা যখন অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় কোষ হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দময় কোষে অবস্থান করেন অথবা যখন ইঁহার গন্ধাবরণ, রসাবরণ, তৈজসাবরণ, বায়বীয় আবরণ, ব্যোমাবরণ অহং আবরণ, মহত্তত্ত্বাবরণ লয় হইয়া যায়, কেবলমাত্র কারণ শরীর বা অজ্ঞানাবরণ থাকে তখন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্বরূপানন্দ স্ফুরণ হয়। আনন্দভোগের দ্বার, এই সময়ে খোলা হইয়া যায় বলিয়া ইনি চেতোমুখ।

বিষয়ানন্দ ভোগের দ্বার ইন্দ্রিয়সমূহ। স্বরূপানন্দ ভোগ জন্য কোন ইন্দ্রিয় নাই। এই জন্য সর্ব্বেন্দ্রিয় রুদ্ধ হইলে যখন পঞ্চাবরণ বা সপ্তাবরণ লয় হয়, তখন অজ্ঞানাবরণ থাকিলেও আনন্দভোগের দ্বার কথঞ্চিৎ খোলা হয় বলিয়া ইনি চেতোমুখ। ক্রমে যখন তুরীয় অবস্থায় স্থিতিলাভ করেন, তখন সেই অচেত্যোন্মুখতাই ভরিতাবস্থা বা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহা জানিলে আর কোন শোক থাকে না। চেত্যনির্ম্মুক্তভাই মুক্তি। আর অচেত্যোন্মুখতাই সমাধি।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ৯ ॥

তস্য চেত্যোন্মুখত্বস্ত চেত্যাসম্ভবনং বিনা।
রোদ্ধুং ন শক্যতে দৃশ্যং চেত্যং শ্যাম্যতি বৈ কথম্॥ ১০॥

মূল অজ্ঞান নাশ হইলে তৎকার্য্য যে অন্তঃকরণতাদাত্ম্যাধ্যাস লক্ষণ হৃদয়-গ্রন্থি—এই হৃদয়গ্রন্থির তখন নাশ হয়। হৃদয়গ্রন্থির নাশ হইলে তাহার মূল যে সংশয় সকল—সেই সংশয় সকলের নাশ হয়। পরাবর পরমাত্মার দর্শন হইলে হৃদয়গ্রন্থির নাশ হয়, সংশয় সকল দূর হয় এবং সঞ্চিত কর্ম্ম সকল ক্ষয় হয়। ভাবিতে পার যে চিত্তটাকে নিরোধ করিলেই ত চেত্য দর্শন থাকে না। না তাহা হয় না। যতদিন দৃশ্যবস্তু থাকিবে, ততদিন চেত্যোন্মুখতা রোধ করা যাইবে না। দৃশ্য সকল মিথ্যা, দৃশ্য সকল ভ্রান্তির পরিণাম এই বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই চিত্তের চেত্যোন্মুখতা রোধ হইবে না। যোগের দ্বারা চিত্ত নিরোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু যোগ ভাঙ্গিলে আবার যাহা তাহাই থাকিবে। ইহাতে মোক্ষ কিরূপে হইবে? তাই বলা হয়,—

অচেত্য চিৎস্বরূপং যৎ তচ্চাসম্ভবনং বিনা।
ক্ব স্বরূপোন্মুখত্বং হি কেবলং চেত্যরোধতঃ॥ ১২॥

রাম—যাঁহাকে না জানায়—অর্থাৎ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া না জানিয়া জীব বলিয়া জানায় সংসার-দুঃখ জন্মিতেছে—সেই জীব কিরূপ?

বশিষ্ঠ—জন্ম জঙ্গলে বিশীর্ণ চেতন জীবকে যাঁহারা পরমাত্মা বলেন তাঁহারা পণ্ডিত হইলেও অজ্ঞ। "তেঽজ্ঞাঃ পণ্ডিতা অপি।" জীবভাবই সংসার ও দুঃখ-প্রবাহের কারণ। জীবকে জানায় কিছুই জানা হয় না। সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র দ্বারা পরমাত্মাকে জানিলে তবে দুঃখ দূর হয়। যেমন বিষবেগ শান্ত হইলে বিসূচিকা দূর হয়, সেইরূপ জীবভাব ত্যাগ করিয়া পরমাত্মভাব গ্রহণ করিতে পারিলেই সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি হয়।

রাম—রূপং কথয় মে ব্রহ্মন্ যথাবৎ পরমাত্মনঃ।
যস্মিন্ দৃষ্টে মনোমোহান্ সমগ্রান্ সন্তরিষ্যতি॥ ১৮॥

জীবকে জানিলে কোন দুঃখ দূর হইবে না। অতএব হে ব্রহ্মন্! পরমাত্মার যথাযথ রূপ বর্ণন করুন। যাঁহাকে দেখিলে সমগ্র মনোমায়া হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে, তাঁহার রূপই বলুন।

বশিষ্ঠ—দেশাদ্দেশান্তরং দূরং প্রাপ্তায়াঃ সম্বিদোবপুঃ।

নিমেষেণৈব যন্মধ্যে তদ্রূপং পরমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥
অত্যন্তাভাব এবাস্তি সংসারস্য যথা স্থিতেঃ।
যস্মিন্ বোধমহাম্ভোধৌ তদ্রূপং পরমাত্মনঃ ॥ ২০ ॥
দ্রষ্টৃদৃশ্য ক্রমোযত্র স্থিতোপ্যস্তময়ং গতঃ।
যদনাকাশমাকাশং তদ্রূপং পরমাত্মনঃ ॥ ২১ ॥
অশূন্যমিব যচ্ছূন্যং যস্মিন্ শূন্যং জগৎস্থিতম্।
সর্গৌঘে সতি যচ্ছূন্যং তদ্রূপং পরমাত্মনঃ ॥ ২২ ॥
যন্মহাচিন্ময়মপি বৃহৎ পাষাণবৎ স্থিতম্।
জড়ং বা জড়মেবাস্তু তদ্রূপং পরমাত্মনঃ ॥ ২৩ ॥
স বাহ্যাভ্যন্তরং যেন সর্ব্বং সম্প্রাপ্য সঙ্গমম্।
স্বরূপ সত্তামাপ্নোতি তদ্রূপং পরমাত্মনঃ। ২৪ ॥
প্রকাশস্য যথালোকঃ শূন্যত্বং নভসো যথা।
তথেদং সংস্থিতং যত্র তদ্রূপং পরমাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥

একদেশ হইতে অন্য দূরদেশ প্রাপ্ত হইয়াও জ্ঞানস্বরূপ যিনি নিমেষমধ্যে নিকটেও থাকেন, সেই জ্ঞানই পরমাত্মার রূপ। [বৃক্ষশাখার মধ্য হইতে যখন চন্দ্র দর্শন করা যায়, তখন যেমন চক্ষু দ্বারা নির্গত যে মন, তাহা দ্বারা অভিব্যক্ত যে জ্ঞান—সেই জ্ঞান শাখাদেশ হইতে দূর যে চন্দ্রদেশ তাহাকে নিমেষমাত্রে প্রাপ্ত হয় অথবা চন্দ্রদেশে গিয়াও সমকালে শাখদেশেও থাকে, জ্ঞানশরীর অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাও সেইরূপ। এখানে শাখাপ্রদেশ ও চন্দ্রপ্রদেশ সবিষয় হইলেও ইহাদের মধ্যে যে সম্বিদের বপু-স্বরূপ, তাহা নির্ব্বিষয় অপরোক্ষ চিৎরূপ।

সৃষ্টি স্থিতি নাশাদি বিকারের অন্তরালে—কোলে কোলে থাকিয়াও যাঁহাতে মিথ্যা জগতের অত্যন্ত অভাব সর্ব্বদাই আছে—সেই মহাবোধরূপ সমুদ্রই পরমাত্মার রূপ।

দ্রষ্টা দৃশ্যক্রম যাঁহাতে থাকিয়াও নিত্য অস্তমিত—থাকিয়াও নাই—আকাশ না হইয়াও যিনি আকাশের মত বিপুল—তাহাই পরমাত্মারূপ।

জগৎ নাই, কিছুই নাই, যিনি আপনি আপনি বসিয়া যাঁহার সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না—তাই যিনি শূন্যস্বরূপ—শূন্য হইয়াও যিনি অশূন্যমত—যাঁহার উপরে মিথ্যা জগৎ সত্তালাভ করিয়াছে—যেমন মরুমরীচিকার জল সেইরূপ। আর এই শূন্য জগৎ, অসৎ জগৎ যাঁহাতে স্থিত—সৃষ্টিপ্রবাহস্বরূপ ওঘ যার—সেই অজ্ঞান



উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৮ম বর্ষ।] ১৩২০ সাল, পৌষ। [৯ম সংখ্যা

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র"

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
"তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥" ৬।৩০

সর্ব্বশাস্ত্র-সারভূতা শ্রীগীতাতে এই কথা নিজ মুখে তুমিই বলিয়াছ। "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র"—কথাটি ত বেশ মিষ্ট। পড়িলে কিংবা শুনিলেই যেন তোমাকে দেখিবার ইচ্ছা ভিতরে জাগিয়া উঠে। মনে হয় তবে ত তোমাকে দেখা যাইতে পারে। একবার কেন দেখি না, তুমি কেমন! ভাল করিয়া চক্ষু চাহিয়া একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখি। উপরে দেখি বিস্তীর্ণ নীল আকাশ—তাহাতে চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা নানা বর্ণের মেঘ। নীচে দেখি বিশাল ভূমণ্ডল—তাহাতে কত জীব, কত বৃক্ষ, লতা নদী, পর্ব্বত। কৈ তোমাকে ত কোথাও দেখিতে পাই না। নিজ শরীরের দিকে চাহিয়া দেখি দশেন্দ্রিয় যুক্ত পাঞ্চভৌতিক শরীরটাই দেখিতে পাই। ভিতরে প্রবেশ করি—দেখি রাগ, দ্বেষ, সঙ্কল্প, বিকল্প, সংশয়, নিশ্চয়, অহঙ্কার। মন প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। কৈ তোমাকে ত দেখিতে পাওয়া গেল না। তবে কি দেখিতে পাওয়া যায় না?

যায় বৈ কি। না হইলে তুমি ও কথা বলিবে কেন। আবার ভাবি—ভাল কেহ কি কখনও তোমাকে দেখিয়াছে? দেখিবে না কেন? যে অবতারে গীতার উপদেশ করা হইয়াছে সে সময়ের সকলেই ত তোমাকে দেখিয়াছে। পাণ্ডবেরা দেখিয়াছিলেন, কৌরবেরা দেখিয়াছিলেন, যাদবেরা দেখিয়াছিলেন, দ্রৌপদী দেখিয়াছিলেন, রুক্মিণী, সত্যভামা ইত্যাদি যদুকামিনীরা দেখিয়াছিলেন, ব্রজ-গোপীরা দেখিয়াছিলেন, ব্রজবালকেরা দেখিয়াছিলেন, যমুনা দেখিয়াছিলেন, বংশীবট দেখিয়াছিলেন, নন্দ যশোদা দেখিয়াছিলেন, বসুদেব দৈবকী দেখিয়াছিলেন এবং কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ ইঁহারাও দেখিয়া-ছিলেন। সকলেই সেই একই মূর্ত্তি দেখিয়াছিয়াছিলেন কিন্তু তবু যশোদার "তুমি" আর অর্জ্জুনের "তুমি" এ উভয়ে অনেক প্রভেদ। সকলেই আপন আপন ভাবে দেখিয়াছিলেন তাই মূর্ত্তি এক হইলেও রূপ ভিন্ন ভিন্ন। আমি যে তোমাকে দেখিতে চাই—আমি কোন্ মূর্ত্তিতে, কোন্ রূপেতে তোমাকে দেখিব? আপন চক্ষে ত দেখিতে পাইলাম না। পরের চক্ষে যদি দেখিলে হয় তবে তাহাই না হয় একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্। কাহার মত করিয়া দেখিব? তোমার যে মূর্ত্তি চিন্তা করি তাহাই সুন্দর, যে রূপ ধ্যান করি তাহাই মধুর। কেবল দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতেই তুমি কত রূপে কত লোকের হৃদয় উদ্ভো-তিত করিয়াছ তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। যখন তুমি মাতা দৈব-কীর ক্রোড়ে অবতীর্ণ হইলে তখন তোমার রূপে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়া গেল। সেই আলোকে বসুদেব ও দৈবকী এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তাঁহারা প্রথমে দেখিলেন শুধুই আলোক, শুধুই জ্যোতি। পরে যখন সেই জ্যোতির মধ্যে দৃষ্টি স্থির হইল তখন দেখিলেন এক অতি সুন্দর নীলাভ কৃষ্ণ মূর্ত্তি, মস্তকে নানা রত্ন বিজড়িত হিরন্ময় মুকুট, চতুর্ভুজ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম-ধারী, পরিধান পীত কৌষেয় বসন, হৃদয়ে ভৃগুপদ চিহ্ন ও তাহার উপরে হর-হৃদিস্থিত জপামণ্ডিত রক্ত বর্ণ চরণ তল সদৃশ রক্তবর্ণ কৌস্তুভমণি দেদীপ্যমান, সর্ব্বাঙ্গ নানা অলঙ্কারে সুশোভিত! ক্রমে সেই মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। তখন দেখিলেন ক্রোড়ে এক অপূর্ব্ব শিশু,—সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী মূর্ত্তিরই অনু-রূপ, অথচ দ্বিভুজ শিশু মূর্ত্তি। চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে যত না মুগ্ধ হইয়াছিলেন এই শিশুমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার অধিক মুগ্ধ হইয়া গেলেন, কি যেন কি হারাণ জিনিস ফিরাইয়া পাইলেন, আনন্দে আত্মহারা হইয়াগেলেন। কত মুখচুম্বন করিলেন,

কত বুকের কাছে চাপিয়া চাপিয়া স্তন দিলেন, উভয়ে কত উভয়ের ক্রোড়ে তুলিয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণের জন্য যেন সমস্ত ভুলিয়া গেলেন, শোক দুঃখ ভুলিলেন, কংসের অত্যাচার ভুলিলেন, সমস্ত সংসার ভুলিলেন—সেই রূপ দেখিয়া। বসুদেব দৈবকী জীবনে কখনও সেরূপ ভুলিতে পারেন নাই। সে রূপ একবার দেখিলে কখনও ভোলা যায় না! ভোলা দূরের কথা, কখনও সেরূপ চক্ষের অন্তরাল হয় না। যে দিকে তাকাও, যাহা দেখ তাহাতেই যেন সেই রূপ বিকাশ পায়। "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র" যেন আপনা হইতেই হইয়া যায়। এই অবতারেই তুমি সময়ে সময়ে আরও কতরূপে কত লোকের মন হরণ করিয়াছিলে। আমি আরও কতকগুলি রূপের কথা বলিতেছি। এক সময়ে নিদ্রাভঙ্গে চোখের কাজল ও নাসার তিলক গালে মাখিয়া হাসিতে হাসিতে কখন বসিয়া কখন হামা দিয়া পুতনার কোলে উঠিয়া তাহার স্তন পান করিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়াছিলে। একদিন নগ্ন দেহে ধুলাখেলা করিতে করিতে ছুটিয়া গিয়া নন্দের বাধা ক্ষুদ্র দুটি হাতে মাথার উপর ধরিয়া নন্দের কাছে লইয়া গিয়াছিলে। ইহার কিছুকাল পরে মাতা যশোদা শাসন করিবার জন্য তোমাকে বন্ধন করিতে থাকিলে তুমি ধুলি মিশ্রিত ক্ষীর, সর মুখে মাখিয়া শান্ত শিশুটির মত দাঁড়াইয়া যেন ভয়ে ভয়ে এক একবার মাতার মুখের দিকে চাহিয়াছিলে। যশোদার পরান ধড়া চূড়া বাঁধিয়া ধবলী শ্যামলী ইত্যাদি গাভী সকল লইয়া গোপবালকগণ সঙ্গে বৃন্দাবনে তুমি কত খেলা খেলিয়াছিলে। কোন এক জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে নিশিথ সময়ে সমস্ত সংসার নিদ্রিত হইলে যমুনা তীরে বনমালা সুশোভিত মদনমোহন বেশে বংশী বাজাইয়া অনন্তরূপের আধার শ্রীমতী রাধাদেবী ও তাঁহার সহচরীগণকে সঙ্গে লইয়া অপূর্ব্ব রাসলীলা করিয়া ত্রিজগৎ মুগ্ধ করিয়াছিলে। গোচারণ করিতে করিতে গোপবালকগণ কালিদহের বিষাক্তজল পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে, তুমি কৃত্রিম কোপসহকারে, আরক্তনয়নে কালিয় হ্রদে ঝাঁপ দিয়াছিলে এবং কালিয়কে যুদ্ধে আহ্বান করতঃ তাহার সহস্র ফণা চূর্ণ করিয়া অবশিষ্ট ফণাটির উপর ত্রিভঙ্গভাবে দাঁড়াইয়া বংশীধ্বনি করিতে করিতে মৃত গোপবালকদিগের শরীরে জীবনসংঞ্চার করিয়াছিলে। কোন দিন দেব-রাজের দর্পচূর্ণ করিবার জন্য বহুসংখ্যক গোপ-গোপীবৃন্দের মধ্যে একাকী ক্ষুদ্র একখানি হস্ত দ্বারা গোবর্দ্ধন পর্ব্বত তুলিয়া অজস্র জলধারা হইতে বৃন্দাবন

রক্ষা করিয়াছিলে। কোন সময়ে মানময়ী রাধার মানভঞ্জন করিবার জন্য ভীত ভাবে ধীরে ধীরে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে হাত বাড়াইয়া অপসৃত চরণ হইতে স্খলিত হস্ত মাটিতে রাখিয়া কাতর নয়নে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়াছিলে। এক সময়ে এক পূর্ণিমা নিশিতে কুঞ্জকাননে রাধিকা ও তাঁহার সখীগণ সমভিব্যাহারে রাসলীলা করিতে থাকিলে অকস্মাৎ আয়ান আসিয়া বিঘ্নদান করে। তখন তুমি দেখিতে দেখিতে মহামেঘপ্রভা, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা হইয়া, অসি মুণ্ড লইয়া, মুণ্ডমালা পরিয়া, লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া, ত্রিনয়ন হইতে অগ্নিশিখা উদ্গীরণ করিতে করিতে নগ্নবেশে শবরূপী মহাশিবের উপর উঠিয়া দাড়াইলে। পূর্ণিমা তখন ঘোর অমানিশাতে পরিণত হইল। কুঞ্জবন আয়ানের চক্ষে শ্মশান বলিয়া মনে হইল। পরম প্রেমময়ীকে সে কঠোর সাধক মনে করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে প্রস্থান করিল। ইহার পর রাজবেশে ভূষিত হইয়া সময়ে সময়ে কংস শিশুপালাদিকে তাহাদের পাপের প্রতিফল প্রদান করিবার জন্য চক্রহস্তে বীরদর্পে সভাস্থলে দাঁড়াইয়া সভাস্থিত ভক্তগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলে। যে দিন যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় সমবেত কুরুপাণ্ডব এবং রাজন্যবর্গের মধ্যে দুঃশাসন একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া তাঁহাকে সকলের সমক্ষে বিবস্ত্রা করিতে চেষ্টা করে, তখন দ্রৌপদী কাতর হইয়া সকলের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করেন। নানাকারণে সকলের দ্বারা তিনি উপেক্ষিত হইলে অবশেষে যখন নিতান্ত নিরাশ্রয় এবং ভীত হইয়া, সকলের ভরসা ত্যাগ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে, যুক্তকরে আকাশের দিকে চাহিয়া তোমার শরণাপন্ন হয়েন, তখন তুমি আকাশে থাকিয়া নীলমেঘের ন্যায় তাঁহার চক্ষে ভাসিয়াছিলে এবং তড়িৎ হাসি হাসিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করতঃ ধীরে ধীরে অলক্ষিতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া বস্ত্ররূপে দ্রৌপদীকে বেষ্টিত করিয়া সকলের সমক্ষে তাঁহার লজ্জা রক্ষা করিয়াছিলে। আবার যখন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের পূর্ব্বে অর্জ্জুন বিষাদে অভিভূত হইয়া যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া বসিলেন তখন তাঁহার রথে অশ্ববল্গা হস্তে সারথিভাবে অবস্থিত তুমি তাঁহাকে নানাপ্রকার যোগের উপদেশ করিয়া এবং অবশেষে আপনার বিরাটমূর্ত্তিতে তাঁহার নিকট প্রকট হইয়া তাঁহাকে শান্ত করিয়াছিলে। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর এক দিন ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তোমাকে অস্ত্রধারণ করাইয়া তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন। এবং সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার জন্য যুদ্ধকালে যখন তুমি

অর্জ্জুনের রথে বসিয়া তাঁহার সারথ্য করিতেছিলে সেই সময়ে তিনি অস্ত্রে অস্ত্রে তোমার শরীর জর্জ্জরিত করিলে তুমি যেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চক্রনেমি হস্তে বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিতে ধরাতল কাঁপাইয়া ভীষ্মকে আক্রমন করিবার জন্য ছুটিয়া গিয়াছিলে। প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে উদ্বিগ্নচিত্ত ক্ষত্রিয়প্রবর ভীষ্ম এতক্ষণ প্রতি অস্ত্রক্ষেপে কাতর প্রাণে তোমার শরণাপন্ন হইতেছিলেন। তোমাকে চক্রহস্তে আসিতে দেখিয়া বাষ্পাকুলিতলোচনে ভক্তিগদ্গদ চিত্তে শরাসন ত্যাগ করিয়া যুক্তকরে তোমার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আরও কত কত রূপের কথা বলিব। তোমার রূপেরত অন্ত নাই। সাক্ষাৎ মহাদেবও তোমার রূপের অন্ত না পাইয়া কেবল নাম মাত্র সার করিয়া দিবারাত্রি তাহাই পঞ্চমুখে জপ করেন। তোমার সমস্ত মূর্ত্তিই সুন্দর, সকল রূপই মনোহর। তুমি নানা অবতারে নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিতেছ! মৎস্য মূর্ত্তিতে বেদের উদ্ধার করিয়াছিলে; কূর্ম্ম মূর্ত্তিতে পৃথিবী ধারণ করিয়াছিলে; বরাহ মূর্ত্তিতে দন্তদ্বারা পৃথিবীকে জল হইতে উত্তোলন করিয়াছিলে; নৃসিংহ মূর্ত্তিতে হিরণ্যকশিপু বধ করিয়াছিলে; বামন মূর্ত্তিতে বলির হস্ত হইতে পৃথিবী ও স্বর্গ উদ্ধার করিয়া দেবতাদিগকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলে; পরশুরাম মূর্ত্তিতে ক্ষত্রিয় দলন করিয়াছিলে; রাম মূর্ত্তিতে রাবণ বধ করিয়া সীতার উদ্ধার করিয়াছিলে এবংঐ অবতারের লীলার দ্বারা জীবের মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলে। বুদ্ধ মূর্ত্তিতে জীবের নীরস প্রাণে করুণার সঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে পুনরায় সৎপথে আনয়ন করিয়াছিলে। ভবিষ্যতে তুমিই কল্কি মূর্ত্তিতে জগতের সমস্ত পাপ বিনষ্ট করিয়া আবার সত্যযুগের প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। তুমি যে বলিতেছ "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র"। বল এ মূর্ত্তিগুলির কোন মূর্ত্তিতে তোমাকে সর্ব্বত্র দেখিতে হইবে? তুমি কখন শ্বেত, কখন কৃষ্ণ, কখন পুরুষ, কখন নারী। তুমি কখন শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী, কখন অক্ষসূত্র কমুণ্ডলুধারী, কখন ত্রিশূল ডমরুধারী। তুমি কখন শ্যামা, কখন শ্যাম, কখন শিব, কখন রাম। বলিয়া দাও কোন্ মূর্ত্তিতে তোমাকে দেখিব। যে রূপটি দেখি সেইটিই সুন্দর কারণ সকল রূপই তোমার। এই অনন্ত সৌন্দর্য্যের দিকে লক্ষ্য পড়িলে চিত্ত যেন আত্মহারা হইয়া যায়। মনে হয় দেখিবে কে আর দেখিবেই বা কি? চারিদিকে যেন সেই অনন্তরূপরাশি উছলিয়া পড়িতে থাকে। তখন আর কিছুই নাই। "যঃ" নাই, "মাং" নাই, "পশ্যতি" নাই। যাহা থাকে তাহা বর্ণনা করা

যায় না। তাহা আমিও নয়, তুমিও নয় অথচ দুয়ের সমাবেশ! কিন্তু যতক্ষণ এই অনন্তরূপের উপর দৃষ্টি না পাড়ে ততক্ষণ "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র" ইহার অর্থ কি? বুঝি কোন বিশেষ মূর্ত্তি বা বিশেষ রূপের কথা এখানে বলা হইতেছে না। সমস্তই যখন তোমাব মূর্ত্তি তখন তাহার মধ্যে ইতর বিশেষ করিবার প্রয়োজন কি। যেটিকে ধরিব সেইটিই যখন তোমার, তখন যেটি হউক একটিকে ধরিলেই হইল। আসল কথা—স্মরণ রাখা। সমস্তই যখন তোমার রূপ তখন মূলে তোমাকে স্মরণ রাখিয়া যে কোন একটি মূর্ত্তিতে তোমাকে সর্ব্বত্র দেখিলেই হইতে পারে। যাহার যে মূর্ত্তি ভাল লাগে সে সেই মূর্ত্তিতে দেখিবে। এই জন্যই পুরাণাদি শাস্ত্র নানা স্থানে নানা মূর্ত্তিতে এবং নানা ভাবেতে তোমাকে দেখাইয়াছেন। যে যে মূর্ত্তির ভক্ত, যে যে ভাবের ভক্ত সে সেই মূর্ত্তিতে সেই ভাবেতে তোমাকে দর্শন করে। তাহাতেই তাহার ইষ্ট সিদ্ধ হয়, জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয়।

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র" ইহাতে তোমাকে যে কোন মূর্ত্তিতে হউক দেখিতে হইবে, ইহাই বুঝিলাম। কিন্তু শুধু একবার দেখিলেই কি হইল? বোধ হয় না। প্রাতঃকালে স্নান করিয়া একবার মন্দিরে গিয়া তোমার দর্শন করিলাম, অথবা পূজা করিতে বসিয়া ধ্যানে একবার তোমায় দেখিলাম, তাহা হইলে হইবে না। এ দেখা শুধু একবার চোখের দেখা নহে। এ দেখা আরম্ভ হইলে আর ইহার অন্ত থাকিবে না। তোমাকে সর্ব্বত্র দেখিতে হইবে। ইহা আরম্ভ হইবে চক্ষু দ্বারা এবং ইহার চরম উৎকর্ষ হইবে যখন এই দর্শন সমস্ত একাদশ ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা হইতে থাকিবে। তখন দর্শন ও অনুভব এক হইয়া যাইবে। তখন স্থূল, সূক্ষ্ম, ভাল, মন্দ সকল বস্তুতেই তোমাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। তখন তুমি আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা, পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষ, জল, বায়ু, মেঘ সর্ব্বত্রই দর্শন দিবে। পুরুষ, নারী, বালক, বৃদ্ধ, পশু, পক্ষী, কীট সর্ব্বত্রই তোমার দর্শন হইবে। দেখিবে বৃহতেও তুমি, ক্ষুদ্রেতেও তুমি। তুমি উচ্চে, তুমি নীচে, তুমি উর্দ্ধে, তুমি অধে, তুমি চতুষ্পার্শে, তুমি দূরে তুমি নিকটে, তুমি স্বর্গে তুমি নরকে, তুমি আলোকে, তুমি আঁধারে, তুমি পাপে, তুমি পুণ্যে। তুমি দেবতায়, তুমি মনুষ্যে, তুমি মিত্রে, তুমি শত্রুতে। তুমি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধে, তুমি মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারে, তুমি প্রাণে, তুমি পাঞ্চভৌতিক শরীরে, তুমি পঞ্চভূতে, তুমি ইন্দ্রিয়ে, তুমি ইন্দ্রিয়াতীতে। দেখিবে কামক্রোধাদি

বিকারে তুমি, সমদমাদি সাধনায় তুমি, যোগে তুমি, ভোগে তুমি, সুখে তুমি, দুঃখে তুমি, বিপদে তুমি, সম্পদে তুমি। তুমিই আধি ব্যাধিতে, তুমিই জন্ম মৃত্যুতে, তুমিই সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়ে। বড় আশ্চর্য্য এই দর্শন, কিন্তু কিরূপে ইহা হইবে? সচরাচর কোন বস্তুর দর্শন কিরূপে হয়? চিত্ত চক্ষু দ্বারা নিসৃত হইয়া কোন বস্তুতে পড়িলে সেই বস্তুর আকারে আকারিত হয় এবং তদাকারে আকারিত চিত্তকে দর্শন করিলেই সেই বস্তুর দর্শন হইয়া থাকে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির সম্বন্ধেও সেইরূপ। লোকে ঘট পট দেখে না, দেখে আপন আপন চিত্তকেই। সুতরাং যাহা দেখিতে হইবে অর্থাৎ তোমার কোন রূপ বিশেষ যেমন এক, সেইরূপ যাহাতে দেখিতে হইবে সেই বিস্তীর্ণ "সর্ব্বত্র" ও সঙ্কুচিত হইয়া এক, চিত্তেই পরিণত হইতেছে। বহুস্থানে তোমাকে দেখা বড় কঠিন বলিয়া মনে হইয়াছিল কিন্তু এক চিত্তেতেই তোমাকে দেখ যেন অপেক্ষাকৃত সহজ মনে হইতেছে। এই চিত্তেতে যদি তোমার মূর্ত্তি, তোমার ভাব যোল আনা ভরিয়া রাখা যায় তবে দৃষ্টি অন্য বস্তুতে পড়িলেও চিত্ত তদাকারে আকারিত হইবে না। সুতরাং অন্য বস্তুর দর্শন না হইয়া সর্ব্বত্র তোমারই দর্শন হইতে থাকিবে। পরে তোমাতেই দৃষ্টি স্থির রাখিয়া তাহাতে সর্ব্ব বস্তুর দর্শন করিতে হইবে। অর্থাৎ তোমাতেই পূর্ণকাম হইতে হইবে। কোন্ বস্তু ইচ্ছা করিয়া দেখি? যাহা দেখিয়া সুখ পাই। সুখ পাই কিসে? যাহাতে কোন অভাব দূর হয়। অতএব তোমাতে সর্ব্ব বস্তুর দর্শন করার মর্ম্ম এই যে আমার যে যে বস্তুর অভাব তাহা সমস্তই তোমাতে বিদ্যমান আছে। যে তোমাকে দেখে তাহার সকল অভাব দূর হয়। তুমি সমস্ত রসের আধার, তুমি সমস্ত অভাব বর্জ্জিত। তোমাকে দেখিয়া, তোমাকে পাইয়া যদি সমস্ত রসের আস্বাদ পাওয়া যায়, আর কোন অভাব না থাকে তাহা হইলে "সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি" সাধিত হইল। ইতি—

শ্রীআঃ—

(পূর্ণিয়া)

তবে দেখা পাবি তাঁর।

যা, উড়ে যা, মন পাখী আমার,
যারে হেসে ভেসে, তাঁর সেই দেশে,
যে আমার আমি যাঁর।

শোন্ পাখী তোরে বলি, সোজা পথে যাবি চলি,
সাধিবি নাম কেবলি,
তবে দেখা পাবি তাঁর, যে আমার আমি যাঁর।

অন্য সাধ নাহি পুষে, কর্ম্মক্ষয় মাত্র আশে,
নামগানে গেলে ভেসে,
তবে দেখা পাবি তাঁর, যে আমার আমি যাঁর।

প্রাণে প্রাণে নাম গাবি, পর কথা না কহিবি,
নিজ কর্ম্মে প্রাণ দিবি,
তবে দেখা পাবি তাঁর, যে আমার আমি যাঁর।

মন মুখ এক করি, বিশেষে সত্যে আদরি,
যত কর্ম্ম যাবি করি,
তবে দেখা পাবি তাঁর, যে আমার আমি যাঁর।

সাফ্ কল্লে আঁস্তাকুড়ে, * সে সঙ্গে ভাঁড়ার ঘরে,
দেবালয় হয়ে পড়ে
তবে দেখা পাবি তাঁর, যে আমার আমি যাঁর।

দোকান রাখ্‌লে খুলে, তবেত খদ্দের মিলে
বুক্‌টা তেম্নি খুল্‌লে,
তবে দেখা পাবি তাঁর, যে আমার আমি যাঁর।

অন্য চিন্তা এলে পরে, খ্যাদাবি নিজ মনেরে,
নাক কাণ মোলিবিরে,
তবে দেখা পাবি তাঁর, যে আমার আমি যাঁর।

---

* আঁস্তাকুড়, ভাঁড়ার ঘর ও ঠাকুর ঘর—মনের বিভিন্ন অবস্থা মাত্র।

সেধে নিজ মতামতে, না দিবিরে কোন মতে,
না বিকাবি পর মতে,
তবে দেখা পাবি তাঁর, যে আমার আমি যাঁর।

পথে ঘাটে শিল নোড়া, তারা সবে দিতো সাড়া,
না মাড়াবি সেই পাড়া,
তবে দেখা পাবি তাঁর, যে আমার আমি যাঁর।

রটাবে কলঙ্ক কত, নর নারী বিধিমত,
উল্লাসে সহিবি যত,
তবে দেখা পাবি তাঁর, যে আমার আমি যাঁর।

ওষুধ ধরেছে ভেবে, আনন্দে রহিবি তবে,
কর্ম্মক্ষয় হ'য়ে যাবে,
তবে দেখা পাবি তাঁর, যে আমার আমি যাঁর।

দুঃখ যত স'য়ে গেলে, সকলি মঙ্গল বলে,
কর্ম্মক্ষয় ফল মিলে,
তবে দেখা পাবি তাঁর, যে আমার আমি যাঁর।

সাধ্যমত রেখে দূরে, ভব সুখে যারা ঘুরে,
প্রাণ তবে রসে পূরে,
তবে দেখা পাবি তাঁর, যে আমার আমি যাঁর।

না কহিবি তাঁর কথা, জড় সনে—যথা তথা,
বুঝে সুঝে কৈলে কথা,
তবে দেখা পাবি তাঁর, যে আমার আমি যাঁর।

আপনারে আছি জ্ঞানে, পালিবি স্বাস্থ্যবিধানে,
থাকিবি প্রফুল্ল মনে,
তবে দেখা পাবি তাঁর, যে আমার আমি যাঁর।

তরু লতা ফুল সনে, আর শশী তারা সনে,
আলাপিবি সংগোপনে,
তবে দেখা পাবি তাঁর, যে আমার আমি যাঁর।

পুষ্‌লে শুভ কামনা, সবে গণি নিজ জনা,
লভি যাবি কৃপাকণা,
তবে দেখা পাবি তাঁর, যে আমার আমি যাঁর।

তাঁর মূর্ত্তি এঁকে হৃদে, কর্ম্ম-যত যাবি সেধে,
এ ভাব গাঁথ্‌লে হৃদে,
তবে দেখা পাবি তাঁর, যে আমার আমি যাঁর।

শ্বেত বা কাঞ্চন বর্ণে, ফল দেয় যত কর্ম্মে,
জপ নাম এই বর্ণে,
তবে দেখা পাবি তাঁর, যে আমার আমি যাঁর।

দিন দিন যত্ন করি, 'আমি' পাখী দিবি ছাড়ি,
এই ত করম তোরি,
তবে দেখা পাবি তাঁর, যে আমার আমি যাঁর।

কেমনে বাসব ভাল, না জানি বাস্‌তে ভাল,
এম্নি-ভাব হলে ভাল,
তবে দেখা পাবি তাঁর, যে আমার আমি যাঁর।

কথাগুলো গেঁথে বুকে, যাস্ চলে হুঁসে থেকে,
চিন্‌বি তবে তুই কে,
তবে দেখা পাবি তাঁর, যে আমার আমি যাঁর।

পাখী গা শোনা সে নাম, কিবা নাম প্রাণারাম,
সুধামাখা সেই নাম,
তবে দেখা পাবি তাঁর, যে আমার আমি যাঁর।

কি করম ক'ত্তে এলি, কি করম সেধে গেলি,
দেখ্‌দেখি আঁখি মেলি,
তবে দেখা পাবি তাঁর যে আমার আমি যাঁর।

মন ও মন্ত্রের বিবাদ।

(ভিক্ষুগীতা)

মন্ত্র, ঈশ্বর আর মন, মায়া। ঈশ্বর মায়াধীশ। যিনি মায়াকে বশীভূত করিয়া কার্য্য করান তিনিই ঈশ্বর।

মানুষের মধ্যে যে মনকে সকলেই জানে, তিনি মায়ার স্থানীয়। যিনি মনকে বশীভূত করিয়া কার্য্য করাইতে পারেন তিনি ঈশ্বরের সমান হয়েন।

এই কলিযুগে মনের বশীভূত কত লোক? মনের মধ্যে যাহা উঠিতেছে তাহার বশীভূত হইয়াই মানুষ ছুটিতেছে।

লোকের উপকার কর, জগতের উপকার কর, সমাজকে উন্নত কর, এই কালে এই কথা বালকের মুখেও পাওয়া যায়। আর যাঁহারা বালকের পিতা তাঁহারও সমাজকে উন্নত করিবার জন্য কত সভা সমিতি করিলেন, কত প্রবন্ধ লিখিলেন, কত কবিতা লিখিলেন, কত লোকহিতকর কার্য্যে হাত দিলেন; কিন্তু মরিবার সময় বলিয়া মরিলেন হায়! জীবন লইয়া কি করিলাম? "সমাজ সমাজ বলিয়া কত চিৎকার করিলাম, কত লোককে তীব্র সমালোচনা করিয়া ফিরাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কৈ সমাজের স্রোত ত ফিরিল না? হায়! যাহা করিলাম, তাহার কোন ফলত স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারিলাম না। এখন ত ভগ্ন হৃদয়ে পৃথিবী হইতে তাড়িত হইতেছি!"

আমরা স্বচক্ষে অনেক সমাজবৎসল লোকের এই দশা দেখিয়াছি। ইহা কল্পনা করিয়া বলিতেছি না।

তবে কি মানুষ সমাজের হিতের জন্য কিছু করিবে না?

কে বলে ইহা। সমাজের হিতের জন্য, দশের উপকারের জন্য যে যাহা করিতেছে করুক কিন্তু তাহার সঙ্গে আরও একটু করুক ইহাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা। নিজের জন্য সেইটুকু বাদ দিয়া পরের জন্য যাহা করিতে যাইবে তাহাতে সমাজের যথার্থ উপকার ত হইবে না—তুমিও মরিবার সময় বহু যাতনা পাইয়া বলিয়া যাইবে জীবনটা ঠিক মত চালাইতে পারি নাই।

কেন জান—তোমার সকল কর্ম্মই ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কৃত হয়। একটু ভাল ফল দেখিলে তোমার আনন্দ; কিন্তু নিষ্ফল দেখিলে তোমার বিষাদ এবং

তুমি কর তাহার সহিত বিবাদ।

এই হর্ষবিষাদে তুমি যখন বদ্ধ. তখন তুমি ঠিক পথ পাও নাই। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন কর্ম্ম কর কিন্তু কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছি এই ভাবনায় কর্ম্ম কর। কর্ম্মটিকে মুখ্য ভাবিও না। কর্ম্মকে গৌণ করিয় ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করাকেই মুখ্য ভাবনা কর। ইহাতে ফলাফলে তোমার দৃষ্টি থাকে না—তুমি ঈশ্বর-প্রীতিজন্য কর্ম্ম করিতেছ বলিয়া একর্ম্মে তোমার বন্ধন নাই। ইহাই হইল নিষ্কাম কর্ম্ম। শাস্ত্র ইহাকেই বলিতেছেন কর্ম্মের কৌশল। এই নিষ্কাম কর্ম্মে এক সঙ্গে দ্বিবিধ ব্যাপার লাভ হয়। কর্ম্ম দ্বারা হয় জীবের উপকার আর নিষ্কাম ভাব দ্বারা হয় ঈশ্বর সেবা।

যে ঈশ্বর বিশ্বাস করে না, সে কিরূপে জীবহিতকর কার্য্য করিবে? জীবের হিত যে ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। দেখনা কেন—উপন্যাস লিখিয়া, গল্প করিয়া, কবিতা লিখিয়া, কত লোক সমাজ সেবা করিতেছে মনে করে? আজ ত দেশ পুস্তকে পুস্তকে ছাইয়া যাইতেছে—ইহাতে কাহারও কোনও উপকার হইতেছে? তুমি উপদেশ দিতেছ সত্য—কিন্তু সেই উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতেছে কে? তুমি কত ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছ; যুবা বয়সে কত বক্তৃতা দিতেছ কিন্তু একটু বয়স হইলেই বুঝিবে তোমার উপদেশে চলিতেছে কে? সাধনা করিতেছে কে? বর্ব্বর হওয়া কি ভাল? প্রথমেই দেখিলে ক্ষতি কি? আমার মত অনেকেই এইরূপ করিয়াছে তাহাতে বিশেষ ফল হয় নাই—এই বলিয়া যাহাতে লোককে সাধনা-মার্গে লইয়া যাইতে পারা যায় তাহাই না কর্ত্তব্য? অন্যকে সাধক করিতে হইলে নিজেও সাধক হইতে হয়, নতুবা হয় না। যাহা লোককে করিতে বল তাহা নিজে কর। নতুবা তোমার কথা কখন জীবন্ত হইবে না। তাই বলা হইতেছে নিজে মনকে দমন করিতে চেষ্টা কর সঙ্গে সঙ্গে লোকহিতকর কার্য্যও কর—ইহাও যে সাধনার অঙ্গ। সাধু হইয়াছ, সন্ন্যাসী হইয়াছ কিন্তু তোমার সাক্ষাতে একজন পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হইয়া মরিয়া যাইতেছে তুমি আসন ছাড়িয়া তাহাকে একটু জল দিবে না—বরং বেদান্তের কথা বলিবে মরে কে—আত্মাত অমর, ইহাও যেমন ব্যভিচার আবার লোকের জন্য নিরন্তর ছুটাছুটি করিতেছ কিন্তু নিজের জন্য শাস্ত্র-প্রদর্শিত কোন সাধনাই করিতেছ না—ইহাও সেইরূপ ব্যভিচার। এই দুই ব্যভিচারে আরও সমাজের হাহাকার বাড়িয়াই যাইতেছে।

ইহারই নিবৃত্তি জন্য বলা হইতেছে যে, যাহা করিতেছ কর কিন্তু নিজেও সাধক হইতে চেষ্টা কর ইহাতেই প্রকৃত কল্যাণ হইবে।

তাই বলা যাইতেছে—মনকে বশীভূত করিবার কার্য্যটি কর; ইহাই সাধনা।

অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়। মন্ত্রকে অভ্যাসের বস্তু কর। মন্ত্রই মনকে বশীভূত করিতে পারেন, এজন্য মন্ত্রকেও ঈশ্বর বলা যায়।

বৈরাগ্য দ্বারাও মন আয়ত্ত হয়। এজন্য বৈরাগ্যকেও ঈশ্বর-স্থানীয় বলা যায়।

বৈরাগ্যটি বিষাদযোগ। বিষাদযোগ অবলম্বন করিয়া মন্ত্র জপ করিতে করিতে যখন মন বশীভূত হয় তখন জীব শিবত্ব লাভ করে।

মনের সহিত মন্ত্রের যে যুদ্ধ তাই শ্রীচণ্ডীর অসুর বধ যুদ্ধের অনুরূপ। কেহ মনে করিবেন না যে, চণ্ডীকে আধ্যাত্মিক ব্যাপার মাত্র বলিতেছি। তবে বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ। আর সকল ব্যাপারে এই অধ্যাত্ম বিদ্যা নিত্য বিরাজমানা।

রামায়ণ মহাভারত পড়িলাম, গল্প বেশ লাগিল। কিন্তু ইহাদের ভিতর যে অধ্যাত্ম বিদ্যা আছে—তাহা যতক্ষণ ধরা না যায়, ততক্ষণ ইহা পাঠের প্রকৃত ফল পাওয়া যায় না। অধ্যাত্ম কথাটার অর্থ আর কিছুই নহে নিজের সঙ্গে মিলাইয়া লওয়া।

শাস্ত্র যদি শাস্ত্রই রহিল—আর নিজের সঙ্গে না মিলিল—তবে আর তাহা শাস্ত্র কি হইল? উপস্থিত সময়ে অনেক শাস্ত্র-ব্যবসায়ী আছেন। তাঁহারা বলেন—শাস্ত্র শাস্ত্রই আছেন, আমরা আমাদের মতন আছি। কোন কোন শাস্ত্র-ব্যবসায়ীর মুখে শুনা যায় সভ্যতার জন্য শাস্ত্র পাঠ করি কিন্তু শাস্ত্রমত চরিত্র গঠন আবার কি? এইগুলি কলির শিক্ষা। আমরা বলি শাস্ত্র পড়িয়া যদি শাস্ত্রমত চরিত্র গঠন না হইল তবে সমূহ বিপদ আসিয়া গেল। সমাজও সর্ব্বত্র এই বিপদ সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। কে ইহাকে উদ্ধার করিবে? যিনি উদ্ধার করিতে পারেন তিনি আমাদিগকে কৃপা করুন ইহাই প্রার্থনা।

বলিতেছিলাম মনের সহিত মন্ত্রের যুদ্ধ শ্রীচণ্ডীর যুদ্ধের মতন। মনরূপ মহিষাসুর যখন পৃথিবীতে নানা প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করে, যখন ইহার অত্যাচারে স্বর্গের সহিত মর্ত্ত্যের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তখন ইন্দ্রিয়-দেবতাগণ

একত্র মিলিত হইলে এক মহাশক্তির আবির্ভাব হয়। ইন্দ্রিয়-দেবতাগণ তখন আপন আপন অস্ত্র দিয়া সেই শক্তিকে উত্তেজিত করেন। শক্তি দেবী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াই সমরে আগমন করেন। সকল দেবশক্তির সমাবেশ হইলে অসুর তখন বশীভূত হয়, ইহাই দুর্গা পূজা।

মন-অসুরের সহিত তুমি যুদ্ধ কর—অসুরনাশিনী মার সাহায্য পাইবেই। নতুবা জয়ের জন্য কোন চেষ্টা না করিয়া যদি এক ঘেয়ে কাতরোক্তি কর—মা তোমার বঙ্গদেশ গেল—ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ, রোগ শোকে বঙ্গবাসী আজ মৃত্যুমুখে—মা এস মা—আমাদিগের এই কাঁদনিতে মা নড়েন না। মন দমন করিবার আয়োজন কর আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কাছে বল, প্রার্থনা কর, তবেই মা'র কৃপা হইবে। তোমার গাড়ীর চাকা কাদায় বসিয়া গিয়াছে তুমি কিন্তু গাড়ী হইতে নাবিয়া গুড়ক খাইতেছ আর রাস্তার লোককে বলিতেছ দেনা ভাই চাকাটা ঠেলিয়া। তোমার মত খাপ্পা খাঁয়ের সাহায্যে কেহই আসিবে না। কিন্তু নিজে কোমরে কাপড় আঁটিয়া লাগিয়া পড় দেখিবে তোমার সাহায্যার্থ অনেকে আসিবে। সেইরূপ মন অসুরকে আয়ত্ব করিবার জন্য চেষ্টা কর, দেখিবে মা স্বয়ং তোমার হৃদয়ে দাঁড়াইয়া মনকে পরাস্ত করিবার বল তোমায় দিতেছেন। জীব অন্তঃসমরে প্রবৃত্ত হইয়া যখন কাতর হইবে সেই সময়ে যদি অসুরনাশিনী মা'কে একবার স্মরণ করে, যদি অসুরনাশিনী মায়ের মূর্ত্তি একবার ধ্যান করে তবে সে যেন কি এক নূতন বলে বলীয়ান্ হয়। সে বেশ বোধ করিতে পারে—মা যেন বরাভয় ও অসিমুণ্ড ধারণ করিয়া তাহার মনকে শাসন করিতেছেন। সাধক বেশ বুঝিতে পারে মাই তাহার মনরূপ অসুরকে কখন তিরস্কার করেন, কখন ধমকান্, দমন জন্য বল প্রয়োগ করেন, সাধক বলেন—'কটু কইবি সাজা পাবি মাকে দিব ক'য়ে। সে যে অসুরনাশিনী শ্যামা বড় ক্ষেপা মেয়ে ইত্যাদি।

ইহাই শক্তি সাহায্যে মনোজয়ের আভাস, নিত্য অভ্যাসে ইহা স্পষ্ট হইবে।

কোন প্রকার বিবাদ করাই কষ্ট কর। মনের সহিত বিবাদ বিশেষ কষ্ট কর। কিন্তু একটু অভ্যাস করিলে মন ও মন্ত্রের বিবাদে একটা আনন্দ পাওয়া যায়। উহাই সাধনার সুখ।

এই বিবাদে কখন মন মন্ত্রকে পরাস্ত করে, আবার কখন মন্ত্র মনকে পরাস্ত করেন, এই উভয় ব্যাপারেই আনন্দ আছে। প্রথম প্রথম মনও বশ হইতে চায় না আর মন্ত্রও ছাড়িতে চায় না। উভয়েই প্রবল বেগে যখন কার্য্য করে তখন

প্রায় দেখা যায় মন্ত্রের কাছে মনই পরাস্ত হয়। বিশেষ যদি শ্বাসের সাহায্যে উঠা নামা করিতে করিতে মন্ত্র জপ করা যায় তবে যিনি ইহা করেন তিনি জানেন মন নিশ্চয়ই বশ হয়। সেই জন্য মন্ত্র কখন ছাড়িতে নাই। এমন কি যখন পায়ে হাঁটিয়া কোথাও যাইতেছ বা গাড়ী করিয়া কোথাও যাইতেছ তখনও নহে; তবে চলা ফেরার সময় শুধু শব্দ সাহায্যে উঠা নাবা করিতে হয় অন্য সময়ে শ্বাস সাহায্যে ইহা করিতে হয়। যতদিন না চিত্তশুদ্ধি হয় ততদিন এইরূপ লাগিয়া থাকা চাই। এইভাবে রাম রাম করিলে আর রাম ছাড়িয়া থাক যায় না। যখন তাহাকে ছাড়িয়া আর থাকিতে পারা যায় না তখন অল্পে অল্পে প্রেমের উদয় হয়। এই প্রেম গাঢ় হইলেই প্রেমময়কে পাওয়া যায়

(২)

দৃষ্টান্ত শত উপদেশের কার্য্য করে। তাহাই হউক।

আজকালকার লোকের দিকে একবার তাকাও। যুবা বয়সটা যায় কামিনীঘটিত লাঞ্ছনায়, আর শেষ বয়সটা যায় অর্থাশক্তির প্রবল তাড়নায়।

এসব শুনিয়া কি হইবে? আমার যাহা হইতেছে শাস্ত্র হইতে এইরূপ একটি চরিত্র যদি দেখাও আর সে ব্যক্তির সদ্গতি কিরূপে লাগিয়াছিল তাহাও যদি দেখাইতে পার, তবে আমিও সেইরূপ করিয়া সদ্গতি লাভ করিব।

আগে বল তোমার কি হইয়াছে। তার পরে তোমার আদর্শ কি হওয়া উচিত তাহা দেখাইব।

জান ত জন্মাবধি খালি টাকা টানা করিতেছি। না খাইয়া একদিনও কাটাই নাই; তবু ভয় টাকা যদি না থাকে তবেত ছেলে-পুলে না খাইয়া মরিবে। এত বৎসর গেল আজ পর্য্যন্ত ছেলেপুলে না খাইয়া কিন্তু মরিল না। না খাইয়াও রহিল না। টাকাও ঢের জমিয়াছে। আগে আগে বাড়ীঘর করা, বাড়ীঘর সাজান, পাঁচজনের মতন হওয়া, এর জন্য টাকার দরকার হইত; এখন ত সে সব হইয়াছে, তবু টাকা চাই। এখন কি জন্য যে টাকা দরকার তাও ত জানি না। জান ত আমি কৃপণের অগ্রগণ্য। দান ইত্যাদির নাম শুনিলেই ভয় হয়। এমন কি বাড়ীতে ভাল করিয়া কেহ খাইতে চাহিলে তখুনি বাজার খরচের হিসাব লইয়া খরচ কমাইতে বসি। আর বলি এ না হইলে টাকা জমিবে কিরূপে? স্ত্রী কিছু বলিলে বলি—কমবক্তি! এর পরে খাবি কি? ছেলে পুলেই বা খাবে কি? টাকা জমান চাই।

কিন্তু মূল ত জানিতেছ। এখন টাকার আর অন্য আবশ্যক নাই। শুধু জমিলেই সুখ। ছেলে পুলেও যে বেশ বিবেচক তাহাও নহে। জানি—ইহারা সব উড়াইয়া দিবে। তবু নানা প্রকার কৌশলে উইল করিয়া যাহাতে নিঃশেষ করিতে না পারে—সেই ফন্দি করি। জানি—এত কষ্টের রক্ত জল করা টাকা ইহার কিছুই কিন্তু লইয়া যাইতে পারিব না—তবু জমান চাই। ফলে তোমার অজ্ঞাত কি আছে—আমি যেমন লোভী তেমনি কামী, আর তেমনি কোপন স্বভাব। আমার মতন কথাটি যে বলে, তাহাকে বেশ ভাল বোধ হয়; কিন্তু অন্যরূপ বলিলেই বলি—লোকটা ভাল নয় হে,—ভারি একটী স্বার্থ লইয়া আমার কাছে আসে।

এসব ত জানি। সম্প্রতি নিজের দোষগুলি যে এত করিয়া বলিতেছ—কিছু কি হইয়াছে?

কিছু না হইলে আর কি এসব কথা বাহির হয়? যাহা দেখিতেছি তাহাতে শীঘ্রই "হাতে খোলা" ইত্যাদি পড়িবে।

ভালদিন যখন ছিল—তখন জ্ঞাতি এবং অতিথিকে একটা মুখের মিষ্ট কথা দিয়াও সন্তোষ করি নাই। ধর্ম্মকর্ম্মহীন বাড়ীতে আত্মা-পুরুষও ভোগ সমূহ দ্বারা তর্পিত হন নাই। পুত্র ও সম্বন্ধী ইত্যাদি দুঃশীল—ইহারা কবে আমার অন্ত হইবে তাই চিন্তা করে। স্ত্রী কন্যা ও ভৃত্যগণ সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট। তাহারা সদাবিষণ্ণ বলিয়া আমার অভিলষিত আচরণ করে না—যাগ যজ্ঞ ত নাই, দেবতারাও ক্রুদ্ধ।

আমার মত পুণ্যপথ হইতে ভ্রষ্ট অথচ বড়মানুষ থাকিয়া পরে নির্দ্ধন হইয়া গিয়াছে—এমন কোন লোকের ইতিহাস যদি বল—তবে আমার উপকার হয়।

মালব দেশে এক-ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ ছিল। তুমি যাহা যাহা বলিলে তার সেইরূপ সমস্তই ছিল। পরে সেই কৃপণ ব্রাহ্মণের বহু পরিশ্রম ও বহু আয়াস লব্ধ অর্থ নানা প্রকারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সেই ব্রহ্মবন্ধুর কতক টাকা গেল জ্ঞাতিগণের হস্তে; কতক গেল দস্যু হস্তে ডাকাতিতে, কতক গেল উকিলের হাতে—কতক গেল রাজার হাতে।

এইরূপে ধন ত গেল—আর এদিকে স্বজনেরাও উপেক্ষা করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ দুর্ল্লঙ্ঘ্য চিন্তায় মগ্ন হইল। ধনক্ষয়ে সন্তপ্ত ও বাষ্পকণ্ঠ হইয়া ব্রাহ্মণ সদাই খেদ করিত। করিতে করিতে তাহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল।

যত হউক ব্রাহ্মণ বংশে ত জন্ম। ব্রাহ্মণ দুঃখ করিয়া বলিত অহো! কি কষ্ট!

আমি অনর্থক আত্মাকে অনুতপ্ত করিয়াছি। আমার আত্মা, না ধর্ম্মের নিমিত্ত, না ভোগের নিমিত্ত হইল। এতদিন আমি বৃথা অর্থের নিমিত্তই এই এত কষ্ট স্বীকার করিলাম।

আমার মত কদর্য্য লোকের ধন ইহলোকে আত্মার উপতাপের জন্য; মরিলে নরকভোগের জন্য। এরূপ লোকের ধন কখনই কোন সুখের জন্য হয় না। কৈ আমিও কোন দিন সুখী ছিলাম না, স্ত্রী পুত্র কন্যাও কখন সুখী ছিল না। গহনা কাপড়, গাড়ী ঘোঁড়া, বাগান পুকুর যখন নূতন হইবে তখনই একটু সুখ; তাও মন খোলা সুখ নহে। গহনাটা হইয়াছে বটে, কিন্তু অমুক সদরআলার স্ত্রীর যেমনটি তেমনটি হয় নাই—আর কিছু দিলেই ঠিক হইত সুখ এই ভাবের।

আমি লোভী মনে করিয়াছিলাম—স্ত্রী পুত্র আদি পরিবার গহনা, কাপড়, টাকা পাইলেই বশ থাকিবে—তাহা কিন্তু হইল না। এখন সব বুঝিতেছি। কুষ্ঠ যেমন ব্যক্তির রূপ বিনষ্ট করে, আমার লোভও আমার সকল সুখ বিনাশ করিয়াছে।

এখন ত বৃদ্ধ হইয়াছি। এখন আর কি সাধনা করিব? আর মৃত্যু কবলিত লোকের ধনে কি হয়?

ব্রাহ্মণ এই সব চিন্তা করিয়া আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কাহাকেও কিছু বলিয়া গেল না। একটা লোক দেখান খোঁজা হইল, কিন্তু বিশেষ চেষ্টা কিছুই হইল না। ব্রাহ্মণ নির্জ্জন স্থানে আসিয়া মনে করিল—যে অবস্থা আসিয়াছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব আর ধর্ম্মাদি সাধনে অপ্রমত্ত হইয়া শরীর শুষ্ক করিব। সেই ত্রিলোকনাথ আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। খট্টাঙ্গ যে, মুহূর্ত্তেক সময়েই, ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিল, আর আমার প্রতি কি কৃপা হইবে না? দেখি!

ব্রাহ্মণ ভৌতিক, দৈবিক ও দৈহিক সকল প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে লাগিল। এই ভিক্ষুক এক সময়ে বড় মানুষ ছিল অন্য দেশেও তাহার কথা রাষ্ট্র হইল। ভিক্ষুক সত্য সত্যই মুনি ব্রত ধারণ করিয়াছে, আসক্তি শূন্য হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয় তথাপি 'ব্যাঘ্রের মাংস খাওয়া' লোকাপবাদ দুর্নির্ব্বার। অসজ্জনেরা সেই ভিক্ষুক অবধূতকে তিরস্কার করিত। তাহার লোটা কমণ্ডলু কাড়িয়া লইত। চীরখণ্ড ফেলিয়া দিত। নদীতীরে ভিক্ষালব্ধ

অন্ন ভোজন করিতে বসিলে, কেহ কেহ তাহা কাড়িয়া লইত। অন্য পাপিষ্ঠেরা গাত্রে মূত্র ত্যাগ করিত। মৌন থাকিলে কথা কওয়াইতে চেষ্টা করিত। অপরেরা চোর বলিয়া তর্জ্জন করিত। কেহ কেহ তাহার উপর অধোবায়ু ত্যাগ করিত—ভিক্ষু সব সহ্য করিত। পাপ ভোগ হইয়া যাইতেছে মনে করিত। সাত্ত্বিক ধৈর্য্য অবলম্বন করাতে তাহার জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ভিক্ষুর শেষ বিচার অতি সুন্দর। ভিক্ষু কাহারও দোষ দিত না—বলিত মনই একমাত্র দুঃখের কারণ। মনঃসংযম করিলে সকল দুঃখ দূর হয়—এমন কি মনঃকল্পিত এই শরীর যে অবস্থায় থাক না কেন, কিছুতেই আর বিচলিত হইতে হয় না। ভিক্ষু সকল অগ্রাহ্য করিয়া প্রাচীনতম মহর্ষিগণের সেবিত পরমাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া মুকুন্দের সেবা দ্বারাই দুরন্ত সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইল। দিন থাকিতে সেই চরণ আশ্রয় কর, তুমিও উত্তীর্ণ হইবে।

অনুরোধ।

ওই মেঘ মায়া আবরণ
দাও ধীরে দাও সরায়ে,
নীল নির্ম্মল কান্ত বরণ
মরমে তোলগো ফুটায়ে।

তব বিদ্যুৎ-চকিত দরশনে
ঘন আবরণ দেয় শুধু টেনে,
ব্যাকুল পরাণ পথ নাহি চেনে,
আঁধারে ঘুরায় ভুলায়ে।

ভ্রান্তি কেনগো জনমে মনে?
সব সংশয় করি চূর—
মর্ম্ম মলিন বাসনা হরি
মোর ক্লান্তি করগো দূর।

৺কাশীধাম—মৃ

সতী-স্ত্রী।

চিত্ত কি কিছু দুর্ব্বল হইতেছে ?

হইতেছে ?

হইতে দিতেছ কেন ?

এত বিপদ্‌রাশির মধ্যে থাকিতে থাকিতে শরীর প্রায়ই সুস্থ থাকিতেছে না—কর্ম্মও যথাসময়ে হইতেছে না—কাজেই চিত্ত দুর্ব্বল হইয়া উঠিতেছে।

এতদিন ত কর্ম্ম করিলে—যদি আর কর্ম্ম সেরূপ ভাবে না কর—ইহাতে চিত্ত দুর্ব্বল হইবে কেন ?

বল দেখি কি করিব ?

ইচ্ছা ত্যাগ করাই সদ্যোমুক্তি। ইচ্ছাময় হওয়াই ক্রমমুক্তি। ইচ্ছাশক্তিকে প্রবল কর। ইহা সকল অবস্থাতেই পারা যায়। তুমি ইচ্ছা করিয়াই চিত্তকে দুর্ব্বল করিতেছ। আবার ইচ্ছা করিলেই ইহাকে সবল করিতে পারিবে। বিশেষ আমি তোমার আছি, তোমার দুর্ব্বল হইবার কারণ নাই।

হাঁ। স্মরণ হইতেছে। তুমি বলিতেছ শারীরিক যাতনা যতই কেন হউক না—ইচ্ছা করিলে ইহাকে স্বীকার করা যায় আবার স্বীকার নাও করা যায়। ইহাকে স্বীকার না করিয়া ভ্রূমধ্যের বিপরীত স্থানে আদিত্যমণ্ডলে যাহা দেখি তাহাই দেখিতে দেখিতে ডাকা, আর যাতনা যাহা হয় তাহা যতদূর পারা যায় অগ্রাহ্য করা—এই ত ?

তোমার কথা তোমাকেই বলিতেছি। এই যে যাতনা হইতেছে ইহা কে দিতেছে—তাহা ত জান ?

তোমার সপত্নী দ্বয়।

ইহা ত জানই ; তথাপি তাহাদের ভয়ে যে তুমি তাহাদের বশ হইয়া তাহাদের কার্য্যকে নিজের কার্য্য বলিয়া স্বীকার কর—ইহাই ত বিপত্তির মূল।

তুমি নিঃসঙ্গ। কাহারও সহিত তোমার সঙ্গ হয় না। আমারও সহিত নয় ; আর ঐ দুজনের সঙ্গেত একবারেই নয়।

কিন্তু একবারে নিঃসঙ্গ ভাবে থাকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। ইহা জীবন্মুক্ত ভিন্ন কেহই পারে না।

আর একটি ক্রম আছে। এই ক্রমে তুমি সর্ব্বশক্তিমান্। সমস্ত শক্তি যখন তোমার আছে তখন সর্ব্বদা সুস্থ থাকিবার শক্তিও আছে। কিন্তু পুনঃ পুনঃ দুঃসঙ্গে পড়িয়া যদি চিত্তকে দুর্ব্বল করিয়া থাক তবে সর্ব্বশক্তির আর স্ফুরণ হইবে না। সেই জন্য প্রকৃতির প্রধান প্রধান বস্তুর নিকট হইতে তোমাকে সাহায্য লইতে হইবে। সূর্য্যদেবের নিকট হইতে আরোগ্য প্রার্থনা করিতে হয়। সমস্ত আরোগ্যের স্থান হইতেছেন সূর্য্যদেব। "আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ"। ইচ্ছাশক্তিকে প্রবল করিয়া, ভাস্কর দেব হইতে আরোগ্য সংগ্রহ করিবে। এই জন্য আদিত্যমণ্ডল মধ্যে আসন করিয়া, উজ্জ্বল বর্ণে মন্ত্রকে মণ্ডিত করিয়া তাহাই দেখিতে দেখিতে জপ করিতে হয়। কখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জপ করা উচিত নহে। উহাতে লয় আসিয়া যাইবে। আবার নানা দিকে চাহিতে চাহিতেও জপ করা উচিত নহে, উহাতে বিক্ষেপ আসিয়া যায়। জপ করিতে হইলে বাহিরের হউক বা ভিতরের হউক কোন একটি বস্তুর দিকে দৃষ্টি ঠিক রাখিয়া জপ করিতে হয়। যখন দেহের মধ্যে নাসাগ্রেও না রাখিতে পার তখন যাহাতে সুবিধা হয় তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া জপ কর। কিন্তু বাহিরে সূর্য্যমণ্ডল ভাবনা করিয়া করিও।

জপ করিতে করিতে যখন দৃষ্টি অন্যদিকে আসিবে তখন মনও অন্যদিকে গিয়াছে জানিও। সেই সময়ে তুমি ইচ্ছাশক্তিকে প্রবল করিও। ইচ্ছা করিলেই তুমি পার। কেবল ঐ দুয়ের বশে বহুদিন থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে বলিয়া এখন ইচ্ছা সত্ত্বেও—উহারা আক্রমণ করিয়া বসে। তুমি বিশেষ করিয়া চেষ্টা কর। কিছুতেই ছাড়িও না। তোমাকে নির্জ্জনে পাওয়া আমার ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। আমি দেখিতেছি আমার সপত্নীরা আসিতেছে। আমি বিন্দু মধ্যে আমার স্বস্থানে রহিলাম। যাহা বলিলাম ভুলিও না? আমার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতে চাও তবে বিন্দুমধ্যে আমার সেই নিভৃত কক্ষে আসিও। আমার স্থান সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে। তুমি আসিলেই হয়। আমায় ভুলিও না।

সংসার সঙ্গে।

(১)

সংসার! তুমি কি? যে কিছু চায় তারেত তুমি অশান্তিই দাও। যে কিছু চায় না—শুধু আর জায়গা নাই বলিয়া—অন্য কোথায় যাইবার যোগ্যতা নাই বলিয়া শুধু তোমাতে থাকে—তুমি তারেও ত ছাড় না! তোমার কাছে যে সুখ চায় সেই যথার্থ আহাম্মক।

একথা সবাই বোঝে। তবু চায় কেন? এ তোমার কৌশল। যদি আগাগোড়াই তুমি দুঃখটি সম্মুখে ধরিতে তবে কেহই তোমায় লইয়া থাকিতে চাহিত না। কিন্তু তাহা ত তুমি কর না। তুমি যে দুঃখটি দাও, তাহা সুখগন্ধ দুঃখ। এই সুখপ্রলেপটুকুর জন্য লোকে শত দুঃখ পাইয়াও ঐ সুখগন্ধটুকুর জন্য তোমাতে পড়িয়া থাকে। অমৃতের আবরণে বিষ-ঠাকা। অমৃত দিব বলিয়া বিষ দিয়া প্রাণসংহার কর। সংসারে সবাই ত মরিয়াছে, মরিতেছে, মরিবে। সুখে ত কাহারও মৃত্যু নাই। সুখ অমৃত—সুখ স্বরূপ সেই পরমপুরুষ। দুঃখই মৃত্যু। সংসার যদি যথার্থ সুখ দিত তবে ত মরণ কাহারও হইত না।

আচ্ছা দুঃখের বোধ আসিল কোথা হইতে?

সুখের একটা বোধ থাকে তাই দুঃখ কি লোকে জানে।

সংসারের কিছুই সুখকর বোধ হয় না কেন?

কেমন করিয়া বোধ হইবে? মহাদেব গৌরীর নৃত্য দর্শন করিয়াছেন—সে আনন্দ-নৃত্যে মহাদেব আনন্দে মগ্ন হইয়া তুরীয় অবস্থায় স্থিতিলাভ করিয়াছেন। এই মহাদেবের মনোরঞ্জন কি মর্কটের নৃত্যে হইবে? যে জীবচৈতন্য একদিন আপন হৃদয়ে ঈশ্বরচৈতন্যের স্পর্শ অনুভব করিয়াছে, সে কি কখন কপট, ঘৃণিত, কদর্য্য সংসারের হাবভাবে সুখ পাইতে পারে? রাজহংস কি কখন কুৎসিত শৈবাল-জঙ্গলে প্রীতিলাভ করিতে পারে? জ্ঞানবৈরাগ্যে যাঁহার প্রীতি তিনি কি কখন ভোগলাম্পট্যে সুখী হইতে পারেন? পরম সরল পুরুষের সঙ্গ করিয়া যিনি আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, তিনি কি কখন স্বার্থ কৌশলে পরবঞ্চক জম্বুকের ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে পারেন? না তিনি কখন যথেচ্ছাচারী মূঢ়ের শিশুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন?

তাই বলি রে জম্বুক-ধর্ম্মী সংসার! রে শিশুধর্ম্ম হতভাগ্য সংসার! আমি তোমায় পরিত্যাগ করিলাম।

কিরূপে সংসার বুঝিয়া, সংসার-বাসনা ত্যাগ করিয়া সংসারে থাকিতে হয়, তাহারই কৌশল ঋষিগণ যাহা শিখাইয়াছেন তাহাই এখানে আলোচনা করিলাম।

সংসারের কোন কিছু বিপদ আপদে উদ্বিগ্ন হওয়ার নাম মূর্খতা। বিচারের অভাবেই মানুষ মূর্খ হয়।

রোগাদি হইলে পুত্র, কন্যা, বা আত্মীয় বন্ধুবান্ধব যখন যাতনায় ছট্‌ফট করে তখন উদ্বেগ না হয় কার?

সত্য কথা—প্রতীকার সাধ্যমত করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি বিচার কর, মানুষটি কর্ম্মের সমষ্টি, আর যে কর্ম্ম মানুষ করিয়া আসিয়াছে, তাহার ফলভোগ অবশ্যই করিতে হইবে, এজন্য সহ্য করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু মানুষ সহ্য করিতে পারে না কেন?

বৈরাগ্য অভ্যাস করে না বলিয়া শতবার ঠকিয়াও কিছু শিক্ষা হয় না।

(২)

আশ্বাসের কথা।

১। এই জীবনে সপ্তজ্ঞান ভূমিকার প্রথমটিতে উঠিয়াও যদি মরিতে পার, তবে বুঝিও তোমার ভাল হইল।

"ভোগপূর্ণ এই সংসারই আমার প্রিয়" এই নিশ্চয় করিয়া, যে ব্যক্তি নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম করে, সে ব্যক্তি প্রবৃত্তি পথে।

ক্রমাগত ঠকিয়া ঠকিয়া—অনেকবার সংসারে গতায়াতের পরে যখন পুরুষ বিবেকবান্ হয়—বিবেকবান্ হইয়া ভাবে, সংসার অসার, ইহাতে বহু ঠকিলাম, বহুবার বিড়ম্বিত হইলাম, যাহা যাহা প্রিয় ভাবিয়া আসক্ত হইয়াছিলাম তাহাই কে জোর করিয়া কাড়িয়া লইল, এই অসার সংসারে আর আমার কোন প্রয়োজন নাই; পর্য্যুষিত—পূর্ব্বে বহুলোকের ব্যবহৃত কর্ম্মে আমার আবশ্যক কি? তাহাতে কেন আর বৃথা দিনক্ষয় করি—যাহাতে কর্ম্মফল স্বরূপ মৃত্যু উপস্থিত হয়, তাহাতে আমার আর প্রয়োজন নাই। যাহাতে আর জন্ম মৃত্যু হইবে না—এরূপ বিশ্রান্তি কি আছে—সেইরূপ বিশ্রান্তিই আমার আবশ্যক, এইরূপ নিশ্চয় যিনি করিতে পারিয়াছেন, তিনিই নিবৃত্তি পথে।

মানুষ যখন বিচারবান্ হয়, তখন "আমি বৈরাগ্যবান্ হইয়া কিরূপে সংসার সাগর পার হইব" নিরন্তর এই বিচার করে। এতদ্দ্বারা সে ভোগ চিন্তা হইতে বিরত হয়। তখন ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয়। ঈশ্বরের সেবা করিতেছি ভাবনা করিয়া, মানুষ লোকের সহিত ভালবাসা পূর্ণ ব্যবহার তখন করে। এরূপ অবস্থা যখন প্রাপ্ত হয়, তখন মানুষ প্রথম ভূমিকায় আইসে। সংসার নিন্দা, বৈরাগ্য অভ্যাস এবং সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা এই সমস্তই তাহার কার্য্য হয়। ক্রমে সদাচার, ধারণা, ধ্যানাদিতে রুচি হয়। পরে আর কোন বিষয় সঙ্গে ইচ্ছা হয় না। আমি কর্ত্তা নহি, আমি ভোক্তা নহি, এই ধারণা প্রবল করিয়া বাহ্য বস্তুতে অনাস্থা করে। ইহাই দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভূমিকা। ইহার মধ্যে শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, সত্ত্বাপত্তি ও অসংসক্তি পর্য্যন্ত রহিল। এই ভূমিকাতে ভাবনা হয়—সুখ বা দুঃখ যাহা কিছু সমস্তই প্রাক্তন কর্ম্মকৃত ও ঈশ্বরের অধীন। এ বিষয়ে আমার কর্তৃত্ব নাই। ভোগ-রাশিও একরূপ ব্যাধি। সম্পদও বিষম আপদ। আমি কর্ত্তা নহি, ঈশ্বরই কর্ত্তা। পূর্ব্বকৃত বা ইদানীং ক্রিয়মাণ, কোন কর্ম্মই আমার নাই—এই নিশ্চয় করিয়া যে মৌনভাবে থাকা তাহাই তৃতীয় ভূমিকার ফল।

সৎশাস্ত্র, সৎসঙ্গ এই সমস্ত দ্বারা মানুষ প্রথম তিন ভূমিকা পর্য্যন্ত উঠিতে পারে।

হে ভগবন্—যে ব্যক্তি অসৎকুল জাত মূঢ় এবং সৎসঙ্গ যাহার হয় নাই, তাহার উপায় কি ?

ভগবান্ বশিষ্ঠ বড়ই আশ্বাসের কথা বলিতেছেন। তিনি বলিতেছেন :—

যে ব্যক্তি মূঢ়, অসৎকুল জাত, দোষী তাহার সাধুসঙ্গ না ঘটিলেও বিচার বলে তাহার বৈরাগ্যের উদয় হইতে পারে। বৈরাগ্যের অভ্যাস হইলে—সে ব্যক্তিও প্রথম ভূমিকায় উঠিতে পারে।

বৈরাগ্যের উদয়ই ভূমিকা প্রাপ্তির হেতু। যাহার শত জন্ম ধরিয়া আত্ম বিচার ও সাধুসঙ্গেও বৈরাগ্যের উদয় হয় না, সে মূঢ় ব্যক্তির উদ্ধারের উপায় নাই।

বৈরাগ্যের উদয় হইলেই অবশ্যই ভূমিকাপ্রাপ্তি ও তদ্দ্বারা সংসার নাশ হইবে ইহাই শাস্ত্রের সার মর্ম্ম।

জাগ্রৎ অবস্থায় বাহ্যবস্তুর ভেদজ্ঞান থাকে। শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা,

সত্ত্বাপত্তি এবং অসংশক্তি এই ভূমিকা পর্য্যন্ত জাগ্রৎ অবস্থা। পরে স্বপ্নাবস্থা। স্বপ্নাবস্থায় সমস্তই এক হইয়া যায়—ভেদজ্ঞান থাকে না। জগৎপ্রপঞ্চ বিভাগশূন্য, অনাদি, অনন্ত, একবস্তু বলিয়া বোধ হইয়া যায়। ইহা চতুর্থ ভূমিকা।

অধিক বলিবার প্রয়োজন কি?

নিত্য বৈরাগ্য অভ্যাস কর। করিয়া কল্পনা, স্মৃতি ও সঙ্কল্প দূর কর। করিয়া পরিপূর্ণ চৈতন্যকে এই স্পর্শ করিলাম ভাবনা করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাক। সমাধি আসে ভালই, না আসে তাহাও ভাল। অভ্যাস কর, ইহাতে ক্রমে জ্ঞানভূমিকা পার হইয়া জীবন্মুক্ত ও বিদেহমুক্ত হইবে।

হে ভগবন্! কল্পনা, স্মৃতি ও সঙ্কল্প ইহারা কি, এবং ত্যাগই বা হইবে কিরূপে?

বৈরাগ্য অভ্যাস যখন ঠিক হইবে, তখন কল্পনা, স্মৃতি ও সঙ্কল্প ত্যাগ হইবে।

"ইহা আমার হউক" এই ভাবনা দ্বারা চিত্ত যখন বিষয়ের অনুধাবন করে, তাহাকে বলে কল্পনা। বাহ্য বস্তুর অভাবনাই কল্পনা ত্যাগ।

পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণকে বলে স্মৃতি; আর পূর্ব্বে যাহা অনুভূত নহে, তাহারই সঙ্কল্প হয়।

অনুভূত স্মৃতি এবং অননুভূত সঙ্কল্প এই উভয়ই ত্যাগ করিয়া—পরিপূর্ণ পরমশান্ত আনন্দস্বরূপকে ত্রিকোণ মণ্ডল পার হইয়া, এই স্পর্শ করিলাম, এই স্পর্শ করিলাম, এইরূপ ভাবনা করিয়া তূষ্ণীভাবে অবস্থান কর। ইহাই তোমার সাধনা।

মনোযোগ।

মনোযোগ হয় না। কেন হয় না? কি তুমি?

শুধু বকিলে কি হইবে? যাতে হয় তাই বলিয়া দিলে ত ভাল হয়।

গরম হ'লেত চলিবে না। তা কি বলিয়া দি নাই? যখন যা দেখিবে, তখন তাই নিয়ে মেতে উঠিবে, আর যখন দেখা শুনার কিছুই নাই, যখন কাজ করিতে বসিবে—তখন কখন ঢুলিবে, কখন বৃথা ভাবনা করিবে, কখন অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিবে, আর কখন বলিবে কিছুই ভাল লাগে না। এই সব বলিয়া আলস্য অনিচ্ছা করিবে। এই ত তোমার হাল।

আমি ত চেষ্টা করি। তুমি ছাই চেষ্টা কর। উহাকে আবার চেষ্টা বলে? মরিব তথাপি কর্ত্তব্য ছাড়িব না, এর নাম চেষ্টা। তোমারও সব কথা শুনা যাইবে না, তোমাকে করিতেই হইবে।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্ বুঝিতেছি, ইহাই আমার আনন্দপ্রদ গন্তব্য ভূমি, কিন্তু আমি কি উপায়ে এই বিস্মৃতপূর্ব্ব অবস্থায় উপনীত হইব?

আচার্য্য] বৎস! শ্রুতি বলিয়াছেন—'প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি' (কেঃ উঃ ১,১) এই লোক হইতে প্রেত হইলে, তবে এই অমৃতময় স্থান লাভ করা যায়। প্রেত হইবার সময়ে অনিচ্ছুক মানবহৃদয় যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তুমি জীবন থাকিতে থাকিতেই সেই অবস্থা লাভ কর।

শ্রুতি বলেন (বৃঃ আঃ ৪।) প্রয়াণকালে জীব আপন তেজোমাত্রা (ইন্দ্রিয় দেবগণ) যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারে গতাগতি করিতেছিল, তৎসমুদয় লইয়া আপন আসনস্বরূপ হৃদয়দেশে উপস্থিত হয়েন। এদিকে হিরণ্যগর্ভের যে আদিত্যরূপ দৃষ্টি দ্বারা জীবের দৃষ্টি অনুগৃহীত হইয়া বস্তু দর্শন করিতেছিল, তিনিও কর্ম্মক্ষয় নিবন্ধন তাহা প্রত্যাহার করেন, জীব তখন আর দেখিতে পায় না এবং হিরণ্য-গর্ভের শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রত্যাহারে জীব তখন আর শুনিতে পায় না। এইরূপ আঘ্রাণ-শক্তি, আস্বাদ-শক্তি, বাক্‌শক্তি, মননশক্তি, স্পর্শশক্তি, বিজ্ঞান-শক্তি—সর্ব্বশক্তিমান্ হিরণ্যগর্ভের নিগ্রহে—জীব সব শক্তি হারাইয়া দীনহীন পথের কাঙ্গালের মত হৃদয়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবে তদনুগৃহীত পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন যেমন হীনশক্তি হইয়াছিলেন, যেমন অবলীলাধৃত গাণ্ডীব উত্তোলনেও অসমর্থ হইয়াছিলেন, যেমন অশ্রুপূর্ণ দীননয়নে আপন বাসভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন,—জীবও তদ্রূপ আপন লীলাকমলস্বরূপ নয়ন উন্মীলনেও অসমর্থ হইয়া আপন বাহু উত্তোলনেও হীনশক্তি হইয়া নিষ্প্রভ দীননয়নে মহাপ্রস্থানের জন্য আপন আবাসভূমি হৃদয়কমলে প্রত্যাগত হয়।

বৎস! জীব শেষের দিনে পথের কাঙ্গাল হইয়া যে গতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়, তুমি সাধের জীবন থাকিতে থাকিতেই মৃত্যুর অভিনয় করিয়া মৃত্যু-মারণে অভ্যস্ত হও, তুমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে। দেবগণ তোমার সহ-যাত্রী—তুমি হতাশ হইও না। ঐ দেখ তোমার অজ্ঞাতসারে তোমাকে জানাইলে তুমি কোলাহলে তাহাদের শান্তিভঙ্গ করিবে—এই জন্যই যেন তাঁহারা তোমাকে না জানাইয়া প্রতিনিয়ত কোথায় যাইতেছেন—তুমি উঁহাদের সহযাত্রী হও। শ্রুতি বলিতেছেন—'মধ্যে বামনধাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে' জননী-প্রজ্বালিত এই মঙ্গল প্রদীপ দেখ, তাঁহারা কি করিতেছেন—ঐ দেখ, তোমার চক্ষু কর্ণ নাসা

জিহ্বা ত্বক্ প্রভৃতিতে অধিষ্ঠিত সূর্য্য, দিক্, অশ্বিনীকুমার, বরুণ, বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণ রূপশব্দ গন্ধ রস স্পর্শরূপ উপহার হস্তে লইয়া প্রজাকুল যেমন উপঢৌকন-হস্তে রাজ-দর্শনে যায় এবং রাজার নিকট উপহার নিবেদন করে,—তদ্রূপ সর্ব্বদা গমন করিতেছেন; তুমি ইহাদের সঙ্গ লইয়া গমন কর। মরণসময়ে যেমন জীবগণ ইন্দ্রিয়াদি লইয়া হৃদয়দেশে আগমন করে তুমি উপাসনার জন্য তাহাই কর এবং অনুগ্রাহক দেবতা হিরণ্যগর্ভের নিকট প্রথমেই প্রার্থনা কর—হে হৃদয় দেব! আমারই দুষ্কৃতিফলে কামলোলুপ আমারই চিত্তের প্রার্থনানুসারে যে তুমি আপন চক্ষুকর্ণাদি দেবতা দ্বারা আমার ইন্দ্রিয়নিচয়কে অনুগ্রহ করিয়া, আমার চিত্তের নিকটে অবরেণ্য ভর্গের ভূর্ভুবঃস্বঃ মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছিলে—করুণাময়! আর আমি তোমার ঐ পাপকাশিনী ঘোরা মূর্ত্তি দেখিতে চাহি না, তুমি তোমার অমৃতময় বরেণ্য মূর্ত্তির দিকে আমাকে লইয়া যাও, তোমার ইন্দ্রিয় দেবতাগণকে তোমার অঙ্গে মিলাইয়া লইয়া আমার ইন্দ্রিয়-গণকে আমার অঙ্গে মিলাইয়া দাও; তুমি আমার আচার্য্য! আমি পতিত হইয়াছি, তুমি আবার আমায় উপনীত কর—এইরূপ নিরন্তর প্রার্থনা কর, তিনি প্রসন্ন হইবেন, এবং তুমিও হৃদয়কমলমধ্যে ত্রিকোণরূপী শুদ্ধ সত্ত্বময় জ্যোতির্ম্মণ্ডলে উপনীত হইতে পারিবে এবং আপনাকে জ্যোতির্ম্ময় বসনধারী তৈজসপুরুষরূপে এবং আচার্য্য আমাকে হিরণ্যগর্ভরূপে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। তখন তুমি বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়া একাগ্রতা সাধনার সুযোগ পাইবে; তখনকার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা এখন নহে, হিরণ্যগর্ভরূপে আমিই তোমায় বলিয়া দিব—আপাততঃ এই সাধনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ কর।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্! আপনার সঙ্গের পবিত্রতায় এবং তমোহারী উপদেশে আমার চিত্ত বিশোধিত হওয়ায় আমি এই বিশোধিত চিত্ত-দর্পণে ক্ষণেকের জন্য যে ছবি দেখিতেছি, উহা স্থায়িভাবে দেখিবার অধিকার কি আমি লাভ করিতে পারিব? জল যেমন আপনাতেই উৎপন্ন কুম্ভিকা (পানা) রাশি দ্বারা আপনিই আচ্ছাদিত হইয়া থাকে,—আমিও যে সেইরূপ—এখনও কামনা-জালে আচ্ছাদিতই রহিলাম!

আচার্য্য] বৎস! যে উপায়ে কর্ম্ম করিলে স্থায়ী চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়, তাহা তোমাকে বলিয়াছি। তুমি আলস্য, অনিচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া অনুরক্ত-হৃদয়ে ঐ

নিয়মে বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, অবশ্যই তুমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবে।

ব্রহ্মচারী] সোম—লতা বিশেষ—উহা কিরূপে অলঙ্কৃত হয়?

আচার্য্য] সোমরস সংস্কারের জন্য কতিপয় মন্ত্র আছে, মন্ত্র দ্বারা সোমরসের যে সংস্কার, তাহাকেই উহার অলঙ্কার বলা হয়—ইহাই আচার্য্য সায়ণ কৃত আধিভৌতিক ব্যাখ্যা। আধ্যাত্মিক ভাবে শ্রুত্যর্থ গ্রহণ করিতে হইলে, ইহা অন্যরূপ বুঝিতে হয়।

ব্রহ্মচারী] যজ্ঞের সর্ব্ববিধ উপকরণই ভৌতিক। এরূপ স্থলে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা কি সঙ্গত?

আচার্য্য] ভগবান্ বেদব্যাস স্বকীয় সংহিতায় বলিয়াছেন—

অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিণোবরাঃ।
ধারিভ্যশ্চার্থতত্ত্বজ্ঞা স্তেভ্যো হ্যধ্যাত্ম-চিন্তকাঃ॥

অর্থাৎ অজ্ঞ অপেক্ষা গ্রন্থী শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা গ্রন্থলিখিত বিষয়ে ধারণাসম্পন্ন জন শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে অর্থতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ তদপেক্ষা অধ্যাত্ম-চিন্তাশীল অধিকারী শ্রেষ্ঠ।

বস্তুতঃ একদিকে যেমন অধ্যাত্ম-চিন্তা ভিন্ন সূক্ষ্মতত্ত্ব সরস হয় না, অপরদিকে-বিনা অধ্যাত্ম-চিন্তায় চিত্ত প্রসার লাভ করে না। এই জন্যই মাঝে মাঝে আমি তোমার নিকট শ্রুতির আধ্যাত্মিক অর্থ সম্বন্ধে একটু একটু ইঙ্গিত করিব। এখানেও দেখ, সোম শব্দের আধিভৌতিক অপেক্ষা আধ্যাত্মিক অর্থ কত সরসতর।

সোমশব্দে চন্দ্র ও সোমলতা—এখানে যদি চন্দ্র অর্থ গ্রহণ করিয়া সোম শব্দে চন্দ্রাধিষ্ঠিত মন এই অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে অর্থ হয়,— 'ইমে সোমাঃ' অর্থাৎ (আমার) এই চিত্ত (বৃত্তিসমূহ) অলঙ্কৃত হইয়াছে অর্থাৎ মৈত্রী, করুণা ইত্যাদি ভাবনা দ্বারা প্রসাধিত হইয়াছে, অতএব হে অন্তরীক্ষস্থান-বাসিন্! হৃদয়-দেব বায়ো, তুমি এস। হে ভাবগ্রাহন্! তুমি হৃদয়-নিহিত তোমারই জন্য যত্ন সঞ্চিত ভাবরাশি—উপভোগ কর। আমাদের এই আহ্বানে কর্ণপাত কর। এইরূপ অর্থ শুনিতেই শুনিতে মনে হয় বিরহ-বেদনা-ক্লিষ্ট কঙ্কালসার অযোধ্যাবাসী পৌরগণ রামাগমন-সংবাদে উৎফুল্ল এবং যথাসম্ভব বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া যেমন পিপাসু-নয়নে রামের আগমন পথ চাহিয়াছিল,

যাজ্ঞিকও যেন ঠিক সেইরূপ ভাবাবেশমন্থর আপন হৃদয়খানি লইয়া হৃদয়-দেবতার প্রত্যুদ্গমন করিতেছেন।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্! আধ্যাত্মিক ভাবে ইহার এত সুন্দর অর্থ হয় তাহা আমার ধারণা ছিল না। যাহা হউক এই মন্ত্রে আমার আর সন্দেহ নাই, কেবল একটী কথা বলিবার আছে—আপনি এই দ্বিতীয় সূক্তের প্রারম্ভে বলিয়াছেন—প্রউগ শস্ত্রে এই সূক্তের বিনিয়োগ। এখানে আমার প্রশ্ন প্রউগ শস্ত্র কি? এবং কোন্ কোন্ মন্ত্র প্রউগ শাস্ত্র বিনিযুক্ত?

আচার্য্য] বৎস! ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তৃতীয় পঞ্চিকার প্রথম অধ্যায়ে এবিষয় বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে, আমি সংক্ষেপে তাহারই মর্ম্ম উপদেশ করিতেছি। অগেয়-মন্ত্র-সাধ্য স্তুতিকে শস্ত্র বলে আর গেয়-মন্ত্র-সাধ্য স্তুতিকে স্তোত্র বলে। ঋগ্বেদীয় ঋত্বিক্ শস্ত্র প্রয়োগ করেন, আর সমবেদজ্ঞি ঋত্বক্ স্তোত্র প্রয়োগ করেন।

আজ্য, প্রউগ, ইত্যাদি নামে শস্ত্র বহুসংখ্যক তন্মধ্যে কতিপয় শস্ত্রের নাম পরে প্রসঙ্গ-ক্রমে লিখিত হইবে।

ঐতরেয় শ্রুতি বলেন—দেবরথো বা এষ যদ্‌যজ্ঞ স্তস্যৈতাবন্তরৌ রশ্মী—যদাজ্য প্রউগে, (ঐঃ ব্রাঃ ২ ৫।৫)

অর্থাৎ যজ্ঞ দেবতাগণের রথস্থানীয়, আজ্য শস্ত্র এবং প্রউগ শস্ত্র এই যজ্ঞরূপ রথের অশ্ববন্ধন-রজ্জু স্বরূপ। যেমন অশ্বদ্বয়ের গলবন্ধ-সংযুক্ত রশ্মিদ্বয় সারথি কর্ত্তৃক-ধৃত হইয়া অশ্বদ্বয়ের বিপথ গতির বাধা জন্মায়, তদ্রূপ এই শস্ত্রদ্বয় যজ্ঞব্যাপারকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করিয়া রক্ষা করে।

ঐতরেয় শ্রুতি প্রউগ শস্ত্রের পরিচয় প্রসঙ্গে—বলিয়াছিলেন 'গ্রহোকৃথং বা 'এতদ্ যৎ প্রউগম্'। অর্থাৎ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে সর্ব্বশুদ্ধ যে তেত্রিশটি গ্রহ (যজ্ঞীয় সোমরসের পাত্র) আবশ্যক হয় এই গ্রহ সমূহের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন দেবতা আছে। এই গ্রহদেবতাগণের প্রশংসা-মন্ত্র সমূহই প্রউপ শস্ত্র নামে অভিহিত।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূক্তে সর্ব্বশুদ্ধ ২১টি মন্ত্র, ইহা সাতটি তৃচে বিভক্ত। একএকটি তৃচে তিনটি করিয়া ঋক থাকে এই সাতটী তৃচের দেবতাও সাতটি যথা বায়ু, ইন্দ্রবায়ু, মিত্রাবরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র, বিশ্বদেব এবং সরস্বতী। এই সাতটিই প্রউগ দেবতা। এই সাতটী দেবতার স্তুতি স্বরূপ ঋগ্‌বেদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূক্তের মন্ত্রসমূহ প্রউগ শস্ত্র নামে পরিচিত।

বায় উক্‌থেভি-র্জরন্তে ত্বা মচ্ছা জরিতারঃ। সুত-সোমা অহর্বিদঃ॥ ২

পদানুসরণী] হে বায়ো জরিতারঃ স্তোতারঃ ঋত্বিগ্‌যজমানাঃ ত্বা মচ্ছ ত্বামভিলক্ষ্য উক্‌থেভিঃ আজ্য প্রউগাদি শস্ত্রৈঃ জরন্তে স্তুবন্তি, কীদৃশাঃ জরিতারঃ? সুত-সোমাঃ, সংস্কৃতেন সোমেন উপেতাঃ। অহর্বিদঃ, অহঃশব্দঃ একেনাহ্না নিষ্পাদ্যে হ্যগ্নিষ্টোমাদিক্রতৌ বৈদিক ব্যবহারেণ প্রসিদ্ধঃ, ক্রতু ভিজ্ঞা ইত্যর্থঃ।

পদনিষ্যন্দিনী] বায় (হে দেব বায়ো) উকেথভিঃ (আজ্য প্রউগ প্রভৃতি শস্ত্রনামক ঋগ্‌বেদীয় মন্ত্র সমূহ দ্বারা) জরন্তে (স্তুতি করিতেছেন) ত্বা মচ্ছ (তোমাকে লক্ষ্য করিয়া) জরিতারঃ (ঋত্বিক্ যজমান প্রমুখ স্তোতৃবৃন্দ) সুত-সোমাঃ (সংস্কৃত সোমরস লইয়া বর্ত্তমান) অহর্বিদঃ (একাহ-নিষ্পাদ্য অগ্নিষ্টোমাদিক্রতুবিষয়ে অভিজ্ঞ)।

বঙ্গানুবাদ] হে দেব বায়ো! ঋত্বিক্ যজমান প্রমুখ স্তোতৃবৃন্দ তোমাকে লক্ষ্য করিয়া আজ্যপ্রউগাদি নামক নানাবিধ ঋগ্‌বেদীয় মন্ত্রের সাহায্যে—স্তুতি করিতেছেন। তাঁহারা সংস্কৃত সোমরস লইয়া বর্ত্তমান, এবং অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞব্যাপারে অভিজ্ঞ।

ব্রহ্ম] ভগবন্! উক্‌থ শব্দের ব্যাখ্যায় আপনি বলিলেন—আজ্যশস্ত্র প্রউগ শস্ত্র প্রভৃতি। তন্মধ্যে আজ্যশস্ত্র ও প্রউগশস্ত্র সম্বন্ধে এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রে আপনি উপদেশ করিয়াছেন অন্যান্য শস্ত্র সম্বন্ধে কি এখানে আমাকে উপদেশ করিবেন?

আচার্য্য] বৎস! বলিতেছি শ্রবণ কর। উক্‌থ অর্থে শস্ত্র, বচ্ ধাতু হইতে উক্‌থ শব্দ এবং শন্‌স্ ধাতু হইতে শস্ত্র শব্দ নিষ্পন্ন; উভয়েরই অর্থ স্তুতি। কিন্তু বৈদিক প্রয়োগে উহা ঋক্‌মন্ত্র-নিষ্পাদ্য স্তুতি-অর্থে প্রযুক্ত। উক্‌থ বা শস্ত্র প্রথমতঃ দ্বিবিধ—পবমানোক্‌থ ও গ্রহোক্‌থ (ঐঃ ব্রাঃ ভাঃ ৮।১।১)। আজ্যশস্ত্র, মরুত্বতীয় শস্ত্র, নিষ্কেবল্য শস্ত্র, বৈশ্বদেব শস্ত্র এবং আগ্নিমারুত শস্ত্র পবমানোক্‌থ নামে অভিহিত। এতদ্ভিন্ন প্রশাস্তা ব্রাহ্মণাচ্ছংসী এবং অচ্ছাবাক্ পাঠ্য ঐগ্রান্ন শস্ত্র পবমান শস্ত্রেরই অন্তর্গত। আর প্রউগ শস্ত্রকেই গ্রহোক্‌থ বা গ্রহ-শস্ত্র বলে।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্! এ সম্বন্ধে কি আমার কিছু জ্ঞাতব্য আছে?

আচার্য্য] এসম্বন্ধে আরও কতিপয় বিষয় বক্তব্য আছে, বৎস! বলিতেছি প্রণিহিত মনে শ্রবণ কর। ঐতরেয় শ্রুতিতে আজ্য ও প্রউগ শস্ত্রের

আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক অর্থ সমাম্নাত রহিয়াছে, উল্লিখিত শস্ত্রদ্বয়ের সহিত অধিকতর পরিচয়ের জন্য সৎসমুদয় তোমার জানা আবশ্যক। তন্মধ্যে প্রথমতঃ আজ্য শস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা কর। ঋক্ সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের সাতটি মন্ত্র আজ্যশস্ত্র নামে অভিহিত। দেবতাগণ এই শস্ত্র অবলম্বন করিয়া প্রাতঃকালে অসুরগণকে সম্যক্‌রূপে নির্জ্জিত করিয়াছিলেন; এই জন্য ইহা (আ-সম্যক্‌রূপে, জি অর্থাৎ জয় করা যায় যাহাদ্বারা) আজ্যশস্ত্র নামে অভিহিত। বিজ্ঞান সহকৃত আজ্যশস্ত্র পাঠে ঋত্বিগ্ ও যজমানের প্রাণ, মন, বাক্, শ্রোত্র, অপান, চক্ষু, এই অবয়ব সমূহ সংস্কৃত হয়; পরিশেষে ঋত্বিগ্ এবং যজমানও সংস্কৃত হয়েন।

আমি তোমাকে ঐতরেয় শ্রুতির নির্দ্দেশ অনুসারে প্রাণাদি সংস্কার ক্রম প্রদর্শন করিতেছি—তৃতীয় মণ্ডলগত আজ্য শস্ত্রের প্রথম মন্ত্র—প্রবো দেবাযাগ্নয়ে ইত্যাদি। মন্ত্র ও প্রাণ উভয়েরই আদিতে প্রশব্দ রহিয়াছে এই জন্য এতদুভয়ের সাম্য আছে স্বীকার করা হয়, বিশেষতঃ মন্ত্রের আদিস্থিত প্রশব্দ (আদ্যক্ষর সাম্যে) প্রাণস্বরূপ। যেহেতু ভূতনিচয় কি সৃষ্টি, কি স্থিতি, কি প্রলয়, সর্ব্বত্রই প্রাণের অনুসরণ করে অর্থাৎ প্রাণস্পন্দনের অনুগৃহীত হইয়া অন্যান্য ভূত নিচয়ের স্পন্দন হয়, সুতরাং অগ্রে প্রাণের সংস্কার আবশ্যক, এইজন্য প্রাণস্বরূপ প্রশব্দ পূর্ব্বে লইয়া যে মন্ত্রে সমাম্নাত হইয়াছে ইহা দ্বারা প্রাণসংস্কার করা হইতেছে। এইরূপ মনঃ সংস্কারের জন্য আজ্য শস্ত্রের দ্বিতীয় মন্ত্র। অধ্যয়ন ক্রমে ইহা পঞ্চম মন্ত্র হইলেও "প্রয়োগকালে ইহা দ্বিতীয় স্থানে গৃহীত হয়) উচ্চারণ করা হয়। দ্বিতীয় মন্ত্র—দীদিবাংস মপূর্ব্ব্যম্ ইত্যাদি। এই মন্ত্রের "দীদিবাংসম্' এবং 'অপূর্ব্ব্যম্' এই দুইটী পদই মনের বাচক। কেননা, দিবাংসম্ অর্থে দীপ্তিযুক্ত, মনই আপন সত্ত্ব-প্রকাশে দৃশ্যপদার্থ নিচয় উদ্ভাসিত করে। আর অপূর্ব্ব্যম্ অর্থে পূর্ব্ববৃত্তি অর্থাৎ যাহার পূর্ব্বে আর কোন ইন্দ্রিয় প্রবুদ্ধ নহে মনই সংকল্প দ্বারা অন্য ইন্দ্রিয়গ্রামকে উদ্বোধিত করিয়া স্বকার্য্যে নিযুক্ত করে—সুতরাং মনই অপূর্ব্ব্য। অতএব 'দীদিবাংসমপূর্ব্ব্যম্' ইত্যাদি মন্ত্রের উচ্চারণে মনের সংস্কার সাধিত হয়। এইরূপ 'সনঃ শর্ম্মাণিবীতয়ে' ইত্যাদি মন্ত্র বাক্-সংস্কারের জন্য ব্যবহৃত হয়। উদ্ধৃত মন্ত্রে যে শর্ম্ম শব্দ রহিয়াছে উহার অর্থ বাক্। শর্ম্ম শব্দে বাক্ অর্থ বুঝিবার কারণ এই—শিষ্যের বাগিন্দ্রিয় গুরুকর্ত্তৃক উচ্চারিত অর্থের প্রতিধ্বনি করিয়া শম্ম বা সুখযুক্ত জীবনলাভের কারণরূপে

পরিণত হয়, এই জন্য বাক্ শর্ম্ম নামে অভিহিত। এই জন্য শর্ম্মশব্দযুক্ত মন্ত্রে, বাকের সংস্কার সম্পাদিত হইয়া থাকে। এইরূপ উতনো ব্রহ্মন্নবিষ ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্মশব্দ উচ্চারিত হইয়াছে বলিয়া—এই মন্ত্র দ্বারা শ্রবণের সংস্কার করা হয়; এখানেও শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা ব্রহ্ম বা বেদ গৃহীত হয় বলিয়া ব্রহ্মশব্দের অর্থ শ্রবণেন্দ্রিয়। এইরূপ 'স যন্তা বিপ্র এষাম' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অপানের সংস্কার সম্পাদিত হয়; কারণ অশ্ব নিচর্মাচিত্ত যন্তা বা সারথির স্থায় নিশ্বাসরূপ অপান বায়ু দ্বারা নিয়মিত হইয়া প্রাণবায়ু ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বাহ্যদেশে গমনাগমন করিয়া থাকে এই জন্য উদ্ধৃত মন্ত্রস্থিত যন্তা পদ অপানবাচক। এইরূপ "ঋতো বা যস্য রোদসী" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা চক্ষুর সংস্কার করা হয়। উদ্ধৃত মন্ত্রস্থিত—ঋত শব্দ চক্ষুবাচক। কারণ বস্তু নির্ণয়ার্থ বিবাদকালে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষই সমধিক শ্রদ্ধেয়; এই জন্য চক্ষুর নাম ঋত। এইরূপে আজ্য শস্ত্রীয় ছয়টি মন্ত্র দ্বারা যজমানের ষড়ঙ্গ সংস্কার সাধিত হয় এবং উপসংহার মন্ত্রে সমস্ত অবয়ব সম্পন্ন পুরুষের সংস্কার সম্পাদিত হয়। অপিচ এই মন্ত্রে প্রতিদিন বর্দ্ধমান সহস্রসংখ্যক পুত্র পৌত্রাদি গো অশ্ব প্রভৃতি প্রভূত রত্ন কনকাদি এবং অনুপক্ষীয়মাণ (প্রতিদিন বর্দ্ধিষ্ণু) ধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। বৎস! পূর্ব্বোক্তরূপে সংস্কারপ্রাপ্ত যাজ্ঞিক, প্রতিদিন বর্দ্ধিষ্ণু কোন্ ধন প্রাপ্ত হন, তাহা তোমাকে প্রথম সূক্তে পোষমেব দিবে দিবে এবং 'রত্নধাতমম্' এই দুই পদের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্! যজ্ঞ-দীক্ষিত যজমান ত গর্ভাধানাদি বহু সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছেন। বিশেষতঃ উপনয়ন সংস্কারে ত এই যাজ্ঞিকই মানবক অবস্থা হইতে হিরণ্যগর্ভরূপ আচার্য্য সমীপে উপনীত হইয়াছেন, তৎপর আরও কি পাপ অবশিষ্ট রহিয়াছে যে, পুনরায় যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইয়াও তাঁহার সংস্কার আবশ্যক হইতেছে?

আচার্য্য] বৎস! মায়ালেপই আত্মার পাপ। আত্মা স্বয়ং জ্যোতিঃ, মায়ালেপ যতই সত্ত্ববহুল হউক না কেন, তাহা পাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আত্মা জ্যোতির্ম্ময়, আর পাপ অন্ধকার তুল্য। অনাদি অভিমান বা অধ্যাসের ফলে এই আলো আঁধার মিশিয়া জীবভাব আসিয়াছে। হিরণ্যগর্ভই আদি জীব, তৎপর বিরাট্, তৎপর বিশ্বনামক (জরায়ুজ অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ) চতুর্ব্বিধ জীব। হিরণ্যগর্ভই এই বিকসিত পাপময় সংসাররূপ অশ্বত্থ'বৃক্ষের মূল; মায়া ইহার

বীজ। আপন ব্যষ্টি অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মূল অভিমানে ফিরিয়া, জীব হিরণ্যগর্ভরূপ ধারণ করিলেও পাপ অবশিষ্ট থাকে; তখনও বীজরূপিণী অঘটন-ঘটনাপটীয়সী অনন্ত হিরণ্যগর্ভ-প্রসূতি মায়া অবশিষ্ট থাকেন। এই মায়া-কুহক জ্ঞান—বিনাশ্য। কিন্তু বৎস! আমি তোমাকে এখানে কর্ম্ম বিনাশ্য পাপের কথাই বলিতেছি মায়ারূপ পাপবীজের কথা বলিতেছি না। সত্য বটে আচার্য্য তোমাকে তৈজস স্বরূপে উপনীত করিয়াছেন, আপন হিরণ্যগর্ভরূপ পরিচয় পূর্ব্বক তদীয় ধ্যানে তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তুমি সে ভাবে থাকিতে পার কই! জানুচারী শিশুর পাদচারণ মায়ের অভিলষিত বলিয়া মা তাহাকে হাতে ধরিয়া হাঁটিতে শিক্ষা দিলেও অনভ্যস্ত শিশু যেমন আপনি হাঁটিতে যাইয়া শতবার স্খলিত হয়, এবং আপন অনভ্যাস জ্ঞাপন করে, তদ্রূপ তোমার অনভ্যস্ত দৃষ্টি এখনও যে হিরণ্যগর্ভের মনোরম সুষমা হইতে স্খলিত হয়, সুতরাং হিরণ্যগর্ভধারণার প্রতিবন্ধকস্বরূপ পাপরাশি ক্ষালন আবশ্যক, এই জন্যই বজ্ঞসংস্কার আবশ্যক হইয়াছে।

ভগবান্ মনু বলেন—

> বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈ র্নিষেকাদি র্দ্বিজন্মনাম্।
> কার্য্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ॥
> গার্ভৈর্হোমৈ র্জাতকর্ম্ম-চৌড়মৌঞ্জী নিবন্ধনৈঃ।
> বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানা মপমৃজ্যতে॥
> স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈ স্ত্রৈবিদ্যেনে জ্যয়া সুতৈঃ।
> মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥

(মনুসংহিতা ২অঃ ২৬—২৮ শ্লোঃ)

অর্থাৎ বেদ মূলক এবং বেদমন্ত্র সাধ্য পবিত্রতা জনক ক্রিয়াকলাপদ্বারা দ্বিজাতির গর্ভাধানাদি সংস্কার অনুষ্ঠেয়। এই সমুদয় সংস্কার ইহলোকে পাপরূপ মলরাশি প্রক্ষালন করিয়া দ্বিজাতি শিশুকে বেদাধ্যয়নাদ অধিকার প্রদান করে, এবং পরলোকে পবিত্রগতি প্রদান করে।

বৎস! মনে করিও না, বিষয়ানভিজ্ঞ শিশুর এত পাপ কোথা হইতে আসিল। বিস্মৃতির আবরণ উন্মোচন করিয়া প্রণিহিত মনে চিন্তা কর; দেখিবে আজ তুমি দেহ ও ইন্দ্রিয় নিচয়ের যে উপচীয়মান অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতেছ ইহা এক সময়ে ছিল না। তুমি যখন পিতৃহৃদয়ে শুক্রদেহে অবস্থিত ছিলে, তখন হইতে

য

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৮ম বর্ষ।] ১৩২০ সাল, মাঘ। [১০ম সংখ্যা

মেনকার প্রতি উমা—গান।

নাই আভরণ এমন কথা মুখে এনোনা মা আর,
আমি কেবল করতে পারি মা অলঙ্কারের অহংকার।
এ জগৎ বটে মা আমার অলঙ্কার-সাজান থাল,
প্রাতমর্ধ্য সায়ংকালে পরায়ে দেয় স্বয়ং কাল;
আবার নিশাকালে ব'দলে পরায়,
তাতে আলো আঁধার দুই দেখা যায়,
বল মা তবে কার মা ভবে
আছে এমন অলঙ্কার।
কে বলে মা তোমার উমার অলঙ্কারের অপ্রতুল,
পরি আমি স্থির তড়িতের সূতায় গাঁথা তারার ফুল;
প'রে থাকি তাই মা বলি ইন্দ্রধনুর একাবলী
তা বৈ বৈজয়ন্তী কি মা প'র্‌বে বৈজয়ন্তীর হার।
জীবের জীবন নাসার নোলক জানে তা'ত সর্ব্বজন,
পদ্মপত্র জলের মতন দোলে যে তা সর্ব্বক্ষণ।

জ্ঞানসমুদ্রের মহারতন, উপনিষৎ কর্ণভূষণ
মুকুট আমার সদানন্দ
নাশেন ভবের অন্ধকার।
বরাভয় মোর হাতের বলয়, তাত সবার জানা কথা,
করুণার কঙ্কণ পরি মুক্তিফলে মালা গাঁথা ;
মায়া-যন্ত্রে কায়া ঢাকি সদা সঙ্গোপনে থাকি,
নিতম্বে সতত পরি সপ্তসিন্ধুর চন্দ্রহার।
অষ্টসিদ্ধির নূপুর পরি তাইতে বেশী অনুরাগ,
পুণ্যগন্ধ স্বরূপিণী স্বয়ং শ্রী মোর অঙ্গরাগ।
ব্রহ্মা আমার অলক্তের জল, কেশব আমার চক্ষের কাজল,
কালানল তাম্বূল আমি
চর্ব্বণ করি বারম্বার।
গোবিন্দ দেখেছে মাগো সুধাইলে বলবে সেই
বাছা বাছা কাঁচা মেঘের আমলা বেঁটে মাথায় দেই
পোহাইলে বিভাবরী শিশু সূর্য্যের সিন্দূর পরি
চাঁদ বেটে চন্দনের ফোঁটা
দিয়ে থাকি অনিবার ॥

৺ গোবিন্দ চৌধুরী
শেরপুর।

সময়ে কাজ।

ভাবনার সময় কর্ম্ম করিও না, আর কর্ম্মের সময় ভাবনা করিও না। যখন সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম কর তখন নিষ্কাম ভাবেই কর্ম্ম করিয়া যাও। তুমি প্রসন্ন হও—এই ভাবটি মাত্র মনে রাখিয়া কর্ম্ম করিয়া যাও। সম্মুখের পাত্রের জল—তাহাকে জলরূপী তুমি ভাবনা করিয়া তাহাই মস্তকে দিতেছ এই জল স্পর্শে তোমার স্পর্শ হইতেছে ভাবনা করিয়া কর্ম্ম করিয়া চল। সূর্য্যোপস্থানে সূর্য্যরূপে তুমি

ভাবনা করিয়া কর্ম্ম কর। আর প্রতি কর্ম্মকালে বলিতে থাক প্রসন্ন হও। প্রসন্ন যে হইতেছ তাহা বুঝাইয়া দাও।

ভূত দেখিয়াছ? ভূত ত চক্ষে দেখা যায় না। কিন্তু ভূতের ভয় ত অনেকেই পান। আর ভূত যে অনেকেই দেখেন—সে দেখা এই চক্ষের দেখা নহে, অনুভব চক্ষের দেখা।

রাত্রিতে কোথাও যাইতেছি। যাইতেছি একা। চারিদিক্ নিস্তব্ধ। হঠাৎ যেমন মনে হয় কেহ যেন দাঁড়াইয়া আছে। এটা যেমন অনুভব—সেইরূপ অনুভব যখন ঈশ্বরসম্বন্ধে হইবে, তখন বুঝিও কিছু হইতেছে। প্রাতঃকৃত্য পরে যখন নির্জ্জনে একাকী দাঁড়াইয়া আকাশ পানে চাহিবে, তখন সূর্য্য-কিরীটিনী ঊষা দেখিয়া যদি চমকিয়া উঠ আর বল এই যে তুমি; তুমি কুমারী; শুধু কল্পনার বলা নয়—শুধু কবিতা নয়—ভূত দেখার মত যখন হৃদয় কাঁপিয়া উঠিবে, তখন জানিব হাঁ তাঁর অনুভব হইতেছে।

আবার মধ্যাহ্নে নীল আকাশ যখন অতি তরল অগাধ জলরাশির মত নিস্তরঙ্গ ভাবে থাকিয়াও গলিত অভ্রমত কি এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করে —সম্মুখে পর্ব্বত আর চারিদিকে জনপ্রাণী নাই সেইরূপ নির্জ্জন স্থানে দাঁড়াইয়া যখন ভাবিবে এই যে মা—মা যুবতী মূর্ত্তিতে এই মাত্র জগৎ-জীবকে আহার দিয়া যেন দাঁড়াইয়াছেন—একটা সত্তা যখন তোমার প্রাণে আসিবে, তখন জানিও হাঁ ঈশ্বরকে ডাকা হইয়াছে।

বিনা নির্জ্জনে এ ভাব আসিবে না, আর কর্ম্মকালেও এভাব আনিতে পারিবে না।

সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম করিয়া মন্ত্রের অর্থ চিন্তারূপ স্বাধ্যায়ও নিত্য কর্ত্তব্য। পরে একান্তে যাও; যদি সৎকর্ম্ম করিয়া থাক, তবে সময়ে সময়ে অকস্মাৎ ঐরূপ ভাব আসিয়া পড়িবে। তুমিও ধন্য হইয়া যাইবে।

কল্পনায় বুঝা এক, আর সত্য সত্য অনুভব করা এক। সঞ্জয় বিশ্বরূপ বর্ণনা করিতে করিতে ঐরূপ অনুভব করিয়াছিলেন; তাই তাঁহার শরীর পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চ হইয়াছিল। অর্জ্জুনও কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া তাহাই যে বিশ্বরূপ তাহা কৃষ্ণকৃপায় দেখিয়াছিলেন। তুমিও বৈরাগ্য মাখিয়া ব্যাকুল হইয়া, প্রসন্ন হও—প্রসন্ন হও—বলিতে বলিতে তাঁহার আজ্ঞাপালন জন্য কর্ম্ম করিয়া যাও। যদি সুকৃতকর্ম্মা হও তবে ঐরূপ অনুভব করিবে। তাই বলা

হইতেছে সন্ধ্যা করার সময় স্বাধ্যায় করিও না, আর স্বাধ্যায় করার সময় সন্ধ্যা করিও না। সময়ের কাজ সময়ে কর, ঠিক হইবে।

এইরূপ গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়া সন্ন্যাসীর চাল চালিও না। আর সন্ন্যাসী হইয়া গৃহীর কর্ম্ম করিও না। আবার বালক হইয়া যুবার কার্য্য করিও না, যুবা হইয়া বালক সাজিও না। যদি কর, তবে তুমি ভ্রষ্ট। তাই বলিতেছি সময়ের কাজ সময়ে কর।

আবাহন-ধ্যান-মন্ত্রজপ।

১। উপাসনা, চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তএকাগ্রতার জন্য। বিচার, জ্ঞান লাভের জন্য। জ্ঞানলাভ হইলে যে আপনিই আপনিভাবে স্থিতিলাভ হয়, তাহাকেও কেহ কেহ নির্গুণ উপাসনা বলেন। আপনিই আপনি ভাবে স্থিতিলাভ করিবার জন্য দুইটি উপায় আছে। প্রথম উপায় আপনিই আপনি বস্তুটি বিশ্বরূপ ধারণ করেন—বিশ্বরূপে আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য। সূর্য্যদেব যেমন রশ্মিতে আপনাকে প্রকাশ করেন—সেইরূপ অবিজ্ঞাতস্বরূপ যিনি, বাক্য ও মনের অগোচর যিনি, ব্রহ্ম যিনি—তিনি শক্তিতে আপনাকে প্রকাশ করেন। শক্তি আবার অব্যক্ত। সেই শক্তিও অবয়ব ধারণ করিয়া ব্যক্তাবস্থায় আগমন করে। অব্যক্ত যিনি, তিনি ব্যক্তাবস্থায় আসিতে গেলেই অবয়ব ধারণ চাই। যন্ত্র না হইলে, অব্যক্ত শক্তি ব্যক্তাবস্থায় আসিতে পারিবে না—শক্তির প্রকাশ হইবে না।

২। ব্রহ্মে স্বভাবতঃ মণিতে ঝলক উঠার মত, শক্তি উঠে। শক্তি উঠিলে, সেই শক্তি যুক্ত হয়েন বলিয়া ব্রহ্ম শক্তিমান্। নতুবা শক্তি যখন উঠে না—শক্তি যখন ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন অবস্থায় থাকেন,—যে অব্যক্ত অচিন্ত্য অবস্থায় শক্তিকে আছেও বলা যায় না, নাইও বলা যায় না,—আছে বলিলে অনুভূতি নাই বলিয়া দোষ যখন আইসে, নাই বলিলে শক্তি উদয় হইল কোথা হইতে ইত্যাদি দোষ যখন পড়ে,—নাইও বলা হয় না, আছেও বলা হয় না বলিয়া যে

শক্তিকে বলা হয়—মায়া, অনির্ব্বচনীয়া, ভাবরূপা যৎকিঞ্চিৎ,—সেই শক্তি উদয়ে যিনি শক্তিমান্ তিনিই পুরুষ, আর ঈশ্বরাধীন শক্তি বলিয়া সেই শক্তি প্রকৃতি।

৩। পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে আমি বহু হইব এই সঙ্কল্প বীজাধান করেন। প্রকৃতির আদি বিকৃতি এই গর্ভাধানের ফল। এই আদি বিকৃতিই মহৎ ব্রহ্ম। এই মহৎ ব্রহ্মই ব্রহ্মা। ইনি শুদ্ধ সত্তামাত্রাত্মক। ইনিই মহামন। ইনি অব্যক্ত, শক্তির সত্তামাত্রাত্মক আদি ব্যক্তাবস্থা। ইহা হইতেই ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম তত্ত্ব গুলি প্রসূত হয়, পরে তাহাই স্থূল হইয়া যায়। অহংতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্রা, পঞ্চ মহাভূত প্রভৃতির সৃষ্টি হয় প্রকৃতি ও পুরুষের যোগে; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যোগে।

৪। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যোগে দৃশ্য প্রপঞ্চ। ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষ বীজপ্রদ পিতা। ক্ষেত্র বা মহৎ ব্রহ্ম গর্ভধারিণী মাতা। বীজ যাহা তাহাই ক্ষেত্রজ্ঞের বা চৈতন্যের প্রতিবিম্ব। এই প্রতিবিম্বই সঙ্কল্প।

৫। মহৎ ব্রহ্মে চেতন পুরুষের প্রতিবিম্বকে যেমন পরাপ্রকৃতি বা জীব বলা হইল, সেইরূপ মায়াতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বকে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর বলা হইয়াছে। ঈশ্বর ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, জীব ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব।

৬। ব্রহ্মের ঝলক যাহা তাহাকেই ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলা হইল। এই ঝলককেই শক্তি বলা হইল। এই শক্তিটি চলনাত্মিকা। এই শক্তিটি স্পন্দ-ধর্ম্মিণী। ইনি ত্রিগুণময়ী।

৭। সঙ্কল্পকেই শক্তি বলা হইল। সঙ্কল্পকেই ত্রিগুণময়ী বলা হইল। "গুণ আমন্ত্রণে। আমন্ত্রণার্থক গুণ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ করিয়া গুণ শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা আমন্ত্রিত, অভ্যস্ত, গুণিত বা পুনঃ পুনঃ ব্যাবর্ত্তিত হয়, তাহাই গুণ। গুণৈরিতি গুণ্যন্তে অভ্যস্যন্তে ইতি গুণাঃ। অভ্যাসঃ পৌনঃপুন্যে নানুষ্ঠানম্। অভি+অস+ঘঞ্। আভিমুখ্যেনাস্যতে—ক্ষিপ্যতে ইতি অভ্যাসঃ। কোন এক বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে যাহা পুনঃ পুনঃ ক্ষিপ্ত হয়, তাহাই অভ্যাস।" গুণের এই পুনঃ পুনঃ ব্যাবর্ত্তিত হওয়া অভ্যাস কিরূপে?

৮। প্রথমে সঙ্কল্প শক্তির সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন বিভাগ থাকে না। সঙ্কল্প অবরুদ্ধ অবস্থায় গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ অব্যক্ত বা প্রকৃতি। সঙ্কল্প

চলন, স্পন্দন, ছন্দ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সঙ্কল্প পুনঃ পুনঃ ব্যাবৰ্ত্তিত হইতে চায়। প্রথম কার্য্য যখন আরম্ভ হয়, তখন রুদ্ধাবস্থায় অতিসূক্ষ্ম স্পন্দন হয়। সঙ্কল্পের এই অপ্রবৃত্তি অবস্থাই তম। ইহাই অন্ধকার। সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্তই তমতে আচ্ছন্ন থাকে। ভগবান্ মনু বলেন—আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতম-লক্ষণম্। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সৰ্ব্বতঃ॥ সমস্ত সৃষ্টি যেন গাঢ় নিদ্রার মত এক মহান্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ব্রহ্ম হইতে মায়ার উদ্ভব—ইহা অবুদ্ধি পূর্ব্বক। কিন্তু মহৎ ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি—ইহা ঈশ্বরের বুদ্ধি দ্বারা হয়। জগৎসৃষ্টি বুদ্ধি পূর্ব্বক।

৯। মহানাত্মা ত্রিবিধো ভবাত। সত্ত্বংরজস্তম ইতি। সত্ত্বং তু মধ্যে বিশুদ্ধং তিষ্ঠত্যভিতো রজস্তমসী। সত্ত্ব, মধ্যস্থানে—ইহার এক পার্শ্বে রজঃ, এক পার্শ্বে তম। সত্তামাত্রাত্মক মহৎ ব্রহ্ম প্রথমে তমরূপে স্পন্দিত হয়েন। যেখানে এই তম জাগিয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রবৃত্তি অবস্থা থাকে। প্রবৃত্তিটি রজঃ। যেখানে প্রবৃত্তি সেইখানে প্রকাশ থাকিবেই। প্রকাশটি সত্ত্ব।

১০। প্রকাশ, প্রকাশ হইতে চায়। অন্ধকার ইহাকে প্রথমে আচ্ছন্ন করে। আবার প্রকাশের আবরণ সরাইবার একটা চেষ্টাও সঙ্গে থাকে। প্রকাশই সত্ত্ব; আবরণটি তম, সরাইবার চেষ্টাটি রজঃ। সূর্য্য প্রকাশ হইতে চাহেন। অন্ধকার সেখানে আছে, অন্ধকার সরানার চেষ্টাও আছে। তবে প্রকাশ যেখানে সৃষ্টি হইতে চায় সেইখানে আত্মার প্রকাশ হওয়া লক্ষ্য। সঙ্কল্পে প্রকাশ জাগিতে গেলেই প্রথম তম তাহাকে আবরণ করে। তবেই প্রকাশের পূর্ব্ব অবস্থা তম। তম অন্ধকার। অন্ধকার সরাইবার চেষ্টাও সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করে। ইহাই রজঃ। সঙ্কল্প গুণিত হইয়া, ব্যাবৰ্ত্তিত হইয়া, গুণ রূপে পরিণত হয়। সত্ত্ব রজ স্তম এই তিনটি গুণ। শক্তি এই তিনটি গুণান্বিতা বলিয়া ইহা ত্রিগুণময়ী। গুণ বাদ দিলে প্রকৃতি কি?

১১। সত্ত্ব রজ স্তম বাদ দিলে প্রকৃতি নির্গুণা। ইহাই প্রকৃতির স্বরূপ। প্রকৃতির স্বরূপও সেই আপনিই আপনি ভাব। আপনি আপনি ভাবই ব্রহ্ম। প্রকৃতির স্বরূপই ব্রহ্ম। পুরুষের যেমন ক্ষর ও অক্ষর এই দুই ভাগ আছে, প্রকৃতির সেইরূপ ক্ষর ও অক্ষর দুই ভাগ আছে। মহাভারত বলেন "প্রকৃতি যখন মহাদাদি গুণে সংযুক্ত থাকেন তখন তাঁহাকে ক্ষর এবং সত্ত্বাদি গুণের অনবস্থান জন্য নির্গুণ হইলেই অক্ষর" শান্তিপৰ্ব্ব ৩০৮। প্রতি সৃষ্টবস্তু ক্ষর

ও অক্ষর লইয়াই সৃষ্ট। জড় ও চৈতন্য দ্বারাই এই সৃষ্টি জড়িত। কোন সৃষ্টবস্তু হইতে জড়ভাব বিগলিত করিতে পারিলেই, আপনিই আপনি ভাব যে অসঙ্গ চৈতন্য, তাহা প্রকাশ হয়েন। তাই বলা হয়, প্রতি বস্তুর স্বরূপাবস্থাই ব্রহ্ম।

১২। কাজেই সকল বস্তু ধরিয়াই উপাসনা হয়। ঋষিগণ কাহার উপাসনা করিতেন? পূর্ব্বে বলা হইল—আপনিই আপনি ভাবে স্থিতি জন্য বিশ্বরূপ উপাসনা এবং মূর্ত্তি অবলম্বনে বিশ্বরূপে আগমন—ইহাই তাঁহাদের উপাসনা ছিল।

১৩। বেদ কাহার আবাহন করেন? আয়াহি বলিয়া কাহাকে ডাকেন? যিনি বরদা—বর প্রদান করেন, যিনি ত্র্যক্ষরা—অউম এই অক্ষরত্রয়ময়ী, যিনি ব্রহ্মবাদিনী—যাহাতে ব্রহ্মের প্রকাশ হয় বলিয়া যিনি ব্রহ্মকে বলেন, যিনি সমস্ত স্পন্দনের মাতা, যিনি গান করিলেই ত্রাণ করেন—বেদ তাঁহারই উপাসনা করিতে বলেন? ইনিই শক্তি। শক্তি ভিন্ন ব্রহ্মের প্রকাশ আর কোথায় হইবে? আবার সৃষ্টপদার্থ ভিন্ন শক্তির প্রকাশ আর কোথায়? তাই সৃষ্টবস্তু ভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা আর কাহাতে প্রকাশ হইবেন? শক্তিই ব্রহ্মের প্রকাশস্থান বলিয়া শক্তির উপাসনাই বিধি। উপাসনা দ্বারা ব্রহ্ম লাভ হয় না। শক্তির উপাসনায় ব্রহ্মলাভের শক্তি আইসে।

১৪। যে শক্তি ইন্দ্রিয় দ্বারা নিরন্তর চঞ্চল হইয়া বাহিরে ভিতরে ছুটিতেছে, যে শক্তি একবারও স্থির থাকে না—তাহাকে বাহিরে যাইতে না দিয়া যদি অন্তরে একাগ্রতার বস্তুতে অবরুদ্ধ করা যায়—দর্শন শ্রবণ বাক্যাদিরূপে যাহা বাহির হইয়া যাইতেছে, সেই দর্শন শ্রবণ বাক্যাদি শক্তির বাহিরে আসা বন্ধ করিবার জন্য যখন ইন্দ্রিয়গুলিকে মনে এবং মনকে প্রত্যগাত্মায় অবরুদ্ধ করা যায় অথবা ভিতরে বা বাহিরে কোন মূর্ত্তিতে বদ্ধ করা যায়—তখন শক্তিময় একটি কিছু থাকে। সেই শক্তিব্যাপী যিনি, তিনিই ব্রহ্ম। সেই শক্তি যাহার উপর ভাসিয়াছিল—গতি যাহাকে লইয়া যাইতেছিল—সেই শক্তির আধার, গতির আধারই ব্রহ্ম বা স্থিতি। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা ইঁহাকে লাভ করা যায়।

১৫। আবাহনের পর ধ্যান। যিনি ঋগ্বেদধারিণী, যিনি ব্রহ্মরূপা, যিনি রূপে হংসস্থিতা, যিনি সর্ব্বদা সোহহং—সেই আমি—মন্ত্রজপে আরূঢ়া—যিনি

কুশহস্তা—সেই কুমারীকে প্রথমে হৃদয়ে বসাইয়া—তিনিই যে বিশ্বরূপিণী, তিনিই যে বিশ্বরূপে সাজিয়াছেন; আর বিশ্বরূপে যে শক্তি অবয়বধারিণী তিনিই সেই বিশ্বরূপ পুরুষ লইয়াই বিশ্বরূপ—শক্তিমান্ লইয়াই, সর্ব্বশক্তি শক্তিমানের সহিত অভেদ, এই শক্তিকে মন্ত্রজপ দ্বারা ভজন' করাই বেদ-প্রদর্শিত উপাসনা।

১৬। মন্ত্র দ্বারাই উপাসনা করিতে হয়। গায়ত্রী মন্ত্রই শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

মনোযোগ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যাহা যাহা করিতে হইবে আবার বলিয়া দিতেছি শ্রবণ কর। করিয়া মরিতে হয় মরিব তথাপি কর্ত্তব্য শিথিল করিব না এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া কর।

(১) রাত্রিতে আহারের পরে সর্ব্বদার কার্য্য করিতে করিতে শতপদ ভ্রমণ করিবে, পরে শয্যায় আসিয়া বীরাসনে উপবেশন করিবে। করিয়া সমস্ত দিনে যাহা করিবার নিয়ম ছিল তাহা কতদূর করিলে ভাবনা কর। ঠিক ঠিক যদি না করিয়া থাক তবে আবার ভাবনা কর যাহা যাহা তোমার করা উচিত।

পরদিন প্রাতঃকাল হইতে যাহা যাহা করিবে সেইগুলি ভাবনা করিয়া রাখ। ইহাই তোমার হিতচিন্তা। তারপরে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নিদ্রা আইসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের নাম জপ, প্রণাম ও প্রার্থনার সহিত করিতে থাক। নিদ্রা আসিলেই শয়ন কর। নিদ্রা আসিবার পূর্ব্বে বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া আলস্যের প্রশ্রয় দিও না।

(২) রাত্রিশেষে নিদ্রা ভাঙ্গিলেই অমনি ভগবানের নাম করিতে করিতে পদ্মাসনে বিছানায় উঠিয়া বস। বসিয়া প্রথমেই শ্রীভগবানের নাম কর যতক্ষণ পার। পরে আবার নিজের হিতচিন্তা কর।

এই হিতচিন্তা করার সময় সমস্ত দিনের কর্ত্তব্য, যাহার পর যাহা করিতে হইবে, তাহাই ভাবনা করিয়া লও। ইহার পরে প্রাতঃকৃত্য যাহা যাহা

শাস্ত্রনির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন তাহাই করিয়া বাহিরে আইস। শ্রীভগবানের নামটিই সর্ব্বদার কার্য্য মনে রাখিয়া, সেই নাম স্মরণ করিয়া, শৌচাদি শেষ করিয়া কর্ত্তব্য করিতে লাগিয়া যাও। ব্যবহারিক কার্য্যে যাইবার সময় ভাবনা, বাক্য ও কার্য্য তাঁহাকে জানাইয়া করিতে যেন মনে থাকে।

আমি এইরূপই করিতে প্রাণপণ করিব। আমি বুঝিতেছি যাহা যাহা করিতে হইবে তাহার কথা এইরূপে চিন্তা করিলে কার্য্যে মনোযোগ লাগিবেই, হাঁ তাহাই।

বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্র-নন্দন।

প্রথম মিলন।

বিশাখা সকল কথাই রাধিকাকে বলিলেন; শ্রীমতী কৃষ্ণসঙ্গ লাভে অধৈর্য্য হইয়াছেন। আহ্লাদে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে, ভাবিতেছেন আজ আমার কৃষ্ণসঙ্গ লাভ হইবে; সেই রমণীয় দর্শনকে হৃদয়ে ধরিব এ কথা যতই মনে আসিতেছে, ততই হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিতেছে। আবার কখনও মনে হইতেছে আমি কুলবধূ, আমার ইচ্ছা হইলেই বা তাহা পূরণ হইবার উপায় কৈ? * বাঘিনী ননদিনী সর্ব্বদাই আমাকে বিষ নয়নে দেখিয়া থাকে, সে যদি এ কথা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে, তাহ'লে আমার আর দুর্গতির সীমা থাক্‌বে না, তখন গুরুজনের কাছেই বা কি ক'রে মুখ দেখাব? হয়তো কলঙ্কিনী অপবাদ দিয়া আমাকে সংসার হইতে বাহির করিয়া দিবে। হায়! তখন আমার ভাগ্যে কি হবে, আমি কার কাছে দাঁড়াব, রাধা ব'লে কে আমাকে তখন জিজ্ঞাসা ক'রবে। শ্রীমতীর চক্ষে জল আসিয়াছে, বলিতেছেন,—সখি! বুঝি আমার ভাগ্যে সেই কালবরণের সঙ্গলাভ হোলো না।

কানু হেরব ছিল মনে সাধ।
কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ॥
তব ধরি অবোধী মুগধী হাম নারী।
কি কহি কি বলি কিছু বুঝই না পারি॥

---

* কৃষ্ণরাধিকার অবতারকালে এইরূপ হইতে পারে। সাধক অন্তরে এই ভাব চিন্তা করিতে পারিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে। কিন্তু নায়িকা একটা খুজিয়া লইয়া বা নায়ক একটা যোগাড় করিয়া যদি রাধাকৃষ্ণের ভাব স্থূলে অভিনয় করা হয়, তবে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত যে নরকস্থ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।'

শাঙন ঘন সম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধক্ ধক্ করয়ে পরাণ॥
কাহে লাগি স্বজনি দরশন ভেলা।
রভসে আপন জীউ পরহাতে দেলা॥
না জানিয়ে কি করু মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লই গেঁও মোর॥
এত সব আদর গেঁও দরশাই।
যত বিছুরিয়ে তত বিছুর না যাই॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারী।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥

শ্রীমতী বড়ই ভাবিতা হইয়াছেন; এক দিকে শ্রীকৃষ্ণের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আবার অন্য দিকে লোকাপবাদ এবং গুরুগঞ্জনার ভয়েও পরিণাম চিন্তা করিতেছেন।

বিশাখা সকল কথাই বুঝিতে পারিয়াছেন,—শ্রীমতীর এই আকস্মিক ভাবান্তর দেখিয়া বলিতেছেন—

সে যে নাগর গুণধাম। জপয়ে তোহারি নাম॥
শুনিতে তোহারি বাত। পুলকে ভরয়ে গাত॥
অবনত করি শির। নয়ানে ঝরয়ে নীর॥
যদি বা পুছয়ে বাণী। উলটী করয়ে পাণি॥
কহিয়ে তোহারি রীতে। আন না বুঝবি চিতে॥
ধৈরজ নাহিক তায়। বড়ু চণ্ডিদাসে গায়॥

রাধিকে! তুমি জান না যে, সেই শ্যামসুন্দর তোমার জন্য কতদূর অধৈর্য্য হইয়াছেন; কালাকে ভ'জতে গেলে কুল ত্যাগ করিতে হইবে, এ কথা কি তুমি পূর্ব্বে বুঝিতে পার নাই? সখি! আজ তুমি কুলশীলের জন্য ভাবিতা হইয়াছ কিন্তু বল দেখি, তাঁহার সেই শ্যাম নাম শুনিয়া, তাঁহার বাঁশী শুনিয়া, তার পর যমুনাকূলে কদম্বতলে তাঁহাকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তোমার দেহ ছাড়া আর কিছু রাখিতে পারিয়াছ কি? সেই দিনই তোমার জীবন, যৌবন সকলই কি মনে মনে সেই কালার পায়ে সমর্পণ কর নাই? আজ কুলের ভয় করিতেছ, আজ লোকাপবাদের ভয় হইতেছে—কিন্তু মনে আছে কি, "মাথে ল'য়ে কুলডালা

ঘুঁচাব গৃহের জ্বালা, যবে হবে কালা পরিবাদ।" এ কথা কে বলিয়াছিল? মনে আছে, "নাম পরতাপে যাঁর, ঐছন করল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়॥" এ কথাও কি তুমি বল নাই? তাই বল্‌ছি শ্যামসুন্দরকে আর কাঁদাইও না, সখি! সংসারে থাকিয়া, কুলশীল রক্ষা করিয়া, এই "হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি" সহ্য করা অপেক্ষা চল কালার কলঙ্ক-সাগরে ঝাঁপ দিয়া চিরতরে শীতল হইগে।

শ্রীমতী বসিয়াছিলেন, কি ভাবিয়া দাঁড়াইলেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। শরীরে ঈষৎ ঘর্ম্ম দেখা দিল, নাসিকার অগ্রভাগ লালবর্ণ হইয়া যেন কম্পিত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ বিশাখার মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন, বিশাখা! আর না, আর পারিলাম না, আমার ভাগ্যে যাহাই থাকুক, আমি কৃষ্ণসঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়া কখনই এ পাপ-সংসারে বাস করিতে পারিব না, তাঁহাকে ছাড়িয়া এই দেহভারও বহন করিতে পারিব না, সখি।

গঞ্জে গঞ্জুক গুরুজন তাহে না ডরাই।
ছাড়ে ছাড়ুক নিজ পতি আপদ্ এড়াই॥
বলে বলুক পাড়ার লোক তাহে নাহি ডর।
না বলুক না ডাকুক না যাব কারু ঘর॥
ধরম করম যাক্ তাহে না ডরাই।
মানের ভরমে পাছে কানুরে হারাই॥
কালা মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানুগুণ যশ কাণে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু অনুরাগে রাঙা বসন পরিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
যদুনাথ দাসে কহে এই মনে সাধ।
হয় হউক জগভরি কালা-পরিবাদ॥

শ্রীনিঃ ১

সমুদ্র মন্থন।

অনন্ত বাসনা মোর বাসুকির ডোরে,
বাঁধিয়া করম-গিরি সুদৃঢ় কঠিন,
মন্থনীতে অকুল এ হৃদয় জলধি -
জানিনা উঠিবে ভালে সুধা কি গরল ?
ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, মোহিনী কমলা,
দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত নিধি ভোগ্য দেবতার ;
সর্ব্বদেব পূজাদেব বিশ্বপতি যিনি,
তাঁর ভাগ্যে হলাহল বিধি-বিড়ম্বনা—
দৈত্য সব বৃথা হায়, টানিছে ঘর্ঘরে,
দেব-ভোগ্য অমরতা লভিতে বাসনা ;
ক্ষুদ্র আমি নাহি চাহি অমরত্ব-সুধা—
আমায় হৃদয় লভ্য হৃদয়ে বিলীন।

শ্রীহ (মালদহ)

কুন্তী।

১

সুনীল মৃদুবাহিনী যমুনার তীর। উপরে সুনীল আকাশ। চারিদিক্ স্তব্ধ। সূর্য্যদেব এই মাত্র পশ্চিম গগন স্তরে স্তরে রঞ্জিত করিয়া অস্ত গেলেন। গোধূলির অন্ধকার, দিক্সীমার বনশ্রেণী হইতে উত্থিত হইয়া, অনন্ত নভোমণ্ডলে ঘনীভূত হইতে লাগিল। ওপারের দিগন্তচুম্বিত বনানী এখন স্থির। যমুনাসলিল নিষ্কম্প। এপারের কৃষ্ণকায় ভীম দুর্গ, বুরুজ ও প্রাচীরের খাঁজকাটা আলিশা লইয়া আকাশ স্পর্শ করিয়াছে ও নীচের স্বচ্ছজলে কৃষ্ণছায়া ফেলিয়া, মুখ দেখিতেছে। তাহার পশ্চাতে ভোজনগর, মধ্যে মধ্যে বিটপী শোভিত নানা সৌধশ্রেণী লইয়া, পারাবতের খোপবৎ শ্যাম ভূমিখণ্ডের উপর

পড়িয়া রহিয়াছে। ক্রমে দীপালোক, নগরের প্রতি সৌধের গবাক্ষে গবাক্ষে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। শঙ্খধ্বনিতে দিক্ বিধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং গগনে নন্দনের পারিজাতপুষ্পসদৃশ নক্ষত্রমালা ধীরে ধীরে এক একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিল।

যখন বেশ গা ঢাকা ঢাকা হইল, তখন আসলিল দুর্গমূল হইতে, শ্বেত মর্ম্মর সোপানাবলীর শীর্ষদেশে, দীর্ঘ বরুজের তলে, একটি কুমারী দৃষ্ট হইলেন। তিনি আস্তে আস্তে, ভয়ে ভয়ে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ, যেন কি একটি পদার্থ বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন। জল স্পর্শ করিতে আর এক ধাপ—শুদ্ধ একটি মাত্র ধাপ অবশিষ্ট আছে; কুমারী থমকিয়া দাঁড়াইলেন। একবার আয়তনেত্রে স্তব্ধ আকাশের দিকে চাহিলেন। বক্ষের বস্তুটিকে তাঁহার মুখমণ্ডলের নিকট লইয়া গেলেন ও একটি প্রগাঢ় চুম্বন করিলেন। অকস্মাৎ সদ্যপ্রসূত শিশুর ক্রন্দনধ্বনিতে সুপ্ত নদীর উভয় তট জাগরিত হইয়া উঠিল। কুমারী ব্যস্ত হইয়া শিশুটিকে বক্ষের নিকটে দোলাইতে লাগিলেন। শিশু আবার নিদ্রিত হইল।

এইবার তিনি কটিদেশ অবধি জলে নামিলেন। চক্রাকার তরঙ্গমালা তাঁহার কোলে জন্মলাভ করিয়া বক্ষের শিশুটিকে ডাকিতে ডাকিতে ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। তিনি মঞ্জুষায় ক্ষুদ্র শয্যায়-শায়িত, ঘুমন্ত শিশুটিকে জলে ভাসাইয়া, অলঙ্কার-পরা কনকবর্ণ রক্তাভ করপল্লবে ঈষৎ ঠেলিয়া দিলেন। শিশুগর্ভে মঞ্জুষা, ধীরে ধীরে স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিল।

বালিকা জল হইতে সোপানে উঠিলেন, সিক্ত বস্ত্র হইতে অলক্তকরঞ্জিত চরণ যুগল—পূজা করিবার মত রাঙ্গা টুক্‌টুকে পা ধুইয়া জল ঝরিতে লাগিল। তিনি কতক্ষণ নদীর দিকে মুখ করিয়া, ভাসমান শিশুটিকে অনিমেষ-লোচনে অবলোকন করিতে লাগিলেন। যখন আর দৃষ্টি চলে না, তখন তিনি ত্বরিতপদে বসনাঞ্চলে নীরবে অশ্রু মুছিয়া, সোপানারোহণ করিতে করিতে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

২

পুরাকালে যমুনা নদীর ধারে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী ছিল। তাহার নাম ভোঁজ-নগর। কারণ সে রাজ্যে কুন্তী-ভোজ নামে এক নরপতি বাস

করিতেন। তিনি নিজে নগরখানি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহার নাম ইহাই রাখিয়াছিলেন। কুন্তী ভোজ বড় ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার হৃদয় দয়াদাক্ষিণ্যে পূর্ণ ছিল। প্রজাগণ তাঁহার রাজ্যে নিরুপদ্রবে, নিশ্চিন্ত-মনে ব্যবসায়, বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম ইত্যাদি লইয়া সুখে কালযাপন করিত। ভূভাগ শস্যশালী ছিল। নদী, পল্বল ও কূপ জলে কূলে কূলে পূর্ণ ছিল। দস্যু তস্করের ভয়ের লেশও ছিল না।

কুন্তী-ভোজ নিঃসন্তান ছিলেন। যখন তাঁহার যৌবনকাল উত্তীর্ণ হইয়া বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তিনি দেখিলেন যে, আর তাঁর পুত্র-কন্যাদি কিছুই হইবে না; তখন তিনি তাঁহার মামাত ভ্রাতা সুরসেনের নিকট একটি সন্তান প্রার্থনা করেন। পরে এই সুরসেনের পুত্র বসুদেব ও বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছিলেন। ইহাঁরা যদুবংশী। ইহাঁদের রাজ্য দ্বারকা।

কুন্তী-ভোজ সুরসেনের নিকট তাহার পৃথানাম্নী কন্যাটি প্রার্থনা করিলেন। সুরসেন পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া, বিনা আপত্তিতে পৃথাকে কুন্তী ভোজের করে সমর্পণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে গৃহে আনিয়া, স্বীয় কন্যাবৎ যত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

মস্তকে শিরোমণি কজ্জল-রঞ্জিত দীর্ঘায়তনেত্রা এতটুকু পৃথা যখন মণি-মুক্তা-জড়িত ভ্রমরকৃষ্ণ বেণীমূল দোলাইয়া, বৃহৎ রাজ-পুরীর চতুর্দ্দিকে এঘর ওঘর করিয়া বেড়াইতেন, তখন সূর্য্য-রশ্মি পতিত জল-প্রতিবিম্বের ন্যায় অপত্যস্নেহের একটি নির্ম্মল তরঙ্গ-হিল্লোল রাজ-বাটীর সর্ব্বত্রই কম্পিত হইতে দেখা যাইত। মায়াবিনী পৃথা কখন রাজসভা হইতে প্রত্যাগত কুন্তীভোজের জানুদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুটি হাতে জড়াইয়া ধরিয়া, একটি চুম্বনের দাবী করিতেন; কুন্তীভোজ তৎক্ষণাৎ কন্যাকে বুকে তুলিয়া লইয়া, একটি চুম্বন দানান্তে আবার নামাইয়া দিতেন। কখন তিনি গৃহকর্ম্ম-রতা মহিষীর নিকট ছুটিয়া গিয়া, তাঁহার পিছন হইতে সুমধুর কলকণ্ঠে—'মা! মা!'—বলিতে বলিতে গলদেশ বেষ্টন করিয়া, মুখে মুখ লুকাইতেন; মহিষী হস্তদ্বয় গদ্‌গদচিত্তে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়া, স্নেহ নিশ্বাসের সহ মুখ ফিরাইয়া তাহাকে চুমা দিতেন। আবার কখন তিনি দাসী কিম্বা সখীমহলে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের কোলে উঠিয়া, কোল আলো করিয়া, তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিতেন ও নিজে হাসিমুখে কৃতার্থ হইতেন। এইরূপে পৃথার শৈশবকাল উত্তীর্ণ হইল। তিনি কৈশোরে পদার্পণ করিলেন। কিন্তু

তাঁহার পূর্ব্বের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাহার কারণ আর কিছুই নহে। ভোজের আলয়ে আসিয়া, ভোজের পালিত বলিয়া, এখানে সকলে তাঁহাকে কুন্তী নামে ডাকিতে লাগিলেন; কেহ পৃথা বলিতেন না। সুতরাং লোকে তাঁহার পৃথা নাম বিস্মৃত হইল এবং তাহার পরিবর্ত্তে কুন্তী নামটি নিজের প্রভাব বিস্তার করিল। আমরাও ইহার পর হইতে তাঁহাকে কুন্তী বলিয়া ডাকিব।

কুন্তীদেবী কৈশোরে পদার্পণ করিলে, তাঁহার চরিত্র-ক্ষেত্রে যাবতীয় সদ্গুণ-রাশি একে একে পুষ্পের মত প্রস্ফুটিত হইয়া দিগ্দিকে সৌগন্ধ বিস্তার করিতে লাগিল। তাঁহার সারল্য, সৌজন্যতা, ধর্ম্মভীরুতা, দেবদ্বিজে ভক্তি, সাধুসেবা এবং আতিথেয়তার কথা নগরের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল।

কুন্তীভোজ তাঁহার রাজ-অট্টালিকার পার্শ্বেই এক বৃহৎ অতিথিশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রত্যহ কত অতিথি, সাধু ও সন্ন্যাসী আসিয়া সেখানে আশ্রয় পাইতেন এবং কিছুদিন সেখানে বসবাস করিয়া, অপর্য্যাপ্ত দান-সামগ্রী বস্ত্রে বাঁধিয়া, রাজাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিতেন।

যেমন পিতা, কুন্তীও তেমনি পিতার উপযুক্ত কন্যা ছিলেন। এখন তাঁহার উৎসাহে কুন্তীভোজের দান-ধ্যান আরও বাড়িয়া চলিল। অতিথিশালার পুনঃসংস্কার হইয়া আয়তন আরও বৃদ্ধি হইল। কুন্তীদেবী এখন এখানকার একমাত্র কর্ত্রী হইলেন। তিনি দুবেলা স্নান-শুচি সমাপনান্তে অতিথিশালা পর্য্যবেক্ষণ করেন। যতদূর পারেন, যাবতীয় অতিথিসেবার কার্য্য স্বহস্তে করিয়া থাকেন এবং যেগুলি তাঁহার সাধ্যাতীত বিবেচনা করেন, সেগুলি দাসীদিগের দ্বারা করাইয়া লয়েন।

এই প্রকারে কুন্তীদেবীর কৈশোরের দিনগুলি অতিথি, সাধু ও সন্ন্যাসী লইয়া কাটিতে লাগিল। এমন সময়, একদিন দুর্ব্বাসা ঋষি আসিয়া, সেই অতিথিশালায় আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কুন্তীদেবী প্রাণপণে তাঁহার পরিচর্য্যায় মনোনিবেশ করিলেন। কারণ তিনি পিতার নিকট শুনিয়াছিলেন যে, এ ঋষিটি বড় কোপন-স্বভাব।

কুন্তীর সেবা দেখিয়া দুর্ব্বাসা তাঁহার উপর বড় সদয় হইলেন। বিদায়ের

দিন তিনি কুন্তীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"মা; আমি তোমার সেবায় বড় তুষ্ট হইয়াছি। তোমায় একটি বর-মন্ত্র দান করিব।"

কুন্তী সম্ভ্রমে, ভয়ে ভয়ে দুর্ব্বাসার নিকট গেলেন। তখন দুর্ব্বাসা স্নেহার্দ্র হৃদয়ে, কুন্তীদেবীর স্কন্ধে তপঃক্লিষ্ট শীর্ণ শীরাস্ফীত একখানি হাত রাখিয়া, পক্বশ্মশ্রুভার ও জটা-গুম্ফ-মণ্ডিত আনন নিকটে লইয়া গিয়া, কিয়ৎকাল ঈষৎ অধর নাড়িয়া, তাহার কাণে কি মন্ত্র দিলেন এবং বলিলেন,—"মা, যখন তুমি এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যে কোন দেবতাকে স্মরণ ক'রবে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার বরে সেইরূপ বীর্য্যবান্ এক একটি পুত্র লাভ করিবে।

কুন্তী দুর্ব্বাসার নিকট বর-মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া একটি প্রণাম করিলেন। দুর্ব্বাসা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই মন্ত্র পাইবার মাসাবধি পরে, একদিন রাজ-প্রাসাদের প্রান্তভাগে, যেখানে যমুনা দুর্গ মূল বেষ্টন ও ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, সেখানে একটি বুরুজের উপরিস্থিত অর্দ্ধচক্রাকার কাঠগড়ায় ঘেরা বারাণ্ডায় বসিয়া কুন্তীদেবী সায়ংকালীন সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিলেন। সূর্য্য নীল-নভোমণ্ডলে খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি স্তরে স্তরে রক্তিম অঙ্গারবর্ণে রঞ্জিত করিয়া, একটি অগ্নি-গোলকের ন্যায় নিম্নে অবতরণ করিতেছিলেন। তাঁহার উজ্জ্বল কিরণ যমুনার নীল স্বচ্ছ সলিলের উপর, আড়াআড়ি ভাবে একখান সোনার পাত ফেলিয়া দিয়াছিল; দীপ্ত রশ্মি, ওপারের বনানীর তরু-শ্রেণী-শিরঃ স্বর্ণবিভায় মণ্ডিত করিয়া, ঘন ছায়ার মাঝে মাঝে আলোক দান করিতেছিল এবং নিকটেই একটি উন্নত-মস্তক নারিকেলকুঞ্জের চারিধারে, কতকগুলি চীল উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছিল। বালিকা কুন্তী, কেবল একদৃষ্টে সূর্য্যের দিকে চাহিয়াছিলেন।

চাহিয়া থাকিতে থাকিতে, হঠাৎ তাঁহার দুর্ব্বাসা-দত্ত বর-মন্ত্রের কথা মনে পড়িল। তাঁহার বালিকা বয়স। এসময়ে স্বভাবতই সকলে কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত, সূর্য্যের দিকে চাহিতে চাহিতে মন্ত্রটি আবৃত্তি করিয়া ফেলিলেন।

তখন ওপারের সূর্য্য-মণ্ডল বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া এপারের দিকে আসিতে লাগিল। অবশেষে, বারাণ্ডার ধারে কুন্তীদেবীর সম্মুখে আসিয়া, মণ্ডলটি স্থির হইল। কুন্তীদেবী বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন যে, মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী—

মস্তকে মুকুট, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, চতুর্ভুজ এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁহাকে বলিতেছেন,—"বৎসে, আমাকে স্মরণ করিয়াছ কেন ?"

কুন্তী কি উত্তর দিবেন খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি শঙ্কা-বিস্ফারিত লোচনে কেবল তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কোন উত্তর না পাইয়া, সেই তেজঃকান্তি পুরুষ পুনরায় গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"সুভগে, তোমার আমার ন্যায় বল-বীর্য্যশালী একটি পুত্র হউক।"

তাঁহার বাক্য শেষ হইবামাত্র, কুন্তীদেবী স্বীয় ক্রোড়ে ঈষৎ ভার বোধ করিলেন। চাহিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার কোলে একটি সুন্দর সদ্যপ্রসূত শিশু ঘুমাইতেছে। তিনি ভয়ে ও লজ্জায় মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া গেলেন এবং মুখ তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে বলিলেন,—"দেব এ কি করিলে ?"

তখন মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষ অর্থাৎ সূর্য্যদেব, মণ্ডল সহিত অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন। তিনি দূর হইতে কুন্তীকে বলিলেন,—"দেবি, আমি কি করিব ? মহর্ষি দুর্ব্বাসার কথা কখন মিথ্যা হইবার নহে।" বলিতে বলিতে তিনিও পারের দিগন্তে বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে অস্তমিত হইলেন। ধরণী গাঢ় তিমিরাবৃত হইল। গগন নক্ষত্র মালায় বিভূষিত হইল। ওপারের অন্ধকারময় বনের ভিতর, একদল শিবা উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিল।

কুন্তী কিয়ৎকাল স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া বুরুজের বারাণ্ডায় বসিয়া রহিলেন। তার পর আস্তে আস্তে, শিশুটীকে লইয়া একটি মঞ্জুষায় পুতুলের ক্ষুদ্র শয্যা পাতিয়া, তাহাকে শয়ন করাইলেন; গোপনে অন্ধকার দুর্গের ঘাটে আসিলেন এবং তাহাকে যমুনার জলে ভাসাইয়া দিলেন। পাঠকবর্গ, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তাহা বিশেষ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গুপ্ত।

তুমি আমার কে ?

কে বলিয়া দিবে তুমি আমার কে ? কাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিব ? যাহার নিকট জিজ্ঞাসা করি সেই বলে "এ সহজ কথাটী বুঝ না" ? কিন্তু কেহই বলিয়া দেয় না তুমি আমার কে। শুনিয়াছি তুমি আমার কিছু হও।

কিন্তু কি হও? আমি কত খুঁজিয়াছি, কত জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কেহই ত বলিয়া দেয় না তুমি আমার কে? সকল বস্ম গ্রন্থ ত খুজিলাম, কেহই ত তুমি আমার কে লিখে নাই। কেমন করিয়া জানিব তুমি আমার কে? কে জানাইবে, কে বলিয়া দিবে, কে আমার মনের আঁধার ঘুচাইয়া দিবে? কেহ বলে তুমি আমার পিতা আমি তোমার পুত্র। তাই বা কেমন করিয়া হয়? আমি ত আমার পিতাকে চক্ষের উপরে দেখিতেছি। তাহার সঙ্গে ত তোমার রূপের তুলনা হয় না! শুনিয়াছি তোমার ভুবন-ভুলান রূপ। গলায় বনমালা, মাথায় ময়ুরপুচ্ছ, হস্তে বাঁশী! কই তেমন ভাবে ত আমার পিতাকে কখনও দেখি নাই। তবে কি আমি ভুল বুঝিয়াছি? আমাকে লোকে প্রতারণা করিয়াছে? না—তাই বা কেমন করিয়া হইতে পারে? আমি যাঁহার নিকট শুনিয়াছি তিনি ত মিথ্যা বলিবার লোক নহেন। তিনি যাহা বলেন তাহা ত সকলই সত্য হয়—তবে এটা এমন হইল কেন? আমি বুঝিতে পারিলাম না—তুমি আমার কি হও। আমি তোমার জন্য পাগল হইলাম কেন? তোমাকে কোন দিন দেখি নাই, শুনি নাই, অথচ তোমার জন্য পাগল। লোকে শুনিলে বলিবে কি? ছি, ছি, লজ্জার কথা! লোকে বলে "কেহ মদ খাইয়া পাগল আর কেহ না খাইয়াই পাগল।" আমি যে মদ না খাইয়াই পাগল হইলাম। তোমাকে কখনও দেখি নাই, জানি নাই, তথাপি লোকমুখে তোমার রূপের কথা শুনিয়াই মজিলাম! মান, সম্ভ্রম, লজ্জা, ভয়ের মাথা খাইয়া যে তোমার নাম করি - বলি তুমি যে আমার কে তাই ত জানি না! মানুষে যখন জিজ্ঞাসা করিবে তখন কি উত্তর দিব? যখন শুনিবে যে তুমি আমার কে—তাই আমি জানি না—তখন যে আমায় টিট্‌কারী দিবে! আমি তখন কি করিব? কি বলিয়া তাহাদিগকে বুঝাইব? কেমন করিয়া তাহাদের কাছে মুখ দেখাইব? কে বলিয়া দিবে তুমি আমার কে—তোমার সহিত আমার কি সম্বন্ধ।

যখন একলা বসিয়া তোমার ছেলেবেলার কথা ভাবি, তখন যে বড় লজ্জা বোধ হয়। তুমি যে তখন মাখন চুরি করিয়া বেড়াইতে। লোকে যে তোমার জন্য অস্থির থাকিত! তুমি চোর, লজ্জায় মরিয়া যাই যে! আমি চোরের প্রেমাকাঙ্ক্ষা! যাহা হউক তোমায় একবার জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি তুমি কি চোর? কি চুরি করিতে জান? মাখন না আরও কিছু?

আমি ত দেখিতেছি তুমি একটা পাকা চোর। মাখন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত চুরি, কোনটাই ত তোমার বাদ নাই! তুমি যে প্রাণও চুরি কর। আমি তোমায় জানি না, তোমার সঙ্গে পরিচয় নাই অথচ আমার প্রাণটী চুরি করিয়াছ, আমার হৃদয়খানি জুড়িয়া বসিয়াছ। ভাল চোর বটে। একবার দেখা পাইলে তোমার উপযুক্ত সাজা দিয়া দিতাম। এমন ভাবে বাঁধিতাম যে, তোমার চুরি করার সাধ মিটাইয়া দিতাম।

তুমি আমার কে, তোমায় জানি না অথচ তোমার জন্য আমি ভাবিয়া মরি। বলিহারি চুরি তোমার! সর্ব্বদাই তোমার কথা ভাবি, জানি না কেন? কে যেন বলে "ভাবিতে ভাবিতেই জানিতে পারিবি।" তাই বসিয়া বসিয়া কেবলই ভাবি—তুমি আমার কে? যখন সেই মাখন চুরি করিয়া যশোদার বন্ধনের ভয়ে চোরের মত পালাইতে, তখনকার কথা ভাবিয়া মনে বড় কষ্ট হয়। মনে হয় আমার, হৃদয়ের ন্যায় একটা স্থান কি তখন ছিল না? আমি ভাবি যদি আমি তখন থাকিতাম, তবে তোমায় বলিতাম :—

"ক্ষীরসারমপহৃত্য শঙ্কয়া,
ক্রিয়তে যদি পলায়নং ত্বয়া ;
মানসে মম নিতান্ত তামসে,
নন্দনন্দন কথং ন লীয়সে।

কিন্তু কৈ আমার সে সৌভাগ্য হইল কোথায়? আমি তখন ছিলাম কি না জানি না, কিন্তু বর্ত্তমানে ত তোমায় দেখি না। আমার এ হৃদয় তোমার উপযুক্ত হইত বটে। যাহা হউক আর একটী কথা মনে পড়িল। আঁধার ঘরেই ত চুরি করিবার সুবিধা—চোর ত অন্ধকারই ভাল বাসে, তবে মনচোর! তুমি ত—এ আঁধার ঘরে কেন এস না?

আবার মনে পড়িল তোমায় কেন ডাকিতেছি? তুমি আমার কে? লোকে দেখিয়া, শুনিয়া, পরিচয় করিয়া তবে প্রেমে পড়ে। আমি যে না দেখিয়া, না জানিয়াই মজিলাম! লোকের আশা থাকে একদিন মিলন হইবে, আমার যে সে আশাও নাই। তোমার যে দেখিব, তোমায় যে জানিব, তোমায় লইয়া যে প্রেমে মাতোয়ারা হইব সে আশা আমার কোথায়? তুমি কোথায় আছ তাই যে আমি জানি না; না হয় গিয়া তোমায় একবার দেখিয়া আসিতাম। তবুও লোকের কাছে বলিতে পারিতাম—কেন তোমরা

ডাকি, কেন তোমায় ভালবাসি। তাহাও ত হইবার নয়। তোমাকে নাকি আবার সকলে দেখিতে পায় না—তোমার নাকি থাকিবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। তুমি সর্ব্বত্রই থাক। তাহা ত থাকিবারই কথা—যাহার চুরি করাই অভ্যাস, সে কি কখনও এক স্থানে চুরি করিয়া সন্তুষ্ট থাকে? তাহার সকল স্থানেই চুরি করিতে ইচ্ছা হয়। যেখানে ভাল জিনিষ দেখিবে, তাহা ত তোমার চুরি না করিলে শান্তি নাই! তাই তুমি সর্ব্বত্রই থাক। তুমি যে মানুষের চেয়েও বড় চোর। মানুষ টাকা কড়ি লইয়াই সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু তুমি তাহা চাও না। তোমার চুরি করিবার বস্তু প্রাণ, মন, জীবন, যৌবন ইত্যাদি। চুরি যদি করিবেই তবে কর ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহার সদ্ব্যবহার কর এই প্রার্থনা। মন প্রাণ ত আর খেলিবার বস্তু নহে—ইহা লইয়া এত খেলা কেন? উহা যেমন লইবে, তেমন আবার নিজের বলিয়া জানিও। আমার প্রাণ মন চুরি করিয়া তুমি তাহা দ্বারা খেলা করিতেছ। তোমার খেলায় যে আমায় প্রাণে মারা হয়। আমি যে এ খেলা সহ্য করিতে পারি না। আমায় তোমার করিয়া লও। আমার জানাইয়া দাও—তুমি আমার কে, তোমার সহিত আমার কি সম্বন্ধ? কেন আমি তোমায় ডাকি—কেন খাইতে শুইতে তোমার কথা আমার মনে পড়ে?

যদি প্রকৃত পক্ষেই তুমি আমার কেহ হও, তবে জানাইয়া দিলে কি কোন ক্ষতি আছে? তাহা হইলে আমি তোমাকে আরও ভালবাসিতে পারিব। বুঝিব, তুমি আমার একজন আত্মীয়। দূরের হও, কাছের হও, তোমাকে কাছের করিয়া লইব। সর্ব্বদা তোমাকে কাছে কাছে রাখিব। সারাদিন প্রাণ ভরিয়া তোমারই রূপসুধা পান করিব। সংসারের সকল ভুলিয়া, তোমার দিকেই অনিমেষে চাহিয়া থাকিব। আমাকে জানাইয়া দাও—তুমি আমার কে, তোমার সহিত আমার কি সম্পর্ক?

শ্রীস..................

গৌহাটী (আসাম)।

কারে ডাকি ?

কবির যাঁরে নিত্য স্মরণ করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন, ধ্রুব যাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে বনে গিয়াছিলেন, প্রহ্লাদ যাঁহাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া হিরণ্যকশিপুর সমস্ত অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, আমি ত তাঁহাকেই ডাকি। আমি ডাকি বটে, তবে আমি নিরন্তর তাঁতে লাগিয়া থাকিতে কি পারি? যাঁরা ডাকেন তাঁরা যে নিরন্তর লাগিয়া থাকেন—তাঁরে ডাকার এত সুখ যে সর্ব্বদাই ডাকিতে ইচ্ছা করে—সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। তাঁরে ডাকার এত রস যে, না ডাকিয়া থাকাই যায় না। এ রস আমি পাই না কেন?

আচ্ছা দেখ দেখি শরণাপন্ন হওয়ায় রস আছে কি না? কাহাকেও কি কখন ভাল বাসিয়াছ? যাঁহাকে দেখিলে প্রাণ জাগিয়া উঠে, যাঁরে দেখিলে প্রাণ সম্মান-পূর্ণ হয়, যাঁরে দেখিলে চক্ষের টান পড়ে, আঁখি পলকশূন্য হইয়া যায়, যার সম্বন্ধে যতবার চিন্তা কর বুঝিতে পার তুমি কাছে গেলে সে বড় সন্তুষ্ট হয়। বল দেখি এমন লোকের শরণাপন্ন যখন হও—যখন বল আমি তোমার শরণাপন্ন—সত্য সত্যই শরণাপন্ন, যখন তারে এই কথা বল তখন রস পাও কি না? যদি সত্য সত্য তারে ভালবাসিয়া থাক, তবে রস পাইবেই। আর যদি অন্য সব বিষয়ে আসক্তিও রাখ আর ভালও বাস, যদি আরও পাঁচ জনের জন্য তুমি ব্যস্ত থাক অথচ যখন সেই একজনকে কাছে পাও—তখন আর পাঁচ জনকে ভুলিতে পার—এক্ষেত্রেও তোমার ভালবাসা ঠিক হয় নাই। এক্ষেত্রে শরণাপন্ন হওয়া ঠিক হয় নাই। কিন্তু যদি অন্য কিছুই চাই না, সত্য সত্যই অন্য কিছুই আর ভাল লাগে না, অন্যকে বাহিরে অগ্রাহ্য না করিলেও ভিতরে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করি না—এরূপ কোন ব্যক্তি যদি তোমার চক্ষে লাগিয়া থাকে, তবে তাহার নিকটে মুখে প্রকাশ করিয়া বলিও আমি শরণাপন্ন—দেখিবে সঙ্গে সঙ্গে রস পাইবেই।

এইটি যদি বুঝিতে পার তবে ইহাও বুঝিবে যে ধ্রুব প্রহ্লাদ যাঁরে ভাল বাসিয়াছিলেন তাঁরে যদি ভাল বাসিয়া থাক, শুধু তাঁরেই চাও আর কিছুই চাও না,—এই চাওয়াতে যদি কপটতা না থাকে, তবে তাঁর কাছে বলিয়া দেখিও আমি শরণ লইলাম, শুধু মুখে বলিও আঁখি শরণে আসিলাম—দেখিও রস পাও কি না।

ভালবাসার পইঠা আছে। বিশ্বাসে ভালবাসা হয়; বহিরঙ্গ কর্ম্মে ভালবাসা হয়; অন্তরঙ্গ কর্ম্মে ভালবাসা হয়: জ্ঞানে ভালবাসা হয়; আবার নিঃসঙ্গ ধ্যান স্থিতিতে ভালবাসা হয়—এইগুলি ক্রম। যত যত উপরের পইঠায় যাইতে পারিবে, তত তত রস পাইবে। বুঝিয়া দেখ, কথা ঠিক।

তিথি-ফলাফল বর্ণন—সর্ব্ব কর্ম্মে।

	চৈত্র	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন
(১)	৪	৫	৬	৭	৯	৮	১১	১০	১	১২	৩	২
(২)	৫	৬	৭	৮	১০	৯	১২	১১	২	১	৪	৩
(৩)	৬	৭	৮	৯	১১	১০	১	১২	৩	২	৫	৪
(৪)	৭	৮	৯	১০	১২	১১	২	১	৪	৩	৬	৫
(৫)	৮	৯	১০	১১	১	১২	৩	২	৫	৪	৭	৬
(৬)	৯	১০	১১	১২	২	১	৪	৩	৬	৫	৮	৭
(৭)	১০	১১	১২	১	৩	২	৫	৪	৭	৬	৯	৮
(৮)	১১	১২	১	২	৪	৩	৬	৫	৮	৭	১০	৯
(৯)	১২	১	২	৩	৫	৪	৭	৬	৯	৮	১১	১০
(১০)	১	২	৩	৪	৬	৫	৮	৭	১০	৯	১২	১১
(১১)	২	৩	৪	৫	৭	৬	৯	৮	১১	১০	১	১২
(১২)	৩	৪	৫	৬	৮	৭	১০	৯	১২	১১	২	১

(১) সুখ সম্পদ্ আনন্দ, এবং কিছু কার্য্য কিম্বা যাত্রা করিলে শুভ হয়।

(২) ক্লেশ, পীড়া, বহু দুঃখ, এই দিন ভাল নয়।

(৩) সজ্জন সঙ্গ হয়, ধন প্রাপ্ত হয়।

(৪) দুঃখ ও দারিদ্র্য এবং মৃত্যু হয়।

(৫) রাজসম্মান এবং লক্ষ্মী লাভ হয়।

(৬) এই তিথিতে কোথাও যাত্রা করা নিষেধ। যাত্রা করিলে শত্রুহস্তে নিপাত হয়।

(৭) এই তিথিতে যাত্রা করিলে মন চিন্তাযুক্ত হয় এবং বাটীতে শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে হয়।

(৮) মরণ সদৃশ হয়, বহু দুঃখ হয়, এবং সমস্ত সম্পদ্ নষ্ট হয়।

(৯) সৌভাগ্য, যশঃপ্রাপ্তি কুশল, সুখ ও আনন্দ হয়।

(১০) কার্য্য-সিদ্ধিতে বহু বিলম্ব হয় এবং দুঃখ হয় ও সম্পদ্ নাশ হয়।

(১১) যাহা মনে ইচ্ছা করিয়া যাত্রা করা যায় বিলম্বে সিদ্ধ হয় এবং অত্যন্ত ভাল হয়।

(১২) ধনপ্রাপ্তি, সুখ, যশঃ এবং অত্যন্ত আনন্দের সহিত কার্য্যসিদ্ধি হয়। তৃতীয়া ত্রয়োদশী চতুর্থী চতুর্দ্দশী পঞ্চমী পূর্ণিমা অষ্টমী অমাবস্যা এই সব এক হয়। শ্রীগোরখজী কহিতেছেন, যাত্রা—দিক্‌শূল, যোগিনী, ভদ্রা, চন্দ্রঘাত চার ঘড়ির মধ্যে শুভ। এই যন্ত্র দেখিয়া যিনি চলেন এবং যে কার্য্য করেন তাহার সিদ্ধি হয় এবং শুভ হয়।

শ্রীমৎ গৌড়েন্দ্র ব্রহ্মযিজী কৃত।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

বর্ত্তমান এই পৃথিবী-ব্যাপী ধর্ম্ম-বিপ্লবে—এই প্রাচ্য-প্রতীচ্য সম্মিলন-আবর্ত্তে হিন্দু কোন্ পথে যাইবে? ইহাই এখন সুধীগণের আলোচ্য এবং চিন্তার বিষয়। এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। হিন্দু হিন্দুর পথে যাইবে। হিন্দুর পথ কি? বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। তাহা ক্রমে ক্রমে দেখান যাইতেছে। এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটি বিষয় বলিয়া রাখা সঙ্গত মনে করিতেছি। বেদে * অবশ্যই জাতিভেদের উল্লেখ না থাকিলেও, আর্য্য ও অনার্য্য শব্দের উল্লেখ আছে (১); ব্রাহ্মণ শব্দের উল্লেখ আছে (২)। ইহাতে কি জাতিভেদের অস্তিত্ব অনুমিত হয় না?

মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রণেতা মনু বলিতেছেন ঃ—

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ ॥"

লোকবৃদ্ধিকামনায় পরমেশ্বর আপনার মুখ, বাহু, ঊরু ও চরণ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণ সৃষ্টি করিলেন। ইহাই মনু-বিবৃত সৃষ্টিতত্ত্ব। প্রজাপতি ব্রহ্মা, এই চারি বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম নির্দ্দেশও করিয়াছেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কর্ম্ম।

প্রজারক্ষণ, দান, যজ্ঞ অধ্যয়ন, ভোগাসক্তির পরিবর্জ্জন সংক্ষেপতঃ এই কয়েকটি কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের। আর পশুরক্ষণ দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, বৃদ্ধির জন্য ধনপ্রয়োগ, এবং কৃষিকার্য্য এইই বৈশ্যের কর্ম্ম। অসূয়া-চিত্তে উপরোক্ত তিন বর্ণের সেবাই শূদ্রের কার্য্য;

মনু সংহিতায় সঙ্কর বর্ণের* উল্লেখ আছে। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের অনুলোম, এবং প্রতিলোম বিবাহে অথবা মিলনে, এই সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি। কায়স্থ জাতির কথা মনুতে নাই। বিষ্ণু পুরাণ এবং যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় কায়স্থের উল্লেখ আছে।

ব্রাহ্মণের উৎপত্তি ব্রহ্মার মুখে, ক্ষত্রিয়ের বাহুতে, বৈশ্যের ঊরুদেশে, এবং শূদ্রের চরণে,—মনুর এ কথায় বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞান-বার্ত্তিকালোকিত শিক্ষিত যুবক যে, কেহ বিশ্বাস স্থাপন করিবেন, তাহা মনে হয় না। তাঁহারা বলিবেন— ও একটা রূপক মাত্র। ব্রাহ্মণ সমাজের মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য ঊরুদেশ, এবং শূদ্র পদতল। এই চতুঃশক্তি সংমিলনে এক বিরাট আর্য্য অথবা হিন্দু সমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এ কথায় অবিশ্বাস করিবার আমাদেরও কোন কারণ নাই; বরং তাহা, আমরা মানিয়া লইতেছি। ক্রমশঃ—

(শ্রীচ)

---

* বেদে জাতিভেদ বিলক্ষণ আছে। বহু স্থানে আছে। এমন কি, দেবতাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র দেবতা আছেন। গীতা চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং শ্লোক ব্যাখ্যা। উঃস।

(১) ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১০৪ সূক্তে "দাস" শব্দের উল্লেখ আছে। উহা অনার্য্যবাচক।

(২) ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১০১ সূক্তে আর্য্যদের শ্বেতবর্ণ কথিত হইয়াছে। উহা ব্রাহ্মণ শব্দ প্রতিপাদক। লেখক।

ভাসিলেও যিনি শূন্য তাহাই পরমাত্মার রূপ।

অনন্ত চিন্ময় হইয়াও মূর্খলোকের দৃষ্টিতে যিনি বৃহৎ পাষাণের ন্যায় জড়ভাবে অবস্থিত, অন্তরে অজড় বা চৈতন্য হইয়াও যিনি জড়ের মত তাহাই পরমাত্মার রূপ।

বাহ্য হইতেছে অধিভূত ও অধিদৈব। অভ্যন্তর হইতেছে অধ্যাত্ম। এই বাহির ভিতরের সহিত সর্ব্ব জগৎ যাঁহা দ্বারা সঙ্গমকে—আধ্যাসিকতাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হইয়া সৎ এই ব্যবহার যোগ্যতা লক্ষণ স্বরূপ সত্তা প্রাপ্ত হইতেছে তাহাই পরমাত্মার রূপ।

প্রকাশের যেমন আলোক, আকাশের যেমন শূন্যতা—সূর্য্য ও আলোক, আকাশ ও শূন্যতা যেমন অভিন্নভাবে স্থিত, সেইরূপ যাঁহাতে এই সকল অবস্থিত তাহাই পরমাত্মার রূপ।

রাম ——— সদ্রূপং পরমাত্মেতি কথং নাম হি বুধ্যতে।

ইয়তোস্য জগন্নাম্নো দৃশ্যস্যাসম্ভবঃ কথম্॥ ২৬॥

সৎ রূপ পরমাত্মার অনুভব কিরূপে হইবে? এই জগন্নাম ধেয় দৃশ্যই বা অসম্ভব কিরূপে বোধ হইবে?

বশিষ্ঠ—আকাশে নীলিমা যেমন ভ্রম মাত্র সেইরূপ ব্রহ্মে এই জগদ্দর্শন ইহা ভ্রম মাত্র। নৌকারোহী দেখে যে তীরতরু চলিতেছে, কিন্তু জানে যে ইহা ভ্রম। যে বিচার দ্বারা এই ভ্রম দূর হয় সেইরূপ বিচার দ্বারা জগদ্দর্শন দূর হইবে। যত দিন নৌকারোহীর তীরতরু দর্শন থাকিবে, তত দিন তীরতরু চলিতেছে এই ভ্রমও থাকিবে। কিন্তু যখন বিচার দ্বারা নিশ্চয় হইবে যে আমি নৌকারোহী নই, আমার কোথাও গতি হইতেছে না—এই আত্মস্বরূপের দর্শনও তজ্জন্য শ্রবণ মননাদি প্রবাহক্রমে চলিলেই ভ্রম দূর হইবে। তাই বলা হইতেছে—

তৎজ্ঞাতং ব্রহ্মণো রূপং ভবেন্নান্যেন কর্ম্মণা।

দৃশ্যাত্যন্তাভাবতস্তু ঋতে নান্যা শুভা গতিঃ॥

অন্য কোন কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় না। দৃশ্যদর্শনের মিথ্যাত্ব জ্ঞান ভিন্ন কিছুতেই ব্রহ্মকে জানিতে পারিবে না।

রাম—এই মিথ্যা জ্ঞান কিরূপে দূর হইবে?

বশিষ্ঠ—যথাস্থিত এই দৃশ্যের অত্যন্ত অভাব সম্বন্ধে যিনি শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন,

তিনিই বোধ প্রাপ্ত হইলেন। যঃ শিষ্যতে স বুধ্যতে যো বুধ্যতে স ততো বোধাৎ বোদ্ধ রাত্মৈব জায়তে। বোধ প্রাপ্ত হইলেই সেই বোদ্ধার আত্মস্বরূপে তাঁহার প্রকাশ হইল। বিচার দ্বারা নিশ্চয় কর—দৃশ্যদর্শন ভ্রম মাত্র। তখন বৈরাগ্য জন্মিবে। বৈরাগ্য হইলেই বিবেক বুদ্ধি জন্মিল। আর কিছুই নাই আত্মাই আছেন। মহাপ্রলয়ে আর কিছুই থাকে না, সুষুপ্তিতে আর কিছুই থাকে না আত্মাই থাকেন। ইহা দৃঢ় ভাবনাতেই আত্মদর্শন হয়।

ন বিদঃ প্রতিবিম্বোঽস্তি দৃশ্যাভাবাদৃতে ক্বচিৎ।
কচ্চিন্না প্রতিবম্বেন কিলাদর্শোঽবতিষ্ঠতে ॥ ৩০ ॥
জগন্নাম্নোঽস্য দৃশ্যস্য স্বসত্তাঽসম্ভবং বিনা।
বুধ্যতে পরমং তত্ত্বং ন কদাচন কেনচিৎ ॥ ৩১ ॥

দৃশ্যের অভাব না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞাতার প্রতিবিম্ব নাই—প্রতিবিম্ব ধরারও উপায় নাই। আবার দর্পণও কখন প্রতিবিম্বশূন্য হইয়া থাকিতে পারে না। এই জগৎ নামক দৃশ্যের সত্তা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না অসম্ভব বোধ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ কখন পরম তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না।

রাম—দৃশ্যের অভাব হইলে তবে ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব ধরা যায়—একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিন।

বশিষ্ঠ—স্থির জলের উপরে পূর্ণচন্দ্রের ছায়া বেশ দেখা যায়। কিন্তু জল অতিশয় আন্দোলিত হইলে ছায়া দেখা যায় না। সৃষ্টিতরঙ্গের অতিশয় আন্দোলিত অবস্থাতে অর্থাৎ যখন দৃশ্যদর্শন পূর্ণ ভাবে আছে, তখন ব্রহ্মদর্শন হয় না। কিন্তু দৃশ্যের অভাব যখন হয়, তখন সেই অভাব জ্ঞানে অস্মিতা সমাধি পর্য্যন্ত হয়। আর কিছুই নাই-সুষুপ্তিতে ইহার অনুভব স্মরণ করা কি পাও? কিছু নাই বলিলে আমি আছি এই প্রতিবিম্বটি পাওয়া যায়। ভাল করিয়া দেখ— বিদঃ অর্থে যিনি জানেন তাঁহার। সেই জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যরূপীই আমি। জানা দুই প্রকার। বস্তুর ভাবটি জানাও জানা, আর তাহার অভাব জানাও জানা। আমি কামকেও জানি, আবার কামের অভাবকেও জানি। 'আমি দৃশ্যকেও জানি, আবার দৃশ্যের অভাবকেও জানি।

রাম—কিরূপে? অভাবকে জানি কিরূপে?

বশিষ্ঠ—জাগ্রতে দৃশ্যকে জানি কিন্তু সুষুপ্তিতে দৃশ্যের অভাবকে জানি। নতুবা সুষুপ্তিভঙ্গে কিরূপে বলিতে পারি—বেশ ছিলাম, আর কিছুই ছিল না?

এই যে আর কিছুই ছিল না—ইহাই ত অভাব জ্ঞান। এই অনুভব হয় বলিয়া জাগরণে ইহার স্মৃতি থাকে। তবেই দেখ দৃশ্যদর্শনকালেও যখন দৃশ্যের অভাব স্মরণ করা যায়—অর্থাৎ জাগ্রতে যখন সুষুপ্তি স্মরণে দৃশ্যের অভাব ভাবনা হয়—যখন আর কিছুই নাই এই ভাবনা পর্য্যন্ত করিতে পার তখন শুধু আমিটি কি অর্থাৎ আপনি আপনি রূপ ব্রহ্মের একটা আভাস, একটা ছায়া মাত্র ধরিতে পার। তাই বলা হইতেছে দৃশ্যের অভাব না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব ধরা যায় না।

আরও বিচার কর নির্ম্মল বুদ্ধিতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব নাই কারণ নির্ম্মল বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্ম আপন আবরক অজ্ঞানকে দগ্ধ করিয়া তত্ত্বতঃ প্রতীত হয়েন। আবার মলিন বুদ্ধিতেও ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব ধরা যায় না। কারণ দ্বৈতাক্রান্ত বুদ্ধি যখন হয় তখন তাহাতে অদ্বৈত প্রতিবিম্বের অনুদয়ই হয়। সাধারণতঃ যে বুদ্ধির কথা মানুষে কহে তাহাই দর্পণ। সেই বুদ্ধি দর্পণ যেমন কোন কালে দ্বৈত প্রতিবিম্ব গ্রহণ ভিন্ন অবস্থান করিতে পারে না সেইরূপ দৃশ্যের অভাব রূপ অদ্বৈত ভাব ভিন্ন কখনও ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বকে ধরিতে পারা যায় না। আর কিছুই নাই আমিই আছি এই অস্মিতা সমাধিতে পৌঁছিলে তবে ব্রহ্মের আভাস কথঞ্চিৎ পাওয়া যায়। তাই বলা হইতেছে, জগৎ নামক এই দৃশ্যের মিথ্যা সত্তার অসম্ভব না হওয়া পর্য্যন্ত পরম তত্ত্বকে কখন কোন উপায়ে বুঝিতে পারা যায় না।

রাম—ইয়তো দৃশ্যজাতস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য জগৎস্থিতেঃ।
মুনে! কথমসত্তাস্তি কঃ মেরু সর্ষপোদরে ॥৩২॥

হে মুনে! এই মূর্ত্তিমান্ সামাশূন্য ব্রহ্মাণ্ড চক্ষের উপরে ভাসিতেছে "ইহা নাই" কিরূপে ইহা অবধারিত হইবে? সর্ষপের মধ্যে সুমেরু প্রবিষ্ট হইয়া অদৃশ্য হইবে কিরূপে? অতিসূক্ষ্ম চিন্মাত্র পরব্রহ্মে জগৎ নামক স্থূল প্রপঞ্চ অদৃশ্য হইয়া যাইবে কিরূপে?

বশিষ্ঠ—হে রাম! কিছুদিন তুমি তোমার চিত্তকে বিক্ষেপ শূন্য করিয়া সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের আলোচনা কর—পরে আমি এক্ষণেই তোমার চিত্তস্থ দৃশ্য-ভ্রান্তিকে প্রমার্জ্জিত করিব। মৃগতৃষ্ণিকার মত এই মিথ্যা দৃশ্য দূর করিতে বিলম্ব কি হইবে? দৃশ্যের অভাব হইলে দ্রষ্টাভাব আর কোথায় থাকিবে?

তখনই দ্রষ্টার স্বরূপ যে শুদ্ধ চৈতন্য ভাব সেই ভাবে অবস্থান করিয়া তুমি জীবন্মুক্ত হইবে।

বিবেচনা করিয়া দেখ—মরুভূমিপতিত সূর্য্যকিরণেই জলভ্রম হয়। ইহাই মরুমরীচিকা; ইহাই মৃগতৃষ্ণিকা। কিন্তু যিনি সূর্য্যকিরণট জানেন, তাঁহার আর ভ্রম কেন হইবে? সেইরূপ ব্রহ্মেই এই জগৎ ভ্রম হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মকে জানিলে আর ভ্রমজ্ঞান কিরূপে থাকিবে? কিন্তু যাহা ভ্রম তাহাকে যদি কোটিকল্প ধরিয়াও জানিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। যাহার উপরে এই ভ্রম জ্ঞান দাঁড়াইয়াছে তাহাকে জানিলেই ভ্রমের নাশ হয়। এই জন্য দৃশ্যজ্ঞান মার্জ্জনা করিতে হইলে ব্রহ্মকেই জানিতে হইবে।

রাম—আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে? দৃশ্য যতদিন আছে ততদিন দ্রষ্টাও আছেন। এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডই দৃশ্য। ইহা যতদিন আছে ততদিন দ্রষ্টাও আছেন। এবং তিনি এই দৃশ্য জ্ঞান দ্বারাই বদ্ধ। কিরূপে তবে দৃশ্যদর্শন থাকিবে না—আবার দৃশ্যদর্শন নাই বলিয়া দ্রষ্টাভাবও থাকিবে না এইরূপে দৃশ্য ও দ্রষ্টাভাবের অভাবে শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ যিনি সেই আপনি আপনি ভাবই থাকিবেন। বলুন কিরূপে আপনি আপনি ভাবে স্থিতিলাভ করিব?

বশিষ্ঠ—দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি। জ্ঞান ও যোগ দ্বারা এই স্বরূপে অবস্থান হয়। ভক্তি যোগটি অষ্টাঙ্গ যোগেরই অন্তরঙ্গ অবস্থা।

ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন—যোগটি চিত্তবৃত্তির নিরোধ। চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। যদি জিজ্ঞাস কর ইহাতে কি হয়? উত্তরে ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেবস্থানম্। দ্রষ্টুর স্বরূপ যে আপনি আপনি ভাব যোগ দ্বারা সেই স্বরূপে অবস্থান হয়। অষ্টাঙ্গ যোগের অন্তরঙ্গ সাধনা হইতেছে ধারণা ধ্যান ও সমাধি। যোগিগণ জ্যোতির ধারণা ইত্যাদি করেন। ভক্তগণও ধারণা ধ্যান সমাধি করেন। ইহা কিন্তু মূর্ত্তি বিষয়ে। যোগী ও ভক্তের ইহাই পার্থক্য। ভক্তিপথেরও আবার ভিন্ন ভিন্ন ক্রম আছে। প্রথম ক্রম দাস ভাব। দ্বিতীয় ক্রম বিরাট ভাব। দাস ভাবে শরণাপত্তিই প্রধান সাধনা। বিরাট ভাবে আপনাকে বিরাট পুরুষ বলিয়া চিন্তা করিতে হয়।

ভক্তিপথ স্ত্রীলোকের জন্যই প্রশস্ত। জ্ঞান পুরুষের জন্য। ভবিষ্যতের

কঠোর সাধনাশূন্য জগৎ ভক্তিপথেরই পক্ষপাতী হইবে। তাহাও এই ভাবে। ভক্তি পথে উঠিতে হইলে ভালবাসা চাই। মনে কর কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোককে অশাস্ত্রীয় কাজেই দোষভাবে ভালবাসিয়া ফেলিল। এই ভালবাসা আবার অবিবাহিত অবস্থায় হইলেই তবে সাধনার উপযোগী হয়। অন্য অবস্থাতেও সাধনার উপযুক্ত করা যায়। যে পুরুষ যে স্ত্রীলোককে একবার দেখিয়া ভাল বাসিল—তাহার পক্ষে প্রধান কর্ত্তব্য সেই স্ত্রীলোককে সর্ব্বদা চিন্তা করা। এই চিন্তাতে ঐ স্ত্রীলোককেও সর্ব্বদা ঐ পুরুষের চিন্তা করিতেই হইবে। তখন ঐ স্ত্রীলোকের চক্ষে, সমস্ত জগৎটা গুটাইয়া ঐ পুরুষ মূর্ত্তিতে আসিবে। স্ত্রীলোকটি ঐ পুরুষ ভিন্ন আর কোথাও কিছু যেন দেখিবে না। যখন যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে হইবে তখন তাহার ভালবাসার বস্তুটি ক্ষুদ্র থাকবে না তাহাই ভগবান হইয়া যাইবে।

কলিযুগের ক্ষীণবীর্য্য জগৎ যেন এই ভাবই লইতে চাহিবে ঐ কালের বহু পুস্তকে ইহা প্রচারিত হইবে কিন্তু ইহার দোষ এই—নায়েকর যখন মনে হইবে আমি নায়িকাকে সর্ব্বশক্তিময়ী কোথায় দেখি তখনই বিলক্ষণ গোলমাল হইবে।

জ্ঞানীর সাধনা অন্যরূপ। চিত্তবৃত্তি নিরোধ যোগীর সাধনা। চিত্তকে বিরাট ভাবে ভাবিত করা অথবা অবতার ভাবে ভাবিত করা শ্রেষ্ঠ ভক্তের সাধনা। কিন্তু জ্ঞানীর সাধনা চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিয়া চিত্ত ক্ষয় করা। চিত্ত ব্রহ্ম ভাবে ভাবিত হইলেই চিত্ত নাশ হয়—হইয়া আপনি আপনি ভাবে স্থিতি হয়।

আমি এই যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে জ্ঞানীর সাধনাই বিশেষ রূপে বলিতেছি।

রাম—বলুন দ্রষ্টাভাব শূন্য ও তজ্জন্য দৃশ্যদর্শন শূন্য হইয়া আপনি আপনি স্বরূপে স্থিতিলাভ জন্য জ্ঞানী কিরূপ অনুষ্ঠান করিবেন ?

বশিষ্ঠ—অহং বোধটি হইতেই দৃশ্যজ্ঞান জন্মে ও দ্রষ্টাভাবের উদয় হয়। প্রকৃত পক্ষে অহং বোধটই দৃশ্যমল। মণি হইতে যেমন ঝলক উঠে সেইরূপ ব্রহ্মপদার্থ হইতে কোটিকল্প যদি সৃষ্টি ঝলক উঠে আর অহং বোধটি না থাকে তবে কখনও দ্রষ্টা ও দৃশ্যভাব থাকিতেই পারে না। কিন্তু যখনই অহং বোধ জাগে, তখনই দৃশ্যজ্ঞান জাগিবেই। আবার দৃশ্য না থাকিলে দ্রষ্টা বোধও থাকিতে পারে না। তবেই হইল দ্রষ্টা বোধটি দৃশ্য জ্ঞানের অন্তর্গত। দ্রষ্টু

দৃশ্য ভাবটি যখন না থাকে তখনই ইহাদের আশ্রয়ীভূত ব্রহ্মসত্তাটি স্থির হয়। আমি শীঘ্রই তোমার অহন্তাদি জগদ্দৃশ্য মার্জ্জনা করিয়া দিব। যাহা নাই তাহার মার্জ্জনে আর ভার কি হইবে?

যথা বন্ধ্যাসুতো নাস্তি যথা নাস্তি মরৌ জলম্।
যথা নাস্তি নভো বৃক্ষস্তথা নাস্তি জগদ্ভ্রমঃ॥ ৪৩॥

বন্ধ্যাপুত্র যেমন নাই, মরুতে জল যেমন থাকে না, আকাশে বৃক্ষ যেমন থাকে না সেইরূপ ব্রহ্মেও জগৎ নাই।

যদিদং দৃশ্যতে রাম! তদ্ ব্রহ্মৈব নিরাময়ম্
এতৎ পুরস্তাদ্বক্ষ্যামি যুক্তিতো ন গিরৈব চ॥ ৪৪॥

হে রাম! যাহা কিছু দেখা যায় তাহাই নিরাময় ব্রহ্ম। এইটি তোমাকে পরে বলিতেছি। এ বিষয়ে যুক্তি দিয়াই বলিব কথার কথা বলিব না। যুক্তিযুক্ত বাক্যে যে অবহেলা করে সে মূর্খ।

উৎপত্তি প্রকরণ কেন এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত ব্রহ্মে যে জগৎ ভ্রম এই ভ্রমের উৎপত্তি কিরূপে হয়, স্থিতিই বা কিরূপে হয়, লয়ই বা কিরূপে হয়, তাহা দেখান আবশ্যক। কারণ একমাত্র ব্রহ্মই আছেন। জগৎ নাই। একবারেই নাই। যাহা দেখা যায় তাহা ভ্রমে।

৮ম সর্গ।

সৎ শাস্ত্র নিরূপণ।

রাম—পূর্ব্বে বলিলেন

যদিদং দৃশ্যতে রাম! তদ্ব্রহ্মৈব নিরাময়ম্।
এতৎ পুরস্তাদ্বক্ষ্যামি যুক্তিতো ন গিরৈব চ॥

যাহা কিছু দেখি তাহাই নিরাময়—(নীরোগ, সুস্থ) ব্রহ্ম। আপনি যুক্তি বা অনুভব দিয়া ইহা বলিবেন—শুধু কথায় ইহা বলিবেন না—ইহা বলিয়াছেন। এখন বলুন কোন্ যুক্তি দ্বারা ইহা জানা যায়? এইটি অনুভব করিতে পারিলেই আমার জ্ঞান পিপাসা মিটিয়া যাইবে।

বশিষ্ঠ—আকাশে যেমন বৃক্ষ নাই, সেইরূপ ব্রহ্মেও জগৎ নাই। সূর্য্যকিরণ জানিলে যেমন মরু মরীচিকা ভ্রম দূর হয় সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা এই জগদ্দর্শন-

ভ্রম দূর হইবে। কিন্তু বহুদিন হইতে এই ভ্রম বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। আমি নানা আখ্যায়িকা দ্বারা তোমাকে প্রবুদ্ধ করিব। তুমি যদি মনোযোগ করিয়া শ্রবণ কর তবে বুঝিবে তুমি মুক্ত স্বভাব—বদ্ধ স্বভাব নও। কিন্তু উদ্বেগ বশতঃ কিছু শুনিয়াই যদি ক্ষান্ত হও তবে পশু ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে।

যো যমর্থং প্রার্থয়তে তদর্থং যততে তথা।
সোঽবশ্যং তদবাপ্নোতি ন চেচ্ছ্রান্তো নিবর্ত্ততে ॥ ৫ ॥

যে যাহা চায় এবং তাহার জন্য যত্নাতিশয় প্রকাশও করে, সে অবশ্যই তাহা পায়। কিন্তু সম্যক্ যত্ন না করিলে পরিশ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আইসে—প্রার্থিত বস্তু লাভ করিতে পারে না।

সাধুসঙ্গমসৎশাস্ত্রপরো ভবসি রাম চেৎ।
তদ্দিনৈরেব নো মাসৈঃ প্রাপ্নোসি পরমং পদম্॥

রাম যদি সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র পরায়ণ হইতে পার তবে একদিনে বা একমাসে নিশ্চয়ই পরমপদ প্রাপ্ত হইবে।

রাম—আত্মজ্ঞান প্রবোধ জন্য কোন্ শাস্ত্র প্রধান তাহাই বলুন।

বশিষ্ঠ—বাশিষ্ঠ রামায়ণই অতি উত্তম। শাস্ত্রাণাং পরমং শাস্ত্রং মহা রামায়ণং শুভম্॥ ইহা শুধু অধ্যাত্ম শাস্ত্র নহে ইহা শ্রেষ্ঠ ইতিহাস। ইহা শুনিলে তত্ত্ব জ্ঞানের বিকাশ হয়, জীবন্মুক্তি লাভ হয়।

রাম—কিরূপে ইহা হয়?

বশিষ্ঠ—স্থিতমেবাস্তমায়াতিজগদ্দৃশ্যং বিচারণাৎ।
যথা স্বপ্নে পরিজ্ঞাতে স্বপ্না দেবেব ভাবনা ॥ ১১ ॥

যথা স্বপ্নাদৌ স্থিতে এবং স্বপ্নোয়ং ইতি পরিজ্ঞাতে স্বপ্ন-সত্যত্ব ভাবনা অস্তমভ্যেতি। যখন স্বপ্ন দেখিতেছি তখন ইহা স্বপ্ন এইটি জানিলে যেমন স্বপ্নের সত্যত্ব ভাবনা অস্তমিত হয় সেইরূপ এই জগৎ চক্ষুর সম্মুখে থাকিলেও এই শাস্ত্রবিচারের পর ইহার সত্যতা অস্তমিত হয়। এই শাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্রের কোষস্বরূপ। এই শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহা অন্য শাস্ত্রেও আছে। এখানে যাহা নাই, তাহা অন্য কোথাও নাই।

এই শাস্ত্র নিত্য পাঠ কর; অন্য শাস্ত্র পাঠ জনিত বোধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বোধ প্রাপ্ত হইবে।

এই শাস্ত্রে যাহার রুচি নাই তাহার অন্য কোন সৎশাস্ত্র আলোচনা করা

উচিত। পরে ইহাতে অধিকার জন্মিবে। এই শাস্ত্র শ্রবণে জীবন্মুক্তি হয়। মুনিগণের শাপ এবং বর যেমন অমোঘ—এই শাস্ত্রের ফলও সেইরূপ অনিবার্য্য।

নশ্যতি সংসৃতি দুঃখমিদং তে
স্বাত্মবিচারণয়া কথয়ৈব।
নো ধনদান তপঃ শ্রুতবেদৈ-
স্তৎকথনোদিত যত্নশতেন ॥ ১৭ ॥

তোমার এই সংসার দুঃখের নাশ আত্ম বিচার ও আত্মকথা দ্বারাই হইবে। ধনদান, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, বেদোক্ত অনুষ্ঠান ইত্যাদি শত যত্ন করিলেও হইবে না।

দেহে আত্মবোধ দুর করিবার একটা সহজ উপায় বলিয়া দিতেছি শ্রবণ কর—করিয়া প্রতিক্ষণে ইহাকে অভ্যাসের বস্তু করিয়া ফেল।

দেহের মধ্যে আত্মা বা আমি ইহা যে ভ্রম তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আমির মধ্যেই এই দেহটা ভাসিয়াছে—যেমন সমস্ত পর্ব্বতটি দেখিলে মনে হয় পর্ব্বতের একদেশেই বন ভাসিয়াছে সেইরূপ।

আমির মধ্যে যে দেহ ভাসিয়াছে সেই দেহটি আবার রজ্জুর উপরে সর্প ভাসার মত। যদিও সর্পটি দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু স্বপ্নকালে যেমন ইহা স্বপ্ন ইহা মিথ্যা ইহা ক্রমাগত বলিতে বলিতে স্বপ্ন ভ্রম ভঙ্গ হয় সেইরূপ দেহটা স্বপ্ন ভ্রমের মত আমাতে ভাসিয়াছে ইহা স্বপ্নভ্রম—ইহা বহুকাল অভ্যাস করিতে করিতে ভ্রম ভাঙ্গিয়া যাইবে। জগৎ দেখিতেছি বটে কিন্তু ইহা রজ্জুতে সর্প ভাসার মত ব্রহ্মে ভাসিয়াছে ইহার অভ্যাসে সুষুপ্তিতে অভাব বোধের মত একটা অভাব-বোধ অথবা পরিপূর্ণ আমির বোধ হইয়া যাইবে। ইহাই জ্ঞান।

৯ম সর্গ

পরম কারণ বর্ণন।

রাম—আত্মবিচার ও আত্মকথা দ্বারাই সংসার-দুঃখের নাশ হয়; যাঁহারা জ্ঞানলাভে একনিষ্ঠ, যাঁহারা আত্মজ্ঞান বিচারী, যাঁহারা আমি কে সংসার কি এই বিচার করিতে সমর্থ, যাঁহারা

তোমার দেহ ও মন পিতার প্রতিষিদ্ধ স্ত্রীসঙ্গাদি-সঙ্কল্প-পাপ-পঙ্কিল হইয়া আসিতেছে। তার পর মাতৃগর্ভে প্রক্ষিপ্ত হইবার পর ক্রমোপচিত সেই রেতোবিন্দুরূপ তোমার দেহ এবং তদধিষ্ঠিত তোমার চিত্ত গর্ভের ক্লেদাদিপূর্ণ শয্যায় দশমাস অবিশাস্থিত রহিয়া কত পাপ-সংস্কারে পূর্ণ হইয়াছে। এই বীজগত এবং গর্ভগত পাপরাশি গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম, চূড়া, উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার দ্বারা প্রক্ষালিত হয়। তৎপর বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত, সাবিত্র চরু হোমাদি, সায়ংপ্রাতঃ হোম, দেবর্ষি পিতৃলোক প্রভৃতির তর্পণ, পুত্রোৎপাদন, পঞ্চমহাযজ্ঞ (ব্রহ্মযজ্ঞ বা বেদাধ্যয়ন, পিতৃযজ্ঞ বা তর্পণ, দেবযজ্ঞ বা প্রাত্যহিক হোম, ভূতযজ্ঞ বা বৈশ্বদেব বলি, নৃযজ্ঞ বা অতিথি সৎকার) এবং জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ দ্বারা দ্বিজাতি শিশুর দেহ ব্রহ্মপ্রাপ্তি যোগ্য করা হয়।

গৌতম বলিয়াছেন—

গর্ভাধান পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন জাতকর্ম্ম নামকরণান্নপ্রাশন চোলোপনয়নং 'চত্বারি বেদব্রতানি স্নানং সহধর্ম্মচারিণীসংযোগঃ পঞ্চানাং যজ্ঞানামনুষ্ঠান-মষ্টকা পার্ব্বণশ্রাদ্ধং শ্রাবণ্যাগ্রহায়ণী চৈত্রী আশ্বযুজীতি সপ্তপাকসংস্থাঃ, অগ্ন্যাধান-মগ্নিহোত্রং দর্শপূর্ণমাসৌ চাতুর্ম্মাস্যাগ্রয়ণেষ্টি নিরূঢ়পশুবন্ধঃ সৌত্রামণীতি সপ্ত হবির্যজ্ঞ সংস্থাঃ, অগ্নিষ্টোমাত্যগ্নিষ্টোম উক্থ্যঃ ষোড়শী বাজপেয়োঽতিরাত্র আপ্তোর্য্যাম ইতি সপ্ত সোমযজ্ঞ সংস্থা ইত্যেতাশ্চত্বারিংশৎ সংস্কারাঃ। অষ্টা-বাত্মগুণাঃ—দয়াসর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরনসূয়া শৌচমনায়াসো মাঙ্গল্যমকার্পণ্যম-স্পৃহেতি। যস্যৈতে চত্বারিংশৎ সংস্কারা অষ্টাবাত্মগুণাশ্চ স ব্রাহ্মণঃ সাযুজ্য-মাপ্নোতি।'

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ গর্ভাধান প্রভৃতি চত্বারিংশৎ প্রকার সংস্কার-প্রাপ্ত কর্ম্মে বীতমল, এবং যাহার হৃদয় দয়াদি আটটি মানস সংস্কার সম্পন্ন, সেই ব্রাহ্মণ সাযুজ্য লাভ করে। পুরাকালে অধিকাংশ ব্রাহ্মণেরই এই অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কার হইত; তৎকালে অত্যল্পমাত্র গৃহস্থই নিরাগ্নি থাকিতেন। অনধিকার প্রযুক্ত যাহারা নিরগ্নি থাকিতেন, কেবল তাহাদেরই কতিপয় পাকযজ্ঞ, হবির্যজ্ঞ, এবং সোমসংস্কার হইত না; তদ্ভিন্ন অপর সকলেই অষ্ট-চত্বারিংশৎ সংস্কার প্রাপ্ত হইতেন এবং শ্রুতি ও তদনুচারিণী স্মৃতির সহিত চিরপরিচিত রহিয়া শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত সর্ব্ববিধ আদেশ প্রতিপালন করিয়া তাহারা আগন্তুক মলক্ষালন-পূর্ব্বক ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতেন। আর বর্ত্তমান সময়ে অষ্ট-চত্বারিংশৎ

সংস্কার ত দূরের কথা—গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কার যাহা আছে তাহাও যথা-সময়ে যথারীতি অনুষ্ঠিত হয় না। কাহার কাহারও আবার দুর্ভাগ্যবশতঃ একটিও সংস্কার হয় না; সুতরাং বৈজিক ও গার্ভিক পাপ যাহা বর্ত্তমান সময়ে পুরাকাল অপেক্ষা শতসহস্র গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে; তাহা পরেও মন্ত্রসংস্কার প্রাপ্ত না হওয়া, প্রত্যুত বাহ্য আভ্যন্তর বিবিধ পাপভারে পরিবর্দ্ধিত হইয়া অধুনাতন জীবকে বেদপাঠ, সংস্কার, পরকাল, ধর্ম্ম, ইত্যাদি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়েও উদাসীন ও সন্দিহান করিয়া তুলিয়াছে। অধিক কি, পরম-তত্ত্ব নির্ণয় উদ্দেশ্যে সতত মধুরভাষিণী, মাতেবহিতকারিণী শ্রুতি ও উপনিষদের ভাষা এখন মালবী ভাষার ন্যায় লোকের অপরিচিত ও উপহাসাস্পদ হইয়াছে। বৎস! এই জন্যই উপনয়নাদি বিশেষ সংস্কারে সংস্কৃত হইলেও বাহ্য আভ্যন্তর নবোদ্ভিন্ন বহু পাপের আক্রমণে যাজ্ঞিকের চিত্ত আক্রান্ত হয়। এই পাপরাশি ক্ষালন করিবার জন্যই যজ্ঞদীক্ষা গার্হস্থ্য জীবনে আবশ্যক হইয়াছে এবং এই পাপা-পনোদন পূর্ব্বক আপন আধিদৈবিক মূর্ত্তিলাভকে স্মৃতি "তৃতীয়ং যজ্ঞ-দীক্ষায়াং" বলিয়া ব্রাহ্মণের তৃতীয় জন্ম বলিয়াছেন। ঐতরেয় শ্রুতিতে যাজ্ঞিকের এই তৃতীয় জন্ম সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে (১ম অঃ, ৩য় খণ্ড)।

ঐতরেয় শ্রুতি-বাক্যের মর্ম্ম এই—জীব যেমন জলময় দেহ অবলম্বনে পিতৃদেহে প্রবিষ্ট হইয়া ঋতুকালে মাতৃগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়, তদ্রূপ ঋত্বিক্ যজমানকে পবিত্র অভিষেকে জলে সুক্ষিত করিয়া যজ্ঞশালারূপ যোনিদ্বারে প্রবেশ করাইবেন। দেবযজন-ভূমিতে প্রবেশের পরে যোনি-প্রবেশিত গর্ভের ন্যায় বহির্গমন নিষেধ করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—"যথা যোনের্গর্ভঃ স্কন্দতি তাদৃশেব তন্ন প্রবস্তব্যম্ আত্মনোগোপীথায় ইতি" অর্থাৎ যোনি হইতে গর্ভস্রাব হইলে যেমন উহা নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ তৎকালে আত্মরক্ষার জন্য যজমানের বহির্গমন নিষিদ্ধ। তার পর উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা যজমানকে আচ্ছাদন করিতে বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—"উল্বং বা এতদ্দীক্ষিতস্য যদ্বাসঃ, উল্বেনৈবৈনং তৎ প্রোর্ণু-বন্তি ইতি"—অর্থাৎ গর্ভ যেমন সূক্ষ্ম চর্ম্ম বেষ্টনে আবৃত থাকে, তদ্রূপ যাজ্ঞিকের এই উত্তরীয় বসনও ঐ উল্বস্থানীয়। এই উল্বস্থানীয় উত্তরীয় ধারণের পর যাজ্ঞিককে কৃষ্ণাজিন দ্বারা আচ্ছাদন করিতে বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—"জরায়ুণৈবৈনং তৎপ্রোর্ণুবন্তি"—অর্থাৎ কৃষ্ণাজিন দ্বারা যে আচ্ছাদিত করা হয়, উহা জরায়ু দ্বারাই আচ্ছাদিত করা হয়। এইরূপে গর্ভরূপী যজমানকে

দেবযজনভূমিরূপ মাতৃগর্ভে স্থাপন পূর্ব্বক শ্রুতি যাজ্ঞিককে মুষ্টি করিতে বলিয়াছেন—এবং আর বলিয়াছেন—যে যেমন গর্ভস্থ সন্তান মুষ্টিবদ্ধ হইয়া অভ্যন্তরে শয়ান থাকে, এবং বদ্ধমুষ্টি হইয়াই যেমন কুমার জন্ম গ্রহণ করে, তদ্রূপ দেবযজন ভূমি প্রবিষ্ট যজমান ও বদ্ধমুষ্টি হইবে, এবং এত মুষ্টি বন্ধনের ফল বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিতেছেন—"তৎসর্ব্বাশ্চ দেবতাঃ মুষ্ট্যোঃ কুরুতে" সমস্ত দেবতাকে যাজ্ঞিক মুষ্টি মধ্যে ধারণ করেন।

শ্রুতি এইরূপে যাজ্ঞিকের তৃতীয় গর্ভের বর্ণনা করিয়া—অবভৃথ স্নানার্থ যাজ্ঞিকের বহির্গমনকে যাজ্ঞিকের জন্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বলিয়াছেন—উন্মুচ্য কৃষ্ণাজিনমবভৃথমভ্যবৈতি, তস্মান্মুক্তাগর্ভা জরায়ো র্জায়ন্তে ইতি সহৈব বাসসা হভ্যবৈতি, তস্মাৎ সহৈবোল্বেন কুমারো জায়তে—অর্থাৎ জরায়ুর আবরণ ছাড়িয়া কুমার যেমন গর্ভ হইতে বহির্গত হয়, তদ্রূপ অবভৃথ স্নানার্থ বহির্গমন কালে যাজ্ঞিক কৃষ্ণাজিন উন্মোচন পূর্ব্বক অবভৃথ স্নানার্থ গমন করিবেন। কুমার যেমন গর্ভবেষ্টন সহকারেই জন্মগ্রহণ করে, তদ্রূপ যাজ্ঞিক উল্বস্থানীয় উত্তরীয় বসন লইয়াই অবভৃথ স্নানার্থ যজ্ঞশালা হইতে বহির্গত হইবে। এই যজ্ঞশালা হইতে বহির্গমন যাজ্ঞিকের তৃতীয় জন্ম। ইহা লক্ষ্য করিয়াই স্মৃতি বলিয়াছেন "তৃতীয় যজ্ঞ দীক্ষায়াম্"।

কিন্তু বৎস! যে ভাগ্যবান্ ব্রহ্মচারী আচার্য্য-উপহৃত আপন তৈজসভাবে স্থিতিলাভ করিয়া তদীয় হিরণ্যগর্ভভাবে আবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া থাকিতে পারে, তাহার আর যজ্ঞদীক্ষারূপ তৃতীয় জন্ম হয় না। আচার্য্য সমীপে উপনিষদ্ রহস্য সহকৃত বেদ অধ্যয়ন মাত্রেই, তাঁহার যজ্ঞাদিলভ্য ফল উপলব্ধ হইয়া যায়। অকর্ম্মী ও বিকর্ম্মীর স্থাবরান্ত অধোগতি কেবল কর্ম্মীর ধূমাদি মার্গে চন্দ্রলোকগতি, এবং বিজ্ঞানসহকৃত কর্ম্মানুষ্ঠায়ীর প্রাণোৎক্রমণ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকগতি এবং জীবন্মুক্তগতি—আলোচনা করিয়া এই ভাগ্যবান্ পুরুষ এই লোকেই ব্রহ্মলোক সুলভ আনন্দ লাভ করিয়া গতিত্রয়ের পর বৈরাগ্য লাভ করেন, এবং ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এবং যথাবিধি শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন দ্বারা জীবন্মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু সাধারণ জীব এই অধিকার লাভের যোগ্য নহে; তাহারা পুনঃ পুনঃ হিরণ্যগর্ভ-ধারণায় স্থাপিত হইয়াও, আপন তৈজসস্বরূপে উপনীত হইয়াও, প্রাক্তন দুষ্কৃতির ফলে পুনঃ পুনঃ এই দেহেই 'আমি' অভিমান করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ অধিকারীর

দেহ ও চিত্তগত কালান্তরসঞ্চিত পাপক্ষালন জন্যই বিবাহপূর্ব্বক যজ্ঞ সংস্কার আবশ্যক।

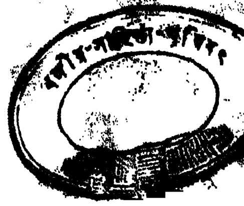
ব্রহ্মচারী] ভগবন্! আমারও মনে হইতেছিল,—আপনি যখন হিরণ্যগর্ভ পুরুষের শ্রবণমনোরম ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করেন, তখন আমার চিত্ত যেন ঐ রসে আপ্লুত হইয়া যায় এবং নিরন্তর এই রসেই ডুবিয়া থাকিব আকাঙ্ক্ষা হয়; কিন্তু এমনই পাপের প্রভাব, মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথায় ঐ দৃশ্য লুকাইয়া যায় খুঁজিয়া পাই না। তবে কি আমি ব্রহ্মচর্য্য হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিব না? এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্যই কি বিবাহরূপ কারা-দ্বারে আমাকে যাইতে হইবে?

আচার্য্য] বৎস! বিলাসের দৃষ্টিতে সন্ন্যাস বা গার্হস্থ্যকে দেখিও না, উহা ভ্রষ্টাচারের চিহ্ন। পারমার্থিক দৃষ্টিতে গার্হস্থ্য কারাগার সন্দেহ নাই, এবং সন্ন্যাস স্বাতন্ত্র্যস্বরূপ সন্দেহ নাই; কিন্তু এই পারমার্থিক দৃষ্টিতে কি তুমি দেখিতেছ? তুমি দেখিতেছ গৃহস্থের যে সতত কত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হয়,—গৃহস্থ যে সন্তান-সন্ততি পিতামাতা বন্ধুবান্ধবাদির প্রতি গুরুতর কর্ত্তব্য ভারে প্রপীড়িত। তুমি দেখিতেছ গৃহস্থের আগণ্ডবাহী অশ্রুজল, তুমি দেখিতেছ সতত 'কোথা যাব, কোথা পাব'—এইরূপ উপার্জ্জন চিন্তায় ক্লিষ্ট গৃহস্থের করতল নিহিত বদন-মণ্ডল! পক্ষান্তরে তুমি দেখিতেছ সন্ন্যাসীর সতত স্বৈরচারিতা: দান-দাক্ষিণ্যে কল্পতরূপম মূর্ত্তি। তুমি দেখিতেছ গৈরিক কৌপানের প্রতি লোকের অযাচিত শ্রদ্ধার লোভনীয় দৃশ্য! বৎস! এই উভয় অবস্থাই ব্যভিচার-সূচক। ব্রহ্মচর্য্য-সংযমে উদাসীন রহিয়া কর্ম্ম উপাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া কর্ম্ম-উপাসনার উপহৃত ভগবদ্ভাব, 'কথার কথা' মনে করিয়া, ভগবানের যোগ-ক্ষেম নির্ব্বাহে অবিশ্বাসী হইয়া, এবং আপনাতে পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া জীব যদৃচ্ছাচারের সুবিধার জন্য যে সন্ন্যাস আশ্রম অনুসন্ধান করে উহা সন্ন্যাস নহে।

বৎস! তুমি শাস্ত্রানুবর্ত্তী হইয়া আশ্রম নির্ণয় কর, শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবে।

বায়ো তব প্রপৃঞ্চতী ধেনা জিগাতি দাশুষে। উরূচী সোমপীতয়ে॥ ৩॥

পদানুসরণী] হে বায়ো তব ধেনা বাক্ সোমপীতয়ে সোমপানার্থং দাশুষে দাশ্বাংসং দত্তবন্তম্ যজমানং জিগাতি গচ্ছতি, হে যজমান! ত্বয়া দত্তং সোমং



উৎসব।



স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৮ম বর্ষ।] ১৩২০ সাল, ফাল্গুন। [১১শ সংখ্যা।

আমি তোমার।

কোন গীতার "সর্ব্ব ধর্ম্মান্" শ্লোকের ব্যাখ্যার এক স্থানে এই ভাবের কথা লেখা আছে—হে আমার দেবতা—আমি আর কাহার হইব ? আমি কামের হইতে চাহি না, আমি ক্রোধের হইতে চাহি না, আমি লোভের হইতে চাহি না, আমি কাহারও ইন্দ্রিয়ের হইতে চাহি না, আমি কাহারও মনের হইতে চাহি না। আমি সংসারের হইতে চাহি না। আমি কোন কিছু ক্ষণস্থায়ীর আর হইতে চাহি না। সকলেরই ত হইতে চাহিয়াছিলাম। বড় দাগা পাইয়াছি, বড় জ্বালায় জ্বলিয়াছি। আর আমি কাহারও হইতে পারিব না। আর কাহার হইব ? আমি তোমার হইলাম।

সংসারের ধাক্কা খাইয়া, মনের অশান্তিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া প্রায় লোককেই জীবনে বহুবার এই কথা বলিতে হয় আর শেষকালে বুঝি সকলকেই এই কথা বলিতে হয়। যাহারা পশুপক্ষী-যোনিতে নাবিয়া যায় তাহাদিগের মুখ হইতেই বুঝি এ কথা বাহির হয় না।

সাধুপ্রকৃতির মানুষ মাত্রকেই যখন ইহা বলিতে হয় তখন কথাগুলি একটু ভাল করিয়া বুঝিতে প্রয়াস করা কি উচিত নয়?

"আমি তোমার" শরণাপত্তির এই প্রথম অবস্থাতে যে পূর্ব্বোক্ত বিলাপ-গাথা গায় সেই বা কে এবং যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এই বিলাপ করে তিনিই বা কে ইহাই বুঝিবার বিষয়। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া হউক। দৃষ্টান্ত ভিন্ন অতি সূক্ষ্ম কথা বেশ করিয়া ধারণা করিবার অন্য উপায় নাই। শ্রীভগবানকে স্থায়ীভাবে ধ্যানধারণায় আনিতে হইলে এই জন্যই স্থূল অবলম্বনই প্রশস্ত। বিশ্বাসে যাহা হয় তাহা কাজচলা গোছ। কাজটাই সে স্থানে মুখ্য আর শ্রীভগবান গৌণমাত্র। এখন "আমি তোমার" বুঝিবার দৃষ্টান্ত আনা যাউক।

ভদ্রানামক পুস্তকের একস্থানে আমরা পড়িয়াছি "ভদ্রা এই স্থানে উপবেশন করিয়া কখন সাগর, কখন নদী, কখন উভয়ের মধুর মিলন ভাবিতেছিল। আর একটু দূরে ঐ নদীর শাখা সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত আসিয়া আর যাইতে পারিতেছে না। সমুদ্রতীরে রাশীকৃত বালুকা। ঐ বালুকাস্তূপ অতিক্রম করিলেই নদী সমুদ্রে গিয়া মিশিত। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ নদী শুনিতেছে, কিন্তু বালুকারাশি অতিক্রম করিবার সামর্থ্য ক্ষুদ্র নদীর নাই। ভদ্রা কত কি চিন্তা করিতেছে। ভাবিতেছে যদি কোলে করিয়া নদীকে সমুদ্রের উপরে দিয়া আসিতে পারিত! ইত্যাদি।

আমরা স্বচক্ষে এই রকমের একটি ক্ষুদ্র নদী দেখিয়াছি। দেখিয়াছি ৺পুরীধামের চক্রতীর্থে। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে নদীটি অন্য স্থানে শুষ্ক খাদমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু চক্রতীর্থ টুকুতেই নদীটি থাকে।

চক্রতীর্থ ও সমুদ্র এই দুয়ের মধ্যে বালুকাস্তূপ। নদী সর্ব্বদাই সমুদ্র-গর্জ্জন শুনিতেছে। সীমাশূন্য সমুদ্রের নীলাম্বুরাশির প্রবল তরঙ্গভঙ্গও বুঝি ক্ষুদ্র নদী দেখিতেছে। আর মনে হয় নদীকে সমুদ্রই যেন জলবিশিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। নদীর প্রাণভরা সাধ বুঝি নদীনাথ সমুদ্রে পড়া। ক্ষীণ বালুকা-স্তূপ ভেদ করিয়া ক্ষুদ্র নদী কিন্তু সমুদ্রে মিশিতে পারিতেছে না। না পারিলেও সাধ ত যায় না। যাহাতে মিশিতে প্রাণ চায়, যাহার সহিত মিলন হইয়া মিশ্রণ হইলে প্রাণের সব জ্বালা জুড়াইয়া যায়—এত নিকটে তারে পাইয়া—প্রতিদিন তার লীলাতরঙ্গভঙ্গ দেখিয়াও যে তাতে মিশিতে পারি না এই ত যাতনা। আরও যখন মনে হয় সমুদ্র যেন নদীকে তার রূপরাশি,

তার অনন্ত রত্নরাজি দেখায় তথাপি কোলে তুলিয়া লয় না—সে ত সব পারে তবু যেন কি বুঝিয়া বিশালবক্ষে ধরে না—তখন না জানি কেমন হয়।

কিন্তু নদীর অন্তরের প্রবল বাসনা—উগ্র আকাজ্ক্ষা—এ আকাজ্ক্ষা কি সমুদ্র একবারেই অসম্পূর্ণ রাখেন? তাই কি হয়? অন্য সকল অভিলাষ ছাড়িয়া, অন্য সকল দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া যদি কেহ তার অনুরাগ গায়ে মাখে—তার অনুরাগে অনুরাগিণী হইয়া তারে পাবার জন্যই উৎকণ্ঠাস্ফুটিত চিত্তে তারেই ভজে তবে কি সে তারে উপেক্ষা করিতে পারে?

না তাহা হয় না। শুভ সময় বুঝিয়া সাগর কখন কখন নদীকে সস্নেহ আলিঙ্গন করেন। আমরা স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াছি।

একদিন পূর্ণিমা। চন্দ্রের আলোকে সমুদ্রের ও নদীর বড় শোভা হইয়াছে। আমরা চক্রতীর্থে সান্ধ্যক্রিয়া করিতেছি। দেখি সমুদ্র ধীরে ধীরে বালুকাস্তূপ সরাইয়া বড় মধুর শব্দ করিয়া নদীবক্ষে আসিতেছে। আমরা চক্ষু বুজিয়াই ছিলাম। নদী-সমুদ্রের সুন্দর মিলন-শব্দে—সুন্দর কুল কুল ধ্বনিতে চক্ষু চাহিয়া দেখি সমুদ্র বালুকাস্তূপ সরাইয়া নদীতে আসিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে এক হইয়া গেল। নদীর জল বাড়িয়া উঠিল। আমরা দূরে সরিয়া আসিয়া কতক্ষণ দেখিলাম। কত আশা প্রাণে জাগিল। গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ঐ মিলন ভুলিলাম না। তার পরদিন প্রভাতেই ছুটিয়া গেলাম। দেখিলাম যেমন সমুদ্র তেমনই গর্জ্জন করিতেছে, যেমন নদী তেমনই আছে। মধ্যে সেই বালুকাস্তূপ। কেবল নদীর জল একটু বাড়িয়াছে। আর নদী সমুদ্রসঙ্গ করিয়া সমুদ্রের গন্ধ গায়ে মাখিয়া রাখিয়াছে।

এই দৃষ্টান্তই "আমি তোমার" বুঝিবার দৃষ্টান্ত আমরা বলিতেছিলাম। আকাশ ত সর্ব্বব্যাপী। একটি ঘট কোনরূপে ভাসিল। ঘটের ভিতরেও আকাশ আর ঘটের বাহিরেও চারিধারে আকাশ। সেইরূপ আকাশের মত অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্য সর্ব্বত্র। দেহঘট সেই চৈতন্য আকাশের কোন স্থানে উঠিল। ভিতরে চৈতন্য বাহিরে চৈতন্য। দেহটা ত জড়ই ছিল। কিন্তু চৈতন্য যখন ভিতরে বাহিরে দেহটাকে ব্যাপিয়া রহিল তখন জড় হইয়াও উহা চেতনের মত হইল। হইয়া চেতনদেহ ভাবিল দেহের মধ্যে চৈতন্য। দেহের মধ্যে চৈতন্য এইটাই ভ্রম। ইহাই অজ্ঞান। ঘটের মধ্যে আকাশ যেমন পরিচ্ছিন্নমত দেখায় সেইরূপ চৈতন্যদীপ্ত-দেহ যখন আপন মধ্যবর্ত্তী

চৈতন্যকে পরিচ্ছিন্নমত দেখে তখনই সর্ব্বপ্রকার দুঃখের আধারস্বরূপ জীবভাবের উদয় হয়। অখণ্ডচৈতন্যকে খণ্ডমত বোধ করাই জীবত্ব। অঘটন ঘটনপটীয়সী মায়ারই এই কার্য্য। মায়াই অজ্ঞান। অজ্ঞানই অপরিচ্ছিন্নকে পরিচ্ছিন্নমত দেখায়, অখণ্ডকে খণ্ডমত করিয়া তুলে। সীমাশূন্য পরব্রহ্মকে সসীম জীবভাব মত প্রকাশ করে। আকাশের বহু হওয়া যেমন স্বরূপতঃ মিথ্যা—আকাশের গ্রামে প্রবেশ করা যেমন তত্ত্বতঃ কল্পিতমাত্র সেইরূপ শ্রুতি বলেন "ময়ি জীবত্বমীশ্বত্বং কল্পিতং বস্তুতো নহি"। এ কল্পনা কিন্তু মানুষের নহে। "ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা" এ কল্পনা কিন্তু মানুষে করে না। অবতারের রূপ মানুষে কল্পনা করিতে পারে না। এ কল্পনা মায়ার। নিরাকার ব্রহ্মই মায়া অবলম্বনে মায়ামানুষ, মায়ামানুষী হয়েন। সাধারণ মানুষের যে আকার হয় সেটা মানুষের কর্ম্ম জন্য। কর্ম্মজন্যই জীবের মাতৃগর্ভে প্রবেশক্লেশ ভোগ হয়। শ্রীভগবানের অবতার গ্রহণে কোন জঠরযাতনা নাই। কারণ তিনি কোন কর্ম্মের বশীভূত নহেন। সকল কর্ম্মের আধার যে প্রকৃতি, সেই প্রকৃতিই তাঁহার বশীভূত। তিনি "অজোহপি সন্ অব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"। বলিতেছিলাম মানুষের দেহ ধারণ ও শ্রীভগবানের দেহ ধারণ একরূপ কারণে হয় না। শ্রীভগবান্ সর্ব্বদা আপন অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপে থাকিয়াও দেহবান্ মত হয়েন আর চৈতন্যদীপ্ত মানুষের দেহ মনে করে দেহমধ্যবর্ত্তী চৈতন্য সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দেহাত্মবোধ জন্মিলেই মানুষ দুঃখী হইয়া যায়। এই স্ব স্বরূপের আত্মবিস্মৃতিই জীবচৈতন্যের সকল দুঃখের মূলীভূত কারণ।

"আমি তোমার" এই কথামধ্যে যে আমিটি পাই সেই আমিটিকে দৃষ্টান্তের ক্ষুদ্র নদীর মত করিয়া বুঝিতে বলিতেছি। আর আমিটি যাঁহার হইতে চায় তাঁহাকে সমুদ্রের মত ভাবিতে বলিতেছি। নদী ও সমুদ্রের মিলনপ্রতিবন্ধক যে বালুকাস্তূপ তাহাকেই বলিতেছি এই দেহটা। অথবা দেহবোধটা। দেহের ভিতরেও তিনি, দেহের বাহিরেও তিনি—কিন্তু দেহব্যাপী চৈতন্য এই দেহ বালুকাস্তূপ ভুলিয়া যাইতে পারিতেছে না। বাহিরে সদাই তাঁহার লীলাতরঙ্গভঙ্গ দেখিতেছে শুনিতেছে কিন্তু বালুকাস্তূপ অতিক্রম করিয়া তাঁহাতে মিলিয়া মিশিয়া যাইতে পারিতেছে না। তিনি কিন্তু উৎকণ্ঠা-

স্ফুটিত সাধকের অনুরাগভজনে পুণ্যমুহূর্ত্তে কখন কখন সাধককে হৃদয়ে ধরিতেছেন। ধরিয়া দেখাইয়া দিতেছেন আমার সহিত মিলন কত মধুর দেখ। শতবার ডাকিতেছেন আয়রে দুঃখী জীব! আমার বক্ষে আয়! আর কোথাও তোর শান্তি নাই। মিলনের সামর্থ্য নদীর নাই। জীবের আছে। তাঁহার আজ্ঞামত ধর্ম্ম করিলেই—নিয়মত করিলেই মানুষ তাঁহাতে মিলে। এই মিলনের প্রথম স্তরই "আমি তোমার" ইতি।

সাধ।

কি চাহি বুঝি'না' আজো শুধু চে'য়ে থাকি,
কমল চরণ দু'টী দেবে বুকে রাখি?
আমি যা' পাইনি প্রভু? শত সাধ করি,
তুমি তা' আমার মাঝে দেবে না কি ধরি?
যে চরণে জন্ম লভি ত্রিলোক-তারিণী
প্রেমময়ী ভক্তি গঙ্গামুক্তি বিধায়িনী;
পাষাণের বক্ষে দেছ চৈতন্য সঞ্চারি
সতীত্ব ফিরিয়া পায় অবোধিনী নারী;
যে চরণ চেয়ে আছে সারা ধরাময়
যেথা নাহি তুমি আমি বিশ্ব পায় লয়,
কত যত্নে চাহি তারে ফুটাইতে হায়!
বৃথা সে নয়নজলে সব ভেসে যায়।

মৃ [৺কাশীধাম]

কি চাই।

কি চাই—কি চাই—এই যেন শতবার জিজ্ঞাসা করি। আপনাকে আপনি বলি কি চাও বলত? কি হইলে তোমার হয়?

কতবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি। কত রকম উত্তরও যেন আসিয়াছে। কিন্তু আমার তৃপ্তি তাহাতেও যেন হয় নাই।

আজ একটা উত্তর আসিল। হয় ত সকলেই এই উত্তর জানে। হয় ত এই কথা কতবার শাস্ত্রমুখে বা লোকমুখে শুনিয়াছি। তখন ত আমার হয় নাই। তবে এখন যে হইতেছে?

এক একটা ভাবের যেন নূতন করিয়া আসা আছে। পুরাতন কথার নূতন করিয়া আসা আছে; সময়ে সময়ে চক্ষের একটা পরদা খুলিয়া যাওয়া আছে। সেই সময়ে শত শত বারের জানা কথারও যেন একটা প্রাণ লইয়া আসা আছে।

যদি কথার মতন কথা প্রাণ লইয়া আইসে তবে তাহা আসিয়া আর যায় না। এ উত্তর কি সেই রকম? মনে হয় ত তাই।

দেখি যদি কথাটা সনাতন হয় তবে এ আর যাইবে না।

কি চাই? উত্তর ভালবাসিতে চাই। তোমাকে ভালবাসিতে চাই। আর তোমার যাহা তাহাকেই ভালবাসিতে চাই।

কি বা তুমি? আর তোমারই বা কি? আকাশ ছাইয়া তুমি। হৃদয় ভরিয়াও তুমি। আর যেখানে যা দেখি তা তোমারই। আবার তাহার অন্তরে বাহিরে তুমি। আমি তোমায় ভালবাসিতে চাই।

ভালবাসিতেই চাই। ভালবাসা পাই বা না পাই তাতে আমার বেশী আসে যায় না। তথাপি যা দেখিয়াছি তাতে এই বুঝিয়াছি তোমায় ভালবাসিলে অনেক ভালবাসা পাওয়া যায়। আমি না চাহিলেও আপনা হইতে আসে। তাই ভালবাসা পাইতে আমার আকাঙ্খা নাই। আমি ভালবাসিতেই চাই।

আমি দেখিয়াছি—এক আধ বার নয়—শত শত বার দেখিয়াছি তোমায় সকলভাবে ভালবাসিতেই আমার ইচ্ছা। তোমায় সকলভাবে ভালবাসাই আমার আনন্দ।

একটা দৃষ্টান্ত দি।

মা'কে আমি ভালবাসি।' কেন বাসি?

শত অপরাধ করিয়া ফেলি। করিয়াও যখন মার কাছে যাই, যাইয়া বলি মা আমি অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি। মা আর অপরাধ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। মা আর দোষ করিতে আমার প্রাণ চায় না। তবুও যে অপরাধ হইয়া যায় এ যেন মা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়। যেন আমার প্রারব্ধ জোর করিয়া অপরাধ করায়। আমার ত আর দোষের কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা আদৌ নাই। তবে পূর্ব্বে যাহা যাহা করিয়াছি তাহার ফল যেন এই দেহে ভোগ হয়। তা হউক। কিন্তু নিষিদ্ধ কর্ম্মকালেও মনে মনে তোমায় কত বলি মা আমি যে এ সব করিতে আর চাই না। তবুও যখন নিষিদ্ধ কর্ম্ম হয় তখন মনে করি তোমায় ডাকি, তোমার আজ্ঞামত চলিতে প্রাণপণ করি, এ সত্ত্বেও যখন অন্য কিছু হয় তখন মনে হয় তুমি বুঝি আমার প্রারব্ধ ভোগ করাইয়া দিতেছ। দোষ করিয়া ফেলিয়াছি তার দণ্ডই প্রারব্ধ ভোগ। এ ভোগ আমার হওয়াই উচিত।

যখন মার কাছে গিয়া এই সব বলি তখন দেখি মা বড় সন্তুষ্ট হয়। আমায় দেখিয়া মার আমার মুখ চক্ষু যেন প্রফুল্ল হয়। আমাকে দেখিলে যাঁর আনন্দ হয় তাঁকে আমি বড় ভালবাসি। মাকে প্রফুল্ল দেখিয়া আমার যে আনন্দ তাই আমার বড় মিষ্ট লাগে।

মাকে ভালবাসি। শত ভাবে ভালবাসি। বালিকা কুমারী দেখিয়া মনে মনে মা মা করি। বড় আনন্দ পাই। মা যে আমার বালিকা বটেন। কুমারীও বটেন। মাকে যে আমার কুমারীং ঋগ্বেদযুক্তাং ব্রহ্মরূপাং বলিয়া চিন্তা করিবার কথা। তিন বেলা যে ঐ বলিয়া চিন্তা করিতে হয়। মাকে যে হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্ বলিয়া তিন বেলা ভাবনা করিতে হয়।

ঐটি মায়ের আমার আদিরূপ। আমি আদিরূপ ত দেখিতে পাই না। উপযুক্ত নই তাই ঐরূপে মা আমায় দেখা দেয় না। কিন্তু কুমারী ভাবে ত মাই দেখা দেন। তাই কুমারী দেখিলে মনে মনে মা মা করি। মা আমার কুমারী সাজিয়া খেলা করে সেই মানুষের খেলায় আমার কত অমানুষিক খেলা মনে হয়। মা মা করিয়া আমি কত আনন্দ পাই। তুমিও করিয়া দেখ না—নিশ্চয়ই আনন্দ পাইবে।

মা আমার আবার যুবতী। যুবতী দেখিয়া কি ছাই রাই ভাব। ছাই রাই ভাবিও না। না ভাবিয়া মা মা কর। আহা কত সুখ তুমি পাইবে।

যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্ এইটিও মায়ের আদিরূপ। এই

আদিরূপ দেখিবার ভাগ্য আমার নাই। নাই থাক্ কিন্তু যুবতী দেখিয়া যখন মনে মনে মা মা করি তখন মা আমার মনের পাপ ধুইয়া দিয়া কি এক অপূর্ব্ব আনন্দ আমার প্রাণে ঢালিয়া দেন। আমি সেই আনন্দ লইয়া বিশ্বাসে সেই সূর্য্যমণ্ডল সংস্থিতাং কে যখন ভাবনা করি তখন কত যে সুখ পাই তাহা ত বলিতে পারি না। যে জাতির যুবতীই দেখি না কেন—চণ্ডালিনী হইতে ব্রাহ্মণী পর্য্যন্ত—যেই হউক না কেন, রাস্তা ঘাটে, পথে রথে, অন্তঃপুরে সভাক্ষেত্রে, যেখানে যখন যাহাকে দেখি তখনই মা মা করি—কতদিন ধরিয়া অভ্যাস করিতে করিতে মা ভাবে ডাকিতেই ইচ্ছা হয়—আবার আনন্দ পাই বলিয়া ঐ ভাবেই ডাকা হইয়া যায়—কত যে সুখ তখন, কত যে শান্তি তখন, ইহা ত বলিয়া বুঝান যায় না। মা মা করিতে করিতে এমনটি হয় যে সুন্দর ফুল দেখিয়া মা মা ডাকা হইয়া যায়, সুন্দর লতা পাতা, সুন্দর আকাশ তারা, সুন্দর নদী সমুদ্র, সুন্দর ঠাকুর দেবতা সকলকেই মা মা ডাকা হইয়া যায়। হয় কি না হয় তুমিও করিয়া দেখ না—বুঝিবে এ কথা ধ্রুব সত্য।

আবার বৃদ্ধা দেখিয়াও মা মা করি। মা যে আমার ঐ মূর্ত্তিতে সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যস্থাং সামবেদ সমাযুতাম্। মার আদি রূপ ত পাই না। কিন্তু বৃদ্ধা দেখিয়া যখন মনে মনে মা মা করি তখন বৃদ্ধার মধ্যে ত কুরূপ কিছুই চক্ষে ঠেকে না। যেন কুরূপ সুরূপ ছাড়াইয়া কি অপরূপ দেখা হইয়া যায়। বৃদ্ধারও সকল কার্য্য যেন কত মধুর হইয়া যায়। মা মা করিতে করিতে সকল দোষ দূর হইয়া কি এক অপূর্ব্বভাবে হৃদয় ভরিয়া উঠে। সকল স্ত্রীলোককে মা ভাবে দেখ না। আবার তিন বেলার নিত্যক্রিয়ায় মায়ের আদিরূপ ভাব না। দেখ দেখি তোমার হৃদয়ের অনাদিসঞ্চিত কামভাব মার প্রেমভাবে পূর্ণ হইয়া যায় কি না? যাইবেই নিশ্চয়। যদি প্রথম প্রথম না যায় জানিও তখনও তোমার দুষ্কৃতি আছে। ডাকিতে ডাকিতেই সব কলুষ কাটিয়া যাইবে। নিশ্চয় যাইবে। কাহারও বা শীঘ্র যায় কাহারও বা বিলম্বে যায়—সে কেবল অপরাধের তারতম্য অনুসারে। কিন্তু যাবেই নিশ্চয়। করিয়া দেখ। ধৈর্য্য ধরিয়া করিয়া যাও। হইবেই।

তাই বলিতেছিলাম ভালবাসিতেই চাই। তোমাকে ভালবাসিতে চাই—তোমার যাহা তাহাকেও ভালবাসিতে চাই। কি তোমার নয়? জগতে যাহা কিছু আছে—তোমার নয় কোন্ বস্তু? সকলই তোমার। কাজেই সকলকেই

ভালবাসিয়া আমার সুখ। শত্রু, মিত্র, সুখ, দুঃখ, সুরূপ, কুরূপ সবই তুমি, সকলেই তুমি। সকলকে দেখিয়া তোমায় স্মরণ করি। আবার নির্জ্জনে তোমায় স্বরূপ ভাবনা করি। আবার কল্পনায় যখন তোমার কাছে যাই— তখন কি হইয়া যাই কি করিয়া বলিব! কখন কখন মন যখন প্রবলবেগে বাসনাতরঙ্গ তুলে—কিছুতেই যখন মনকে তোমাতে নিযুক্ত করিতে পারি না তখন তুমি হাসিতে হাসিতে বলিয়া দাও—সবই আমি আর মনটা কি আমি নই? প্রবল সঙ্কল্পতরঙ্গযুক্ত মনও তুমি যখন বলিতে পারি তখন ত একবারে সব শান্ত হইয়া যায়। তখন আপনা হইতে মন্ত্ররূপিণী তোমাকে ডাকিতে ডাকিতে হস্তদ্বারা তোমাকে প্রণাম করিতে থাকি। আপনা হইতে চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া যায়। কত দয়া মা তোমার। আপনিই আপনার নাম আমার মুখ দিয়া গান কর, তাই তুমি গায়ত্রী।

আর কি বলিব! এ বলার ত অন্ত নাই। শেষে এক কথা বলি।

তোমায় ভালবাসিতে চাই। ভালবাসিতে চাই বলিয়া তোমার আজ্ঞা পালন করি। কোন ফলাফলের জন্য তোমার আজ্ঞা পালন করি না। তোমায় ভালবাসিতে চাই বলিয়া তোমার আজ্ঞাপালন করিতে চাই। সুখ হউক বা দুঃখ হউক তোমার আজ্ঞাপালনটি করাই চাই। যারে ভালবাসা যায় তার কথা যদি শুনিতে রুচি না লাগে, প্রতি কষ্টে, প্রতি ভয়েও তার আজ্ঞা পালন করিতে যখন ইচ্ছা না হয় তখন ভালবাসাটা মৌখিক মাত্র। ভালবাসার প্রাণ আজ্ঞাপালন—তা যত কষ্টই হউক।

এই ভাবে ত্রিসন্ধ্যার কর্ম্ম কর আর লোকসঙ্গে মাতৃভাবে মা মা ডাকিয়া যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হও। ইহাই আজকালকার দিনের প্রথম সোপান। ইতি।

শান্তিনিকেতন।

কোথায় গেলে পাবিরে ভাই! শান্তিনিকেতন?
কোথায় গেলে দেখ্‌বি সেই প্রিয়দরশন?
সে যে আপন মনের মাঝে, বনের মাঝে নহে,
কুণ্ডলিনী গুটিয়ে ফণা মৌন যেথা রহে।

তাহার শিরে, হৃদয় 'পরে জ্বল্‌ছে যেথা মণি,
দেখ্‌তে পাবি সে আলোকে সকল ঘরখানি।
বিশ্ব জুড়ি উঠ্‌ছে সেথা ভাবের সুধাগীতি,
ফুটছে কত মনের ফুল, ঝরছে শুধু প্রীতি।
ঊর্দ্ধে তার রাজ্য এক স্বপ্ন হ'তে দূর।
সেইখানে ত সুখের ঘর সেই শান্তিপুর।

শ্রীঃ (মালদহ)।

তোমার রূপ—ভূমিকা।

"ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজস্রম্"। শ্রীপতির অজস্ররূপ ধ্যান করা উচিত। ভগবান্ শঙ্কর এই কথা উপদেশ করেন।

তোমার অজস্ররূপ! সেই অজস্ররূপের ধ্যান করিতে হয়। আগে ভাবিতাম কত মহাজন এই অজস্ররূপ দেখেন, এই অজস্ররূপের ধ্যান করেন। আমি কি অন্ধ? আমি অজস্ররূপও দেখিতে পাই না, ধ্যান করিতেও পাই না। অকস্মাৎ একদিন একটা উপলক্ষ পাইয়া চক্ষের পরদা খুলিয়া গেল। দেখিলাম সত্যই তোমার অজস্ররূপ। অরূপের রূপ! আহা! অজস্ররূপই বটে। এই রূপ ধ্যান করিবারই যোগ্য বটে। এসনা একটু ধ্যান করি। তুমিও তখন গ্লানি-শূন্য একটা আনন্দ পাইবে। আর তুমি আনন্দ পাইলে আমি কিরূপ থাকি তাহা ত তুমি জানিতেছ। কি আর ভাঙ্গিয়া বলিব।

ধ্যানকে অত বড় শক্ত কিছু একটা নাই বা ভাবিলে? ধৈ ধাতুর অর্থ চিন্তা। রূপের অজস্র চিন্তাকেই অজস্র ধ্যান বল না কেন? এই ধ্যান, এই রূপচিন্তা সবাই পারিবে।

আগে ত বুঝিতাম না—রূপ কোথায়। তখন রূপ আঁকিতে কত চেষ্টা হইত। এখন কি পরদা খুলিয়া দিয়াছ? এখন কোথা হইতে যে আরম্ভ করিব তাই যেন ঠিক করিতে পারি না। সব রূপই একবারে আসিতে চায়। কোথা হইতে আরম্ভ করি?

কোথা হইতে আরম্ভ করিব ভাবিতেছি—মনে করিয়া দিতেছ আদিতে

আদি কবি যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছেন সেখান হইতেই আরম্ভ করা ভাল।

তাই ভাল নিশ্চয় করিলাম: কিন্তু যার সর্ব্বস্ব অন্য কোন মূর্ত্তি তাহার ইহা ভাল লাগিবে কেন?

কেন লাগিবে না? একজনই সবার সর্ব্বস্ব। এই একজনই সব সাজে। এই একজনই কখন পুরুষ কখন প্রকৃতি; কখন কালী কখন কালা; কখন কল্কি কখন দুর্গা কখন বুদ্ধ কখন মহালক্ষ্মী; কখন বলভদ্র কখন ভৈরবী; কখন ত্রিপুরা কখন পরশুরাম; কখন মাতঙ্গী কখন রাম; কখন ভুবনেশ্বরী কখন বামন, কখন ছিন্নমস্তা কখন নরসিংহ; কখন বরাহ কখন ধূমাবতী; কখন কূর্ম্ম কখন বগলা; কখন তারা কখন মীনরূপা। তুমিই সবরূপে রূপ মিশাইছ—তবু কিন্তু তুমি অরূপ।

তুমি কি না পূর্ণ। পূর্ণের ত আকার থাকে না? আর তোমা হতে যা বাহির হয় তারই কি আকার থাকে? কিরূপে থাকিবে? পূর্ণ যাহা তাহা ত নিরাকার। আর "পূর্ণাৎ পূর্ণং প্রসরতি।" পূর্ণ হইতে পূর্ণই বাহির হয়। তবে যাহা তোমা হইতে বাহির হয় তাহাও পূর্ণ। পূর্ণ বলিয়াই আকার নাই। আকারও নাই, রূপও নাই। তাই লোকে বলে "সব রূপে রূপ মিশাইয়ে আপনি নিরাকার" "তুমি বই রূপ আছে কার"।

মিছা দ্বন্দ্ব। তোমায় কৃষ্ণরূপে ভজিলেই হইবে আর কালীরূপে ভজিলে হইবে না, শিবরূপে ভজিলে হইবে না, গণেশরূপে ভজিলে হইবে না, সূর্য্য-রূপে ভজিলে হইবে না; মিছা দ্বন্দ্ব মিছা মূর্খতা। মিছে বিল্বপত্রকে ত্রিফলার পাতা বলা আর গণেশের মাকে হাতিশুঁড়োর মা বলা। এ দ্বন্দ্ব মূর্খতার দ্বন্দ্ব।

শাস্ত্রে কোথাও এ দ্বন্দ্ব নাই। শাস্ত্রে একমাত্র তোমার কথাই সর্ব্বরূপে—বিশ্বরূপে বলা আছে। যিনি গুণাতীত তিনিই সগুণ, তিনিই বিশ্বরূপ, তিনিই সকল অবতার, আবার তিনিই আত্মা।

কৃষ্ণটিই পূর্ণ আর রামটি অপূর্ণ, আর গণেশটি অপূর্ণ—এ বিবাদ মিথ্যা বিবাদ। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এ কথাও যেমন সত্য আবার

একরামঃ পরোবিষ্ণুরাদিনারায়ণঃ স্মৃতঃ।
এষা সা জানকীলক্ষ্মীর্যোগমায়েতি বিশ্রুতা।

এষ এব রজোযুক্তো ব্রহ্মাভূদ্বিশ্বভাবনঃ
সত্ত্বাবিষ্টস্তথাবিষ্ণুস্ত্রিজগৎপ্রতিপালকঃ।
এষ রুদ্রস্তামসোঽন্তে জগৎপ্রলয়কারণম্॥

লোকের অতি সাহস যখন লোকে বলে রাম ভগবান্ স্বয়ং নহেন; মহাদেব স্বয়ং ভগবান্ নহেন; কালী স্বয়ং ভগবতী নহেন; কেবল কৃষ্ণই স্বয়ং। সমস্ত শাস্ত্র একবাক্যে বলিতেছেন—সব অবতারই তিনি, সব অবতারই স্বয়ং ভগবান্—লোকে কোন্ সাহসে বলিতে চায় কৃষ্ণটি বাদে আর গুলি কেহই তিনি স্বয়ং নহেন?

শাস্ত্র ত কোথাও বিরোধ করেন না—তুমি "আমারটি শ্রেষ্ঠ" জাহির করিতে গিয়া মূর্খতা প্রকাশ কর মাত্র। তোমার অন্ধতা সমর্থন করিতে গিয়া তোমাকে যদি বেদ অমান্য করিতে হয়, শাস্ত্র অমান্য করিতে হয়—তাও তুমি করিতে প্রস্তুত হও। ভাল লোকের দোহাই দিয়া—সাধু শান্তজনকে নিজের মত মূর্খ করিয়া ফেল।

তাই বলি শাস্ত্র কৃষ্ণের কথা যখন বলিয়াছেন, তখন বলিয়াছেন কৃষ্ণ শুধু যে ভগবান্ তাই নহেন—কৃষ্ণই পরমাত্মা—কৃষ্ণই আবার "নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্" আবার কৃষ্ণই "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুনতিষ্ঠতি" এক কথায় কৃষ্ণ গুণাতীত, কৃষ্ণ নির্গুণ, কৃষ্ণ বিশ্বরূপ, কৃষ্ণ মায়ামানুষ, কৃষ্ণ আত্মা, কৃষ্ণই পরমাত্মা। শ্রীকৃষ্ণ যেমন এই সব—সমস্ত অবতারও সেইরূপ নির্গুণ সগুণ অবতার ও আত্মা। অন্ধকারে শাস্ত্র না দেখিয়া আলোকে দেখ—দেখিবে বিবাদ-স্থষ্টি তুমিই করিয়াছ, শাস্ত্র করেন নাই।

কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিলাম—তোমার শাস্ত্র তুমি সকলকে বুঝাইয়া দিও। আমি কে—আমি কেন এ কথা সে কথা বলিব? আমি তোমার অজস্ররূপ চিন্তা করি—এই ইচ্ছা। কোথা হইতে আরম্ভ করিব ভাবিতে গিয়া গোলে পড়িয়া গিয়াছিলাম। গোল হইতে আপনার উদ্ধার করিবার জন্য বলিলাম "হৃদয়রাসমন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে" বলিলাম "ধ্যায়ো জ্ঞানময়ঃ শিবঃ" "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"।

দেখিলাম কোথাও গোল নাই—কালীরূপের অজস্র ধ্যান কর, বা কৃষ্ণরূপের অজস্র ধ্যান কর বা রামরূপের অজস্র ধ্যান কর—সকল গুলিতেই সেই একেরই

ধ্যান হইবে। বলিতে পার "তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ" এ কথাও ঠিক। তাই আদি কবির পদানুসরণে আরম্ভ করাই ভাল। তুমি যাহার কেন উপাসক হও না—যদি তোমার ঠাকুর সব সাজিতে না পারে, তবে তুমি কোন গোলমালে আটকাইয়া গিয়াছ। একস্থানে ঠিক থাকিয়া আমার এইটিই সব সাজিয়াছেন, সব করিয়াছেন—ইহাই সত্য কথা।

এখন আদি কবির পদানুসরণে বালরূপ হইতে আরম্ভ করিতেই বাসনা। এ চেষ্টা কি করিব? উত্তর দাও বা না দাও, শত ভাবে বলিয়াছ "স্বগুণ কীর্ত্তন আর স্বরূপ কীর্ত্তনও" তোমার বড় ভাল লাগে। তোমার যা ভাল লাগে তাতেই আনন্দ। যেমন সন্তান মা'র কাছে গেলে মায়ের আনন্দ হয়, সেইরূপ আমরাও তোমার কাছে গেলে তোমার আনন্দ হয়—ইহা মনে ভাবিলে আমরা কি যেন হইয়া যাই।

কোথায় তুমি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক—আর কোথায় আমরা অতি তুচ্ছ, অতি অপরাধী জীব। তবুও যখন তোমার আদেশ পালনে চেষ্টা করিয়া মনে ভাবি—মা! যা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি আর তাহা করিতে ইচ্ছা নাই, মা আর অপরাধ করিতে চাই না—মা আমায় ক্ষমা কর, আমি ভাল হইতেই চাই—আর আমি অন্যায় করিব না—কোন পাপ করিতে আর ইচ্ছা নাই,—এই ভাবিয়া যখন তোমার কাছে যাই ভাবনা করি, তখন দেখি তুমি বড় আনন্দ পাও। সে আনন্দে তোমার মুখ চক্ষু যেন অপূর্ব্বভাবে, অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। আমায় দেখিলে তোমার সুখ হয় এটি যখন মনে করি, তখন তোমায় একটু ভালও বাসি আর তুমিও বাস বুঝি। তাই ত তোমার রূপ তোমার কাছে দেখাইতে চাই।

শেষ কথা একটা বলি। আর কার কাছে বলিব? দেখ আমি বড় রূপের কাঙ্গাল—। কাঙ্গাল বা কাঙ্গালিনী তাহা নাই বলিলাম। তুমি ত জান আমি কি। ব্রহ্মা বিষ্ণু তোমায় ধ্যানে পায় না, আর আমার ধ্যানে আমার চিন্তায় তুমি কি আসিবে?' আমি নিজে ধ্যান করিতে কি জানি? যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের কথা মত করিতে যাইতেছি, এখন তুমি একটু প্রসন্ন হইও। ১৩২০।২৯ অগ্রহায়ণ। সোমবার।

সখা।

১

বেদনা দিয়েছ নাথ হৃদয়ে আমার
সে যে গো তোমারি দান!
তুমিই কাঁদাবে প্রাণে হৃদি-গত প্রাণ!
এ নহে আমার প্রাণ!
তোমার মঙ্গল শঙ্খ উঠিছে নিনাদি,
হতাশে আশ্বাস পাই।
তোমার দুয়ারে ভক্ত করিছে আরতি,
তাই গো বন্দনা গাই।

২

আমার আমিত্ব যত সেত জানি তুমি,
তোমায় লভেছি ব'লে
প্রাণেতে গৌরব জাগে; মন অনুরাগে
ঢালে পুষ্প, পদতলে।
ভাল যদি নাহি বাস, প্রেম যদি নাই,
বৃথা নিবে যাবে প্রাণ—
এই ভালবাসা তবে হৃদয়ে হৃদয়ে
কেমনে লভেছে স্থান!
হৃদি-সখা দাও দেখা, লুকাবে কোথায়,
কোথা আছে তব ঠাঁই?
হৃদয়ে হৃদয়ে শুধু চিরকাল আছ,
তবু কেন দেখা নাই!

শ্রীমু (৺কাশীধাম)।

সামবেদীয় সন্ধ্যা-প্রকাশ।

(তত্ত্বানুশীলন প্রয়াস।)

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ॥

ওঁ আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং
জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তম্।
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং
শ্রীমদ্‌গুরুং নিত্যমহং নমামি॥

শ্রীশ্রীআত্মারামায় নমঃ॥

মঙ্গলাচরণ।

"কারণং সকলস্যাস্য স নো বিষ্ণুঃ প্রসীদতু।"

শ্রীআনন্দস্বরূপ তুমি—তুমি প্রসন্ন হও। আজ তোমার অভয় চরণতলে বসিয়া আমার দৈনিক অভ্যাসের তত্ত্বটীর একটু স্থূল মর্ম্ম বুঝিতে প্রয়াসী হইয়াছি। তুমি কৃপা কর। আমার সফলতা বিফলতা গ্রহণ কর—করিয়া আমার শত ত্রুটী শত অপরাধ ক্ষমা কর। তোমার শ্রীচরণতলে আমার সমস্ত বাসনা গুছাইয়া আন। আনিয়া আমায় তোমার করিয়া লও। প্রভু! আর কি প্রার্থনা করিব ঠাকুর! আর যাহা আছে, তাহা তুমিই করিয়া দিও। আমি যেন 'ন গতির্বিদ্যতে নাথ' বলিয়াই পড়িয়া থাকিতে পারি।

প্রথম অংশ।

(মূলসূত্র—উদ্দেশ্য।)

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ॥

সন ১৩২০ সাল, বৈশাখ মাস। সাংসারিক নানা অশান্তি ও সর্ব্বশেষে গৃহদাহজনিত মনস্তাপ লাভ করিয়া কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিল,—"দাদা! এত করা গেল, কিন্তু কিছুই হইল না। আচ্ছা বল দেখি, সুখ কোথায়?"

জ্যেষ্ঠ—উত্তর করিলেন,—"সুখ নারায়ণের পাদপদ্মে"।

কনিষ্ঠ—বুঝিলাম না।

জ্যেষ্ঠ—এতদিন নগণ্য মুটের মত কেবলি মোট বহিয়া যাহা কিছু সুখের জন্য সঞ্চয় করিয়া ছিলে, তাহাতো দেখিতে দেখিতে পুড়িয়া গেল।

কবির কথায়—

"সুখের লাগিয়া যে ঘর বাঁধিনু, আগুনে পুড়িয়া গেল।" আবার এই সুখ-সাধন-নাশজনিত দুঃখ হৃদয়ে চাপিয়া, নূতন করিয়া সংসার গুছাইবার জন্য নবোদ্যমে জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কিন্তু এবারেও যদি অনুরূপ পীড়াদায়ক একটা অচিন্তিতপূর্ব্ব বিঘ্ন আসিয়া তোমার সকল আশা মাটি করিয়া দেয়—তবে তোমার দুঃখ রাখিবার আর স্থান হইবে না। জগতে যাহা কিছু নশ্বর বলিয়া পরিচিত তাহাতে সুখের খোঁজ করিতে গেলেই—এমনি বিড়ম্বনা পদে পদে। এইজন্য জগতে যাহা নশ্বর নয় তাহারি মধ্যে সুখ খুজিতে হয়।

কনিষ্ঠ—তাহা হইলে কি তোমার মতে, আর ঘর দুয়ার বাঁধিয়া কাজ নাই—কেন না সেগুলি নশ্বর? চাকরী বাকরীরও আর প্রয়োজন নাই এবং বৌগুলাও যে যাহার বাপেরবাড়ী পড়িয়া থাকুক। তুমি, আমি, চোখ-বুজিয়া বসিয়া নারায়ণ ভজিলেই সব গোল মিটিয়া যাইবে।

জ্যেষ্ঠ—সব গোল হঠাৎ মিটিবে না। কেননা মেসের ম্যানেজার মাস কাবারে এটা আমাদের বেশ জানাইয়া দিবে যে আমরা মেসে আছি, রাণী-ভবানীর দানসত্রে নহে।

কনিষ্ঠ—তোমার কথা শুনিলে তো বোধ হয় না যে তুমি কখনও মেসের হিসাবের কথা ভাব।

জ্যেষ্ঠ—তুমি "নারায়ণের পাদপদ্ম আশ্রয়" বলিতে কি বুঝায়, তাহা কোন দিন বুঝিতে চেষ্টা কর নাই বলিয়া এমন সকল দুঃখবর্দ্ধক সংশয় আনিয়া ফেলিতেছ।

কনিষ্ঠ—তোমার নারায়ণ আমার মাথায় থাকুন কিন্তু তাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করিবার অবসর আমার বড়ই অল্প। সে জন্য আমি তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করা অধিকতর সঙ্গত বিবেচনা করি।

জ্যেষ্ঠ—আহা একেবারে খাপ্পা হও কেন?

কনিষ্ঠ—খাপ্‌পা কি সাধে হই? তোমার কথার একটা মাত্রা নাই—সংসারটা যে উচ্ছিন্ন গেল তাহার চিন্তা নাই, আবার এখন কি উপায়ে সব গোছগাছ করিতে হইবে তাহার বন্দোবস্ত করা নাই, বৌগুলা বাপের বাড়ী পড়িয়া রহিল তাহাতে যে কতটা মাথা হেঁট হয় তাহার ভাবনা নাই—শুধু নারায়ণের পাদপদ্ম ভাবিলেই সবই আপনিই ঠিকঠাক হইয়া যাইবে—কেমন ইহাই ত তোমার কথা?

জ্যেষ্ঠ—নারায়ণের নামে তুমি এতটা গরম হইবে জানিতে পারিলে কদাচ আমি ও-নাম তোমার নিকট বলিতাম না। বলিতাম তোমার আফিসের বড় বাবুর খুব খোসামোদ করিও, মন যোগাইয়া চলিও।

কনিষ্ঠ—সংসারী কেরাণীর পক্ষে সেটা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। একথা বোধ হয় তুমি অস্বীকার করিবে না।

জ্যেষ্ঠ—আমি খুব অস্বীকার করি। কেননা তা না হইলে আমি Bird & Coyর আফিসের চাকরী ছাড়িয়া দিতে পারিতাম না। আর সেই চাকরী ছাড়িতে না ছাড়িতেই আমার বর্ত্তমান চাকরী যুটিত না। যাহার কৃপায় আমার দুই পাঁচ টাকা মাইনা বাড়িবে তাহার যদি এতটা গোলামি করিব তবে যাঁহার কৃপায় এমন সুন্দর দেহ, এমন সুন্দর অনুভূতি, এমন সৌন্দর্য্যময় জগৎ ও এমন শিক্ষাপ্রদ সংসার ভোগ করিতেছি তাঁহার জন্য করিবার, তাঁহাকে দিবার কি আমার কিছুই থাকা উচিত নহে?

কনিষ্ঠ—থাকিবে না কেন? তবে তাহার একটা মাত্রা থাকা উচিত?

জ্যেষ্ঠ—কৈ আমি তো তোমাকে বিরাগী হইয়া সংসার ত্যাগ করিতে বলি নাই যে, তুমি মাত্রার কথা তুলিতেছ। আমি কেবল বলিয়াছি "সুখ নারায়ণের পাদপদ্মে"।

কনিষ্ঠ—ভাল, তাহাই স্বীকার। বলত তোমার "নারায়ণের পাদপদ্ম" মিলে কিসে?

জ্যেষ্ঠ—উপাসনায়।

কনিষ্ঠ—ব্রহ্মজ্ঞানীর দল ঐ রকম একটা কথা আওড়ায় বটে। তুমিও কি আমায় সেই রকমে বুঝাইতে চাও নাকি?

জ্যেষ্ঠ—কথার সবটুকু না শুনিয়াই মন্তব্য প্রকাশ কর কেন?

কনিষ্ঠ—আচ্ছা বল, এবার হইতে সব শুনিয়া তবে কথা কহিব। তবে

উপাসনার কথা শুনিলে আমার কেমন গা জ্বালা করে তাই এমন কথা বলিলাম।

জ্যেষ্ঠ—"উপাসনার" মানে বুঝিলে আর গা জ্বলিবে না। তবে শোন। 'উপ' অর্থে সমীপ, 'অস্' ধাতু অর্থে বসা। অর্থাৎ উপাসনা বলিতে বুঝায় নিকটে বসা।

কনিষ্ঠ—কাহার নিকটে বসা?

জ্যেষ্ঠ—আনন্দস্বরূপের।

"আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রয়ান্ত্যভি সংবিশন্তি॥

অর্থাৎ আনন্দ হইতেই এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ দ্বারাই সঞ্জীবিত থাকে এবং পরিশেষে আনন্দ অভিমুখেই ধাবিত হয় ও তাহাতেই প্রবেশ করে। সুতরাং উপাসনা বলিতে বুঝায় এই আনন্দস্বরূপের নিকটে বসার চেষ্টা।

কনিষ্ঠ—তোমার এই "আনন্দস্বরূপ" তো আর শরীরী নন যে, তাঁহার গা ঘেঁসিয়া একটু বসিবার চেষ্টা করিব? শাস্ত্র বলেন:—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। আবার সেই ব্রহ্মের পরিচয় দিতে বসিয়া শাস্ত্র বলেন 'তিনি আনন্দস্বরূপ''। তাই যদি হয়, তবে তোমার আনন্দস্বরূপ তো সদাই সকলের কাছে কাছেই আছেন—আবার উপাসনা কেন?

জ্যেষ্ঠ—তিনি শরীরী না হইলেও তোমার আমার জন্য তিনি শরীর ধারণ করেন। যাক্, সে কথা এখন থাক্। বলিতেছিলাম তিনি সঙ্গে সঙ্গেই আছেন সত্য, কিন্তু তুমি আমি তো তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি না। আর সেই অনুভূতির অভাবেই তো এত জ্বালা-পোড়া, এত অশান্তি ভোগ করিতেছি বলিয়া মনে হয়। সুতরাং তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিলেও তোমার আমার অনুভূতির অভাবে তিনি না থাকার সামিল হইয়া গিয়াছেন। উপাসনারূপ ক্রিয়াটী আমার—তাঁহার তো নহে। তাই তাঁহার নিকট আমি আছি এইটী আমায় অনুভূতিতে আনিতে হইবে। এই ভাবটী আনিতে পারিলেই তাঁহাকে আমার সকল প্রকার কর্ম্মের ও ধর্ম্মের আদিতে, মধ্যে

ও অন্তে আনিতে পারিলেই আমার উপসনাটী ঠিকমত হইবে—আমার সকল দুঃখের নিবৃত্তি হইবে, আমার শান্তিলাভ হইবে।

কনিষ্ঠ—দুঃখের হাত এড়াইতে হইলে তোমার এই আনন্দস্বরূপের উপাসনা করিতেই হইবে। কিন্তু তোমায় যে বলিলাম তিনি তো আর শরীরী নহেন, যে, তাঁহার নিকট গিয়া বসিব—তাহার তো কোন কোন উচ্চ বাচ্য করিলে না ?।

জ্যেষ্ঠ—আচ্ছা, তাহাকে যদি শরীরী বলিয়া তুমি প্রথমে স্বীকার করিতে প্রস্তুত না হও, তবে যেরূপে চলিলে তোমাকে উপাসনার পথ হইতে বিচলিত না হইতে হয় তাহাই বলিতেছি। বিষ্ণু পুরাণকার প্রহ্লাদের মুখ দিয়া বলিয়াছেন, "সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য"।

তোমাকে শারীরশক্তি, মানসশক্তি ও আত্মার শক্তি দিয়া এই সমত্ব লাভ করিতে হইবে। এই সমত্বলাভই অচ্যুতের অর্থাৎ নারায়ণের উপাসনা।

কনিষ্ঠ—আমার ধারণা ছিল, তুমি আমাকে ফুল চন্দন কোশাকুশী লইয়া ঠাকুর-ঘরে আসন বিছাইয়া বসিবার পরামর্শ দিবে এখন দেখিতেছি তুমি সে পথে যাও নাই। ভালই করিয়াছ—কেন না সে কথা বলিলে তোমার উপদেশ কখনও কাজে পৌঁছিত না। সে যাহা হউক, শক্তিপ্রয়োগের কথাটা কি বলিতেছিলে আবার বল।

জ্যেষ্ঠ—যে শক্তিহীন সে কিছুই পায় না, এটা তো স্বীকার কর ?

কনিষ্ঠ—তা করি বৈকি। কেন না শক্তিহীন বলিয়াই আমরা ঋষিদিগের অতুল সুখ সম্পদ হইতে বঞ্চিত।

জ্যেষ্ঠ—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এই আত্মপুরুষের, এই আনন্দস্বরূপের অনুভূতি বলহীনের দ্বারা সম্ভাবিত নহে। তাই এই—আনন্দস্বরূপকে পাইতে হইলে প্রথমে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিকবলে বলবান্ হওয়া চাই। পরে তাঁহাতে তন্ময়তা আসিলেই তৎপদ লাভ হইবেই।

কনিষ্ঠ—বেশ, কিন্তু আমি কিরূপে বুঝিব যে, আনন্দস্বরূপকে লাভ করিবার উপযুক্ত বল আমি সঞ্চয় করিয়াছি ?

জ্যেষ্ঠ—সে জন্য বেশী ভাবিতে হইবে না। যখন দিব্য শয্যা ও প্রস্তর শয়ন তোমার নিকট তুল্য হইয়া যায়, যখন শীত উষ্ণ দ্বারা আর তুমি কাতর হও না, যখন ব্যাধি আসিয়া আর তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তখন

বুঝিও তোমার শারীরিক বলাধান হইয়াছে। যখন মান অপমান, সংযোগ বিয়োগ, হর্ষ বিষাদ, আসক্তি বিরক্তি আর তোমাকে বিচলিত করিতে পারে না, তখন বুঝিও তুমি মানসিক বলে বলীয়ান্ হইয়াছ। সর্ব্বজীবে ও সর্ব্ববস্তুতে সেই আনন্দ-স্বরূপই বিরাজিত—এই ধারণা দ্বারা যখন তোমার হেয় উপাদেয় ও শত্রু মিত্র বোধ তিরোহিত হইয়া যায়, যখন প্রতি বস্তুতেই নারায়ণ দর্শন হইয়া যায়, যখন প্রতি ভাবের মধ্যে ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনকে অনুভব করা যায়,—এক কথায় যখন বিশ্বকে বিশ্বরূপ ভাবে দেখিতে পারা যায় তখন বুঝিও তোমার আত্মা শক্তিশালী হইয়াছেন। এইরূপ ত্রিবিধ বলে বলীয়ান্ যিনি তিনিই আনন্দলাভের অধিকারী। বুঝিলে ?

কনিষ্ঠ—কথাগুলি তো শুনিতে বেশ মিষ্ট—কিন্তু এগুলি কাজে খাটাইবার কোন উপায় আছে কি ?

জ্যেষ্ঠ—আছে বই কি।

কনিষ্ঠ—সেগুলি কি, বলনা ?

জ্যেষ্ঠ—শুভ ও সংযত আহার দ্বারা দেহের পুষ্টি সম্পাদন পূর্ব্বক, বীর্য্যধারণ ও উপযুক্ত ব্যায়ামাদি দ্বারা তাহাকে দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, কর্ম্মপটু ও নীরোগ করিতে পারিলেই প্রথমতঃ একটা শক্তি তোমার হাতে আসিবে। পরে শাস্ত্রানুশীলন ও গুরূপদেশ শ্রবণ মননাদি দ্বারা জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি অনুশীলিত হইলে যখন তোমার অজ্ঞান মল অপসৃত হইয়া যাইবে, তখন মান অপমান, লজ্জা ভয় কিছুই থাকিবে না; থাকিবে শুধুই সন্তোষ, থাকিবে নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান। ইহাতে মানসিক বল যে মনের পূর্ণ স্বাস্থ্য, তাহা লাভ করিতে পারিবে। তারপর যখন এইরূপে বিশুদ্ধ চিত্তে অনুভব করা যায় যে, সুমহৎ আদিত্য হইতে ক্ষুদ্রতম পরমাণু পর্য্যন্ত বিশ্বের যাবতীয় পদার্থই সেই শক্তিমানের শক্তিবিকাশ মাত্র,—জগতের সর্ব্ব জীবহৃদয়েই সেই চেতনস্বরূপ বিশেষ ভাবে বসিয়া আছেন—তখন ভক্তি ও প্রীতিতে হৃদয় পূরিয়া যায়—মনে হয় নদ, নদী, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, জল, স্থল, চন্দ্র, সূর্য্য সকলই আমার নমস্য, সকলি আমার উপাস্য। তখন আর বস্তুতে দৃষ্টি পড়ে না, দৃষ্টি পড়ে তাহার আশ্রয়-স্বরূপের মধুর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে—তাহাতে শত্রু মিত্র বোধ থাকে না, হেয় উপাদেয় বোধও থাকে না। থাকে শুধু পূর্ণানন্দের অনর্ব্বচনীয় মধুর ভাব—সে ভাবে সব মধু হইয়া যায়,—কোথায় এতটুকু বিষাদ থাকে না। এই মধু-

ভাব প্রণোদিত হইয়াই বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদেরই পুণ্য-শ্লোক পিতামহগণ গাহিয়াছিলেন—

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে।

কনিষ্ঠ—এগুলা কি তোমার মনগড়া কথা? না, আনন্দলাভের শাস্ত্রগত পদ্ধতিই এইরূপ?

জ্যেষ্ঠ—আমি মনগড়া নূতন কথা কোথায় পাইব ভাই? শাস্ত্র এইরূপেই পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইবার বল দেখি, উপযুক্ত অনুশীলনের ফলে যে ব্যক্তি শরীরের নীরোগতা ও কর্ম্মপটুতা লাভ করিয়া সর্ব্বদা পরোপকার করিতে পারে, মনের পূর্ণ স্বাস্থ্য যে অত্যুত্তম সন্তোষ তাহা প্রাপ্ত হয় ও আত্মার স্বচ্ছন্দতা যে পরম শান্তভাব তাহা লাভ করে—সে কি যথার্থই সুখী ও আনন্দময় নহে?

কনিষ্ঠ—এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনুষ্য তো আজিও দেখিলাম না।

জ্যেষ্ঠ—কেন, মনুষ্যদেহধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি সর্ব্ববিষয়ে আমাদের পরিপূর্ণ আদর্শ নহেন? অতুলনীয় শারীরিক শক্তি, অদ্ভুত প্রতিভা, অপূর্ব্ব কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগ এবং সুমধুর জীব-প্রীতি একাধারে কত সুন্দর ভাবে মিলিত হইয়াছে ভাব দেখি। এক ভারতবর্ষ ভিন্ন, অন্য কোনও দেশে এ আদর্শ জন্মগ্রহণ করেন না। এতদ্ব্যতীত, এত উচ্চ না হউক, আরও বহু মহাপুরুষের নাম উল্লেখ করিতে পারি—যাঁহাদের স্মৃতিতে শুধু স্মৃতিতেই মানুষ পবিত্র, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও আনন্দময় হইতে পারে। তুমি বাল্যকাল হইতেই ওয়াসিংটন ওয়েলিংটন নেপোলিয়ন দেখিয়া আসিতেছ—কাজেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মনুষ্য দেখ নাই। ভারতের অতীত ইতিহাসের পাতা উল্টাইলে, বহু আদর্শ মনুষ্যের পরিচয় পাইতে পারিতে।

কনিষ্ঠ—আর লজ্জা দিও না। আচ্ছা দাদা, এইরূপ ব্যক্তিকে কোন্ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে?

জ্যেষ্ঠ—যোগী।

কনিষ্ঠ—তবে সংসারে সুখী হইতে গেলে, তোমার মতে, যোগী হইতে হইবে?

জ্যেষ্ঠ—নিশ্চয়ই।

কনিষ্ঠ—তোমার সুখ তোমারই থাক, আমার অমন সুখে কাজ নাই।

জ্যেষ্ঠ—এতক্ষণ বৃথাই বকাবকি করিলাম। একটা স্ত্রীলোকের বুদ্ধিও যে তোমার 'ঘটে' নাই, তাহা জানিতাম না।

কনিষ্ঠ—কিসে বুঝিলে যে, আমার বুদ্ধি একটা স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ?

জ্যেষ্ঠ—তোমার আলাপে। তুমি কি না স্বচ্ছন্দে বলিলে, যদি সুখী হইতে হইতে গেলে যোগী হইতে হয় তবে সে সুখে তোমার প্রয়োজন নাই। এটা কতবড় নির্ব্বুদ্ধিতা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি? পাঠ্য বিষয় বিশেষের প্রতি যোগী বা মনোযোগী না হইলে কি কেহ বিদ্যার্জ্জন করিতে পারে? ধনার্জ্জনে যোগী না হইলে কি কেহ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতে পারে ? এইরূপ যে কাযেই তুমি উন্নত হইতে চাও না কেন, তোমায় যোগী হইতেই হইবে।

কনিষ্ঠ—এখন বুঝিয়াছি—যোগী অর্থে নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তি। আমি ভাবিয়াছিলাম, যে ব্যক্তি চক্ষু বুজিয়া দম্ বন্ধ করিয়া ভগবান্ ভগবান্ বা আর কিছু করে—সেই-ই যোগী। তবে কি সংসারের সকল কাজই তোমার মতে যোগী হইয়া করিতে হইবে ?

জ্যেষ্ঠ—নিশ্চয়ই, ঐ বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই।

কনিষ্ঠ—তাহা হইলে, আমরা যে নিত্য সন্ধ্যা করি, যাকে তুমি সংসার-যাত্রায় ভগবৎ অনুসরণ বল, তাহাও তো যোগী হইয়া করিতে হইবে ? কিন্তু এরূপ করিলে সামঞ্জস্য থাকিবে কি করিয়া ? সংসারটা করিব খুব মনোযোগ দিয়া, আবার সন্ধ্যা পূজাও করিব খুব মনোযোগী হইয়া—ইহা কি সম্ভব ?

জ্যেষ্ঠ—সম্ভব বৈ কি। তবে ইহার মধ্যে একটু কৌশল খাটাইতে হয়। সেই কৌশলটী হইতেছে যোগস্থ হইয়া অর্থাৎ মমতা বোধ না রাখিয়া, শুধু একান্ত অনুষ্ঠেয় ইহা বিবেচনা করিয়া, সকল কার্য্য করা।

কনিষ্ঠ—কথাটা বড় গোলমেলে রকমের হইল। এখন যোগ বলিতে কি বুঝায় বল দেখি ?

জ্যেষ্ঠ—গোলমাল ভাবিলেই গোলমেলে হয়। আসক্তিহীন ভাবে কাজ করিলে গোলমাল ঘটিবে কেন ? প্রথমে, কর্ম্মের সুকৌশলকেই যোগ বলে ইহা বুঝিয়া রাখ—"যোগঃ কর্ম্মসুকৌশলম্"।

কনিষ্ঠ—ইহা ছাড়া 'যোগ' শব্দের আবার অন্য কি অর্থ আছে ?

জ্যেষ্ঠ—বলিতেছি শ্রবণ কর। শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বৃত্তিগুলির যথোপযুক্ত অনুশীলনের ফলে মনুষ্য যখন যথার্থ মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করে, তখন তাহার শরীর, মন ও আত্মা সর্ব্বাধার ও সর্ব্বব্যাপী ঐশী সুরের সঙ্গে একই সুরে বাঁধা হইয়া যায়, তখন আর তাহার শরীর, মনও আত্মা হইতে ভিন্ন ভিন্ন সুর বাহির হইতে পারে না—তাহারা একই একমুখী সুরে বাজিতে থাকে। বিভিন্নতা বিচিত্রতা নিরস্ত হইয়া যায়। এইরূপে সেই সর্ব্বব্যাপী সুরের সঙ্গে জীবনসুর মিশানর নামই যোগ—বৈচিত্র্যে একত্ব সম্পাদন। আর এই ভাব লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন :—

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"।

কনিষ্ঠ—তাহা হইলে সুখ লাভের জন্য, মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের জন্য, সকল বৃত্তি উপযুক্তরূপে অনুশীলনের জন্য, এক কথায়, এই যোগাবস্থা বা সমত্ব লাভ করিবার জন্য কি কি কাজ করা উচিত?

জ্যেষ্ঠ—সমকালে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অভ্যাসার্থ প্রযত্ন করিলেই, ক্রমে অশুদ্ধিক্ষয়ে সমত্ব লাভ হয়—পরমানন্দপ্রাপ্তি হয়।

কনিষ্ঠ—এতো পাতঞ্জল দর্শনের যোগাঙ্গের কথা বলিতেছ।

জ্যেষ্ঠ—তা' না হইলে আমি আবার নূতন কথা কোথায় পাইব?

কনিষ্ঠ—আচ্ছা, তবে এক এক করিয়া এই যোগাঙ্গগুলির বিষয় বল। মেলা গোলমাল করিলে বা Phylosophy র কূট তর্ক আনিয়া ফেলিলে সব খিচুড়ী পাকাইয়া যাইবে। সুতরাং আমি যাহাতে বুঝিতে পারি এমন করিয়া বলিও।

জ্যেষ্ঠ। আজ আর নয়। চল একটু বেড়াইয়া আসি। কাল আফিস হইতে আসিয়া, ঠাণ্ডা হইয়া, পুনরায় আলোচনা করা যাইবে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।

প্রথমতঃ একটা কথা বিচার্য্য এই যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি শক্তির প্রতিষ্ঠা হইল বটে, ইহা জাতিগত, না গুণগত? এ প্রশ্নটির মীমাংসা বড়ই জটিল। মনুর মতে জাতিগত বলিয়া মনে হয়, এবং গীতার শ্রীকৃষ্ণোক্তি গুণ এবং কর্ম্মের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে। আমাদের মনে হয়, এই যে চতুর্ব্বর্ণের বিভাগ ইহা জাতিগত এবং গুণগত। রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে পারিলে, গুণ এবং কর্ম্ম বংশের ক্রম অনুসরণ করে। ইহা একটি বৈজ্ঞানিক সত্য এবং স্বাভাবিক। মনু বলেন, ব্রাহ্মণের যে শরীরোৎপত্তি, তাহা ধর্ম্মের শাশ্বত মূর্ত্তিমান্ অবস্থা। ধর্ম্মার্থে উপনীত হইয়া ব্রাহ্মণ ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহার মতে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের উৎপত্তিও ঐরূপ এক একটি ধর্ম্মের শাশ্বত মূর্ত্তিমান্ অবস্থায় হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু গণ্য, মান্য লেখক, অধুনা এলফিন্‌ষ্টোন সাহেবের মতে মত দিয়া বলিতেছেন যে, অতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে জাতিভেদ ছিল না। শিল্পের উন্নতিও আদৌ আরম্ভ হয় নাই। পরে প্রয়োজন অনুসারে কুম্ভকার, স্বর্ণকার, তন্তুবায় প্রভৃতি জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল।

আর্য্যঋষিরা যে বৃটনদের মত কাল রঙ মাখিয়া লজ্জানিবারণ করিতেন, অথবা নগ্ন অবস্থায় বিচরণ করিতেন, একথা এখনও যে পতিত নরাধম হিন্দু কেহ বিশ্বাস করিবে, তাহা আমাদের মনে হয় না। বেদে অনেক স্থলে নানাবিধ অলঙ্কার এবং আয়ুধের পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুলি যে, বর্ব্বর শিল্পীর বিকৃত-মস্তিষ্কের ফল তাহাই বা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব?

কেহ কেহ অনুমান করেন, আর্য্য এবং অনার্য্য সংমিশ্রণে জাতিভেদের উৎপত্তি হইয়াছিল। আর্য্য ও অনার্য্য সংঘটন বেদে অবশ্যই বর্ণিত আছে। পরে ইহাদের মধ্যে মিলন স্বাভাবিক। কিন্তু কেবল তদ্দ্বারা যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল একথা স্বীকার করা যায় না। তাহা হইলে ব্রাহ্মণের নৈতিক অবনতই জাতিভেদের বিশিষ্ট কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ক্রমশঃ—

র।

তচ্চিত্তাস্তদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ তন্নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥১॥

যাঁহারা পরমাত্মাতে চিত্ত দিয়াছেন, যাঁহাদের প্রাণ তাঁহার জন্যই ব্যাকুল, যাঁহারা বাক্যালাপকালে তাঁহার কথাই বুঝাইয়া থাকেন, সর্ব্বদা তাঁহার কথা বলিতেই যাঁহাদের তৃপ্তি, তাঁহাকেই লইয়াই যাঁহারা সর্ব্বদা রমণ করেন, সেই সকল জ্ঞানে-একনিষ্ঠ, আত্মজ্ঞান বিচার পরায়ণ মহাপুরুষেরাই জীবন্মুক্তি লাভ করেন।

বশিষ্ঠ—আর যাহা জীবন্মুক্তি তাহাই বিদেহ মুক্তি।

রাম— বন্ধন বিদেহ মুক্তস্য জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্।
ব্রূহি যেন তথৈবাহং যতে শাস্ত্রদৃশা ধিয়া ॥ ৩ ॥

হে ব্রহ্মন্—আপনি বিদেহ মুক্ত ও জীবন্মুক্তের লক্ষণ এমন করিয়া বলুন যাহা শুনিয়া আমি শাস্ত্রানুসারিণী বুদ্ধি দ্বারা তল্লাভে যত্নবান্ হইতে পারি।

বশিষ্ঠ—জীবন্মুক্ত বা বিদেহ মুক্ত হইতে হইলে যাহা করিতে হইবে তাহা এই:—

(১) এই দৃশ্য জগৎ অসৎ, দর্পণ প্রতিবিম্বিত নগরের ন্যায়, ইহার দৃঢ় ধারণা চাই।

(২) সর্ব্বদা জ্ঞাননিষ্ঠ থাকা চাই। ব্যবহারিক জগতেও কর্তৃত্ব শূন্য হওয়া চাই। জাগ্রতেও সুষুপ্তির মত নিরাকার হইতে হইবে। যে সাধনায় ইহা হয় তাহা করা চাই।

(৩) সুখে দুঃখে সমান ও যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্ট হইতে হইবে।

(৪) আত্মাতে থাকিয়াও অবিদ্যানাশের জন্য জাগ্রতের মত থাকা চাই। ইন্দ্রিয়গুলিকে অধীনে রাখিয়া কোন কিছু না করা, কোন কিছু না দেখা অর্থাৎ এক কথায় বাসনা শূন্য হওয়া চাই।

(৫) বাহিরে রাগদ্বেষাদির অভিনয় মত করা, কিন্তু ভিতরে তদ্বর্জ্জিত এবং চিদাকাশে অবস্থিত হওয়া চাই।

(৬) অহং অভিমান না থাকা এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও পাপ পুণ্যে বুদ্ধিকে লিপ্ত না করা উচিত।

(৭) লোকের উদ্বেগ জনক না হওয়া এবং লোক কর্তৃক উদ্বিগ্ন না হওয়া যাহাতে হয় তাহাই করিতে হইবে।

(৮) সংসারে আস্থা নাই, চিত্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত থাকিলেও চিত্তের রহিতের মত থাকা চাই।

রাম—জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কিরূপে অবস্থান করেন?

বশিষ্ঠ—জীবন্মুক্ত যিনি তিনি সর্ব্বাত্মা ব্রহ্মের মত অবস্থিত। জীবন্মুক্ত হইলে পুরুষ ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া যান। তিনিই সূর্য্য হইয়া উত্তাপ দেন, বিষ্ণু হইয়া রক্ষা করেন, রুদ্র হইয়া সংহার করেন, ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করেন। তিনিই এক কথায় সমস্ত হইয়া থাকেন।

রাম—আমি কি এই অবস্থা লাভ করিতে পারিব?

বশিষ্ঠ—তুমি আমি ইহা তাহা ইত্যাদি ভাব বিশিষ্ট জগতকে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক বোধ করিতে পারিলেই পারিবে।

রাম—জগৎ নাই, জগতের অত্যন্তাভাব জ্ঞানটি আমাকে আবার উপদেশ করুন।

বশিষ্ঠ—জগৎরূপ মিথ্যাজ্ঞান অনাদিকাল হইতে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বারা ইহা দূর হয়। বিচারের পূর্ব্বে যোগ দ্বারা চিত্ত শান্ত কর এবং ভক্তিদ্বারা চিত্তকে ভগবৎরসে রসময় কর। করিতে করিতে বুঝিবে কিরূপে সমস্তই তাঁহাতে বিলীন হইয়া যায়। যখন সমস্ত লয় হইয়া যায় তখন তিনি মাত্রই অবশিষ্ট থাকেন।

মহাপ্রলয়ে এই যে অনির্ব্বচনীয় বস্তু অবশিষ্ট থাকেন তাঁহা হইতেই এই জগতের স্ফুরণ হয়। মুক্তাভোজী হংস যেমন মুক্তার মতনই দৃষ্ট হয় সেইরূপ জগৎভোজী ব্রহ্ম জগতেরই ন্যায়। অধ্যারোপ-দৃষ্টিতে ইনি এই জগতের ন্যায়—আবার অপবাদ দৃষ্টিতে ইনি কিছুরই মত নহেন। এই জন্য, এই দেব সৎ ও অসৎরূপ।

রাম—যাঁহার উপরে এই দৃশ্যদর্শনরূপ অজ্ঞান ভাসিয়া এই জ্ঞানস্বরূপকে আবৃত করে, তাহা যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় বস্তু। এই সর্ব্বব্যাপী বস্তুই কি সমস্ত অনুভব করেন—ইনিই কি সমস্তই জানেন, সমস্তই দেখেন?' জীবের ডাক শুনেন, জীবের বিপদ নিবারণ করেন, ব্যথিতকে শান্তি দেন, অপবিত্রকে পবিত্র করেন, পতিতকে উদ্ধার করেন?

বশিষ্ঠ— অকর্ণ জিহ্বনাসাত্বগ্নেত্রঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শৃণোত্যাস্বাদয়তি যো জিঘ্রেৎ স্পৃশতি পশ্যতি ॥ ৫২ ॥

তাঁহার কর্ণ নাই তথাপি তিনি শ্রবণ করেন, জিহ্বা নাই আস্বাদন করেন, নাসিকা নাই ঘ্রাণ করেন, ত্বক্ নাই স্পর্শ করেন, নেত্র নাই তথাপি দর্শন করেন। ইহা অসম্ভব মনে করিও না। কোন ইন্দ্রিয় না থাকিলেও স্বপ্নে সমস্তই ত হয়। মনে মনে কি না হয়? সঙ্কল্পে কি না হয়? যে আলোকে তাঁহাকে দেখা যায়—সৎ অসৎ ভাবে জানা যায়,—সেই চিদালোকও তিনি। যখন অজ্ঞান বা সঙ্কল্প বা মায়া তাঁহাতে ভাসে, সেই কালে বিচিত্র সৃষ্টি দেখা যায়; আবার অজ্ঞান নিবৃত্তিতে তিনি অনাদিনিধন। তখন তাঁহার স্বরূপের উপর আর কোন সৃষ্টি-চিত্র ভাসে না।

অর্দ্ধোন্মীলিতদৃশ্যভ্রূ মধ্যে তারকবৎজগৎ।
ব্যোমাত্মৈব সদাভাসং স্বরূপং যোঽভিপশ্যতি॥ ৫৪॥

জীবন্মুক্তিদশাতে জগতের আভাস পর্য্যন্ত বাধিত করিয়া যাঁহাকে দেখা হয়, তিনি ইনিই। অর্থাৎ যোগীরা খেচরীমুদ্রায় ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিনিবেশ করিয়া যেমন অর্দ্ধোন্মীলিত চক্ষু দ্বারা দৃশ্য ভ্রূমধ্যে নিবিষ্ট অতএব অস্ফুট কৃষ্ণতারকা দর্শন মত সদাভাস জগৎ দেখেন, সেইরূপ ব্যোমাত্মার স্বরূপ দর্শনও তিনিই।

শশ শৃঙ্গ যেমন হয় না, সেইরূপ তাঁহার কারণও হয় না। তরঙ্গের উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গ যেমন সমুদ্রের কার্য্য সেইরূপ জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, ভঙ্গও তাহার কার্য্য।

জ্বলতঃ সর্ব্বতোজস্রং চিত্তস্থানেষ্ তিষ্ঠতঃ।
যস্য চিন্মাত্র দীপস্য ভাসা ভাতি জগত্রয়ম্॥ ৫৬॥

এই চিন্মাত্র প্রদীপ চিত্রস্থানে থাকিয়াই সর্ব্বত্র অজস্র আলোক দিতেছে। এই চেতনাত্মক দীপের দীপ্তিতে ত্রিজগৎ ভাসমান হইতেছে।

যং বিনাঽর্কাদয়োঽপ্যেতে প্রকাশাস্তিমিরোপমাঃ।
সতি যস্মিন্ প্রবর্ত্তন্তে ত্রিজগন্মৃগতৃষ্ণিকাঃ॥ ৫৭॥
সম্পন্দে সমুদেতীব নিস্পন্দান্তর্গতেন চ।
ইয়ং যস্মিন্ জগল্লক্ষ্মীরলাত ইব চক্রতা॥ ৫৮॥
সর্ব্বদৈব প্রবুদ্ধোঃ যঃ সুপ্তো যঃ সর্ব্বদৈব চ।
ন সুপ্তো ন প্রবুদ্ধশ্চ য সর্ব্ব ত্রৈব সর্ব্বদা॥ ৬১॥
যদস্পন্দং শিবং শান্তং যৎস্পন্দং ত্রিজগৎস্থিতিঃ।
স্পন্দাস্পন্দবিলাসাত্মা য একো ভরিতাকৃতিঃ॥ ৬২॥

মূকোপমোপি যোঽমূকো মন্তা যোপ্যুপলোপমঃ।
যো ভোক্তা নিত্যতৃপ্তোপি কর্ত্তা যশ্চাপ্যকিঞ্চনঃ ॥ ৬৪ ॥
যোঽনঙ্গোপি সমস্তাঙ্গঃ সহস্রকরলোচনঃ।
ন কিঞ্চিৎ সংস্থিতেনাপি যেন ব্যাপ্তমিদং জগৎ ॥ ৬৫ ॥
নিরিন্দ্রিয়বলস্যাপি যস্যাশেষেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যস্য নির্ম্মননস্যৈতা মনোনির্ম্মাণরীতয়ঃ ॥ ৬৬ ॥
যদনালোকনাদ্ভ্রান্তি সংসারোরগ ভীতয়ঃ।
যস্মিন্ দৃষ্টে পলায়ন্তে সর্ব্বাশাঃ সর্ব্বভীতয়ঃ ॥ ৬৭ ॥
ক্রিয়াং রূপং রসং গন্ধং শব্দং স্পর্শঞ্চ চেতনং।
যদ্বেৎসি তদসৌ দেবো যেন বেৎসি তদপ্যসৌ ॥ ৭৪ ॥
দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যানাং মধ্যে যৎ দর্শনং স্থিতম্।
সাধো তদবধানেন স্বাত্মানমববুধ্যসে ॥ ৭৫ ॥

যিনি না থাকিলে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি প্রকাশ পদার্থ অন্ধকার মত হয়, যিনি থাকাতে এই ত্রিজগৎ মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় উৎপন্ন হইতেছে; যাঁহার স্পন্দন ও নিস্পন্দ অবস্থাতে, যাঁহার মনোভাব গ্রহণ ও ত্যাগ কালে,—নিশি-ভ্রাম্যমাণ জ্বলন্ত অঙ্গারের চক্রাকারতার মত এই জগল্লক্ষ্মী পুনঃ পুনঃ উদয় ও লয় হয়; যিনি সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ, যিনি সর্ব্বদা সুপ্ত, আবার যিনি সুপ্তও নহেন, প্রবুদ্ধও নহেন; স্পন্দনরহিত অবস্থায় যিনি পরমশান্ত মঙ্গলময়, আবার স্পন্দনযুক্ত অবস্থাই যাঁহার ত্রিজগৎরূপে স্থিতি, যিনি স্পন্দ ও অস্পন্দরূপে বিলাস করেন, করিয়াও যিনি এক শুদ্ধ ভরিতাকার—পূর্ণাকার; যিনি বাগিন্দ্রিয়শূন্য মূকের তুল্য হইয়াও অমূকবাচাল; আবার যিনি মননশীল হইয়াও প্রস্তর সম, নিত্যতৃপ্ত থাকিয়াও যিনি ভোজন করেন, যিনি অকিঞ্চন, সর্ব্বক্রিয়া শূন্য হইয়াও কর্ত্তা; অনঙ্গ হইয়াও যাঁহার সকল অঙ্গ আছে, যিনি সহস্র হস্ত, সহস্র চক্ষু; কোথাও সংস্থিত না হইয়াও যিনি জগৎ ব্যাপিয়া আছেন; কোন ইন্দ্রিয় নাই তথাপি যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম করেন, যাঁহার মন নাই তথাপি সর্ব্বলোকবিদিত এই মায়িক মানসসৃষ্টি যাঁহার; যাঁহাকে না দেখিতে পাইলে লোকের এই ভ্রান্তি সংসার-সর্প ভয় হয়, আবার যাঁহাকে দেখিলে সব আশা, সব ভয় দূর হয়; [নট যেমন নাট্যশালার দীপসাহায্যে নাট্য-ক্রিয়া করে, সেইরূপ যিনি সাক্ষীস্বরূপ থাকাতে চিত্তের বিবিধ স্পন্দন হয়;

সমুদ্র হইতে তরঙ্গ, কল্লোল, ক্ষুদ্র লহরীর মত যাঁহা হইতে বিচিত্র সৃষ্টি হইতেছে অথচ তিনি একই আছেন—কেবল অজ্ঞান হইতে উত্থিত উপাধিপ্রভাবে সেই এক চিদাত্মাই যেন বহু জড় প্রপঞ্চরূপে ভাসিতেছেন; এক বই দুই আত্মা নাই, ইনিই চিদাত্মা বা বোধাত্মা বা জ্ঞানাত্মা—তথাপি লোক মরিল বলিয়া কত অজ্ঞানাত্মা নিরন্তর ক্রন্দন করিতেছে] হে রাম! এক কথায় বলি, দেহকর্ম্মেন্দ্রিয় উপাধিতে যে ক্রিয়া হইতেছে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় উপাধিতে যে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি হইতেছে—এবং অন্তঃকরণ উপাধিতে চেতনা—এই সমস্ত তুমি যাহা জানিতেছ, সেই সমস্তই সেই দেব, সেই দীপ্তিশীল, ক্রীড়াশীল পরমাত্মা। আবার যাহা দ্বারা ক্রিয়া, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও চেতন জানিতেছ তাহাও তিনি। দর্শনকর্ত্তা, দর্শন ও দৃশ্য ইহাদের মধ্যে যে দর্শনটি আছে সে সাধো! সেই দর্শন স্বরূপটি যদি নিশ্চয় করিতে পার তবে আত্মাকে ধরিতে পারিবে।

এই জগৎ ভ্রমটা যাঁহার উপর ভাসিয়াছে,সেই ব্রহ্ম জন্মশূন্য জরাশূন্য, আদি-শূন্য, তিনি সনাতন পুরুষ, তিনি নিত্য, তিনি মঙ্গলস্বরূপ, তিনি সর্ব্বপ্রকার মলিনতা শূন্য, তিনি বন্দনীয়, উচ্চজন দ্বারাও অনিন্দ্য, সকল প্রকার কলনা—চিহ্নশূন্য, সর্ব্বকারণের কারণ তিনি, অনুভবস্বরূপও তিনি। তাঁহাকে জানা যায় না অথচ সমস্ত জানাও তিনি।

১০ সর্গঃ।

মহাপ্রলয়াবশিষ্ট পরমভাব বর্ণন।

রাম—মহাপ্রলয় হইয়া গেলে সমস্ত বিশ্ব যখন লয় হয় তখন যিনি অবশিষ্ট থাকেন তাঁহার কোন নামও নাই, কোন আকারও নাই। ইহা বুঝিব কিরূপে? কেনই বা বলিতেছেন ইহা কিছুই নয় কথং বা নৈব কিঞ্চিৎস্যাৎ। আবার কেন বলিতেছেন ইহাই সব। কথং বা সর্ব্বমিত্যপি। আপনার এই বাক্‌ভঙ্গীতে আমি মুগ্ধ হইতেছি।

বশিষ্ঠ—তোমার প্রশ্নটি অতি বিষম। তথাপি সূর্য্য যেমন নৈশ তম দূর করেন, সেইরূপে আমি তোমার সংশয় দূর করিতেছি।

মহাপ্রলয় হইয়া গেলে যিনি থাকেন তিনি শূন্য পদার্থ নহেন।

অনুৎকীর্ণা যথা স্তম্ভে সংস্থিতা শালভঞ্জিকা।
তথা বিশ্বং স্থিতং তত্র তেন শূন্যং ন তৎপদম্॥ ৭॥

মনে কর কোন কাষ্ঠস্তম্ভে এখনও কাষ্ঠপুত্তলিকা খোদাই করিয়া বাহির করা হয় নাই। সেই অনুৎকীর্ণ স্তম্ভে যেমন কাষ্ঠপুত্তলিকা থাকে, সেইরূপ পরমব্রহ্মে এই জগৎ থাকে সেই জন্য পরমব্রহ্ম শূন্য পদার্থ নহে। জগৎ সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, এই জগৎটা যাহাতে থাকে তাহা বন্ধ্যাপুত্রের মত শূন্য-পদার্থ হইবে কিরূপে ?

যথা ন পুত্রিকাশূন্যঃ স্তম্ভোঽনুৎকীর্ণপুত্রিকঃ।
তথা ভাতং জগৎব্রহ্ম তেন শূন্যং ন তৎপদম্॥ ৯॥

পুত্তলিকা খুদিয়া বাহির করা হয় নাই এমন স্তম্ভকে যেমন পুত্তলিকাশূন্য বলা যায় না,—ব্রহ্ম সম্বন্ধে জগৎটাও সেইরূপ। তবে ব্রহ্মপদ শূন্য কিরূপে ? মায়া, শিল্পকৌশলে কাষ্ঠস্তম্ভস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় এই খোদাই করা জগৎ বাহির করিতেছেন। যেমন স্থির জলে তরঙ্গের সদ্ভাব ও অভাব দুইই আছে, সেইরূপ পরমশান্ত পরমপদে জগতের শূন্যতা ও অশূন্যতা উভয়ই আছে।

রাম—লোকে আপত্তি করিতে পারে যে, সর্ব্ব উপকরণ থাকিলেও কর্ত্তার ইচ্ছা ভিন্ন ত স্তম্ভ হইতে পুত্তলিকা বাহির হইতে পারে না ? কিন্তু মহাপ্রলয়ে দ্বিতীয় কেহই থাকে না। তবে কাহার ইচ্ছায় ব্রহ্ম হইতে জগৎ বাহির হইবে ?

বশিষ্ঠ—ব্রহ্ম হইতে জগৎ আবির্ভাব হয়—এই আবির্ভাব অংশে উপরের দৃষ্টান্তটি সত্য কিন্তু কর্ত্তা অংশে নহে।

কাহার ইচ্ছায় জগৎ পুত্তলিকা ব্রহ্ম হইতে রচিত হইয়া বাহির হয় ইহার উত্তর নানা লোকে নানাপ্রকারে দিয়া থাকে। কেহ বলেন (১) জগৎ স্বভাবতঃ হয়, কেহ বলেন (২) মায়াবী ঈশ্বরের ইচ্ছায় জগৎ হয় ইত্যাদি। কিন্তু যথার্থ সত্য কথা এই যে :—

ন কদাচিদুদেতীদং পরস্মান্ন চ শাম্যতি।
ইত্থং স্থিতং কেবলং সৎ ব্রহ্ম স্বাত্মনি সংস্থিতম্॥ ১৩॥

কস্মিন্ কালে এই জগৎ পরম ব্রহ্ম হইতে উদিতও হয় নাই, অস্তমিতও হয় নাই। কেবল—স্বরূপ ও সৎস্বরূপ ব্রহ্ম পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা মত আপনাতে

আপনিই অবস্থিত আছেন। সূর্য্যাদি কোন কিছু দ্বারা তাঁহার প্রকাশ হয় না। তিনি স্বপ্রকাশ পদার্থ। এ বিষয়ে অনুভূতি প্রধান। বুদ্ধি ইত্যাদি পদার্থেরও অন্তরে থাকিয়াও তিনি বুদ্ধ্যাদিকে প্রকাশ করেন। তিনি সাক্ষাৎ অনুভূতি স্বরূপ এই জন্য তাঁহার দ্বারা সমস্ত পদার্থ অনুভূত হয়, কিন্তু তিনি নিজে অননুভবনীয়।

মৃত্তিকার অন্তরে যেমন ঘট থাকে সেইরূপ এই জগৎ যাঁহার অন্তরে স্থিত কিরূপে তাঁহাকে শূন্য বলিবে?

রাম— ঘটের অন্তর্গত জল যদি ঘটের সমান না হয় তবে ব্রহ্মের অন্তর্গত জগৎ ব্রহ্মের স্বভাব পাইবে কিরূপে?

বশিষ্ঠ—এ দৃষ্টান্ত ঠিক নহে। ব্রহ্মবস্তু নিরাকার। ব্রহ্ম নিরাকার বলিয়া তদন্তর্গত জগৎও নিরাকার। ঐ যে বলা হয়, জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে একটা আদ্যন্ত-শূন্য তমঃ সর্ব্বত্র বিদ্যমান ছিল ইহা কি জান? কোন কিছুতে ভৌতিক প্রকাশের অভাব দেখিলে তাহাকে লোকে তমঃ বলে। কাজেই ভৌতিক প্রকাশ যখন হয় নাই, তখন সেই স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে ঘেরিয়া আর কি থাকা সম্ভব? ব্যোমরূপী পরমাত্মার নিকট সমস্ত ভৌতিক প্রকাশ অভিভূত।

যদি বল সূর্য্যকিরণের মধ্যে কি অন্ধকার থাকে? না অন্ধকার যাহাকে তুমি বল তাহা থাকে না সত্য, কিন্তু সূর্য্যকিরণের মধ্যেও কিছু অনুভব করা যায়—তাহা তীক্ষ্ণতা। সেইরূপ এই চিদাকাশ বা চৈতন্যরূপ আকাশে চিতি-গ্রাহ্যতা শক্তিটি থাকে। ব্রহ্ম, জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞেয় বিষয় নাই অথচ যে জ্ঞান নিত্য থাকেন তাহাই জ্ঞানের স্বরূপ। জ্ঞেয় বস্তুর অনুভবটিও যেমন অনুভব, আবার তাহার অভাবটিও সেইরূপ অনুভব বটে। সুষুপ্তিতে দৃশ্যজগতের অভাবটি অনুভূত হয়। ইহা বলাও যা, আর আপনি আপনি স্বরূপটি অনুভব হয় বলাও তাই। তাই বলা হয়, জ্ঞান যাহা তাহার অন্তরে যেন অতি সূক্ষ্মভাবে জ্ঞেয় গ্রাহ্যতা শক্তি থাকে। এ ক্ষেত্রে জ্ঞানটি জ্ঞেয় হইতে ভিন্ন নহে। এইটি লক্ষ্য' করিয়াই বলা হয় শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। ইহাকেই কেহ বলেন, শক্তি ও শক্তিমানে যে ভেদ তাহা অচিন্ত্য ভেদাভেদ। সেই কারণে বলা হয়, চিৎ অচিৎ উভয়ই পরমাত্মায় আছে। তিনিই দর্শন, তিনিই দৃশ্য। অথচ তাঁহাতে দৃশ্যতা নাই। যেমন বাস্তব দৃশ্যতা নাই সেইরূপ বাস্তব জগৎও নাই। রূপালোকে বাহিরে দেখা আবার অন্তরালোকে ভিতরে দেখা, সমস্তই তিনি।

বিশ্ব যেমন ভাবেই থাকুক শেষে ইহা হয় সুষুপ্ত, না হয় তুরীয়। মহাপ্রলয়ে যেমন জগৎ থাকে না, সেইরূপ সুষুপ্তিতেও জগৎ থাকে না। অজ্ঞানী যেরূপ দৃষ্টিতে জগৎ দেখেন, সুষুপ্তাত্মা যোগী কিন্তু সে ভাবে জগৎ দেখেন না। তিনি ইহাতে স্বপ্নে দর্শনের মত ব্যবহার উপযোগী কিছুই দেখেন না। স্বপ্নে দর্শনটাকে যদি কিছু বলিতে চাও, আর সেইরূপ একটা কিছু ব্রহ্মে আছে যদি বলিতে চাও তবে বল যাহা সেই পূর্ণব্রহ্মে উপাধিবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত তাহাও পূর্ণ। পূর্ণে পূর্ণেরই স্থিতি সম্ভব।

আকারিণি যথা সৌম্যে স্থিতাম্ভোয়ে মহোর্ম্ময়ঃ।
অনাকৃতৌ তথাবিশ্বং স্থিতং তৎসদৃশং পরে ॥ ২৭ ॥
পূর্ণাৎ পূর্ণং প্রসরতি যত্তৎ পূর্ণং নিরাকৃতি।
ব্রহ্মণো বিশ্বমাভাতং তদ্ধি স্বার্থং বিচক্ষিতাম্ ॥ ২৮ ॥
পূর্ণাৎ পূর্ণং প্রসরতি সংস্থিতং পূর্ণমেব তৎ।
অতোবিশ্বমনুৎপন্নং যচ্চোৎপন্নং তদেব তৎ ॥ ২৯ ॥

তোমার প্রশ্ন হইতেছে নিরাকার ব্রহ্ম হইতে সাকার জগৎ উৎপন্ন হয় কিরূপে? আমার উত্তর যাহা তাহা ত জান—জগৎ বলিয়া কোন কিছুই উৎপন্নই হয় নাই। কেন বলি এই কথা ইহার যুক্তি লক্ষ্য কর।

(১) এক আকার বিশিষ্ট শান্ত জল হইতে নানা আকার বিশিষ্ট উর্ম্মি বহির হয় ইহা সকলেই দেখে। অর্থাৎ আকারবিশিষ্ট পদার্থ হইতে আকার-বিশিষ্ট বস্তুই বাহির হয়। সেইরূপ নিরাকার যাহা তাহা হইতে যদি কিছু বাহির হয় তাহা নিরাকারই হইবে। তবে জগৎটাকে যে আমরা আকার-বিশিষ্ট দেখি তাহা ভ্রান্তি। যদি জগৎ বলিয়া কিছু থাকে আর তাহা যদি নিরাকার ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে ইহা নিরাকারই হইবে। জগতের কারণ হইতেছে ব্রহ্ম। তবেই দেখা গেল অন্ততঃ আকার সম্বন্ধে জগৎ ও ব্রহ্মের কার্য্য ও কারণের কোন ভেদ নাই। জগতের আকার নাই, ইহা কিন্তু কেহ কখন বলেনও না; অনুভবও করেন না।

(২) পূর্ণ হইতে পূর্ণই প্রসারিত হয়। যাহা পূর্ণ তাহা কিন্তু নিরাকার। ব্রহ্মকে পরমাত্মা বলা হউক, আর বিশ্বকে জীবাত্মা বলা হউক।

পূর্ণব্রহ্ম হইতে উপাধিভেদে জীবভাবে যাঁহার প্রকাশ হয়, তিনি পরমার্থতঃ পূর্ণই। জীবকে যদি ব্রহ্ম না বল কোনরূপ সীমাবিশিষ্ট বল তবে জীব কিন্তু সাকার।

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৮ম বর্ষ।] ১৩২০ সাল, চৈত্র। [১২শ সংখ্যা।

৺বৈদ্যনাথ।

হে বরেণ্য, আদিদেব, জগতের পতি!
রোগ, শোক, ব্যাধি, মৃত্যু নাশিবার তরে,
অবতীর্ণ শিলারূপী মৃত্যুঞ্জয় তুমি—
শোভায় অতুল এই রমণীয় দেশে!
জানি না কি কর্ম্মফলে রাবণ হেথায়,
স্থাপিলা তোমারে কর্ম্মনাশা নদীতীরে—
সর্ব্ব কর্ম্মফল জীব অর্পিয়া মহেশে;
লভিবে নির্ব্বাণমুক্তি তাই কি বাসনা?
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিরাজি পাদপ মেখলা,
শোভে তব অঙ্কে শ্যামা বিশ্ববিমোহিনী—
কি সুন্দর, কি সুন্দর ঘন বনু শিরে,
ঊষাসতী মেখেদেছে স্বর্ণ আল্পনা।
সৌম্য, শান্ত মূর্ত্তিমতি রাজরাজেশ্বরী
অঙ্গুলি হেলনে যেন বরিছে তোঁমারে।

পুঞ্জীভূত সারি সারি শুভ্র মেঘমালা,
চামর ঢুলায় ধীরে শ্যামাঙ্গিনী-শিরে—
যেন দেব পশুপতি তব অভিষেক !
শ্মশান-বিহারী ভোলা রাজরাজেশ্বর।
দূরে গিরি প্রান্তদেশে বলাকার শ্রেণী
মাল্যাকারে ত্রিধারায় উড়িছে সতত,
জাহ্নবী, যমুনা আর সরস্বতী ধারা,
একত্র মিলিছে যেন ত্রিবেণী-সঙ্গমে।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুবর্গ হেথা—
হেন ভূমি কোথা যা'র স্বরগ তুলনা ?
সুখ, স্বাস্থ্য, শান্তি সদা নির্ম্মল সলিলে,
নবপ্রাণ আনে ধীরে সুধীর পবন।
নব বল, নব আশা, নব উদ্দীপনা,
নিয়ত জাগিছে প্রাণে প্রহরীর মত।
হরহর বম্‌বম্‌ বিজয়ের বাণী,
হৃদিব্যূহ ভেদি নিত্য উঠিছে আমার।
দুঃখ হর, ব্যাধি হর, হর উমাপতি।
ঘুচাও জীবন-দৈন্য অপবিত্র আশা !
চিরস্থির নহে কভু মানবজীবন—
তুমি নিত্যবুদ্ধ, শান্ত, মুক্ত, জ্যোতির্ম্ময়,
রাখিও আমারে পদে সদা মতিমান—
সর্ব্বার্থ সাধিকা শ্যামা আনন্দবর্দ্ধন।

শ্রীহ।

কবে আসিবে ?

কবে আসিবে ? আবার ত বৎসর গেল। আবার মধুমাস আসিল। চৈত্রঃ শ্রীমানয়ং মাসঃ পুণ্যঃ পুষ্পিতকাননঃ। এই সেই শোভা আনয়নের মাস। এই সেই পুণ্যমাস। এই সেই পুষ্পিত কানন মাস। চারিধারে সব শোভা ফুটিয়া উঠিল। পুষ্পিত কানন হাসিয়া উঠিল। আমার মধুমাস কবে আসিবে ? আমার শুষ্ক কানন কবে পুষ্পিত হইবে ? কবে তুমি আসিবে ? তুমি যে বলিয়াছিলে আসিব ? তবে কবে আসিবে ?

আর যেখানে আমি আছি ? তুমি যে এখানেও আসিয়াছিলে ? আসিয়া আমায় দেখাইয়া দিয়া গিয়াছ এ স্থান কত ভয়ানক ? এখানকার প্রায় লোক কত ভয়ঙ্কর ? আমি যে আর থাকিতে পারি না। আমি কোথায় ছিলাম আর কোথায় আসিয়াছি ! কি ছিলাম আর কি হইয়া আছি ! তোমার কাছে থাকিলে আমি কি থাকি আর তুমি কাছে না থাকিলে আমি কি হইয়া থাকি ? তোমার কাছে থাকিলে সব খুলিয়া যায়—আর এখানে ! এখানে কারও কাছে প্রাণ খুলিতে পারি না। কারও সঙ্গে মিশিতে পারি না—তবু সকলের সঙ্গে মিশিতে হয়। সবার সবে যোগ দিতে হয়। নতুবা শুধু শুধু কত হায়রাণ করে। আর কত পারিব ?

তোমার কাছে ত যেতে পারি না। যদি পারিতাম তবে কি—তবে কি এক মুহূর্ত্তও তোমা ছাড়া হইয়া থাকিতাম। আমি যেতে পারি না, আর তুমি—তুমি কর্ম্মক্ষয় না হইলেও আসিবে না। এত দুঃখেও আমার দুঃখপূর্ণ হয় নাই। আরও আছে ? আরও সহিতে হইবে ? বল আমি কি করিয়া সহিব ? বল আর কত দিন বা সহিব ? বল আমার দিন কি আসিবে ? এই জীবনে কি হইবে ? আর ত সময় নাই। তবে তুমি কবে আসিবে ? বল যখন আমার সব ক্ষীণ হইবে তখন আসিয়া কি হইবে ? আহা ! তাও বুঝি হয়—তুমি প্রাণের প্রাণ। তুমি আসিলে আমার আবার বল হইবে। আমার আবার সব ফুটিয়া উঠিবে ? তবে তুমি কেন এস না ? আমি এই দুরবস্থাগত হইয়া আর কত থাকিব ? আমি এই অনভিলষিত কর্ম্ম আর কত করিব ?

আমার কাছে তোমার ছবি আছে। আমি তাই দেখিয়া আর কতদিন থাকিব ? হায় ! আমি বরাবর এই উৎকণ্ঠা-স্ফুটিতচিত্ত হইয়া থাকিতে পারি না বলিয়া কি তুমি এস না ? কখন কখন বেশ আছি বলি বলিয়া কি তুমি এস না ? বেশ আছি বলি কার কাছে ? এদের কাছে যে এদের মতন হইয়া থাকিতে হয় ? কিন্তু সত্যই কি তোমায় ছাড়িয়া আমার বেশ থাকা থাকে ? আমি নিদ্রাতে বেশ থাকি, আহারের রুচিতে বেশ থাকি হাসি গল্পে বেশ থাকি—তাই কি তুমি এস না ? আমার বেশ থাকা সময়ে সময়ে আসিয়া যায় বলিয়াই তুমি এস না। হায় ! কেন আমার ভুল হয় ? কেন আমার চিত্ত সদাই উৎকণ্ঠাস্ফুটিত থাকে না ? তবে কি এই ক্ষণস্থায়ী অসাড় জগৎ আমায় আটকাইয়া রাখে ? এই জগতে এমন কি কিছু আছে যাহা আমাকে তোমায় ভুলাইয়া আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারে ? না না তা পারে না। আমি যে তোমার। আমি যে তোমার কাছেই যেতে চাই। যেতে পারিনা বলিয়াই ডাকি—তুমি এস—তুমি আমায় লইয়া যাও। কবে আসিবে ?

তোমার আসার জন্য ব্যাকুল হই সত্য কিন্তু যাহা বলিয়া দিয়াছ তাহা ব্যাকুল হইয়া করিতে প্রাণপণ করি। তুমি যেদিন আসিয়াছিলে সে দিন যখন কোলে করিয়াছিলে আর আমি মনে করিতেছিলাম কি যেন কি হারান জিনিষ বুঝি পাইতেছি, কি যেন কি ভুল হওয়া জিনিষ বুঝি ভিতরে আসিতেছে —তুমি কোলে করিয়া কি দেখাইয়া দিলে তুমি আমার পশ্চাতে ছিলে—আমাকে —আমি সম্মুখে চাহিয়া চাহিয়াছিলাম—তথাপি পশ্চাতে যেন কি দেখাইয়া—তাহাই ধারণা করিতে বলিলে, বলিলে ইহাতেই আর কেহ আমাকে মারণ উচাটন, বশীকরণাদিতে মুগ্ধ করিতে পারিবে না—আমা তাহাই করিতে প্রাণ-পণ করি। আমি তোমার আজ্ঞা পালনে প্রাণপণ করি। তুমি যে বলিয়া দিয়াছ শুধু এস এস করিলেও হয় না খাওয়ার সময় খাইবে, ঘুমাবার সময় ঘুমাইবে, বেড়াবার সময় বেড়াইবে, সব কাজের সময় সব কাজ করিবে আর বলিবে এস এস এটা ডাকা নয়। তোমার আজ্ঞাপালন, কা[redacted]. স্থির হইয়া বসিয়া, যে যথার্থ ব্যাকুল হওয়া তাই ডাকা।

নিত্যকর্ম্ম করিয়া প্রত্যহ এক এক বার আলোচনা করা চাই—কি আমি চাই ? কোন্ সঙ্কল্প আমার আছে ? কোন বাসনা আমার জাগে ? আরও বিচার করা চাই এই জগতের সকল বস্তুই যখন দুদিনে ফুরাইয়া যাইবে

তখন এই জগতে আমি চিরস্থায়ী কি পাইব? যদি এই বিশ্ব আমাকে চিরস্থায়ী কিছু দিতে না পারে তবে আমি এই জগতের কিছুই ত চাই না। যদি এখানকার কিছুই আমি না চাই তবে এই দেহের উপর আমার মমতা কেন হইবে? এই দেহটা ত অন্তরায়। সকলেরই ত এটা নষ্ট হয়। আমারও নষ্ট হইবে। এটা লইয়া আমি কি করিব?

আর এই মন? এই মনটা বড়ই চপল, বড়ই কপট, বড়ই প্রবঞ্চক। ইহার সঙ্গে আমার সঙ্গ করা একবারেই কর্ত্তব্য নহে। কতকগুলা ভোগ—কতকগুলা দুষ্কর্ম্ম আমি এই অসৎ মনের সঙ্গে পড়িয়া করিয়া ফেলিয়াছি। সেই কর্ম্ম দ্বারা আমার এই দেহ হইয়াছে। সেইগুলা মাত্র এই দেহে ভোগ হইবে: সেই ভোগ সমস্ত ভুগিয়াই এটা কুলালচক্রের মত পড়িয়া যাইবে। তবে তোমাকে স্মরণ করিয়া সেই ভোগ—তাহা সুখই হউক বা দুঃখই হউক—অকাতরে ভোগ করিয়া যাওয়া উচিত। মন্দ কর্ম্ম করিয়াছি—তাহার সাজা হওয়াই উচিত। এই সাজা খাইয়া যখন আমার ভোগ শেষ হইবে তখন আমি নির্ম্মল হইব তখন তুমি আসিবে। হউক—তাহাই হউক। আমি তোমায় ডাকিয়া ডাকিয়া তোমার নিত্যকর্ম্ম পালন করিতে প্রাণপণ করিয়া করিয়া এই দেহ অন্ত করিব। জপই জপই শ্যাম নাম ছার তনু করব বিনাশ—এই আমার জপমালা হউক।

আর এক কথা আজ তুমি মনে করিয়া দিতেছ। আমি ভাবিতেছি দেহের মৃত্যুই ত মৃত্যু। মৃত্যুভয় আমার যাইবে কিরূপে এই দেহটা পড়িয়া গেলে আমি কোথায় যাইব?

জ্ঞানীর দেহ অন্তে জ্ঞানী কোথায় যান, ভক্তের দেহ অন্তে ভক্ত কোথায় যান—এই দুইই তুমি বলিয়া দিয়াছ। আমি তাই নিত্যকর্ম্ম অন্তে আলোচনা করি।

ন তস্যপ্রাণা উৎক্রামন্তি। ইহৈব সমবলীয়ন্তে। জ্ঞানীর প্রাণের উৎক্রমণ হয় না। ঐ যে মৃত্যুকালে সাধারণ লোকের প্রথমে নাভিশ্বাস হয় পরে প্রাণ নাভী হইতে হৃদয়ে আইসে। পরে মুখ দিয়াই হউক বা অন্য দ্বার দিয়াই হউক প্রাণটা বাহির হইয়া যায়। তখন লোকে কত কষ্ট পায়—কত ভীষণ যাতনা জীবের তখন হয়। যখন কেহ মরিতেছে তখন দাঁড়াইয়া দেখিলে তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারে। আহা! মরিবার সময়, মরিবার বহু পূর্ব্বে

হইতে মানুষের লজ্জা-সরম থাকে না—যে জীবনে কখন অসাবধান হয় নাই তাহার অঙ্গের কাপড় আর থাকে না। যতক্ষণ সামর্থ থাকে কাপড় টানিয়া দিলেও কাপড় অঙ্গে রাখিতে পারে না। শত বৃশ্চিক যেন তাহাকে দংশন করে। জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে সে এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। বিছানা যেন তাহার কাছে কণ্টকশয্যা হয়। কি যে যাতনা হয় তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারে না। নিঃশব্দে রোদন করে। বড় অসহায় হইয়া কি যেন কি জানাইতে চায়। জানাইতে না পারিয়া কাঁদে। চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে। কত যাতনা তখন হয়। সাধারণ লোকের মৃত্যুযাতনা বড় হৃদয়বিদারক। সব যাতনাগুলি ভোগ না হইলে প্রাণ কিছুতেই দেহ ছাড়ে না।

জ্ঞানীর কিন্তু মৃত্যু যাতনা হয় না। তাঁহার প্রাণের উৎক্রমণ নাই। এই খানেই জ্ঞানীর প্রাণ সেই মহাপ্রণে বিলীন হইয়া যায়।

জ্ঞানী চিরদিন বিচার করেন দেহটা জড়। এটা সর্ব্বব্যাপী চেতনের এক-দেশে—আকাশের একদেশে যেন ঘটভাসে সেইরূপে ভাসে মাত্র। এই দেহের ভিতরে বাহিরে চেতন থাকেন। চেতন আকাশের মত—আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম। চেতন, আকাশকেও ওতপ্রোত ভাবে বেষ্টন করিয়া আছেন। কিন্তু ইনি আকাশের মত জড় নহেন। ইনি সর্ব্বানভূ। ইনি সমস্ত অনুভব করেন। এই চেতন, দেহ ব্যাপিয়া থাকেন বলিয়া আমরা দেহটাকে চেতন বলি। দেহটার জাগ্রত অবস্থায় যেখানে এটাকে স্পর্শ করা যায় সেই খানেই ইহার অস্তিত্ব অনুভব হয়। সেইরূপ সকল পদার্থকেই—একটা প্রস্তরকেও—চেতন পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। জড় প্রস্তরকে স্পর্শ করিলে আমি একটা কিছু অনুভব করি কিন্তু প্রস্তরটা আমার স্পর্শ অনুভব করে কি না তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি যদি আমার ভিতরের বাহিরের চৈতন্যকে সর্ব্বব্যাপী দেখিতে পারিতাম—যদি ইহাই জড়ের মধ্যেও আছে ইহা অনুভব করিতাম তবে জড়ের চৈতন্য কি অনুভব করিতেছে না করিতেছে তাহা বুঝিতাম। কিন্তু আমার চৈতন্য কেবল এই দেটিতে মাত্র অহং অভিমান করে। কিন্তু তুমি সকল বস্তুতে অহং অভিমান কর কি না তাহা আমি জানি না, তুমি তাহা জান। তুমি সর্ব্বত্রই আছ ইহা আমি জানি। কিন্তু সর্ব্বত্র ভাস কি না—সর্ব্বত্র অহং অভিমান কর কি না তাহা আমি জানি না। আমি তোমা হইতে পরিচ্ছিন্ন হইয়াই—অখণ্ড হইতে শুধু দেহব্যাপী খণ্ড চৈতন্য হইয়াই ভ্রমে পড়ি, সেই

জন্য তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব বুঝিতে পারি না। ঘটের মধ্যবর্ত্তী আকাশ যদি আপনার ঘটত্ব—খণ্ডত্ব—পরিচ্ছিন্নত্ব ছাড়িয়া নিরন্তর ভিতরে বাহিরে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত মহাকাশকে দেখে—সর্ব্বদা আপন পূর্ণস্বরূপকে দেখে তখন সে যেমন আপনার ঘটভাব ভুলিয়া আপন পূর্ণ মহাকাশ স্বরূপেই স্থিতিলাভ করে জ্ঞানীও সেইরূপ এই দেহব্যাপী চৈতন্যকে—দেহের ভিতরে বাহিরে ওতপ্রোত ভাবে যে চেতন আছেন—খণ্ডচৈতন্যকে ইহার দেহ উপাধি ভুলাইয়া অখণ্ড ভাবেই দেখেন। কাজেই দেহটা থাকিতে থাকিতেও ত অনেক বার তিনি দেহ ভুলিয়া চৈতন্যরূপে সমাধি লাভ করেন। তাঁহার কোন বস্তুতে আসক্তি নাই বলিয়া—দেহেতেও নাই, মনেতেও নাই বলিয়া, তাঁহার কোন সঙ্কল্প নাই বলিয়া তিনি ভোগক্ষয়ে যখন দেহটা পড়িয়া যায় তখন এই খানেই সেই পূর্ণে মিলিয়া পূর্ণ হইয়াই থাকেন। জ্ঞানীর পূর্ণরূপে স্থিতি এইরূপ। কিন্তু জ্ঞানীর না জানি কত ভাগ্য? এ ভাগ্য কি সকলের আছে? তুমিই ত বলিয়াছ—

বহূনাং জন্মজন্মান্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥

অনেক জন্মের পরে—শেষ জন্মে জ্ঞানবান্ বাসুদেবই সমস্ত ইহা অনুভব করেন। যিনি এইরূপে আমার ভজনা করেন এরূপ মহাত্মা সুদুর্ল্লভ। আমার ভাগ্যে কি এই জ্ঞান লাভ হইবে?

এখন ভক্তের মৃত্যুকালে কি হইবে সেই বিষয় আলোচনাও করি।

তুমি বলিয়াছ—"তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ"। তুমি তোমার ভক্তকে মৃত্যু সংসার সাগর পার করিয়া দাও। ভক্ত সমস্তই সহ্য করিতে শিক্ষা করেন। তোমার নাম করিয়া করিয়া সবই সওয়া যায় বলিয়া তিনি এতদূর তিতিক্ষু হয়েন যে দেহে যাহা কিছু হউক তিনি তোমার ভাবে থাকেন বলিয়া দেহের কোন কিছুতেই কাতর হয়েন না। মৃত্যুকালে প্রাণের উৎক্রমণেও তাঁহার সুখ হয়। ভক্ত বলেন—

মাতঃ শাম্ভবি! শম্ভুসঙ্গ মিলিতে মৌলৌ নিধায়াঞ্জলিং
তত্তীরে বপুষোঽবসান সময়ে নারায়ণাঙ্ঘ্রিদ্বয়ম্।
সানন্দং স্মরতো ভবিষ্যতি মম প্রাণ প্রয়াণোৎসবে
ভূয়াৎ ভক্তিরবিচ্যুতা হরিহরা দ্বৈতাত্মিকা শাশ্বতি॥

ভক্ত প্রার্থনা করেন প্রাণপ্রয়াণটাই যেন তাঁর উৎসব হয়। উৎসব কেন?

তোমার কাছে যাইব, তোমায় দেখিব, তোমায় সেবিব, তোমায় ভজিব, ইহা অপেক্ষা আর আমার অধিক আনন্দ আর কিসে হইবে? দেহেরবালুকাস্তূপ সরিয়া গেলেই ত ক্ষুদ্র নদী স্বরূপ আমি, আমি শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রের চক্রতীর্থের মত বিশাল সমুদ্রে মিলিব। ইহাই আমার জীবনের সার্থকতা। তোমার কাছে যাইব ইহাই জীবন ধরিয়া সাধিয়াছি। সেইজন্যই-ত উৎকণ্ঠাস্ফুটিত চিত্তে তোমায় ডাকিয়াছি। যখন তুমি আমাকে মৃত্যুসংসার সাগর পার করিতে আসিবে তখন আমার সুখ হইবে না? তখন আমার উৎসব হইবে না ত কখন হইবে? কতকালের পর, কত দুঃখের পর তোমায় পাইব ইহা অপেক্ষা আর আমার আনন্দ কিসে হইবে?

ভক্ত তাই মৃত্যুকালে পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগকে ডাকিয়া বলেন :—

আমি চল্লাম রে ভাই আনন্দ কাননে।
সংসারের লোকে যারে শ্মশান ব'লে ভয় পায় মনে।

* * * * * * * *

অন্তিম সময় দেখে তোরা মুখে বল্‌ছিস হরি বোল
আমিত ভাই স্থির নেত্রে দেখ্‌চি শ্যামা মায়ের কোল
মা আমার ব্যাকুল হয়ে দুটি বাহু পসারিয়ে
ডাক্‌চেন আমায় কোলে আয় বাপ্‌
ভয় কি দুরন্ত শমনে। ইত্যাদি।

মৃত্যুকালে তুমি কিরূপে ভক্তকে সংসার সাগর পার কর তাও তুমি বলিয়াছ। শ্রুতি ত তুমিই। তুমিই বলিতেছ—

সেতুং স্তর দুস্তরান্।

* * * * *

এষা গতিঃ। এতদমৃতম্।
স্বর্গচ্ছ। জ্যোতির্গচ্ছ। সেতুং তীর্ত্ত্বা চতুরা।

মৃত্যুকালে তুমি তোমার মনোমোহন বেশে আসিয়া জীব চৈতন্যকে শক্তি দাও, দিয়া বলিয়া দাও—যাও এই দুস্তর সেতু সকল পার হইয়া যাও। এই গতি। অমরত্ব। স্বর্গে যাও। জ্যোতির দেশে যাও। চারি সেতু পার হইয়া যাও।

আর কি বলিব? একটা কথা শেষে জিজ্ঞাসা করি। ইহা বলিয়াই ইতি করিব।

জ্ঞানীর ত প্রাণপ্রয়াণ নাই। জ্ঞানী ত এই খানেই তোমাতেই বিলীন হয়েন কিন্তু ভক্তকে তুমি কোথায় যাইতে বল? স্বর্গদেশ জ্যোতির দেশ—সে কেমন দেশ! যে মধুময় অমৃতময়, তেজোময় দেশ, হইতে আমি তোমার কথার অবাধ্য হইয়া, তোমার উপদেশ না শুনিয়া মহামোহের দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া, এই মর জগতে আসিয়া পড়িয়াছি; আসিয়া সব ভুলিয়া গিয়াছি যে দেশের কথা কল্পনা করিয়াও আমি যেন কেমন হইয়া যাই; যে দেশে আমি তোমার সঙ্গে ছিলাম তোমার সেই দেশ কেমন? তুমি পৃথিবীতে আসিবার সময় যখন মায়া মানুষ হও, ত্রিজগতে পাপ হরা কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যখন আদ্য ব্রহ্মপদে স্থিতি লাভ কর, আর আপন স্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও যখন সেই চন্দ্রকলাসম নাদের উপরে জ্যোতির বিন্দু মধ্যে—সেই মনোহর দেশে অপূর্ব্ব বেশে, মনোভিরাম, নয়নাভিরাম, বচোভিরাম কি জানি কি মূর্ত্তিতে খেলা কর সেই দেশ কেমন? সেই দেশে কি আমাকে এই ভোগায়তন তনু অন্তে লইয়া যাইবে? আবার কি আমি সেই দেশে তোমার কাছে থাকিতে পাইব? আর আমি কখন তোমার ইঙ্গিত পর্য্যন্ত অমান্য করিব না। আর আমি কখন কৌতুহলাক্রান্ত হইব না। আর আমি কখন সেই দেশের প্রাকার, পরীখা পার হইয়া আসিব না। আমি অনন্ত অনন্ত কাল ধরিয়া সেই দেশে তোমার কাজে, তোমার কাছে—তোমার সেবা, তোমার ধ্যান, তোমার মুখ হইতে তোমার আমার আত্মবিচার লইয়া থাকিব।

এখন একবার দেখাইয়া দাও না—হউক কল্পনা তাতেও ক্ষতি নাই। খুব দৃঢ় কল্পনা দ্বারা বেশ করিয়া সেই রাজ্যটি একবার দেখাইয়া দাও।

আচ্ছা। অতি সংক্ষেপে আভাস দেওয়া মাত্র হয়।

আকাশের মধ্যে সূর্য্য যেমন একটি বিন্দু সেই রকম ভ্রূমধ্যের পশ্চাৎ ভাগে কোন এক মণ্ডল মধ্যে কোটি সূর্য্য মত তেজ অথচ কোটি চন্দ্র সুশীতল এক বিন্দু পারে সেই সুশীতল চৈতন্যদীপ্ত সেই দেশ। কত বড় সেই রাজ্য কে বলিবে। যে যত সৌন্দর্য্য ধারণা করিতে পারে তদপেক্ষাও সেই স্থান সুন্দর। সে স্থান এক বিস্তৃত পঞ্চবটী। চারিধারে রূপবাটিকা, রসবাটিকা, গন্ধবাটিকা, স্পর্শ বাটিকা। সেই সমস্ত পুষ্পবাটিকা বেষ্টিত স্থানের চারিকোণে শৃঙ্গার মণ্ডপ

মুক্তি মণ্ডপ, জ্ঞান মণ্ডপ ও একান্ত মণ্ডপ। মধ্য স্থানে শব্দবাটিকা। সঙ্গীত মাতৃকার নখমুখ মুখরিত তানলয় শুদ্ধ বেদ ঝঙ্কার মধ্যে মধ্যমণ্ডপ। সেই মণ্ডপ মধ্যে যাহারে খুঁজিতেছ তিনি—তিনি মাতৃভাবে সেই স্থানে লইয়া যান। গিয়া আপন স্বরূপ দেখান। সেই পরম শান্ত স্থানের কথা স্মরণেও প্রাণ পুলকিত—মন স্বচ্ছন্দ—হয়। সেখানে যারে দেখি তারে অনন্ত অনন্ত কাল ধরিয়া দেখা হউক তাতেও বিরক্তি নাই। যারে দেখা যায় আর যে দেখে উভয়েই সেখানে চির নবীন কিশোর, নবীন কিশোরী মূর্ত্তি। অধিক আর কি বলা যাইবে সেখানে একান্তে থাকাও যত সুখ আবার তার সঙ্গ করাতেও তত সুখ। যখন ইচ্ছা একান্তে থাক—যখন ইচ্ছা তারে স্মরণ কর। যে মূর্ত্তি দেখিতে চাও সেই মূর্ত্তি ধরিয়াই সে আইসে। যাহা জানিতে চাও তৎক্ষণাৎ সে জানাইয়া দেয়, দেখাইয়া দেয়, অনুভব করাইয়া দেয়। সেখানে গেলেই সত্যসঙ্কল্প হওয়া হইয়া যায়। ক্ষণে ক্ষণে নূতন আনন্দের প্রবাহে সেখানে কি যেন কিসে সে ডুবাইয়া রাখে। আয়াস বলিয়া কোন কিছু সেখানে নাই। অজ্ঞান বলিয়া কোন কিছু সেখানে নাই। অনভিলষিত কর্ম্ম বলিয়া সেখানে কিছু নাই। অধিক আর বলিয়া কি হইবে। কল্পনার ধারণাভ্যাসে ভক্ত সেই স্থানে নিত্য যাইতে যাইতে সত্য সত্যই সেই স্থান প্রাপ্ত হয়। হইয়া তাঁহার সহিত নিজের সম্বন্ধ দেখিয়া স্থিতি লাভ করে। ইতি—

পরিবর্ত্তন।

সুজাতা বড় মানুষের মেয়ে। শ্বশুর বাড়ীর কিছুই তাহার মনে ধরে না। বড় কটুভাষিণী; বড়ই কলহপ্রিয়া। সর্ব্বদা ধনগর্ব্বে ও রূপগর্ব্বে ধরাকে সরা জ্ঞান করে।

বুদ্ধদেব একদিন সুজাতার শ্বশুরবাড়ীতে ভিক্ষা করিবেন। গিয়াই ভয়ানক কোলাহল শুনিলেন। কারণ জিজ্ঞাসিয়া জানিলেন বধুর জন্য সংসারে সর্ব্বদা অশান্তি। বুদ্ধদেব সুজাতাকে ডাকিলেন। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন.

সুজাতা—স্ত্রীলোক সাত প্রকার।

১। কেহ ভীমা উগ্রচণ্ডী
২। কেহ কুটীলা কলহ-প্রিয়া
৩। কেহ প্রিয়ম্বদা
৪। কেহ সুশীলা
৫। কেহ সুগৃহিনী
৬। কেহ প্রিয়সখী
৭। কেহ সেবিকা।

এই সাত প্রকারের স্ত্রীলোকের মধ্যে তুমি কোন্ প্রকারের ?

সুজাতা। প্রভু! আপনার প্রশ্ন আমি বুঝিতেছি না। ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলুন।

বুদ্ধ—অসতী স্ত্রী চপলস্বভাবা ; তিনি স্বামীকে ভালবাসেন না। সর্ব্বদা ক্রোধন স্বভাবা ; সর্ব্বদা নিজের সুখের জন্য ব্যগ্র, ইহাদের লজ্জা নাই ; ইহারা কাহকেও ভয় করে না ; ইহারা লোকনিন্দা গ্রাহ্য করে না ; ইহারা মিথ্যা কথা কহিতে ভয় করে না। আর যাঁহারা সতী তাঁহারা প্রিয়বাক্য বলেন, আহ্নিক পূজা করেন, চরিত্র ইহাদের নম্র, কাহাকেও অপমান করিতে পারে না ; স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণ করেন ; নিজে ক্লেশ করিয়া গুরুজনের তৃপ্তি সাধন করেন। ইঁহাদের মধ্যেও আবার প্রকারভেদ আছে। তুমি কোনরূপ স্ত্রী ?

সুজাতা বুদ্ধদেবের কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল ; বলিল আমি কুলটা, কলহকারিণী, অসতী হইতে ইচ্ছা করি না। আমি সতী হইতেই ইচ্ছা করি। প্রভু! এই মুহূর্ত্ত হইতে আমি ভাল হইব।

সুজাতার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। বুদ্ধদেবের এই উপদেশ পড়িয়া কোন কোন সুজাতার স্বভাব কি এখনও পরিবর্ত্তন হইতে পারে ? করিয়া দেখিলে মন্দ হয় কি ?

কোথাও বধূ মন্দ আবার কোথাও শাশুড়ী প্রলয়ঙ্করী। বুদ্ধদেবের উপদেশে কি ইহাদের চরিত্র ফিরে ? পরিবর্ত্তনের সংবাদ পাইলে বড়ই আনন্দ হইবে।

তোমার দেখা।

তোমার দেখা কি মানুষের নিতান্তই মিলে না ? না—একথাটা ঠিক নয়। মিলে। কত ভাবেই মিলে। কখন নৃশংস ভাবে—কখন অনৃশংস-

ভাবে। মিলে—কখন ঘোরা মূর্ত্তিতে, কখঁন অঘোরামূর্ত্তিতে। কে বলে মিলে না?

মানুষ তোমায় দেখে—কিন্তু দেখেও দেখে না। যখন দেখে ঠিক সেই সময়ে কিছুই বুঝিতে পারে না। অবাক্ হইয়া দেখে। দেখিয়া যা দেখে তা যে তুমি একথা স্মরণ করিতে ভুলিয়া যায়। তোমায় দেখে—দেখিয়া দেখিয়া আবার দেখিতে চায়—দেখিতে বড় ভাল লাগে তাই প্রাণ ভরিয়া দেখে। কি দেখিতেছে, কারে দেখিতেছে তখন সে ভাবনা থাকে না।

তারপর যখন তুমি চলিয়া যাও—যখন আর তোমার দেখে না—তখন লোককে জিজ্ঞাসা করে—বল না তোমরা কি তারে দেখিয়াছ? সেই যে আমি যারে দেখিলাম। বল না সে কে? যদি কোন ভক্ত সঙ্গে থাকেন তিনি বলিয়া দেন—এমন মানুষ ত কখন দেখি নাই। তবে সাধুদের মুখে শুনিয়াছি এই সব পুণ্যস্থানে তারে কেহ কেহ দেখে।

মনে সন্দেহ আইসে। আমায় সে কেন দেখা দিবে? আমি কি তেমন কিছু করিয়াছি যাতে তার দেখা পাওয়া যায়? না না বোধ হয় আর কেহ হইবে। কিন্তু কি সুন্দর রূপ তার? কি সুন্দর ভঙ্গী?

আচ্ছা—এই ত দেখিলাম। সে কোথায় গেল? সে বুঝি কোন বড় বংশের কেহ হইবে।

সঙ্গের লোক বলে—বড়বংশে কেহ যদি হইত তবে তার সঙ্গে লোকজন থাকিত। এর সঙ্গে ত আর কেহ ছিল না। বিশেষ আমরা ত তখুনি তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিলাম। কতকদূর গিয়াই আর ত কিছুই দেখিলাম না।

তারে মানুষ বলিয়া যে সন্দেহ হইয়াছিল সে সন্দেহ তখন থাকে না।

সেই; আসিয়াছিল! হায়! তারে ত চিনিলাম না। হায়! পূজার ত সব দ্রব্যই সেখানে ছিল। সরযূ তীর। স্নানও করিয়াছিলাম। পূজার ফুলও ছিল। সে মানুষ হইয়া আসিয়াছিল। সেও কাছে বসিয়া আবার কারে যেন পূজা করিতেছিল। জানিলেও সবার সাক্ষাতে আমি ত তারে পূজা করিতে পারিতাম না। না হউক—সে কাছেই বসিয়াছিল। উদ্দেশে কেন পূজা করিলাম না?

দেখিয়া ত আসিলাম! তখন কিন্তু কিছুই ভাবিতে পারি নাই। আবার কোন্ শুভ মুহূর্ত্ত আসিল। আবার সেই রূপ, সেই ভঙ্গী, সেই স্নান প্রাণে জাগিল। তখন মনে হইল একটু কিছু লিখিয়া রাখি। লেখা হইল:—

১

তুমি কি এসেছিলে আপন মনে ?
আরতি করে যারে ত্রিভুবনে।
চন্দনচর্চ্চিত ফুল ত কাছে ছিল
সরযূ নেচে নেচে নিকটে ধেয়ে এল
চরণে মঞ্জীর পড়িল নয়নে
হলো না তবু পূজা কি জানি সরমে।
কি জান কি হ'য়ে গেল—কি জানি কি ভুল হল
(পরে) পরাণ লুটাইল চরণে
তুমি কি এসেছিলে আপন মনে ?

২

সে ত আজ কত দিন গিয়াছে চলিয়া
এখনও চ'খে কেন রয়েচে মিশিয়া
সে ছবি মনোহর ব্রহ্মদ্বারও পর
তখন চিনিনি কেন আপনা ভুলিয়া
এখন বলি বা কেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া
সেই ত এসেছিল সরযূ-সিনানে
আরতি করে যারে এ তিনভুবনে।

৩

যার তরে ফুটে ফুল গগনে রবি তারা,
তাপস অবিরাম ডাকিয়া হয় সারা,
ছাইয়া নীলনভ দাঁড়ায়ে যেইজন,
ভরিয়া সব হৃদি রয়েছে সেইজন,
কপালে দীপক মোহনমূরতি
পঞ্চপ্রাণ করে মঙ্গল আরতি।
চরণে প্রাণ যদি মিশিয়া রহিল
চল চল আর বার সেখানে লয়ে চল।
মনে মনে সব জনে পরণাম স্মরণে
সেই ত এসে ছিল মঞ্জীর চরণে।

১৩১৫ সালের ১৪ই ফাল্গুন শুক্রবারে এই লেখা। আজ ১৩২০ সালের ১৬ই ফাল্গুন শনিবার। আজ সেই ভাব আবার আসিল। সেই রূপ আবার মনে পড়িল।

আরও আশ্চর্য্য। একখানি ছবি মিলিয়াছিল। সেই ছবিতে তোমার ছবি আঁকা। অন্ততঃ সেই মঞ্জীরচরণ—যে চরণ আমার প্রয়োজন। ভাবিবার সময় চক্ষু যেন পুনঃ পুনঃ এই আঁকা চরণে সেই চরণ মিলাইতে চায়; সাদৃশ্য না থাকিলে একের সহিত আরকে মিশান যায় কিরূপে?

তাই ত মনে হয়—যে আসিয়াছিল যারে দেখিয়াছিলাম সে তুমি। হয় ত এ কথা ভাবিতে পারিতাম না। হয় ত আর কখন সেই তুমি এ কথা স্মরণ থাকিত না। কত স্থানে কত সুন্দর ত দেখিয়াছি। সব সুন্দর কি মনে আছে? তবে এক চকিতের দেখা এত মনে থাকে কিরূপে? সরযূতীরে এক ক্ষণের জন্য দেখা সে দেখা বুঝি ভুলিয়া যাইতাম—যদি সাধু সেই খানে ঐ কথা বলিয়া না দিতেন। সাধুসঙ্গ না হইলে কি তোমায় চিনা যায়?

কিন্তু তুমি যখন দেখা দিতে মনে কর তখন অন্য কারও বলা বুঝি দরকার হয় না। সেই যে লছমন ঝোলায়—আবার বড় অস্পষ্টভাবে দেখা দিয়াছিলে—আবার তোমার ডাকাও শুনিয়াছিলাম। তাও ত বড় ক্ষণস্থায়ী। তথাপি ত ভুলা গেল না। আর সেই বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরে আর যাব না কিছুতেই কেহ লইয়া যাইতে পারিল না—ভাবিলাম আর কখন বৃন্দাবনেও আসিব না। তারপর মন্দিরে প্রবেশ না করিয়া, গোবিন্দজী না দেখিয়া যখন গোবিন্দজীর মন্দিরের এক ধার দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে—সেই মাঠ—সঙ্গে লোকও ত ছিল—তুমি সেই সবার সাক্ষাতে আসিলে—কোলে উঠিবার জন্য কতই করিলে। তখন ত কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু তার পরেই কেন মনে হইল আর বৃন্দাবন ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। সেও ত কতদিন হইয়া গেল। কিন্তু সে দেখাও ত ভুল হইল না। তবে সে দেখার ভাবটি মনে আছে—তোমার সুন্দর রূপ মনে আছে। কিন্তু তোমার মুখ ত কিছুই মনে নাই।

আর অন্য স্থানের দেখায় বেশ স্পষ্ট মুখ মনে নাই। তবে যাহা আমার আবশ্যক সেই মঞ্জীর পরা চরণ কমল মনে আছে। ইহাতেই আমার হইবে। তবে কেন না বলিব তোমায় দেখা পাই নাই?

বোধ ১৩০৮ হয় সালে কুম্ভ মেলার সময় ফাল্গুন মাসে ইহা হয়—আবার ১২ বৎসর হইয়া গেল। আবার সেই সময় আসিল। আবার হরিদ্বারে কুম্ভ হইতে চলিল। এই এক যুগে কত কি হইয়া গেল। তুমি কিন্তু চকিতে আসিয়াছিলে। ভুল ত হইল না।

এখন আবার কত যুক্তি মিলিল। এখন মনে হয় সেই সেই। এ কথার কোন ভুল নাই। কেন নাই? তাই বলিতেছি।

এ কথা ধ্রুব সত্য বলিয়া মনে হয় যে তুমিই আছ। আর জগতটা যে দেখা যাইতেছে এটা তুমিই ঐরূপে দাঁড়াইয়া আছ। রজ্জুটিই আছে। রজ্জুটিই সর্পরূপে ভাসিয়াছে। বাস্তবিক সর্প নাই। রজ্জুই সর্পরূপে দেখা যাইতেছে। বাস্তবিক জগৎ নাই। তুমিই জগৎরূপে ভাসিয়াছ। সুষুপ্তি যেমন স্বপ্নরূপে ভাসে সেইরূপ তুমিই সৃষ্টিরূপে ভাসিয়াছ। এ কথা শাস্ত্রই বলেন। শাস্ত্র বলেন সুষুপ্তং স্বপ্নবৎ ভাতি ভাতি ব্রহ্মৈব সর্গবৎ। কথা কিন্তু ধ্রুব সত্য।

আবার তোমার সরযূতীরে মূর্ত্তি ধরিয়া আসাও সত্য। তুমি অখণ্ড থাকিয়াও খণ্ডমূর্ত্তিতে ভাস। শাস্ত্রও তাই বলেন। বলেন ভক্তচিন্তানুসারেণ জায়তে ভগবান্ অজঃ।

আমি ভক্ত কি না আমি জানিতে পারি নাই। এত দোষ করিয়াও ভক্ত কিরূপে হওয়া যায় তা আমি বুঝিতে পারি না। তবু মনে হয় যা কিছু অপরাধ হইয়া গিয়াছে তাহা অপরাধ করিব বলিয়া হয় নাই। তোমাকে পাইব কিরূপে তাহা বুঝিতে গিয়া হইয়াছে। এখন মনে হয় তুমিই সর্ব্বপ্রকারে খেলা করিয়াছ।

এ কথাও মিথ্যা নয়। একবারেই নয়। এখন ভাবি যা দেখি তাই ত সেই। সেই ত আছে। মূর্ত্তিটি যাহা দেখি তাহা রজ্জুতে সর্পের মত তাহাতেই ত ভাসে মাত্র।

অখণ্ডকে ভাবা যায় না। যায় না বলাও ঠিক নহে। কারণ যোগী যখন সমাধি করেন তখন ত অখণ্ডেই স্থিতি লাভ করেন। এটাও কখন কখন উপলব্ধি করাইয়াছ। কিন্তু এটা আয়ত্ত করা আমার বুঝি হইল না। সে অবসর ত দিতেছ না। তবু কিন্তু আশা যায় নাই। যদি সে সংযোগ করিয়া দাও—দিয়া ঐরূপ করাইয়া দাও তাহা হইলে উহাইত আর ভার কি? কিন্তু অখণ্ড যখন অখণ্ডরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও খণ্ডমূর্ত্তিতে উদয় হয় তাই যেন আমার

বড় সুখের। আমি মূর্ত্তি ধরিয়াই অখণ্ডে যাইতে চাই। আবার মূর্ত্তির সঙ্গে খেলা করিতে চাই। কখন অখণ্ডে স্থিতি, কখন মূর্ত্তির সহিত খেলা—আবার সর্ব্ব মূর্ত্তিতে সেই অখণ্ডের বহুরূপে খেলা এই আমার বেশ লাগে শাস্ত্র যে বলেন যৎস্বপ্ন জাগর সুষুপ্তমবৈতি নিত্যং -এই আমার বেশ লাগে।

তোমার মূর্ত্তি ধরিয়া গায়ত্রী মন্ত্র মিলাইয়া লওয়ায় বড় সুখ। মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলা তুমিই ভূর্ভুর্বস্বঃ। তুমিই তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য। এই তুমি—তোমার ধ্যান বড়ই সুন্দর। আবার সব মূর্ত্তিই তোমার মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি ইন্দ্রজাল সত্য। কিন্তু তোমাতে ভাসে বলিয়া মৃষা হইয়াও অমৃষা। তেজোবারি মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা। বড় সত্য ইহা। তুমি কিন্তু ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি। এইটি কবে হইবে? কবে এই দেহটাকেও মনে হইবে এটা তোমারই মূর্ত্তি। তোমাই উপর এটা ভাসিয়াছে তুমিই এইরূপে খেলা করিতেছ?

নিত্যকর্ম্ম করিয়া—ভক্তিযোগে পূর্ব্বরাগাদি ভাবনা পরে তুমি আছ আর কিছু নাই এই ক্রম অনুসারে যোগ ভক্তি ও জ্ঞান মিশ্র সাধনই আমার ভাল লাগে। এই ভাবে তোমায় লইয়া থাকা—ইহাই আমার দুঃখনিবৃত্তি। ইহাতেই জীবের দুঃখনিবৃত্তি। যে যতটুকু পারে তার ততটুকু হয়।

বন্দনা।

তুমি প্রভু! তুমি নাথ! হে গুরো! হে তাত!
মাতা! ভ্রাতা! সুত! প্রিয়! বিশ্ববিধাতঃ!
নিখিল জনরঞ্জন, চিরমনোহারি!
ভবতাপ নিবারণ বাঞ্ছাপূর্ণকারি।
অরূপ, অগুণ, রিপুদলন ভয়াল;
অগনিত রূপ গুণ অমিত দয়াল।
পাপ কলুষ দাহন তিমির বিনাশি
আনগো পুণ্যকিরণ দীপ্ত উষা হাসি।

আন মধু-সমীরণ সুমঙ্গল বাত,
প্রস্ফুট করহে সখে! প্রেমপারিজাত।
যা আছে রিক্ত হে নাথ! যাহা আছে শূন্য,
বিশ্বজীবন প্রভু, সকল কর পূর্ণ।
চিত্ত চমৎকৃত দাসী কৃতার্থ তোমারি,
মানসনন্দনে লহ বন্দন হামারি।

মৃ ৺কাশীধাম।

আর সময় নাই।

মনে নানা চিন্তা উঠে বলিয়া ভগবানকে ডাকিতে পার না এই ত তোমার আপত্তি? উপায় বলিয়া দিতেছি—যাহাতে বহু চিন্তা উঠা নিবারণ করিয়া তুমি নাম জপ করিতে পারিবে।

ধনবান্ এক বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। শেষ সময় উপস্থিত। বিষয়-সম্পত্তির কোন বন্দোবস্ত হইল না। সকলে আসিয়া বলিতে লাগিল আপনার সম্পত্তির কি বন্দোবস্ত করিবেন—এই আপনার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলেই দাঁড়াইয়া আছে।

বৃদ্ধের তখনও বেশ সংজ্ঞা আছে। বৃদ্ধ কাতর হইয়া বলিতেছে "আর সময় নাই।" এখন আমায় হরিনাম করিতে দাও। যাহা হয় হউক।

"আর সময় নাই" এইটিই মনস্থিরের উপায়। যখন জপ করিতে বসিলে চিন্তা আইসে তখনই বল "আর সময় নাই" নাম কর। মন তখন অন্য চিন্তা ছাড়িয়া জপ করিতে পারিবে। মন যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত বৃদ্ধের মত কাতর হইবে আর বলিবে—আর ভাবিবার ত সময় নাই যা হয় হউক—এস এস নাম কর, নাম না করিয়া মরিলে যে আবার এই যাতনা আসিবে, ইহা অপেক্ষা আরও ক্লেশের অবস্থায় পড়িতে হইবে, হরি হরি! আর যে আমার গতি নাই—আর যে আমায় রক্ষা করিতে কেহ পারিবে না—তোমার নামই যে আমাকে পরিত্রাণ করিবে, আমি যে শাস্ত্রমুখে নামমাহাত্ম্য শুনিয়া ইহা বিশ্বাস করিয়াছি, আমি যে গুরুমুখে নামের প্রতাপ শুনিয়া দৃঢ় ধারণা করিয়াছি, নামই আমার মত অধিকারীর, আমার মত পতিতের, আমার মত

পাপীর, আমার মত ভ্রষ্টের একমাত্র সম্বল—এই যে ভগবান্ বলিতেছেন যাহারা আমার নাম করে "তেষাং মৃত্যুভয়াদিনী ন ভবন্তি কদাচন।"

আমি যে বিশ্বাস করিয়াছি—নামেই আমার হইবে, আমি যে বেশ বুঝিয়াছি নাম ভিন্ন আর আমার কোন কঠিন তপস্যা করিবার সামর্থ্য নাই—এস এস নাম কর—আর সময় নাই—অপর কি আর ভাবিবে—ভাবিয়া কে কবে কি করিতে পারিয়াছে? এত দুর্ব্বল-বিশ্বাস কেন? তাঁহার নাম কর অবিশ্রামে কর অজস্র কর তিনিই সমস্ত তোমার করিয়া দিবেন খাওয়া পরার ভারও তিনিই লইয়াছেন—কোন ভয় রাখিও না কোন ভাবনা রাখিও না—এতদিন তাঁরে ডাক নাই তবু তিনি খাইতে দিয়াছেন—আর এখন ত ডাকিবে তিনি অবশ্যই খাইতে দিবেন তিনিই বলেন তিনিই যোগক্ষেম বহন করেন—যোগক্ষেমং বহাম্যহম্—তাঁহার নিজেরই কথা।

"সময় নাই" বল—যখনই মন অন্য কথা তুলিবে। সময় নাই বলিয়া মনকে কাতর করিয়া নাম জপ কর—কিছুদিন অভ্যাস কর—সর্ব্বদা নাম কর—অনেক বৃথা ভাবনা হইতে রক্ষা পাইবে অনেক অসম্বন্ধ প্রলাপ হইতে মুক্ত হইবে—এ সব বৃথা কাজ—নাম জপ করা অভ্যাস করিয়া লও—পরে সর্ব্বদা নাম জপ করিয়াও হাতে পায়ে কার্য্য করিতে পারিবে। হাতে পায়ে কার্য্য করিবে মন কিন্তু সর্ব্বদা নামরূপা নামীর সেবায় ব্যস্ত থাকিবে। নাম জপ কর কত অদ্ভুত দেখিবে কি অপূর্ব্ব হইয়া যাইবে।

আশ্বাস।

এখনও সময় আছে। হতাশ হইও না। যাহা ধরিয়াছ তাহা ছাড়িও না। মনটা তোমার। তোমার চিন্তার উপর কাহারও অধিকার নাই। তুমি পাইবে দৃঢ় ভাবনায়। দৃঢ় ভাবনা করিতে পারিলেই স্থূলেও পাইবে। যত অত্যাচার হউক যত অসুবিধা হউক—দৃঢ় ভাবনা করা তোমার আয়ত্বে।

কিন্তু মতলব বদলাই না। উদ্দেশ্য অন্যরূপ করিও না। যেটি হইলে তোমার হইবে ঠিক করিয়াছ সেইটিই দৃঢ় ভাবনা কর। অন্যের কাছে সুন্দর কিছু শুনিয়া যাহার জন্য সাধনা করিতেছিলে তাহা উল্টাইওনা।

যাহা একবার ঠিক কর—আর তাহা পাইবার জন্য যখন সাধনা কর—যখন

দৃঢ় ভাবনা কর—তখন তোমার কার্য্যের জন্য শ্রীভগবানকেই নিযুক্ত কর—ইহা স্থির জানিও। তিনি তোমাকে ধীরে ধীরে তোমার গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইতে থাকেন আগে আগে পথ দেখাইয়া চলেন। তুমি কতক দূর চলিয়া—কতক অভ্যাস করিয়া যদি বল—ঐ দিকটা বেশ, ঐ পথে যাওয়া যাউক, এ পথে কৈ কিছু পাইলাম্ না—এই সমস্ত ভাবিয়া যদি মতলব বদলাও, যদি এক ছাড়িয়া অন্য ধর, তবে তুমি কি করিলে একবার ভাবিয়া দেখ—তোমার যে কার্য্য নিষ্পত্তি জন্য শ্রীভবানকে নিযুক্ত করিয়াছিলে—তিনি কতক রাস্তা গিয়াছেন তাঁহাকে বলিতেছ আমি ও রাস্তায় যাব না এই রাস্তায় আমাকে লইয়া চল। তিনি তাহাই করেন—তোমার দৃঢ় ভাবনা গেল, আবার কতক দূর গিয়া তোমার মতলব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল—আবার, তাঁহাকে অন্য পথে যাইতে বলিলে—তোমার ভাবনা শিথিল হইল, তুমি তাঁহাকেও ডাকিলে কিন্তু ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না, এক ধরিয়া থাকিলে না, ব্যস্ত হইয়া এটা একবার ওটা একবার করিলে তোমার সাধনা হইল না, তুমি দুর্ব্বল হইয়া গেলে—হতাশ আসিল তুমি সব ছাড়িতে প্রস্তুত হইলে ? কিন্তু ছাড়িবে কাহাকে ?

লোকে স্থূল দেহের সঙ্গম জনিত সুখকেই বড় বলিয়া জানে—আলিঙ্গনই বড় সুখের মনে করে, কিন্তু সমান চিত্তবৃত্তির সঙ্গম আস্বাদন যে করিয়াছে—এ সুখ যে ভোগ করিয়াছে এগুরু যাহার মিলিয়াছে সে আপাত রমণীয় সাধনার কথায় আপন পথ যদি উলটায়—তবে ইহা নিশ্চয় যে নূতন পথেও ঐরূপ অসন্তুষ্ট হইয়া বড় হাহাকার সে করিবে। কোথাও তাহার শান্তি হইবে না। শেষে বহু ক্লেশ পাইয়া আবার প্রথম স্থানেই আসিবে—বহু ব্যভিচার করিয়া, বহুবার শাস্ত্র বিধি উল্লঙ্ঘন জনিত পাপাচরণ করিয়া লম্পট হৃদয়ের কথায় লাম্পট্য করিয়া প্রাণেপ্রাণে দগ্ধ হইয়া, নানাপ্রকার দাগা খাইয়া—আবার সেই প্রথম স্থানেই আসিবে—আবার কাঁচিয়া তাহাকে প্রথম হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে।

তাই বলিতেছি যাহা করিয়াছ, তাহাও হইয়া গিয়াছে—আর করিও না। যাহা ধরিয়াছিলে তাহাতেই আইস। তাহাতেই দৃঢ় ভাবনা কর তোমার সর্ব্বসিদ্ধি হইবে।

আর একবার আলোচনা কর কি হইলে হয় ? এক রকম অবস্থা কিছু সবাই চায় না। এক ধর্ম্মও সকলের হইতে পারে না।

কেহ চায় ভগবানে নির্ব্বাণ হইয়া যাই, কেহ চায় যখন ইচ্ছা তাঁহাতে সমাধি করিয়া তাঁহার স্বরূপে আপন স্বরূপ মিশাইয়া থাকি আবার সমাধি বিরামে তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া তাঁহারই সহিত খেলা করি। আবার যখন ইচ্ছা তাঁহাতে এক হইয়া যাই।

খেলিবার স্থান দুইটি। এক হইয়া থাকিবার স্থান একটি। মহাকাশে খেলাটা স্থূলে হয়। মহাকাশেই স্থূল মূর্ত্তি দেখা যায়—মহাকাশেই তাঁহার স্থূল ভাবে জাগতিক খেলা হয়। সংসারে যেমন স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, গুরু, মাতা, পিতা ইত্যাদি ভাব—মহাকাশে যাহার যে ভাব ভাল লাগে সেই ভাবে তাঁহারই সহিত খেলা। মানুষ তখন আর মানুষ থাকে না—তিনিই মানুষ, পশু, পক্ষী, জল, স্থল, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বত, বৃক্ষ, নদী, চন্দ্র, নক্ষত্র, সূর্য্য কাল, রাত্রি—সব তিনি সাজিয়া বহু রঙ্গে খেলা করেন আমিই সর্ব্বদা সকল বস্তুকেই খেলা সঙ্গী পাইয়া পরমানন্দ ভোগ করি।

সূক্ষ্মভাবে খেলার স্থান চিত্তাকাশ। এখানে কোথাও যাইবার আবশ্যক নাই। চিত্তেই সমস্ত আছে—মানস পূজার ব্যাপার চিত্তাকাশে তাঁহার সঙ্গেই হয়। পরে পূজা জপ সমান চিত্ত বৃত্তির সঙ্গম জনিত আস্বাদন বড় সুন্দর ভাবেই চিত্তাকাশে হয়।

সর্ব্বশেষে সমাধিতে চিদাকাশেই এক হইয়া থাকা যায়।

নির্ব্বাণ চাও না অদ্বৈত ভাবে গিয়া ও দ্বৈতভাবে রঙ্গ করিয়া থাকিতে চাও ইহার নিশ্চয় তুমিই কর। চূড়ালা জীবন্মুক্ত হইয়াও শিখিধ্বজের সহিত রঙ্গ করিয়াছিলেন ইহা যদি তোমার অন্তরের বাসনা হয় তবে ঐরূপ দৃঢ় ভাবনা কর হইবেই।

কিন্তু এখানে একটু স্মরণ রাখা উচিত। রঙ্গ ভাল লাগে বলিয়া নিত্য কর্ম্ম বাদ দিও না। নিত্যকর্ম্ম সারিয়া, রঙ্গ সারিয়া প্রত্যহ আত্মবিচার অভ্যাস কর। এ আত্মবিচার আর কিছুই নহে—ঠিক জানিও আমি দেহ নহি, দেহের মধ্যে থাকি সত্য কিন্তু দেহের কোন ধর্ম্ম আমার নহে। জরা, মৃত্যু, রোগ, শোক দেহেরই হয়। আমার জরা, মৃত্যু, রোগ, শোক কিছুই নাই। আমার ভয় কিছুই নাই। আমি ইচ্ছা করিলে দেহ হইতে অন্যত্র যাইতে পারি সপ্তলোক ভ্রমণ করিতে পারি।

এই যে প্রকৃতি দেখিতেছি—ইহা আমি নহি। প্রকৃতি থাক বা না থাক তাহাতে আমার কিছুই যায় আসে না। এই ভাবে স্থূল প্রকৃতিকে উপেক্ষা কর।

আর সূক্ষ্ম প্রকৃতিই বাসনা। অনাদিকাল সঞ্চিত সংস্কার মনের মধ্যে আছে! ইহারাই বাসনারূপে মনের মধ্যে খেলা করে। যখন কোন বাসনা উঠে তখনই তাহাকে উপেক্ষা কর—ইহারা কিছুই নহে—ইহাদের কথা শুনিয়া, কি আর দেখিব, কি আর শুনিব। এই ভাবে সর্ব্ব সঙ্কল্পকে উপেক্ষা করিতে করিতে সঙ্কল্প ক্ষয় হইয়া যাইবে। যে মুহূর্ত্তে তুমি বাসনা ক্ষয় করিলে সেই মুহূর্ত্তেই তুমি মুক্ত হইলে।

এই আত্ম বিচারের সুবিধাজন্য অধ্যাত্ম শাস্ত্র গীতা যোগবাশিষ্ঠ ভাগবত অধ্যাত্ম রামায়ণাদি পাঠ কর। যে যে ভাবের উদয় হয়, তাহা আবার লিখিয়া রাখ। শাস্ত্রাদি পাঠ তাহাকেই শুনাইয়া কর। সৎশাস্ত্র অবলম্বনে তাঁহারই সহিত বিচার কর।

এইরূপে দ্বিতীয় প্রহর সময় হইলে মধ্যাহ্ন স্নান করিয়া মধ্যাহ্ন ক্রিয়া ইত্যাদি কর। মধ্যাহ্ন স্নানে তৈল মর্দ্দন করা যায় কিন্তু প্রাতঃ স্নানে তৈল ব্যবহার করিও না।

মধ্যাহ্ন ক্রিয়া পর পরে আবার তাঁহাকে শাস্ত্র পুরাণাদি পাঠ করিয়া শুনাও। লিখিতে ইচ্ছা হয় লেখ। সংসার কিছু দেখিতে হয় দেখ। এইরূপে সূর্য্য যখন অর্দ্ধেক অস্ত যান তখন হইতে সায়ং সন্ধ্যায় লাগ। পরে যে সময়টুকু পাও চুপ করিয়া শান্ত হইয়া যেন তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছি ভাবনা করিয়া বসিতে অভ্যাস কর। এইরূপ অভ্যাস নিত্য কর। যতটুকু পার কর হইবে।

চিত্তসমাধান।

১। মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার কর তবে চিত্ত ভগবানে স্থির হইবে। এ কার্য্য তোমার হইয়া অন্যে করিয়া দিলে হইবে না। তোমাকেই করিতে হইবে। অপরের দ্বারা তোমার মনের নিগ্রহ হইবে না।

(২) ভাবনা দ্বারা ভিতরে ঈশ্বরের চরণকমল স্পর্শ কর। কর্ম্মদ্বারা বাহিরে যাহাদের সঙ্গ হইয়া বাইবে তাহাদের চিত্তগত শ্রীভগবানকে সন্তোষ কর। ভিতরের ভাবনা, বাহিরের কর্ম্ম, এত দ্বারা চিত্ত নিরন্তর ঈশ্বর স্মরণ করিতে পারিলেই, চিত্ত আর বিষয় লইয়া উন্মত্ত রহিল না। চিত্ত তখন ঈশ্বরে সমাহিত হইল। ইহাই চিত্তশুদ্ধি। এই জন্য বলা হয় কর্ম্ম ভিন্ন চিত্ত শুদ্ধি নাই।

কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরের সেবা করিতেছি এই অনুভব হইতে থাকিলে কর্ম্মে আনন্দ। কর্ম্মে ঈশ্বরানুভব আনন্দ আসিলেই কর্ম্ম যোগরূপে পরিণত হইল। কর্ম্ম যোগরূপে পরিত হইলেই তাহা নিষ্কামকর্ম্ম হইল।

(৩) চিত্তশুদ্ধি হইলেই সব হইল না। চিত্তশুদ্ধির পরের কার্য্য আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ।

(৪) বৈরাগ্য দ্বারা বারম্বার ইন্দ্রিয় বশীকরণ অভ্যাস কর। যেন চক্ষুকর্ণাদি আর বাহিরে যাইতে না পারে। যখন যাইবে তখনই বৈরাগ্য স্মরণ কর করিয়া ভিতরে আইস।

(৫) মনকে বৈরাগ্যযুক্ত করিয়া বিচার করাও। মন বিচারকার্য্যে আলস্য করিলে স্মরণ করাইয়া দাও "জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুঃ" "অন্তবন্ত ইমে দেহা" মরণ ত আছেই কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া মরিবে কেন? কর্ত্তব্য করিয়াই মর। ইহা দ্বারা মন প্রবুদ্ধ হইয়া বিচার করিতে পারিবে। মনকে প্রত্যহ স্মরণ করাও—দেহ থাকিবে না, মনের সঙ্কল্প সমস্তই মিথ্যা—বিষয় ভাবনা সমস্তই মিথ্যা। ঈশ্বর বাদ দিয়া লোক রক্ষা, জগৎ রক্ষা, লোককে ভাল করা, পরের উপকার করা—এ সমস্তই মনের তরঙ্গ। পরম শান্তভাবে থাকিয়া ব্যবহারপরায়ণ হও—ইহাই কার্য্য।

(৬) মন খালি ইহা উহা ভাবনা করিয়াই কষ্ট পায়। সব মিথ্যা স্মরণ করিয়া দিয়া উহাকে আত্মসংস্থ কর। আত্মদর্শন হইবে। পরম শান্তভাবে অবস্থান করাই চরম কথা।

(৭) ইহা না পার ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ কর। বরণীয়ভর্গের উপাসনা কর। সূর্য্যের প্রকাশ দ্বারা তোমার মন বিষয় দেখিতে ছুটিয়া যায়। যখন অন্ধকার ছিল তখন মনটা অন্তরের মধ্যে থাকিয়াই হুটাপাটি করিতেছিল। আলোক যেমন আসিল অমনি সশরীরে বাহিরে ছুটিল। সূর্য্যের যে প্রকাশ বাহিরের বস্তু দেখাইয়া দেয় তাহা বরণীয়ভর্গ নহে। বরণীয়ভর্গ তাহা যাহা বাহির হইতে ভিতরে লইয়া যায়। যাহা আমাদের ধীশক্তিকে আপন পশ্চাতে লইয়া জ্যোতির্ম্ময় পরম শান্ত আনন্দধামে লইয়া যায়।

(৮) ইহাও না পার কল্পতরুমূলে মনিমণ্ডপে অর্দ্ধনারীশ্বর দেখ। ধারণাভ্যাসী হও। সুন্দর স্থান—ফুল, ফল, পশুপক্ষী, সাধু, ঋষি সকলেই সেই চন্দ্রকলামধ্যবর্ত্তী মণ্ডপে আছে। একই বস্তু নাম ও রূপে বহু হইয়া রহিয়াছে

তুমি নিত্য সেই লোকে আছ মনে রাখিয়া বাহিরে দেহ ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্যবহার-পরায়ণ হইবে। ইহাতেই সমাধি আসিবে।

(৯) ইহাও না পার সম্মুখে মূর্ত্তি রাখিয়া পুষ্পাদি দ্বারা পূজা কর এবং ইনি সর্ব্বজীবে আছেন মনে রাখিয়া কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বলোক সেবা কর। সমস্ত সময়ে জপ অভ্যাস কর। জপ ছাড়িয়া থাকিও না।

(১০) সর্ব্বক্ষণ জপ রাখিতে না পার প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে যখন প্রকৃতি ছন্দে ছন্দে স্পন্দিত হইতে হইতে পুরুষের সন্তোষ জন্য সঙ্গীত তুলেন সেই সময়ে সঙ্গীত দ্বারা প্রকৃতির সুরে সুর মিশাও। সঙ্গীত দ্বারাও মনকে ছন্দে আনিয়া—বল প্রভু! তোমার শরণাপন্ন হইলাম আমি তোমার হইলাম আমার মন বাক্য ও কর্ম্মকে তুমি চালাইয়া দিও। আমি আপনি আর ইহাদিগকে রক্ষা করিতে পারি না। এই প্রার্থনার পরে জপ কর। নিয়ম করিয়া কর। যতক্ষণ পার কর।

(১১) ইহাও না পার—বিশ্বাস কর তিনি সর্ব্বজীবে আছেন—তুমি কর্ম্ম-দ্বারা তাঁহারই সেবা করিতেছ ভাবিয়া কর্ম্ম কর।

(১২) ইহাও না পার—সর্ব্বজীবে তিনি আছেন মনে রাখিয়া মনে মনে প্রণাম অভ্যাস কর এবং তাঁহার কার্য্য যাহা লীলাগ্রন্থে পাঠ কর তাহাই ভাবনা কর ইহাতেও সমাধি লাগিবে।

(১৩) এই সমস্ত উপায়ের কোন একটিতে লাগিয়া থাক ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইবে, মন বৈরাগ্যপূর্ণ হইবে, শেষে বিচারপরায়ণ হইয়া আত্মদর্শন করিতে পারিবে।

তৎকুরুষ্বমদর্পণম্।

তাহা আমাতে অর্পণ কর।

তাহা কাহা?

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎকুরুষ্বমদর্পণম্॥

যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা তপস্যা কর তাহা আমাতে অর্পণ কর।

আমাতে কাহাতে ?

যাহার উপরে এই জগৎ ভাসিয়াছে তাহাতে। যাহাতে এই জগদ্দর্শন ভাসিয়া উঠিয়াছে, ভাসিয়া তাঁহাকেই যেন আবরণ করিতেছে তাহাতে। আবরণ করিয়া যাঁহাকে অন্যরূপে যেন দেখাইতেছে তাহাতে।

যাহাতে অর্পণ করিতে হইবে তাহাকে কি রূপে দেখা যাইতেছে।

সমুদ্রের উপরে যখন তরঙ্গ উঠে তখন যেমন সমুদ্রকে তরঙ্গরূপেই দেখা যায় সেইরূপে। রজ্জুতে যখন সর্প ভাসে তখন রজ্জুকেই যেমন সর্পরূপে দেখা যায় সেইরূপে। মরুভূমিতে সূর্য্যকিরণ পড়িয়া যেমন মরীচিকারূপে ভাসে সেইরূপে।

তরঙ্গ ত সমুদ্র ভিন্ন কিছুই নহে, মরীচিকা ত সূর্য্যকিরণ ভিন্ন কিছুই নহে, সর্প ত রজ্জু ভিন্ন কিছুই নহে—সেইরূপ জগৎ কি ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে ?

নিশ্চয়ই। ব্রহ্মে জগৎ নাই। মায়াতে বা অজ্ঞানে আছে। সমুদ্রকে যেমন তরঙ্গ ছাইয়া রাখে কিন্তু তরঙ্গ জল ভিন্ন কিছুই নহে সেইরূপ নাম রূপের তরঙ্গ পরমশান্ত ব্রহ্ম সাগরে ভাসিয়া ব্রহ্মকেই সৃষ্টিবৎ দেখাইতেছে। কিন্তু সর্পটি সত্য সত্য না থাকিয়াও যেমন রজ্জু অবলম্বনে ভাসে সেইরূপ নাম রূপ বিশিষ্ট এই জগৎ সত্য সত্য না থাকিয়াও ব্রহ্ম অবলম্বনে ভাসিয়াছে। "তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্রত্রিসর্গোঽমৃষা" সর্ব্বশাস্ত্র মত শ্রীভাগবতও ইহাই বলিতেছেন।

"তাহা আমাতে অর্পণ কর" এই বাক্যের অন্তর্গত তাহাও আমাতে এই দুইটি শব্দের অর্থ বলিলে। এখন বল অর্পণ কিরূপে করিতে হইবে ?

শুধু যাহা কর যাহা খাও—এই লৌকিক কর্ম্ম আর যজ্ঞ দান তপস্যাদি বৈদিক কর্ম্ম—শুধু তাই কেন ইহার ভিতরে বাক্য এবং ভাবনারূপ কর্ম্ম ও যাহা অনুস্যূত রহিল তাহাও যখন শ্রীভগবানে অর্পণ করিতে হইবে তখন অর্পণটি বেশ করিয়া জানিয়া লইয়া কর্ম্মার্পণরূপ সাধনায় লাগিয়া থাকা উচিত। সাধনা না করিলে শুধু জানায় কোন বিশেষ ফল নাই।

আমি অর্পণ করিতে অভ্যাস করিব তুমি বল।

আগুনে যখন ঘৃত অর্পণ কর তখন ঘৃতের কি দোষ দেখিতে পাও ?

কিছুই না শুধু আগুনটি জ্বলিয়া উঠে মাত্র।

তেমনি ঈশ্বরে কর্ম্ম অর্পণ তাহাকেই বলে যখন কর্ম্ম আর দেখা যায় না কর্ম্মের কথাও মনে থাকে না কেবল ঈশ্বরকে প্রজ্বলিতভাবে স্মরণ হয় মাত্র।

তবে কি স্মরণকেই অর্পণ বলিতেছ ?

উগ্রভাবে স্মরণ করিয়া কর্ম্ম কর। কর্ম্মের ফলাফল দেখিও না। শুধু শ্রীভগবানের সন্তোষ প্রার্থনা করিয়া কর্ম্মকে গৌণ করিয়া ফেল। কর্ম্মের আদিতে শ্রীভগবানকে উগ্রভাবে স্মরণ করিয়া কর্ম্মটা কিছুই নয় তাঁহার সন্তোষটিই প্রধান ভাবিয়া কর্ম্ম কর। ইহাই কর্ম্মার্পণ। যেমন যখন কাহারও সহিত কথা কহিতে যাও তখন যদি বল হে ভগবান্ আমি মূর্খ আমি কি কথা কহিব কহিতেই বা জানি কি—তুমি আমার মধ্যে থাকিয়া কথা কও—অথবা তুমিই আমাকে বলাও—এই ভাবিতে ভাবিতে যখন কথা কও তখন তোমার অহং কর্ত্তা অভিমানও থাকে না—আর তোমার কথাতে কেহ সন্তুষ্ট হইল বা অসন্তুষ্ট হইল ইহাতেও লক্ষ্য থাকে না—যখন এই ভাবে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে—মনে মনে উগ্রভাবে স্মরণ করিতে করিতে যখন কথা কওয়া হইয়া যায় তখন তোমার বাক্য শ্রীভগবানে অর্পিত হয়। এইরূপ সব। ইহা ভুলিও না। ইতি—

উপসংহার।

১৩২০সাল চৈত্র মাস। এই মাস বৎসরের শেষ বলিয়া উপসংহারের কালও বটে।

১৩১৩ হইতে ১৩২০—এই আট বৎসর ধরিয়া "উৎসব" বহুকথা আলোচনা করিল। কর্ম্মী, যোগী, ভক্ত ও জ্ঞানী—ইঁহাদের সাধনার কথা ও সাধ্য-উপাস্যের কথা নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে। সাধ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রের মীমাংসা এই যে যিনি নিগুর্ণ ব্রহ্ম তিনিই সমকালে সগুণ ব্রহ্ম, অবতার ও আত্মা।

ধর্ম্মই সমাজের ভিত্তি। যাহাতে সমাজ ধর্ম্মকে প্রধানভাবে অবলম্বন করিতে পারে, "উৎসবের" প্রধান চেষ্টা তাহাই। কালের গতি যতটুকু আমরা লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে আমাদের বোধ হয় ভারতে নবীন জগতের সমস্ত ধর্ম্ম আসিয়া প্রভুত্ব বিস্তার চেষ্টা করিতেছে। করিলেও লোকে এখন কিছু করিতে চায়—শুধু নাটক, উপন্যাস ও ডিটেক্‌টিভের গল্পের ক্ষণিক আমোদে অথবা কর্ম্মশূন্য পুস্তক অধ্যয়নের চিত্তবিনোদনে মানুষ আর তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছে না। সমাজ যেরূপ বিশৃঙ্খল ভাবে চলিতেছে তাহা উন্নতির চিহ্ন নহে। তবে পূর্ব্বের অসাড় ভাবের পরিবর্ত্তন ইহা বটে। সমাজ-শরীরের এই যে নড়াচড়া অবস্থা এ অবস্থায় বহু ব্যভিচার হওয়া সম্ভব। হইতেছে ও তাহা। কিন্তু ব্যভিচার বহুদিন ধরিয়া চলে না। কিছুদিন ব্যভিচার করিবার পরেই সমাজ তাহার বিষময় ফল ভোগ করিয়া অশান্ত হইয়া উঠে। উপস্থিত সময়ে সকল বিষয়ে অশান্তি এত বাড়িয়াছে যে মানুষ কোন কিছুতেই যেন সুখ পাইতেছে না।

বৎসর বৎসর দুর্ভিক্ষ, নানাবিধ রোগ, নানাজনের অকাল মৃত্যু, গ্রামে গ্রামে হাহাকার, অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, আহার্য্য বস্তুর অতিশয় মূল্যবৃদ্ধি—মানুষ বড় বিপন্ন—তাহার উপরে ভিতরের চরিত্রহীনতার জন্য সংসারে অশান্তি—মানুষ আর যেন সহ্য করিতে পারে না।

বহুলোকের প্রশ্ন "কি করিতে হইবে বলিয়া দিন। আমরা কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।"

জগতের উন্নতি ও সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুঃখ নিবৃত্তি—সমকালে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ ইহাই ছিল ঋষিগণের উপদেশ। "উৎসব" ঐ কথারই প্রতিধ্বনি মাত্র। যাঁহারা সাধনার রস বুঝিয়াছেন তাঁহারাও উৎসবে চির পরিচিত কথাই

পাইয়া থাকেন, আশা করা যায়। আর যাঁহারা নানাবিধ কর্ম্ম করেন তাঁহারাও শাস্ত্রপ্রদর্শিত কর্ম্ম কৌশল এখানে পাইতে পারেন আমরা এইরূপ মনে করি। শাস্ত্রশ্রদ্ধা, সাধ্য নির্ণয় এবং অধিকার ধরিয়া তপস্যা এই তিন বিষয় উৎসব বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতেছে।

(১) যাহাতে সমাজে শাস্ত্র শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হয় তজ্জন্য আমরা, শ্রীগীতা, গীতা পূর্ব্বাধ্যায়, রাময়ণের কথা, শ্রীভাগবত, যোগবাশিষ্ট, অধ্যাত্মরামায়ণ, উপনিষদের কোন কোন অংশ এবং ঋগ্বেদ—ইহাদের কতকগুলি বা পুস্তক আকারে কতক বা প্রবন্ধাকারে উৎসবে দিয়া থাকি। ৪০ পৃষ্ঠার কাগজে পুস্তকগুলি বেশী বেশী দেওয়া যায় না বলিয়া নানা প্রকারে এগুলি প্রকাশিত। সমস্ত পুস্তকগুলি শেষ হয় ইহা আমাদের ইচ্ছা। আগামী বর্ষে ইহাতে বিশেষ লক্ষ্য রাখা যাইবে।

ঋষিগণ আমাদের জন্য যাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা সেই পিতৃপিতামহাগত সম্পত্তির যদি যথা-যথভাবে উত্তরাধিকারী হইতে পারি তবে আমরা যে এই দুঃখময় জগৎকে স্বচ্ছন্দে অবহেলা করিয়া সেই সুখময় পরমধামে আশ্রয় লাভ করিতে পারিব সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই কারণে বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানমার্গের প্রধান গ্রন্থ যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ, ভক্তিমর্গের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অধ্যাত্মরামায়ণ ও শ্রীভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছি। পূর্ব্বে শ্রীগীতা আলোচনা করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে গীতা পরিচয় ও গীতাপূর্ব্বাধ্যায় বা ভারত সমর গ্রন্থে আমরা সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রের সার সার কথা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। গীতা গ্রন্থখানি সমস্ত আর্য্যশাস্ত্রের সার। ইহার আলোচনা করিতে গিয়াই আমরা গীতাপরিচয় ও গীতা পূর্ব্বাধ্যায় লিখিয়াছি। যদি সময় হয় তবে গীতা উত্তরাধ্যায়ে ভীষ্মপর্ব্ব হইতে মহাভারতের শেষ অংশ আলোচনা করিব।

আগামী বৎসর হইতে আমরা উৎসব সম্বন্ধে আরও মনোযোগ করিব। যাহাতে এই মাসিক পত্র একজনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন লেখক হইতে প্রবন্ধ সংগ্রহের চেষ্টা করা যাইবে, এবং ইহাকে যথাসম্ভব স্থায়িভাবে পরিচালিত করিবার জন্য অর্থ সঞ্চয়েরও চেষ্টা করা যাইবে। ভিন্ন ভিন্ন সাধকের লেখা সংগ্রহ করিতে পারিলে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলীর বৈচিত্র্য থাকাও সম্ভব।

যদি আমরা এইগুলি সংগ্রহ করিতে পারি তবে ভবিষ্যতে ইহার কলেবর বৃদ্ধিও করিবার ইচ্ছা রহিল।

(২) সাধ্য-নির্ণয় সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে নির্গুণ ব্রহ্ম যিনি তিনিই সমকালে সগুণব্রহ্ম, অবতার ও আত্মা। প্রতি বস্তুতে যে স্থূল দেহ দেখা যায়—তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দেহ নহে। জগতের সমস্ত বস্তুর দেহগুলির সমষ্টি যাঁহার দেহ, তিনিই বিরাট। আবার প্রতিস্থূলের মধ্যে যে ব্যাপক সূক্ষ্মদেহ আছে তাহার সমষ্টি যাঁহার দেহ তিনি হিরণ্যগর্ভ। আবার সূক্ষ্ম সমস্ত বস্তুর কারণ সমষ্টি যাঁহার দেহ, তিনি প্রাজ্ঞপুরুষ বা ঈশ্বর। বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর যাঁহার মায়িক অভিব্যক্তি তিনিই তুরীয়, তিনিই নির্গুণব্রহ্ম। নির্গুণব্রহ্ম সর্ব্বদা আপন স্বরূপে থাকিয়াও সমকালে বিরাট, হিরণ্যগর্ভও ঈশ্বর। আবার সেই নির্গুণব্রহ্মই এক সময়ে অবতারও আত্মা। এই বিষয়টির ধারণা ভিন্ন শাস্ত্রশ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। হিন্দু মাত্রেরই এই বিষয় পরিষ্কার রূপে বুঝা আবশ্যক। কারণ সাধ্য বস্তুর নিশ্চয় না হইলে সাধনার পথে উৎসাহের সহিত চলা অসম্ভব। উৎসব এইজন্য এই বিষয়ও বিশেষরূপে আলোচনা করে। আর এই সম্বন্ধে যে কেহ কোন সন্দেহজনক প্রশ্ন করিবেন উৎসব তাহারও যথার্থ উত্তর দিতে প্রাণপণ করিবে।

(৩) অধিকারী ধরিয়া তপস্যা—এই বিষয়টিতে উৎসবের বিশেষ লক্ষ্য। তপস্যাই হিন্দু জাতির বিশেষত্ব। তপস্যা-শূন্য হইয়াই এই জাতি নিঃসার হইয়া পড়িতেছে। ঈশ্বর-শূন্য হইয়াই—তপস্যা-বর্জ্জিত হইয়া সংসার করা অসম-সাহসিকতা। অন্ততঃ ভারতের পক্ষে ইহা নিতান্ত ব্যভিচার। যে যে বিষয়ের অধিকারী, তাহার জন্য শাস্ত্র সেইরূপ সাধন পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উৎসব সেই সাধনার কথা বহুভাবে আলোচনা করিতেছে ও করিবে। সর্ব্বসাধারণের জন্য সাধনার মূল ভিত্তিটি উল্লেখ করিয়া আমরা এই উপসংহারের উপসংহার করিতেছি। সাধনাকেই উৎসবের বিশেষত্ব বলা হইয়াছে। কিন্তু ভগবান প্রসন্ন হও—এইটিতে উৎসব বোধ না করিতে পারিলে সকল উৎসবই মৌখিক। কর্ম্মী যিনি তিনি লৌকিক সমস্ত কর্ম্মে ভগবান প্রসন্ন হও যদি অভ্যাস করিতে না পারেন তবে তাঁহার কর্ম্ম শুধুই পরিশ্রম মাত্র। সে কর্ম্মের ফল বন্ধন।

যোগী যিনি তিনি যদি প্রাণায়াম, কুম্ভক, ধারণা ইত্যাদি ব্যাপারে ভগবান্

প্রসন্ন হও ইহার অনুভবে অভ্যাস করিতে না পারেন তবে তিনি যুক্ততম অবস্থা লাভ করিতে পারেন কি না সন্দেহ।

সন্ধ্যা-পূজাপরায়ণ ব্রাহ্মণ যিনি তিনি যদি সন্ধ্যা পূজাদি বৈদিক কর্ম্মে এবং সংসারের লৌকিক কর্ম্মে ভগবান্ প্রসন্ন হও ইহার অনুভব অভ্যাস করিতে না পারেন তবে তিনি মৌখিক সন্ধ্যা পূজার ঘরে আটকাইয়া থাকিবেন; কবে যে তাঁহার জ্ঞানের স্ফুরণ হইবে বলা যায় না। ভক্ত যিনি তিনি যদি মানস পূজায় বা বাহ্য পূজায় বা অন্য সমস্ত কার্য্যে ভগবান প্রসন্ন হও ইহার অনুভব অভ্যাস না করিতে পারেন তবে শ্রীভগবানের প্রসঙ্গ কালেও তিনি শ্রীভগবান লইয়া থাকিতে সর্ব্বদা পারিলেন না। অবিচ্ছেদে তৈলধারাবৎ তাঁহার চিত্ত শ্রীভগবানে ডুবিয়া থাকিল না। তিনি কখন পাইলেন রস কখন পাইলেন হা হুতাশ। জলের ধারা বিন্দু বিন্দু ভাবে পড়ে—ধারার বিচ্ছেদ আছে কিন্তু তৈলধারার বিচ্ছেদ নাই। ধারণা জলবিন্দুর ধারা এবং ধ্যান তৈলধারা। যদি ভক্ত জলবিন্দুর ধারার মতই চিরদিন রহিলেন তবেত অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং হওয়া হইল না; তবে আর শ্রীভগবান তাঁহাকে বলিবেন না তেষামহং সমুর্দ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ। এই যদি না হইল তবেত আর যথার্থ ভক্ত হওয়াও হইল না। যদি ভক্ত হওয়াই না হইল তবে ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ইহার সহায়তা পাওয়া যাইবে কিরূপে? আমি তোমার ভক্ত এই বলিলেই কি ভক্ত হওয়া গেল? তোমার আজ্ঞাপালন যখন রসের সহিত করিতে পারিলাম—তোমার প্রসন্নতার যখন সর্ব্বদা অনুভব করিতে লাগিলাম তখনই ভক্ত হওয়া হইল।

লৌকিক কর্ম্মে তোমার প্রসন্নতার অনুভব—ইহা আমরা আলোচনা করিব না। যে সমস্ত বৈদিক কর্ম্মে তোমার প্রসন্নতার অনুভব অভ্যাস করিতে তোমার আজ্ঞা, এবং যাহা যাহা আমরা এই কয়েক বৎসর ধরিয়া আলোচনা করিয়াছি তাহারই উপসংহার ইহা।

আজকাল তপস্যার অভাব দেখিয়া এবং আজকালকার মানুষের দুর্ব্বলতা দেখিয়া আমরা বলিয়াছি কঠিন তপস্যা বহুলোকেই পারে না। সহজ হইতেই আরম্ভ করা উচিত। যিনি পারেন তিনি ক্রমে কঠিন তপস্যাতে চলুন। কঠিন তপস্যা, বল বৃদ্ধি ভিন্ন হইবে না। তপস্যাই চিত্তের বল বৃদ্ধি করে।

"যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোঽস্মি" শ্রীভগবান্ যজ্ঞের মধ্যে জপকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।

এই জপের কথা বহুবার আলোচনা করা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে শুনা যায় উৎসব দেখিয়া কেহ কেহ কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কেহ বা ত্যক্ত কর্ম্ম আবার সুরু করিয়াছেন। যদি কথা সত্য হয় তবে জপের মধ্যে উপসংহারের কথাটি বলিয়াই আমরা এখনকার মত উপসংহার করিলাম।

যাঁহারা শুধু জপ করেন তাঁহাদের বহু সময় ইহাতে দেওয়া চাই। বহুকাল ধরিয়াও অভ্যাস করা চাই। আবার প্রাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় যে জপ করা হইল সমস্ত দিনও রাত্রির জাগরণ কাল পর্য্যন্ত সেইরূপ রাখিতে হইবে। যাঁহাদের অন্য কর্ম্ম আছে তাঁহারা অবিচ্ছেদে রাখিতে পারিবেন না সত্য কিন্তু জলবিন্দু ধারার মত পুনঃ পুনঃ জপে আসা উচিত। এই ভাবে অভ্যাস করিলে ক্রমে যাহা কিছু করা যাক্ না কেন জপ সর্ব্বদাই চলিবে।

জপটি তুমি প্রসন্ন হও বলিয়া করিতে হইবে। ইহাই প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা এই যে জপকালে যে নাম বা যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জপ করিতে হয় সেই নামটি বা মন্ত্রটি স্বকর্ণে শুনিয়া শুনিয়া যেন জপকরা হয়। আপনার উচ্চারিত জপধ্বনি বা মানসোচ্চারিত মন্ত্রধ্বনি যখন স্বকর্ণে শুনার অভ্যাস হয় তখন আর মন অন্য বিষয় চিন্তা করিতে পারে না। অন্য চিন্তা যখন হয় তখন সেই চিন্তার ভাষা বা শব্দ কর্ণে শুনা যায় এবং তাহাতে মনোযোগ করিতেও হয় কিন্তু নিজের জপধ্বনি যখন শোনা যায় তখন ঐ নিজ-শ্রুত জপের ধ্বনিতে মনোযোগ হইবেই। মনোযোগ হইলেই অন্যচিন্তা আপনি উঠিবে, আপনি লয় পাইবে, শেষে আর উঠিবেই না। এই ভাবে জপের দ্বারা মনস্থির হইবে। কিন্তু যাঁহারা ভগবান প্রসন্ন হও বলিয়া জপ করেন না তাঁহারা মন স্থির হইলেও মনটা ফাঁকা হইয়াছে ইহাই দেখিবেন। মনটা ফাঁকা হওয়া অর্থ মনকে বিষয় চিন্তা হইতে প্রত্যাহার করা। কিন্তু জপটা অভাব বস্তু নহে, ফাঁকা ও নহে। নামের পশ্চাতে যে নামী আছেন তিনি নির্গুণ, সগুণ, অবতার ও আত্মা। সাকার যখন তখন তাঁহার লীলা রসে মন পূর্ণ হওয়াই নাম জপের কার্য্য।

বিশ্বরূপ যখন তখনও যাহা দেখি বা যাহা শুনি বা যাহা ভাবি সব তুমি এই ভাবনায় চিত্ত পূর্ণ হওয়া আবশ্যক, আবার নিরাকার হইলেও তুমি জগতের সমস্ত বস্তু হইতে স্বতন্ত্র, তুমি নিঃসঙ্গ, তুমি অখণ্ড, তুমি অপরিচ্ছিন্ন, তুমি শূন্যকেও ওতঃপ্রোত ভাবে ধরিয়া আছ, তুমি শূন্য অপেক্ষাও ব্যাপক, তুমি

ঐ মহাশূন্য স্বরূপ হইলেও শূন্যের মত ফাঁকা নও, অভাব পদার্থ নও—তুমি সৎ তুমি নিত্য; তুমি চিৎ তুমি জ্ঞান স্বরূপ; তুমি আনন্দ। তুমি সচ্চিদানন্দ, তুমি চৈতন্য। তুমি ভিন্ন সমস্তই জড়, সমস্তই ইন্দ্রজাল। সমস্তই মিথ্যা। এই ভাবে নিজ আত্মার যে প্রসার, তাহাতে যে অবস্থিতি তাহাই অক্ষরোপাসনার ফল। আপন নিঃসঙ্গ ভাবে স্থিতিই ব্রাহ্মীস্থিতি। যিনি ইহা না পারেন তাঁহার জন্য সবই তুমি—বিশ্বরূপ; তোমার ভূভুর্বঃস্বঃ—সপ্তলোক ঊর্দ্ধে সপ্তলোক অধে, তুমি সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া দাঁড়াইয়া আছ। তুমি ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। সর্ব্বত্রই তুমি সবই তুমি।

অব্যক্ত উপাসনায় তুমি সব হইতে ভিন্ন। বিশ্বরূপ উপাসনায় তুমি সমস্ত। আবার সাকার উপাসনায় বিশ্বরূপ-ঘনীভূত ক্ষুদ্র মূর্ত্তিও তুমি। তুমি মায়া মানুষ ও মায়া মানুষী।

জপে এইগুলি হইবে। শুধু জপে বহু বিলম্ব। কিন্তু প্রাণায়ামের সহিত যে জপ তাহাতে শীঘ্র হয়। অবার কুম্ভকে যে জপ তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে অতিশীঘ্র হয়।

কুম্ভকে যে জপ তদ্দ্বারা ভিতরে একটা নিস্তব্ধতা অনুভব হয়। এই নিস্তব্ধতাটা বাহিরের যে শব্দ-তরঙ্গে জগৎ ডুবিয়া আছে তাহার ভিতরের বস্তু। এই চলন রহিত ভাবের সঙ্গে আনন্দ আছেই। কিছুদিন অভ্যাস করিলে যখন নিস্তব্ধতা বেশ স্থায়ী হয় তখন কুম্ভকে সেই নিস্তব্ধতার সঙ্গে একটা জ্যোতি ভাসিতে থাকে। সেই নিস্তব্ধ মেঘে বিদ্যুতের গতাগতির মত একটা জ্যোতি ছুটিয়া বেড়ায়। ক্রমে সেই আলোক স্থির হইয়া দাঁড়ায়। সেই স্থির সৌদামিনী আলোকে বহু অপূর্ব্বরূপ দেখা যায়; সেই আলোক যখন আয়ত্ত হয় তখন সেই আলোক লইয়া দেহের সপ্তস্থানও দেখা যায়। পরম শিবের পাশে পরম শিবাকেও দেখা যায়। কুম্ভক জপে এই সব হয়।

জ্ঞানের কথা এখানে বিশেষ রূপে বলা হইল না। অব্যক্তের উপাসনাই জ্ঞান। জ্ঞানীর ঈশ্বর অব্যক্ত, ইহা জ্ঞেয় ঈশ্বর। ভক্তের ঈশ্বর ধ্যেয় ঈশ্বর। ভক্তি লাভ করিলেই জ্ঞান। জ্ঞানেই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দে স্থিতি।

ওঁ

৺ দোলযাত্রা উপলক্ষে

শ্রীশ্রীশ্বরী সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের নিত্যদোল-সঙ্গীত।

বাহার একতালা।

দোলে, দোলে বিশ্ব-জননী।
অনন্ত নির্গুণে বাঁধি দোলাখানি,
অনন্ত সঙ্গিনী অনন্তরূপিণী,
অনন্ত কালের নিমেষ গণি॥ (দোলে)

১। কেহ বলে মাকে নাদ-স্বরূপিণী,
কেহ বলে সম্বিৎ সন্ধিনী হ্লাদিনী,
ইচ্ছা-ক্রিয়া-জ্ঞান-শক্তি-বলে জ্ঞানী,
(মা আমার) সচ্চিদানন্দ-রূপিণী॥

২। নির্ব্বিকার হৃদে দোলে নিত্যদোলে,
কত নাগর-দোলা দোলে সে হিল্লোলে,
ব্রহ্মময়ী মায়ের এই নিত্যদোলে,
পরব্রহ্মের "বিলাস" দেখে জ্ঞানী॥ (নিষ্কল)

৩। এদিকে দোলনে কল্পারম্ভ হয়,
সুপ্ত বিশ্ববীজ নিষ্কলে কলয়, (১)
প্রকৃতি উন্মেষে, শ্যাম রসময়—
গোপাল-ভাব ব্রহ্মে অমনি॥ (দেখে জ্ঞানী)

৪। ওদিকে দোলনে প্রাকৃত প্রলয়—
পুরুষ প্রকৃতি পায় ব্রহ্মে লয়,
ধ্বস্ত বিশ্ববীজ ব্রহ্মে করে শয়,
ব্রহ্ম তখন 'শিব' শূলপাণি॥ (দেখে জ্ঞানী)

৫। এ দোল-রহস্য বুঝিলে কৌশলে,
পড়িবে না মন ভেদ-জ্ঞান-জালে,
দেখ ব্রহ্মকোলে ব্রহ্মময়ী দোলে,
অভিন্ন জনক জননী॥ (দেখ)

---

(১) কলয়—অঙ্কুরিত হয়। (প্রাপ্ত)

সাকারের সহিত পূর্ণত্বের যোগ হয় না। যেহেতু যিনি পূর্ণ তিনি নিরাকার। যদি তিনি পূর্ণই হইলেন তবে তিনি বিশ্বাত্মারূপে জীবভাবে ভাসেন কিরূপে?

তিনি যে বিশ্বাত্মারূপে ভাসেন "ব্রহ্মণো বিশ্বমাভাতং" তদ্ধি স্বার্থং বিচক্ষিতম্। যৎ বিশ্বাত্মনা ভাতং তদ্ধি স্বার্থং স্বস্বরূপলাভ প্রয়োজনসিদ্ধয়ে বিচক্ষিতম্ দিদৃক্ষিতম্। আপনি আপনি কি তাহা দেখাইবার জন্য, তিনি আপনা হইতে পৃথক্ যে জীব তাহা সাজেন। আপনি আপনি ভাবটি কত সুখের তাহার আস্বাদন জন্যই ব্রহ্ম জীবভাব গ্রহণ করেন। যদি জীবভাবে তাঁহার ভাসা হয় বল, তবে ঐ কথাই বলিতে হয়—আপনি আপনিভাবে নিত্যস্থিত যিনি তিনি অবস্থান্তর লাভ করিয়া তবে আপনাকে আপন আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন—তাই জীবভাব। ইহা লীলা, ইহা মায়িকমাত্র। সত্যকথা এই—পূর্ণ হইতে পূর্ণই প্রসারিত হন। পূর্ণে পূর্ণই অবস্থান করেন। এইজন্য বলা হয় বিশ্ব বা বিশ্বাত্মা উৎপন্ন হয় নাই। "অতোবিশ্বমনুৎপন্নম্"।

তবে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে—পরিদৃশ্যমান্ জগৎরূপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তাহা কি? "যচ্চোৎপন্নম্" তাহা কি?

"তদেব তৎ" তাহা তাহাই। তিনিই তিনি। যদি কিছু উৎপন্ন হয় বল তাহা আপনিই আপনি। যাহা কিছু ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় তাহা ব্রহ্মই। কিছুই উঠে নাই। যদি বলি জগৎ উঠিয়াছে তবে বলিব জগৎ জগৎ নহে ব্রহ্মই। তবেই পাওয়া গেল যাহা দেখিতেছ তাহা রজ্জুতে সর্প। এটা ভ্রমে দেখ। সর্প আদৌ উৎপন্ন হয় নাই। রজ্জু রজ্জুই আছেন। ব্রহ্ম আপনিই আপনি কোন কিছুই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় নাই এইটি খাঁটি সত্য। আত্মমায়া দ্বারা দর্পণ দৃশ্যমান্ নগরীতুল্য এই বিশ্ব কল্পনায় অন্তরে উঠিয়া নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু দর্পনের ন্যায় বাহিরে দেখা যাইতেছে। এটা স্বপ্ন দেখা মাত্র। এটা ভ্রম।

জগৎটা কি ইহা জানিতে গিয়া যখন জানা গেল জগচ্ছব্দার্থতাটি এক রস সম্পুর্ন তখনই বুঝিতে পারা গেল পরমাত্মা হইতে চেত্য বলিয়া কোন কিছু উঠা অসম্ভব। আস্বাদক বলিয়া কোন কিছু থাকাই যখন অসম্ভব তখন আবার "আস্বাদিতে ইচ্ছা হয়' ইহা কিরূপ? অনুভবকর্ত্তাই যখন নাই তখন মরীচিমালীর তীক্ষ্ণতা আবার কি?

আমরা বলি জ্ঞানীর পক্ষে দৃশ্যদর্শন বলিয়া কিছুই নাই। কাজেই ব্রহ্ম ও

জগৎ এক রূপেই প্রতীত। এক রস ব্রহ্মে চিত্ত বা চৈত্য ইত্যাদি ভাব অসত্য হইলেও সত্যমত প্রতিভাত হয়। চেত্যভাব অথবা চিত্তাদিই যখন নাই তখন জীব হইতেছে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব এ কথাটা কি? উপাধির অভাব এ জন্য "প্রতিবিম্ব জীবভাব" হওয়াটাও অসম্ভব। বিম্বও যেমন উঠে নাই, জীবভাবও হয় নাই। এইটিই সত্য। আপনিই আপনি আছেন। অন্য সমস্তই মায়িক।

পরমাণু হইতেও পরমাণু, অণু হইতেও অণু, শুদ্ধ, সূক্ষ্ম, আকাশের অভ্যন্তর অপেক্ষাও পরমশান্ত। দিক্‌কালে তাঁহার রূপ অবচ্ছিন্ন বলিয়া তিনি অতি বিস্তৃত।

তিনি অনাদি। তিনিই তিনি। তিনি আবার ভাসিবেন কোথায়?

যাহাতে ভাসিবেন সেরূপ বস্তুই নাই। যে পরমাত্মা চিৎরূপত্ব পর্য্যন্ত লাভ করেন না—তাঁহাতে আবার জীবত্ব কোথা হইতে আসিবে? তবে বল দেখি চিত্ততাকারা নিত্য বাসনা কিরূপে হয়? যেখানে চিৎরূপের অনুদয়, যেখানে জীবত্বের অভাব, সেখানে আবার বুদ্ধিতা, চিত্ততা, ইন্দ্রিয়ত্ব, বাসনা এসব কোথা হইতে আসিবে?

এইরূপে মহা আড়ম্বরপূর্ণ হইয়াও সেই অজর, আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, শান্ত, পরমপদ আমাদের দৃষ্টিগোচরে অবস্থিতি করিতেছেন।

রাম—আমার বোধ বৃদ্ধির জন্য আবার বলুন সেই অনন্ত জ্ঞানাকার পরমাত্মাকে কিরূপ ভাবে অনুভব করা যায়?

বশিষ্ঠ—মহাপ্রলয়ে সর্ব্বকারণের কারণ যে পরমব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকেন তিনি যেরূপ ভাবে অনুভূত হয়েন তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর।

নাশয়িত্বা স্বমাত্মানং মনসোবৃত্তিসংক্ষয়ে।
সদ্রূপং যদনাখ্যেয়ং তদ্রূপং তস্যবস্তুনঃ ॥৩৯
নাস্তিদৃশাং জগদ্দ্রষ্টা দৃশ্যাভাবাদ্বিলীনবৎ।
ভাতীতিভাসনং যৎ স্যাৎ তদ্রূপং তস্য বস্তুনঃ ॥৪০

মহাপ্রলয়ে নিরোধসমাধিতে মনোবৃত্তিসমূহ বিলীন হইলে মন যখন ইন্ধন-শূন্য অগ্নির মত হয়—তখন মনের স্বরূপ পর্য্যন্ত নাশ করিয়া আখ্যাশূন্য স্বপ্রকাশ সৎরূপ যাহা অবশিষ্ট থাকেন তাহাই পরমাত্মার রূপ।

মহাপ্রলয়ে যখন নির্ব্বিকল্প সমাধি আরম্ভ হয় তখন কোন দৃশ্য নাই

কাজেই জগদ্দর্শন অভাবে জগদ্দ্রষ্টাও বিলীনবৎ ভাসেন এই কালে ত্রিপুটীলয় ভাসনরূপ—সাক্ষিরূপ বোধস্বরূপ যিনি থাকেন তিনিই তাঁহার রূপ।

চিতের্জ্জীবস্বভাবায়া যদচেত্যোন্মুখং বপুঃ।
চিন্মাত্রং বিমলং শান্তং তদ্রূপং পরমাত্মনঃ ॥৪১

আবার মহাপ্রলয় অন্তে সমাধিব্যুত্থান প্রাক্কালে চিৎ যখন ভাবি জীবস্বভাব প্রাপ্ত হইবেন, যখন চেত্যোন্মুখ হইবেন, তখন চিতির যে অচেত্যোন্মুখ বপু—আপনি আপনিস্বরূপ সেই চিন্মাত্র বিমল শান্তরূপই পরমাত্মার রূপ।

রাম—সমাধিপ্রাক্কালে ও ব্যুত্থানকালে পরমাত্মা যেরূপে অনুভূত হয়েন তাহা ত বলিলেন কিন্তু সমাধি মধ্যকালে তিনি কেমন তাহা ত বলিলেন না?

বশিষ্ঠ—সমাধিমধ্যকালেও পরমাত্মার রূপ স্ফুরণ হয় কিন্তু তাহা এত সূক্ষ্ম যে আরুরুক্ষু-যোগী অভ্যাস অবস্থাতে তাহা লক্ষ্য করিতে সমর্থ নহেন তজ্জন্য আদি ও অন্তই দেখাইলাম।

আরও বলি শ্রবণ কর:—বায়ু অঙ্গলগ্ন হইতেছে কিন্তু তাহার কোন অনুভব হইতেছে না। যেরূপ অবস্থায় চিত্তের এই নির্ব্বিকার রূপ অনুভব হয়—সেই অবস্থার রূপই পরমাত্মার রূপ। আরও:—

অস্বপ্নায়া অনন্তায়া অজড়ায়া মনঃস্থিতেঃ।
যৎরূপং চিরনিদ্রায়াস্তত্তদানঘ শিষ্যতে ॥৪৩॥

স্বপ্নবর্জ্জিত, অন্ত বা পরিচ্ছিন্নবর্জ্জিত, জাড্যবর্জ্জিত মনের যে বিশ্রান্তি সেই কালে যে চিরনিদ্রা বা সুষুপ্তি মহাপ্রলয়ে সেই রূপই অবশিষ্ট থাকে।

রাম—বায়ু শরীরে লাগিবে অথচ অনুভব হইবে না ইহা কিরূপে হয়?

বশিষ্ঠ—সমস্ত শরীরে চৈতন্য ছড়াইয়া রহিয়াছে বলিয়াই না কোন কিছু শরীরে লাগিলে তাহার অনুভব হয়? কিন্তু সাধনা দ্বারা যখন সমস্ত শরীর হইতে চৈতন্যকে তুলিয়া লওয়া যায় তখন শরীরটা শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের মত মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। শুষ্ক কাষ্ঠকে যখন বায়ুস্পর্শ করে তখন তাহার অনুভব কি হয়?

রাম—কোন্ সাধনায় শরীর হইতে চৈতন্য গুটাইয়া লওয়া যায়?

বশিষ্ঠ—যে বস্তুতে মনকে একাগ্র করিবে চৈতন্যও একাগ্র হইবার বস্তুতে গুটাইয়া আসিবেন। সূর্য্য হইতে কিরণ যেমন ছড়াইয়া পড়ে আত্মা হইতেও চৈতন্যশক্তি সেইরূপ যে বস্তুতে ছড়াইয়া পড়িবে তাহাই সমস্ত জাগতিক

ব্যাপার অনুভব করিবে—চৈতন্য আছেন বলিয়া। কিন্তু সূর্য্যরশ্মির মত চৈতন্য শক্তিগুলিকে তুলিয়া লইয়া যদি চৈতন্যের আধার, যে আত্মা সেই আত্মাতে উহাদিগকে প্রেরণ করা যায়—যদি আত্মাতে মনঃসংযোগ করা যায়, আত্মাতে মনকে একাগ্র করা যায় তবে দেহটা জড়ের মত পড়িয়া থাকে। বায়ুর স্পর্শ ইহা তখন আর অনুভব করিবে কিরূপে? দেখ না কেন ডাক্তারেরা যখন অস্ত্র করেন তখন রোগীকে ঔষধ প্রয়োগে অজ্ঞান করিয়া ফেলেন অর্থাৎ শরীর হইতে চৈতন্যটাকে লোপ করেন। কিরূপে লোপ করেন, চৈতন্য তখন কোথায় থাকে তাহা তাঁহারা বুঝাইতে না পারিলেও শরীরে চেতন থাকে না বলিয়া শরীরটাকে কাটাকুটি করিলেও কিছুই তখন অনুভব হয় না। আবার শরীরে চেতনা ফিরিয়া আসিলে তবে যাতনা অনুভব হয়। স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে এইরূপ চেতন্য-স্থূলশরীর ছাড়িয়া কোথাও যন। কিন্তু সাধক যখন আত্মাতে মন একাগ্র করিয়া শরীর হইতে চেতনাকে গুটাইয়া লইতে পারেন তখন তিনি সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। একাগ্র সমাধির পরেই নিরোধ সমাধি আপনা হইতে লাভ হয়। চেতন সমাধিতে সাধক—পরিপূর্ণরূপে আপনি আপনি ভাবে স্থিতি লাভ করেন। তিনি তখন সম্পূর্ণ সজাগ। তাঁহার ইন্দ্রিয় সমূহ অবুদ্ধি পূর্ব্বক কার্য্য করে বলিয়াই তিনি কর্ম্ম করিয়াও অনাসক্ত বলিয়া কর্ম্মফল যে সুখ বা দুঃখ তাহাতে জড়িত হন না। রাম! তোমাকে সেই চেতন সমাধি অবস্থায় আনিবার জন্যই আমি পরমাত্ম-বস্তুটি আগে বুঝাইতেছি।

রাম—আর একটি কথা এখানে জিজ্ঞাসা করিতে চাই।

বশিষ্ঠ—বল।

রাম—যিনি পূর্ণ তাঁহার কি কখন স্বস্বরূপের বিনাশ হয়? আত্মা যখন অবতার গ্রহণ করেন, ব্রহ্ম যখন মায়া আশ্রয়ে মায়া মানুষ মূর্ত্তি ধারণ করেন তখন কি তিনি পরিচ্ছিন্ন হন না?

বশিষ্ঠ—আচ্ছা বল দেখি তোমার মন ত অনন্ত সঙ্কল্প লইয়া থাকে। সমুদ্র হইতে লহরী উঠার মত তোমার মন হইতে কোটি কোটি সঙ্কল্প উঠিতে পারে। তুমি যদি কোন সঙ্কল্পে অভিমান না কর তবে তোমার অখণ্ড স্বরূপের কিছুই ত ক্ষতি হয় না। কিন্তু যখন তুমি অনন্ত সঙ্কল্পের মধ্যে কোন একটি সঙ্কল্পকে "আমার সঙ্কল্প" বলিয়া অভিমান কর তখন তুমি অপরিচ্ছিন্ন থাকিয়াও পরিচ্ছিন্ন মত বোধ কর কি না? সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে যখন মায়িক তরঙ্গ